॥ পূর্ণ পরমাত্মনে নমঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত

জীব আমাদের জাতি, মানব (Mankind) ধর্ম আমাদের।

হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ঈসাই পৃথক কোন ধর্ম নয়।

অবশ্যই দেখুন

সন্ত রামপাল জী মহারাজের মঙ্গল প্রবচন

প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭:৩০ থেকে ৮:৩০ পর্যন্ত।
প্রতিদিন দুপুর ২:০০ থেকে ৩:০০ পর্যন্ত।
প্রতিদিন সকাল ৬:০০ থেকে ৭:০০ পর্যন্ত।
প্রতিদিন সকাল ৫:৫৫ থেকে ৬:৫৫ পর্যন্ত।
প্রতিদিন সকাল ৬:০০ থেকে ৭:০০ পর্যন্ত।

ধর্মার্থ মূল্য - 30/-

লেখক : তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল জী মহারাজ

প্রকাশক :
প্রচার প্রসার সমিতি ও সর্ব সংগত সতলোক আশ্রম, হিসার, টোহনা রোড বরবালা
জেলা - হিসার (প্রান্ত- হরিয়ানা) ভারত।

মুদ্রক :- কবীর প্রিন্টার্স

C- 177 , সেক্টর- 3, ববানা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নিউ দিল্লী।

সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ (মন্ত্র দীক্ষা) প্রাপ্ত করার জন্য এবং অধিক তথ্য জানার জন্য এই নম্বর গুলিতে যোগাযোগ করুন :-

Contact No. For Bangali Language :
88829 14911, 8450030878, 83730 02290, 6295917636

সম্পর্ক সূত্র :- 8222880541, 8222880542, 8222880543
8222880544, 8222880545

Visit us at : www.jagatgururampalji.org
e-mail: jagatgururampalji@yahoo.com

সূচী পত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা সংখ্যা নং
1.	ভূমিকা	I
2.	দুটি কথা	IV
	• মক্কা মহাদেবের মন্দির	7
3.	গীতার সত্য সার	8
	• শ্রী ব্রহ্মা জী, শ্রী বিষ্ণু জী তথা শ্রী শিব জীর মাতা পিতা কে?	13
4.	সন্দেহের সমাধান	15
	• গীতাতে দুই প্রকারের জ্ঞান আছে	40
	• পান্ডবদের দ্বারা করা যজ্ঞ	41
	• কোন-কোন মহাত্মা পরমাত্মার দর্শণ পেয়েছেন ?	52
	• গীতা অনুসার ব্রত করা কি ঠিক?	57
	• গীতা অনুসার শ্রাদ্ধ-পিন্ড দান করা কি উচিত ?	57
	• শ্রাদ্ধ পিন্ড দানের প্রতি রূচী ঋষির মতবাদ?	57
	• জিন্দা বাবার দ্বিতীয় বার অন্তর্ধ্যান	63
	• অন্য সন্তের সঙ্গে ধর্ম দাসের জ্ঞান চর্চা	65
	• হিরণ্যকশিপুর কথা	75
	• রাবণ তথা ভস্মাসুরের কথা	75
	• হরিদ্বারে সাধুদের নর সংহার	76
	• চুনক ঋষি ও মানধাতা রাজার কথা	78
	• চৌরাশি লক্ষ প্রকার জীবের থেকে মানব জীবন উত্তম	85
	• কথা আর কাজের মধ্যে পার্থক্য	91
	• ধর্মদাসের সতলোক দর্শন	94
	• অন্য গুরু ধারণ করা কি ঠিক?	97
5.	বেদ মন্ত্রের ফটো কপি (প্রমাণ সহিত)	100
6.	সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি রচনা	115
	• আমরা কালের লোকে কি ভাবে এসেছি?	117
	• শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিবের উৎপত্তি	120
7.	সম্পূর্ণ সৃষ্টি রচনা	124
	• আত্মা কালের জালে কি করে ফেঁসেছে ?	127

• শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু তথা শ্রী শংকর জির উৎপত্তি 131
• ব্রহ্মা নিজের পিতাকে প্রাপ্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে 135
• তিন গুণ কি ? প্রমান সহিত । 132
• ব্রহ্ম (কাল) এর অব্যক্ত থাকার প্রতিজ্ঞা 133
• মাতা (দুর্গা) দ্বারা ব্রহ্মাকে অভিশাপ 136
• পিতাকে (কাল-ব্রহ্ম) প্রাপ্তির জন্য বিষ্ণুর প্রস্থান এবং মাতা দ্বারা আশীর্বাদ 138
• পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্থাপনা 144
• পবিত্র ঋগ্বেদে সৃষ্টি রচনার প্রমান পবিত্র 150
শ্রীমদ্ দেবী মহাপুরণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 155
• পবিত্র শিব মহাপুরানে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 157
• পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 157
• পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কুরান শরিফে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 161
• পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের (কবির্ দেব) অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 162
• আদরনীয় গরীব দাস সাহেবের অমৃত বানীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 165
• আদরনীয় নানক সাহেবের অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 171
• অন্য সন্তের দ্বারা সৃষ্টি রচনার দন্তকথা (শোনা কথা) 174
8. শাস্ত্রে পরমাত্মা 176
• বাইবেলে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ 177
• হজরত মহম্মদ মাংস খেতেন না 182
• সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজের বিচার 182
• “পরমাত্মা সাকার এবং নরাকার যুক্ত”... 188
• বিশ্নোই ধর্মের ভক্তি 189
• সৎ গুরু থেকে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করতে হবে 189
• হরিয়ানায় হরি আসবে 190
• এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ফটো কপি 190

ভূমিকা

"শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা" হল একটি পবিত্র সদগ্রন্থ যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভান্ডার। এই গীতা বর্তমানে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ নামে পরিচিত কিন্তু বাস্তবে এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি পবিত্র গ্রন্থ। এই পবিত্র গ্রন্থের উৎপত্তি আজ থেকে অর্থাৎ ২০১২ থেকে প্রায় ৫৫৫০ (পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ) বছর পূর্বে মহাভারতের সময়কালে হয়েছিল। ঐ সময়ে নির্দিষ্ট কোন ধর্ম বিশেষ ছিল না, কেবল এক সনাতন পন্থ অর্থাৎ মানব ধর্ম ছিল। শব্দের কখনো খন্ডন হয় না, এই শব্দ সেই সমস্ত পুণ্য আত্মাদের মস্তিষ্ক রূপী হোয়াটসঅ্যাপে (WhatsApp) পৌঁছে যায়, যাদের নেটওয়ার্ক ভালো আছে। এই গীতা জ্ঞান শব্দ রূপে মহর্ষি ব্যাসদেবের (শ্রী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন) মস্তিষ্ক রূপী হোয়াটসঅ্যাপে লোড হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই মহর্ষি ব্যাসদেব পবিত্র "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা"- কে কাগজে অথবা তালপাতায় লিপিবদ্ধ করেন যা আজ আমাদের কাছে পবিত্র গীতা হিসেবে উপলব্ধ। এই পবিত্র গীতা শাস্ত্রে সর্বমোট ১৮ টি অধ্যায় এবং ৭০০ টি শ্লোক বিদ্যমান। আমি এই পবিত্র 'শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা' থেকে প্রয়োজন অনুসারে কিছু বিবরণ নিয়ে পবিত্র "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" পুস্তকের রচনা করেছি। যেমন জঙ্গলে (Forest) বিভিন্ন গাছের মধ্যে আয়ুর্বেদিক গাছ-গাছড়া থাকে, সেখান থেকে দক্ষ কবিরাজরা সন্ধান করে নিজের প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়া তুলে এনে জীবন দায়ী ঔষধ তৈরি করে। কিন্তু এতে জঙ্গলের যেমন কোন ক্ষতি হয় না, তেমনি জঙ্গলের পরিবর্তনও হয় না, একই রকম থাকে।

একই ভাবে এই "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত " পুস্তকটিকে জীবন দায়ী ঔষধ মনে করো, আর এই পুস্তক পাঠ করে অর্থাৎ জীবন দায়ী ঔষধ সেবন করে নিজেদের জন্ম-মৃত্যুর দীর্ঘ রোগ থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করুন।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছাড়া মানব জীবন অসম্পূর্ণ। যদি কেউ কোটি-কোটি টাকার মালিক হন এবং তার পরেও তিনি যদি তাঁর জীবনে কোন কিছুর অভাব বোধ করেন অর্থাৎ অতৃপ্ত থাকেন, তখন তিনি সেই অতৃপ্তির স্বাদ পূরণের জন্য বিভিন্ন পর্যটক স্থলে বেড়াতে যান। সেই সময় তাঁর কিছুটা সুখ অনুভব হলেও তা তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটিকে সুখময় করতে পারেনা, এমন কি এতে তাঁর আত্ম কল্যাণও হতে পারে না। দুই-তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, সুখের মোহ কেটে গিয়ে পূর্বের ন্যায় সেই দিন-চর্চা শুরু হয়ে যায়। আবারও তাঁর কিছু কিছু অপূর্ণতা অনুভব হতে থাকে। এই অপূর্ণতা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকে না পাওয়ার অপূর্ণতা। এই অপূর্ণতা পূর্তির জন্য বিশ্বের সকল ধার্মিক মানুষজন নিজ নিজ পরম্পরাগত সাধনা করতে শুরু করে দেয়। যদি সেই সমস্ত ভক্তদের/সাধকদের পরম্পরাগত করা সাধনা শাস্ত্র অনুকূল হয়, তাহলে তা লাভ দায়ক। আর যদি তা শাস্ত্রবিধি বিরুদ্ধ সাধনা অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী আচরণ হয়, তাহলে তা গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ অনুসারে ব্যর্থ। এই সাধনাতে ভক্তের/সাধকের না তো সুখ প্রাপ্তি হয়, না সিদ্ধি শক্তি প্রাপ্তি আর না তো পরম গতি প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যর্থ সাধনা। কিছু ভক্তজন যেকোনো গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করে। যদি সেই গুরু পূর্ণ (তত্ত্বদর্শী) হন, তাহলে লাভ দায়ী আর যদি পূর্ণ না হন, তাহলে তাঁর দ্বারা বলা সাধনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ!

আপনারা এই "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" পুস্তক থেকে জানতে পারবেন যে, প্রমাণিত শাস্ত্র কি কি? সেই অনুসারে আমাদের সাধনা করা উচিত? কোন সাধনাকে

শাস্ত্র বিধি অনুসার সাধনা বলা হয়? সেই সাধনা করতে গেলে কি কি নিয়ম বিধি পালন করতে হয়? কোন মহাত্মার কাছে গেলে সেই সাধনার সন্ধান পাওয়া যাবে? অর্থাৎ পূর্ণ গুরুর পরিচয় কি? এই সব কিছুই এই পবিত্র পুস্তক পড়লে জানতে পারবেন।

এই পুস্তক সমগ্র বিশ্বের অশান্ত মানবকূলকে একই সূত্রে বাঁধবে (এক কথায় সর্ব ধর্ম সমন্বয়)। প্রকৃত পক্ষে এই গীতা-শাস্ত্র কোন ধর্ম বিশেষের জন্য রচিত হয়নি, এটি সম্পূর্ণ মানব কল্যাণের জন্য সেই সময়ে প্রদান করা হয়েছিল, যখন কোনো ধর্ম ছিল না, কেবল একটাই ধর্ম ছিল যার নাম "মানব ধর্ম"। এইজন্য আমার নীতিবাক্য হল :-

জীব আমাদের জাতি, মানব ধর্ম (Mankind) আমাদের।

হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ঈশাই পৃথক কোন ধর্ম নয়।

যেমন বাবা নানকদেবের জন্ম পবিত্র হিন্দু ধর্মে, ক্ষত্রিয় (অরোড়া) বংশে শ্রী কালুরাম মেহতার ঘরে হয়েছিল। এরপর শ্রী ব্রজলাল পান্ডের কাছ থেকে নানকদেব গীতার জ্ঞান বুঝে ওনারই দেখানো পথে ভক্তি করছিলেন। মূল রূপে শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শঙ্করের পূজা করতেন, এছাড়া হিন্দু ধর্মে প্রচলিত অন্যান্য দেবী দেবতারও ভক্তি করতেন। সুলতানপুর শহরে ওখানকার নবাবের মুদিখানায় শ্রী নানকদেব চাকরি করতেন। সুলতানপুর শহর থেকে মোটামুটি এক-দেড় কিলোমিটার দূরে বেঈ নদী প্রবাহিত ছিল। প্রতিদিন সকালে নানকদেব বেঈ নদীতে স্নান করতে যেতেন। পরমাত্মা সতলোক থেকে এসে ভালো আত্মাদের অর্থাৎ যারা দৃঢ় ভক্ত হয়, তাদের সাথে সাক্ষাৎকার করেন। এছাড়া আরও প্রমাণ আপনারা এই পুস্তক পড়ে জানতে পারবেন। ঐ বিধান অনুসারে পরমাত্মা শ্রী নানকদেব সাহেবের সাথেও সাক্ষাৎকার করেন এবং ওনাকে তত্ত্বজ্ঞানের সাথে পরিচিত করান। শাস্ত্র অনুকূল সত্য সাধনার জ্ঞান প্রাপ্ত করান। এরপর শ্রী নানকদেবকে সন্তুষ্ট করতে অর্থাৎ তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য ওনাকে সাথে নিয়ে উপরে নিজের শ্বাশ্বত ধামে অর্থাৎ স্বচ্চখন্ডে নিয়ে যান। সেখানে সর্ব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়ে যথার্থ ভক্তিবিধি প্রদান করে সনাতন ভক্তি পুনঃস্থাপিত করার আদেশ দেন। তিনদিন পর নানকদেবকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। তারপর থেকে শ্রী নানকদেব হিন্দু ধর্মে প্রচলিত মনোকল্পিত আচরণ বন্ধ করে গীতা-শাস্ত্র অনুসারে যথার্থ ভক্তি সাধনার প্রচার করেছিলেন।

পূর্ণ পরমাত্মার সত্য সাধনা করার জন্য সর্ব প্রথম "গুরুধারণ" করা অতি আবশ্যক। এই নিয়ম পালন করে শ্রী নানকদেব শিষ্য বানাতে শুরু করেন এবং স্বয়ং গুরুপদে বিরাজমান হয়েছিলেন। শ্রী নানকদেবের শিষ্যদেরকে পাঞ্জাবি ভাষায় শিখ বলা হয়, যার কারণে সমাজে ওনাদের একটা আলাদা পরিচিতি গড়ে ওঠে। বর্তমানে ওনার অনুগামীরা একটি ভিন্ন ধর্মের রূপ নিয়ে নেয় এবং হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ধর্মের নামে লড়াই ঝগড়া করে মরছে। এটা শুধুমাত্র বিবেকের অভাব।

বিবেচনা :- ভক্তি যে কেউ করুক না কেন তাকে অবশ্যই গুরু ধারণ করতে হবে। গুরুও যেন "বক্ত গুরু" অর্থাৎ সমকালীন গুরু হন, যিনি নিজের মুখকমলে তত্ত্বজ্ঞান এবং সাধনা বিধি বলবেন। গুরু শুধুমাত্র শরীরের নাম নয়, ঐ শরীরের

মধ্যে যে আত্মা আছে তিনিই গুরু। শরীর পাঁচ তত্ত্ববিশিষ্ট হোক অথবা ইলেকট্রনিক (Video) হোক, তাঁকেই বক্ত গুরু অর্থাৎ সমকালীন গুরু বলা হয়। হিন্দুদের মধ্যে বেশির ভাগ হিন্দুরা গুরুধারণ না করে নিজেদের পরম্পরাগত প্রচলিত ভক্তি সাধনা করতে থাকে। পরমাত্মা থেকে পাওয়া তত্ত্ব জ্ঞানের আধারে নানকদেব এই নিয়ম বহির্ভূত বিশৃঙ্খলা সাধনাকে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যেও "বক্ত গুরুর" অভাব, যেমন সূক্ষ্মবেদে (সূক্ষ্মবেদ কি তা আপনারা এই পুস্তক পড়ে জানতে পারবেন) বলা হয়েছে যে:-

রাম-কৃষ্ণ সে কৌন বড়া, উহ্নোনে নে ভী গুরু কীন্হ।

তীন লোক কে বে ধনী, গুরু আগে আধীন॥

ভাবার্থ:- যে সমস্ত হিন্দু শ্রদ্ধালুরা মনোকল্পিত আচরণ করতে থাকে, তাদের জন্য বলা হয়েছে যে, আপনারা তো শ্রীরাম চন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের উপরে কাউকে বড় মানেন না। এদিকে তাঁরা তিন লোকের ধনী অর্থাৎ মালিক হয়েও গুরুধারণ করে ভক্তি করেছিলেন এমনকি তাঁরা নিজেদের গুরুদেবের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করতেন। {বশিষ্ঠ ঋষি ছিলেন শ্রী রামচন্দ্রের গুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ দুর্বাসা ঋষিকে নিজের গুরুদেবের আসনে বসিয়েছিলেন। সন্দীপনী ঋষি তো ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু। আধ্যাত্মিক দীক্ষা গুরু ছিলেন দুর্বাসা ঋষি।} তাহলে আপনার কি বুনিয়াদ অর্থাৎ সামর্থ্য আছে, যে আপনি গুরু বিনা ভক্তি করে নিজের আত্মকল্যান করাবেন। তাই আবারও সূক্ষ্মবেদে বলেছেন যে:-

কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান।

গুরু বিন দোনোঁ নিষ্ফল হৈঁ, ভাবেঁ পুছো বেদ পুরাণ॥

এই পুস্তক থেকে আপনারা ভক্তি বিষয়ক অনেক গুঢ় রহস্য এবং যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনার বিষয় জানতে পারবেন। আমি আশা করছি যে, এই পুস্তক মানব কল্যাণকারী সিদ্ধ হবে। পরম পিতা পরমেশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, হে পরমাত্মা! আপনার এই দাসের প্রচেষ্টা সফল করুন। সমস্ত প্রাণীই আপনার সন্তান, আপনার আত্মা। আপনার এই 'যথার্থ ভক্তি মার্গ' যেন সমস্ত মানব সমাজ বুঝতে পারে এবং তারা যেন নিজের মানব জীবনের কল্যাণ করাতে পারে। বিশ্ব' তে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক।

"সত সাহেব"

তারিখ :- 08-09-2012

লেখক

সন্ত রামপাল দাস মহারাজ

সতলোক আশ্রম বরবালা, হরিয়ানা (ভারত)।

দুটি কথা

জীব আমাদের জাতি, মানব ধর্ম আমাদের।

হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ঈশাই পৃথক কোন ধর্ম নয়॥

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান যে সময় (২০১২ সাল থেকে প্রায় ৫৫৫০ বছর পূর্বে) দেওয়া হয়েছিল, সেই সময় কোন ধর্ম ছিল না। হিন্দুধর্ম অর্থাৎ আদি শংকরাচার্য দ্বারা পরিচালিত পাঁচ দেবতার উপাসনার পরম্পরা অনুসরণকারীদের হিন্দু বলা হয়ে থাকে। (প্রকৃতপক্ষে এটি সনাতন পন্থ যা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলে আসছে)। আদি শঙ্করাচার্য এই হিন্দু ধর্মের স্থাপনা ২০১২ সাল থেকে প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে করেছিলেন। আদি শঙ্করাচার্যের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব অর্থাৎ ঈসা মসীহের জন্মের ৫০৮ বছর পূর্বে হয়েছিল। মাত্র ৮ বছর বয়সে ওনার উপনিষদের জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল এবং ১৬ বছর বয়সে উনি গুহাতে সাধনা রত এক বিরক্ত (ব্রহ্মচারী) সাধুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সাধনা শুরু করেন। যিনি বহুদিন পর্যন্ত গুহা থেকে বাইরে আসতেন না। সেই মহাত্মা আদি শংকরাচার্যকে "জীব-ই হল ব্রহ্ম" (অহম্ আত্মা ব্রহ্ম) - এই পাঠ পড়ান এবং বলেন যে এটি চার বেদে উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে শংকরাচার্যের ভক্তরা যখন শংকরাচার্যকে প্রশ্ন করেন যে, যদি জীব-ই ব্রহ্ম হয়, তাহলে পূজা করার কি প্রয়োজন? আপনিও ব্রহ্ম আর আমিও ব্রহ্ম (ব্রহ্ম শব্দের অর্থ পরমাত্মা)। এই প্রশ্ন শুনে আদি শংকরাচার্য সংশয়ে পড়ে যান। তখন তিনি নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শংকরের ভক্তি করার উপদেশ দেন।

এরপর এই প্রধান পাঁচ দেবতার পূজার বিধান দৃঢ় করেন - ১. শ্রী ব্রহ্মা ২. শ্রী বিষ্ণু ৩. শ্রী শিব ৪. শ্রী দেবী এবং ৫. শ্রী গনেশের, কিন্তু মূল রূপে তমোগুন শঙ্করকেই ইষ্ট মানতে বলেন। এই বিধান দিয়ে আদি শংকরাচার্য মাত্র ২০ বছর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৮ সালে হিন্দু ধর্মের স্থাপনা করেন। এই হিন্দু ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য ভারতবর্ষের চারিদিকে একের পর এক শঙ্কর মঠের স্থাপনা করেন। এরপর আদি শঙ্করাচার্য ১. গিরি সাধুর সংগঠন তৈরি করেছিলেন, যারা পাহাড় পর্বতে বসবাসকারী জনতাদেরকে নিজেদের ধর্মের প্রতি দৃঢ় করতেন। ২. গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচারের জন্য পুরী সাধু সম্প্রদায়ের গঠন করেছিলেন, যারা গ্রামবাসীদেরকে নিজেদের ধার্মিক ক্রিয়া-কর্ম শেখাতেন। ৩. সন্ন্যাসী সাধু সম্প্রদায় গঠন করেন, যারা ব্রহ্মচারী থেকে জনতাকে প্রভাবিত করে নিজেদের সাথে যুক্ত করতেন। ৪. বানপ্রস্থী সাধু বানায়, যারা বনে জঙ্গলে বসবাসকারী জনতাকে নিজেদের জ্ঞান শুনিয়ে নিজেদের সম্প্রদায় যুক্ত করতেন। তাঁরা চারবেদ (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ), ভগবদ্ গীতা, পুরান সমূহ এবং উপনিষদ সমূহকে সত্য জ্ঞানযুক্ত পুস্তক মানতেন যা আজও পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের শ্রদ্ধালুরা এই সমস্ত ধার্মিক গ্রন্থ গুলিকে সত্য মেনে আসছে। এইভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৮ সালে (অর্থাৎ সন ২০১২ থেকে ২৫০০ বছর পূর্বে) হিন্দু ধর্মের স্থাপনা হয়েছিল। আদি শঙ্করাচার্য মাত্র ৩২ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে শরীর ত্যাগ করে ভগবান শংকরের লোকে চলে যান কারণ উনি ভগবান শিবের উপাসক ছিলেন। উনি শিবলোক থেকে এই ধর্মের স্থাপনা করার জন্য এসেছিলেন, এমনটা মনে করা হয়। ওই সময় বৌদ্ধ ধর্ম অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল। তা ভারতে বিস্তার লাভ করা থেকে উনি আটকে ছিলেন। যদি বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে ছড়িয়ে পড়তো তাহলে সম্পূর্ণ ভারতবাসীকে ওরা চীন দেশের মতো নাস্তিক করে দিত।

২. ঈসাই ধর্মের স্থাপনা :- হজরত ঈসা মসীহ ঈসাই ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন। যখন ঈসার মাত্র ৩৩ বছর বয়স ছিল, তখন ওনাকে নৃশংস ভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে বিরোধী ধর্মগুরুরা তৎকালীন গভর্নরের উপর চাপ সৃষ্টি করে মেরে ফেলেন।

যে প্রভু বেদ ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন, সেই প্রভুই ঈসা-মসিহের মাধ্যমে "ইঞ্জিল" নামক গ্রন্থের অবতরণ করেন। এই "ইঞ্জিল" গ্রন্থে আলাদা কোন জ্ঞান নেই, কারণ যা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল তা পূর্বেই বেদ ও গীতার মধ্যে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এই বেদ ও গীতা গ্রন্থ কোন ধর্ম বিশেষের জন্য নয়, এগুলি সমগ্র মানবজাতির জন্য। ঈসা-মসিহের চলে যাওয়ার প্রায় ৬০০ বছর পর হজরত মুহাম্মদ ইসলাম ধর্মের স্থাপনা করেন। হজরত মুহম্মদকেও ওই ব্রহ্মাই পবিত্র "কোরআন শরীফ" গ্রন্থ দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থেও সম্পূর্ণ ভক্তিবিধি নেই কেবল সংকেত আছে, কারণ যথার্থ ভক্তিবিধির জ্ঞান বেদ ও গীতাতে পূর্বেই প্রদান করা হয়েছিল। তাই কোরআন শরীফ গ্রন্থে পুনঃরায় বলার প্রয়োজন ছিল না। যেমন গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এ, যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০ এ বলা হয়েছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা যিনি সকল সৃষ্টির রচনা করেছেন, তাঁর বিষয়ে জানার জন্য কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো। উনিই সঠিক জ্ঞান এবং যথার্থ ভক্তিবিধি বলবেন। যে সন্ত ওই পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান জানেন তিনি অবশ্যই সত্য-সাধনাও জানেন।

পবিত্র বাইবেল গ্রন্থের জ্ঞানও গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং দিয়েছেন। বাইবেল গ্রন্থ হলো তিনটি গ্রন্থের (১.জবুর, ২. তৌরত, ৩. ইঞ্জিল) সংমিশ্রণ। বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থের শুরুতেই লেখা আছে যে, পরমেশ্বর মানুষকে নিজের সুরত অর্থাৎ স্বরূপ অনুসারে উৎপন্ন করেছেন এবং নর ও নারী রূপে সৃষ্টি করেছেন। পরমেশ্বর ষষ্ঠ দিনে সকল সৃষ্টি রচনা সম্পন্ন করে সপ্তম দিনে সিংহাসনে বিশ্রাম করেন।

কোরআন শরীফ:- কোরআন শরীফ পুস্তকের সূরতি নং. ২৫ আয়াত নং. ৫২ থেকে ৫৯ এ বলা হয়েছে যে, কবীর আল্লাহ ছয় দিনে সকল সৃষ্টির রচনা করেন, তারপর সপ্তম দিনে উর্দ্ধ আকাশে তখতে/আরশে (সিংহাসনে) বিরাজমান হন। ওই পরমেশ্বরের খবর কোন বাখবরের অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো। কোরআনে লেখা এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআন শরীফের জ্ঞানদাতা ওই পূর্ণ পরমাত্মা থেকে অর্থাৎ আল্লাহু আকবর থেকে ভিন্ন অন্য কেউ আছেন। যার নিজের ওই পূর্ণ পরমাত্মা অর্থাৎ আল্লাহু আকবরের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই।

কোরআন শরীফের সূরা: ৪২ এর প্রথম আয়াতেই ঐ তিন মন্ত্রের সাংকেতিক জ্ঞান আছে, যা গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ দেওয়া আছে। ওখানে বলা হয়েছিল যে, ব্রহ্মণঃ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের ভক্তির জন্য "ওঁম তৎ সৎ" মন্ত্রের সুমিরন (জপ) করো।

কোরআন শরীফের সূরাঃ ৪২ এর প্রথম আয়াতে এই মন্ত্রের সাংকেতিকও ঠিক এইভাবে দেওয়া আছে, "অ্যন্-সীন্-কাঁফ" (আরবি ভাষায়)

"অ্যন্"- বাংলাতে "অ" অক্ষর হয়, যার সংকেত ওঁম-এর দিকে। "অ্যন্"- এর ভাবার্থ ওঁম, সীন্ = স অর্থাৎ যা গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এর দ্বিতীয় তত্ মন্ত্র - এর বাস্তবিক যে মন্ত্র আছে তার প্রথম অক্ষর "স"। এই ওঁম+সীন্ অথবা তত্ মিলে দুই অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র সতনাম তৈরি হয়। এছাড়া কোরআন শরীফে যে তৃতীয় মন্ত্র "কাঁফ" = "ক" আছে, তা গীতা

অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ লেখা তিন নামের অন্তিম মন্ত্র “সত্”। (যেমন গুরুমুখী লিপিতে অর্থাৎ পাঞ্জাবি ভাষায় ক-কে ককা, খ-কে খখা এবং গ-কে গগা, উ-কে উড়া, ঈ-কে ইড়া বলা হয় এবং লেখা হয়। একইভাবে ফরাসী ভাষাতে অ - কে অ্যন্, স - কে সীন্ এবং ক - কে কাঁফ লেখা হয়ে থাকে।

“সত্” মন্ত্র সংকেতিক কিন্তু বাস্তবিক যে নাম আছে তার প্রথম অক্ষর হল “ক”, (এটি “করীম” মন্ত্র) একে সারনামও বলা হয়। আমার যে সমস্ত ভক্তরা আমার (সন্ত রামপাল দাস) কাছ থেকে তিন মন্ত্রের উপদেশ পেয়েছে, তারা ওই দুই সাংকেতিক মন্ত্রের বাস্তবিক নাম জানে।

“সকল গ্রন্থের মধ্যে কিছু মিল”

বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থে এটিও বলা হয়েছে যে, “যখন আদম এবং তাঁর ধর্মপত্নী “হব্বা” একটি বাগিচার মাঝখানের বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলে, তখন ওনাদের ভালো-মন্দের জ্ঞান হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলায় যখন প্রভু বাগিচায় ঘুরতে আসে তখন তিনি জানতে পারেন যে, আদম এবং হব্বা ভালো মন্দের জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষের ফল খেয়ে নিয়েছে। তখন ওই প্রভু বলেন যে, “ভালো-মন্দের জ্ঞান হওয়ার কারণে আদম আর হব্বা আমাদের একজনের সমান হয়ে গিয়েছে। পাছে এমন না হয়ে যায় যে, এরা সেই গাছের ফল খেয়ে নেয় যা খেলে অমর হয়ে যায়। এই কারণেই আদম এবং তাঁর স্ত্রীকে স্বর্গের বাগিচা থেকে বের করে পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।” (লেখা সমাপ্ত)

বিশ্লেষণ :- এতেই প্রমাণিত হয় যে, “প্রভু একাধিক” কারণ উপরে প্রভু বলেছিলেন যে, ভালো মন্দের জ্ঞান হওয়ার কারণে এরা আমাদের একজনের সমান হয়ে গিয়েছে। এরপর বাইবেলে আরো বলেছে যে, “আব্রাহিম” যখন বাদাম (মামরে) বৃক্ষের নিচে বসে ছিলেন, তখন সেখানে তিনি তিনজন প্রভুকে দেখতে পান, তাদেরকে ভোজন করান এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন। এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলে তিনজন প্রভুর উল্লেখ আছে।

মুসলমান ধর্মে “চার ইয়ারির” (অর্থাৎ চার বন্ধু বা সাথী) উল্লেখ আছে। যারা বালক রূপে থাকে, সূক্ষ্মবেদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে:-

বহী সনক সনন্দনা, বহী চার য়ারী।

তত্ত্বজ্ঞান জানে বিনা, বিগড়ী বাত সারী॥

ভাবার্থ:- হিন্দু ধর্মে যে সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সন্ত কুমার বালক রূপে থাকে, তারা ব্রহ্মার চারজন মানস পুত্র। মুসলমান ধর্মে এদেরকে “চার ইয়ারি” অর্থাৎ চার বালক মিত্র বলা হয়।

আবার, সূক্ষ্ম বেদে বলা হয়েছে যে:-

বহী মোহম্মদ বহী মহাদেব, বহী আদম বহী ব্রহ্মা।

দাস গরীব দুসরা কোই নহীঁ, দেখ আপনে ঘরমা॥

ভাবার্থ:- মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদ ভগবান শিবের লোক থেকে আসা পূণ্যাত্মা ছিলেন। তিনি এক গুহার ভিতরে বসে নিজের পরম্পরাগত সাধনা করতেন। ভগবান শিবের ১১ রুদ্র গনের মধ্যে একজন রুদ্রগণ মুহম্মদের সাথে গুহাতে এসে দেখা

করেন। ওখানকার স্থানীয় ভাষায় (আরবি ভাষায়) কাল প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মের বার্তা শোনায়। ওই রুদ্রকে মুসলমানরা জিবরীল ফেরেশতা বলে, একে পবিত্র ফেরেশতা মানা হয়।

ভাবার্থ এই যে, হজরত মুহম্মদও শিবের সন্তান (সাধক) ছিলেন। মুসলমান ধর্মের পবিত্র স্থান কাবায় ভগবান শিবের লিঙ্গের আকৃতির যে পাথর বসানো আছে, সেখানে মুসলমান শ্রদ্ধালুরা সিজদা করে অর্থাৎ প্রণাম করে।

২. বাবা আদম :- পুরাণে এবং জৈন ধর্মের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ঋষভদেব রাজা নাভিরাজের পুত্র ছিলেন। নাভিরাজ অযোধ্যার রাজা ছিলেন। ঋষভদেবের ১০০ জন পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তান ছিল। একদিন পরমেশ্বর এক সাধুরূপে ঋষভ দেবের সাথে সাক্ষাৎ করে ওনাকে ভক্তি করার প্রেরণা দেন এবং জ্ঞান শোনায় এই যে, মানব জীবনে যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে সাধনা না করা হয়, তাহলে এই মানব জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। বর্তমানে যে সকল মানুষ যা কিছুই পাচ্ছে, তা তার পূর্ব জন্ম-জন্মান্তরের পাপ পুণ্যের প্রতিফলন। আজ আপনি রাজা হয়েছেন এটা আপনার পূর্ব জন্মের শুভ কর্মের ফল। যদি বর্তমানে ভক্তি না করেন তাহলে আপনি ভক্তি শক্তিহীন এবং পুণ্যহীন হয়ে নরকে যাবেন এবং এরপর আবারও অন্যান্য প্রাণীর শরীরে কষ্ট ভোগ করবেন। যেমন বর্তমানে আপনি ইনভার্টারের ব্যাটারি চার্জ করে রেখেছেন আর চার্জার খুলে রেখেছেন, তারপরেও ওই ব্যাটারি তার কাজ করে চলেছে, ইনভার্টারের মাধ্যমে পাখাও ঘুরছে, বাল্ব-টিউবলাইটও জ্বলছে। যদি চার্জার পুনরায় লাগিয়ে চার্জ না করা হয়, তাহলে কিছু সময় পর ইনভার্টার সব কাজ করা বন্ধ করে দেবে। তখন পাখাও চলবে না, বাল্ব-টিউবলাইটও জ্বলবে না। একই রকম ভাবে মানব শরীর একটি ইনভার্টার। শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি হল চার্জার (charger)। পরমাত্মার ভক্তিতেই মানুষ পুনরায় চার্জ যুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ ভক্তির শক্তিতে ধনী এবং পুণ্যবান হয়ে যায়।

ঋষি রূপে প্রকট হওয়া পরমাত্মার মুখকমল থেকে এই জ্ঞান শুনে ঋষভদেব ভক্তি করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। ঋষভদেব যখন সেই ঋষির নাম জানতে চান, তখন সেই ঋষি নিজের নাম "কবি দেব" অর্থাৎ কবির্দেব বলেন এবং এটাও বলেন যে আমি স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মা। চার বেদে আমার নাম "কবির্দেব" লেখা আছে, আমি'ই হলাম পরম অক্ষর ব্রহ্ম। সূক্ষ্ম বেদে লেখা আছে :-

ঋষভ দেব কে আইয়া, কবী নামে করতার।

নৌ যোগেশ্বর কো সমঝাইয়া, জনক বিদেহ উদ্ধার॥

ভাবার্থ :- পরমাত্মা কবি নামে ঋষভদেবের সঙ্গে দেখা করে ভক্তির প্রেরণা দিয়েছিলেন। ওই পরমাত্মাই ৯ জন যোগেশ্বর এবং রাজা জনককে জ্ঞান বুঝিয়ে উদ্ধার করার জন্য ভক্তি করার প্রেরণা দিয়েছিলেন। পরমাত্মার মুখে এই কথা শুনে ঋষভদেবের ভালো লাগেনি যে, এই কবির্দেব ঋষি হলেন সেই প্রভু, তবুও ভক্তি করার জন্য দৃঢ়ভাবে মনস্থির করে নেয়। তারপর একজন তপস্বী ঋষির কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে ওঁম্ (ওঁ) মন্ত্র জপ করতে শুরু করেন অর্থাৎ হঠযোগ করেন। ঋষভদেবের পুত্র ছিলেন "ভরত" আর ভারতের পুত্র ছিলেন মারীচি। ঋষভদেব প্রথম এক বছর ধরে নিরাহার তপস্যা করেন। তারপর আরো ১০০০ বছর ধরে তপস্যা করেন। তপস্যা সমাপ্ত করার পর ঋষভদেব নিজের পৌত্র (নাতিকে) অর্থাৎ ভরতের পুত্র মারীচিকে প্রথম ধর্ম উপদেশ (দীক্ষা) দেন। এই মারীচির আত্মা ২৪-তম

তীর্থঙ্কর মহাবীর জৈন রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঋষভদেব জৈন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না, এটি তো মহাবীর জৈনের দ্বারা প্রচলিত পন্থ। আসলে শ্রী মহাবীরও কোন ধর্মের স্থাপনা করেন নি, উনি তো কেবলমাত্র নিজের অনুভব নিজের শিষ্যদের বলতেন। তারা সকলেই এক ভক্তি করা ভক্ত সম্প্রদায় ছিল। ঋষভদেব "ওঁম" নামের জপ ওঙ্কার বলে উচ্চারণ করতেন। এই মন্ত্রকে বর্তমানে অপভ্রংশ করে "নৌংকার" বলে জৈনরা জপ করতে থাকে। একে ওংকার বা "ওঁ" বলা হয়।

এখন আমরা আমাদের প্রসঙ্গে আসি :- জৈন ধর্মগ্রন্থে এবং জৈন ধর্মের অনুগামীদের দ্বারা লিখিত "আসুন জৈন ধর্মকে জানি" পুস্তকে লেখা আছে যে, ঋষভদেবের (এনাকে আদিনাথ বলে) আত্মা'ই বাবা আদম রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। এখন সূক্ষ্ম বেদের সেই বাণীর সরলার্থ করছি :-

বহী মুহম্মদ ওহী মহাদেব, বহী আদম বহী ব্রহ্মা।
দাস গরীব দুসরা কোঈ নহীঁ, দেখ আপনে ঘরমা॥

বাবা আদম ভগবান ব্রহ্মার লোক থেকে এসেছিলেন, কারণ মানব জীবনে করা সাধনা অনুসারে প্রাণী নিজের পুণ্যের বলে উপরে তিন দেবতাদের লোকে বার-বার যায় এবং নিজের পুণ্য ক্ষয় করে পুনরায় পৃথিবীতে এসে সংস্কারবশতঃ জন্ম নেয়।

সন্ত গরীব দাসজীকে (হরিয়ানা রাজ্যের ঝজ্জর জেলার অন্তর্গত ছুড়ানী গ্রামে বসবাসরত) স্বয়ং সেই পরমাত্মা দর্শন দিয়েছিলেন। যিনি ঋষভদেবের সাথেও পূর্বে সাক্ষাৎকার করেছিলেন। সন্ত গরীব দাসজী পরমেশ্বরের সাথে উপরে গিয়ে স্বচক্ষে সকল ব্যবস্থা দেখে এসে বলেছিলেন যে, আদম ব্রহ্মার লোক থেকে এসেছিলেন, উনি ব্রহ্মার অবতার ছিলেন। মুহম্মদ তমোগুন শিবের অবতার ছিলেন। প্রিয় পাঠকগণ! অবতার দুই প্রকারের হয়, ১. স্বয়ং সেই প্রভু অবতার ধারণ করে আসেন, যেমন- শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে শ্রীবিষ্ণুর অবতার রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। আবার কপিলমুনি, পরশুরামকেও বিষ্ণুর অবতার মানা হয়, এনারা স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু ছিলেন না, কিন্তু বিষ্ণুর লোক থেকে আসা দেবাত্মা ছিলেন। বিষ্ণু কিছু শক্তি দিয়ে এই অবতারগনকে পাঠান। সেই রূপ হজরত মুহম্মদ শ্রী শিবের অবতার (লোক থেকে আসা দেবাত্মা) ছিলেন এবং বাবা আদম শ্রী ব্রহ্মার অবতার (লোক থেকে আসা দেবাত্মা) ছিলেন। এই প্রকার ঈসা মসীহ শ্রীবিষ্ণুর অবতার (লোক থেকে আসা দেবাত্মা) ছিলেন। ঈসাই শ্রদ্ধালুরাও ঈসাকে অর্থাৎ যীশুকে প্রভু নয়, প্রভুর পুত্র মানেন।

সন্ত গরীব দাসজী বলেছেন যে, যদি আপনাদের আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমার দ্বারা বলা শাস্ত্রবিধি অনুসারে সতভক্তি সাধনা করে নিজের ঘরে অর্থাৎ নিজের মানব শরীরের কমল চক্রে স্বচক্ষে স্বয়ং দেখে নিন।

ভাবার্থ:- সমস্ত ধর্মের মানুষের শরীরের গঠন (রচনা) এক। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়ার কারণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে বিভাজিত হয়ে গিয়েছি। সন্ত গরীব দাসজী বলেছেন যে, পরমেশ্বর মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বানিয়েছেন। মেরুদন্ডের হাড় অর্থাৎ Back Bone (Spine) -এর ভিতরের দিকে (কণ্ঠ থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত)

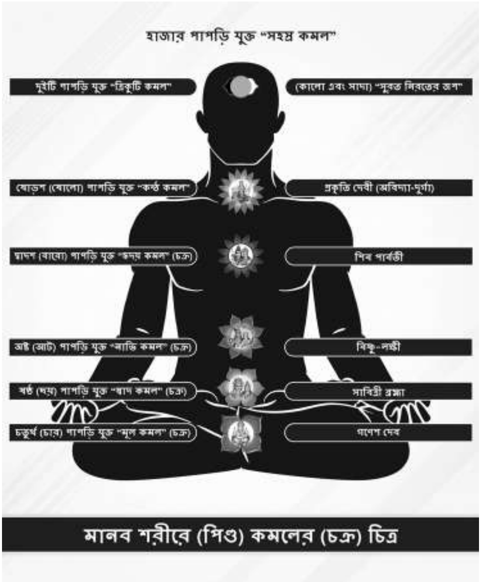

মানব শরীরে (পিণ্ড) কমলের (চক্র) চিত্র

পাঁচটি কোমল চক্র বানানো আছে, কৃপা করে এই চিত্র দেখুন-

১.মূলচক্র :- এই চক্র মেরুদন্ডের হাড়ের শেষ প্রান্ত থেকে এক ইঞ্চি উপরে গুহ্যদ্বারের কাছে অবস্থিত। এই কমলের দেবতা শ্রী গণেশ, এখানে ৪-টি পাপড়ি আছে।

২.স্বাদ চক্র :- এটি মূল কমল বা চক্র থেকে ২ ইঞ্চি উপরে মেরুদন্ডের হাড়ের ভেতরের দিকে যুক্ত আছে। এই কমলের দেবতা শ্রী ব্রহ্মা এবং ওনার ধর্মপত্নী সাবিত্রী দেবী। এই কমলে সর্বমোট ৬-টি পাপড়ি আছে।

৩. নাভি কমল চক্র :- এটি নাভির পিছনে অবস্থিত ওই মেরুদন্ডের হাড়ের সাথে যুক্ত আছে। এই কমলের দেবতা শ্রী বিষ্ণু ও তার ধর্মপত্নী লক্ষ্মী দেবী। এই কমলে ৮-টি পাপড়ি আছে।

৪. হৃদয় কমল চক্র :- এই কমল বুকের মাঝখানে অর্থাৎ মেরুদন্ডের হাড়ের ভেতরের সাথে যুক্ত আছে। এই চক্রের দেবতা হলেন শিব-পার্বতী। এই কমলে ১২-টি পাপড়ি আছে।

৫. কন্ঠ কমল :- এই কমল বুকের পাঁজরের উপরে গলার ঠিক পিছনে মেরুদন্ডের হাড়ের সাথে যুক্ত আছে, অর্থাৎ যেখান থেকে মেরুদণ্ড শুরু হয়। এই কমলের দেবী হলেন শ্রী দুর্গা এবং এই কমলে সর্বমোট ১৬-টি পাপড়ি আছে। এছাড়া বাকি কমল চক্র এর উপরে অবস্থিত।

৬. সঙ্গম কমল বা ষষ্ঠ কমল :- এই কমল চক্র সুষুম্নার উপরের দ্বারে অবস্থিত। এই কমলের ৩-টি পাপড়ি আছে। এর একটি পাপড়িতে দেবী দুর্গা স্বয়ং সরস্বতী রূপে নিবাস করে এবং ওনার সাথে ৭২ কোটি উর্বশী (সুন্দরী পরী) থাকে। তারা উপরে যাওয়া ভক্ত আত্মাদের নিজেদের জালে ফাঁসিয়ে রাখে। দ্বিতীয় পাপড়িতে সুন্দর যুবক পুরুষ থাকে, যারা ভক্ত মতিদের আকর্ষিত করে কাল জালে ফাঁসিয়ে রাখে। কাল স্বয়ং নিজের অন্য রূপ বানিয়ে এই যুবকদের প্রধান হয়ে পরিচালনা করে। তৃতীয় পাপড়িতে পরমাত্মাও অন্য রূপে থাকেন এবং নিজের ভক্ত আত্মাদেরকে কালের এই জাল থেকে মুক্ত করান এবং তাদের জ্ঞান শুনিয়ে সতর্ক করেন!

৭. ত্রিকুটি কমল চক্র :- এই কমল বা চক্র দুই চোখের ভ্রুর মাঝখানে ভিতরের

দিকে কমল দলের লাইনের উপরে অবস্থিত। এই কমলে সদ্‌গুরু রূপে স্বয়ং পরমেশ্বর থাকেন। এই কমলে দুটি পাপড়ি আছে, তার মধ্যে একটি সাদা বর্ণের অন্যটি কালো (ভ্রমরের মত কালো) বর্ণের পাপড়ি আছে। সাদা বর্ণের পাপড়িতে সদ্‌গুরু রূপে সত্যপুরুষের নিবাস আর কালো পাপড়িতে নকল সদ্‌গুরু রূপে কাল নিরঞ্জনের বাস।

৮. সহস্র কমল দল :- এই কমল মাথার মধ্য ভাগে দুই আঙ্গুল নিচে লম্বভাবে অন্য কমলের লাইনের উপরে অবস্থিত। হিন্দু ধর্মের লোকেরা মাথায় যেখানে টিকি রাখতো এবং এখনও অনেকে রাখে, ঠিক তার নিচে সহস্র কমল দল অবস্থিত। এই ক্ষেত্রের দেবতা ব্রহ্ম, একে 'ক্ষর পুরুষ' ও বলা হয়, যিনি গীতা এবং বেদের জ্ঞান বলেছেন। এই কমলে ১০০০ পাপড়ি আছে। কাল ব্রহ্ম এই কমলকে আলোয় আলোকিত করে রেখেছেন এবং স্বয়ং এই কমল চক্র থেকে দূরে থাকেন। উনি নিজে তো দেখা দেন'ই না, কেবল পাপড়ির আলোর প্রকাশ দেখা যায়।

{**অষ্ট কমল দল :-** এই কমলের দেবতা অক্ষর পুরুষ, এই অক্ষর পুরুষকে পর ব্রহ্মও বলা হয়। এই কমলেও ৮-টি পাপড়ি আছে। এই দেবতার স্থিতি এখন বলা যাবে না, কারণ নকল গুরুরা জানতে পারলে জনতাদেরকে ভ্রমিত করে দেবে।}

৯. সংখ্য কমল দল :- এই কমলে পূর্ণব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের নিবাস। এই কমলে অসংখ্য পাপড়ি আছে। এই চক্রের স্থিতিও বলা যাবে না, কারণ উপরে লিখে দেওয়া হয়েছে।

{এখানে যে চিত্র দেখানো হয়েছে, এই চিত্রে ষষ্ঠ ও নবম কমল দেখানো হয়নি, কারণ বিদ্যার্থীদের ধীরে-ধীরে জ্ঞানের প্রসার ঘটানো হয়। এই কমল গভীর রহস্য যুক্ত, এই কমলের বিষয়ে কবীর সাগরের সারাংশে লেখা আছে।}

টেলিভিশনের চ্যানেল যেমন কাজ করে, আমাদের শরীরের কমলও সেইরূপ কাজ করে। টেলিভিশনের চ্যানেল চালু করলে তার সমস্ত কার্যক্রম দেখা যায়। সেই কার্যক্রম বা অনুষ্ঠান চলছে তো স্টুডিওতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে টেলিভিশনে। সেইরূপ আমাদের শরীরে অবস্থিত প্রতিটি কমল চক্রও কাজ করে। এই কমল গুলিকে চালু করার জন্য অর্থাৎ খোলার জন্য বিশেষ মন্ত্র আছে, যা এই দাস (সন্ত রামপাল দাস) জপ করার জন্য দেয়। দীক্ষার প্রথম পর্যায়ে এই শরীরের কমল-চক্রগুলি খোলার মন্ত্র জপ দেওয়া হয়। সেই মন্ত্রের শক্তিতে সকল কমল চক্র চালু (on) হয়ে যায়। তারপর সাধক নিজস্ব শরীরের কমল চক্রে ওই দেবতাদের এবং ওখানকার সমস্ত দৃশ্য দেখতে পায়। এইজন্য সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন যে, আপনারা নিজেদের শরীরের চ্যানেল চালু (on) করে স্বয়ং দেখে নিন, আদম ব্রহ্মার লোক থেকে এসেছিলেন, কারণ ওখানে সমস্ত রেকর্ড জমা আছে। যেমন বর্তমানে YouTube, সেইরূপ প্রত্যেক দেবতাদের লোকে আপনি যদি পূর্বে ঘটা ঘটনা পুনরায় দেখতে চান তাহলে দেখতে পারবেন।

একইভাবে হজরত মুহম্মদ শিব লোক থেকে আসা আত্মা, এটা আপনি দেখতে পারেন। অনুরূপভাবে ঈসা মসিহ বিষ্ণু লোক থেকে আসা আত্মা ছিলেন সেটাও দেখতে পারেন।

"মক্কা মহাদেবের মন্দির"

ভাঈ বালে বালী জন্ম সাখী-তে প্রমাণ আছে :-

"সাখী মদীনে কী চলী" - হিন্দি ভাষায় অনুবাদিত পুস্তকের ২৬২ নম্বর পৃষ্ঠাতে শ্রী নানকদেব চার ইমামের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে:-

আখে নানক শাহ সচ্চ, সুণ হো চার ইমাম।

মক্কা হৈ মহাদেব কা, ব্রাহ্মণ সন সুলতান॥

ভাবার্থ :- এখন আপনাদেরকে আমাদের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করাই। আমি আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, "যে যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সূক্ষ্মবেদ, গীতা এবং চারটি বেদে আছে" সেই জ্ঞান পুরাণ, কোরআন শরীফ, বাইবেল, ৬ - শাস্ত্র ও ১১ - উপনিষদের কোথাও নেই।

উদাহরণ:- যেমন দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম ভুল নয়, কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। অর্থাৎ এখানে B.A এবং M.A স্তরের জ্ঞান নেই। এই তাৎপর্য বোঝার জন্য এতটাই যথেষ্ট।

অন্য উদাহরণ :- গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৪৬ এ বলা হয়েছে যে, হে অর্জুন! বড় জলাশয় (দীঘি) প্রাপ্তির পরে ছোট জলাশয়ের (পুকুর, নালা) উপর যতটা আস্থা থাকে, সেইরূপ পূর্ণ পরমাত্মার সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর অন্য জ্ঞান এবং অন্যান্য ভগবানের প্রতি তেমনি আস্থা রয়ে যায়।

যে সময় গীতাজ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, সেই সময় সকল মানুষজন জলাশয়ের আশেপাশে বসবাস করত। বর্ষাকালে বর্ষার জলে জলাশয় পরিপূর্ণ হয়ে যেত। সারা বছর ধরে মানুষজন নিজেরাও এই জল পান করত এবং পশুদেরও এই জল পান করাতো অর্থাৎ দুইভাবে এই জলের ব্যবহার করা হতো। যদি কোন এক বছর কোন কারনে বর্ষা না হতো, তাহলে ছোট জলাশয়ে আশ্রিত ব্যক্তিদের জীবন সংকটময় হয়ে যেত এবং ঐ এলাকায় ত্রাহি-ত্রাহি রব উঠে যেত।

অপরদিকে দীঘি খুব বড় আর গভীর জলাশয়। যার জল ১০ বছরও যদি বৃষ্টি না হয় তারপরেও শুকিয়ে যায় না। যদি কোন ব্যক্তি এই ধরনের দীঘির সন্ধান পায় তো সে তৎক্ষণাৎ ছোট জলাশয় ত্যাগ করে বড় দীঘির কাছে নিজের বাসস্থান স্থাপন করে নিত। সেইরূপ এই পবিত্র "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" পুস্তক আপনাদেরকে বড়দীঘি সম জ্ঞান প্রাপ্তি করাবে। তাই দেরি না করে অতিসত্ত্বর এই বড় দীঘির ধারে এসে বাসস্থান তৈরি করে নিজের জীবন সফল করুন এবং এই জ্ঞান রূপ অমৃত পান করে অমর হয়ে সতলোকে চলে যান।

হিন্দু ধর্মের লোকেরা বলে থাকেন মুসলমানরা সব বিপরীত সাধনা করে। আমরা সূর্য উদয় হওয়ার সময় প্রণাম করি আর মুসলমানরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সালাম (প্রণাম) করে।

বিশ্লেষণ :- আসলে দুই পন্থের নিয়ম'ই সঠিক কিন্তু বিবেকের অভাব। সূর্য উদয়ের সময় হিন্দুরা সূর্যকে ধন্যবাদ করে বলে যে, হে প্রকাশ দেবতা! আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, আপনি অন্ধকার রাত্রির পর প্রকাশ নিয়ে এসেছেন যাতে আমরা

জীবন নির্বাহের কাজ করতে পারি। আপনি আমাদের প্রতি সদা এইরূপ কৃপা করবেন।

অন্যদিকে মুসলমান ভাইয়েরা জানেন যে, সকালে সূর্য উদয়ের সময় আমাদের বড় ভাই হিন্দুরা সকলের জন্য সূর্যদেবের মঙ্গল আরতি করে ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়েছে। তাই সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আমরাও সূর্যকে ধন্যবাদ করে দিই যে, হে প্রকাশ দেব সূর্য! আপনি সমস্ত জীবকে প্রকাশ প্রদান করে আমাদের বড়'ই উপকার করেছেন, আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনি আগামীকালও এইভাবে কৃপা করবেন। আপনিও আল্লাহু অকবীরের সৃষ্টি আর আমরাও ওনার সন্তান।

বাস্তব তো এটা যে, সূর্যদেবকে না তো হিন্দুরা পুজা করে আর না মুসলমানরা। আসলে দুই পন্থেরই লোকেরা পূর্ব-পশ্চিম দিকে মুখ করে সকালে হিন্দুরা ও সন্ধ্যায় মুসলমানরা পরমাত্মার'ই পূজা করেন।

একমাত্র পূর্ণ পরমাত্মার পূজা করা উচিত। অন্য দেবতা বা ফেরেশতাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করা উচিত। অধিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য অবশ্যই এই পুস্তকের পরবর্তী অংশ **"গীতার সত্য সার"** পড়ুন।

নিবেদন:- এই পুস্তকের শেষ অংশে, 190 নম্বর পৃষ্ঠায় গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রী জয়দয়াল গোয়েন্দকা দ্বারা অনুবাদিত, গীতা সম্বন্ধিত অধ্যায়ের শ্লোক সমূহের ফটোকপি দেওয়া হয়েছে, যাতে সত্যকে শীঘ্রই জানা যায় আর প্রমাণ দেখার জন্য আপনাদের অন্য গীতা ক্রয় করার প্রয়োজন না হয়।

লেখক
সন্ত রামপাল দাস

"গীতার সত্য সার"

❖ গীতা = শ্রীমদ্ভগবদ গীতা।

১. প্রশ্ন :- গীতা জ্ঞান কে, কোন সময় কাকে শুনিয়েছিলেন? এবং কে তা লিপিবদ্ধ করেন? কৃপা করে সবিস্তারে বলুন।

উত্তর :- শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান 'কাল ভগবান' (বেদে এবং গীতায় যিনি ব্রহ্ম নামে পরিচিত) তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন। যে সময়ে কৌরব এবং পাণ্ডবেরা নিজেদের সম্পত্তি অর্থাৎ দিল্লির রাজ্যের উপর নিজেদের নিজেদের অধিকারের দাবি নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। দুই পক্ষের সেনারা কুরুক্ষেত্রের ময়দানে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ছিল। তখন অর্জুন দেখে যে সামনে থাকা সেনাদের মধ্যে পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য, আত্মীয়-স্বজন, কৌরবদের সন্তান, জামাই, ভগ্নিপতি, শ্বশুর প্রভৃতি লড়াই করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। কৌরব এবং পাণ্ডবেরা নিজেদের মধ্যে খুড়তুতো ভাই ছিলেন। সামনে শত্রু পক্ষের লাইনে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুনের মধ্যে সাধু ভাবের উদয় হয়, তাই চিন্তা করে যে, রাজ্য প্রাপ্তির জন্য আমি নিজের জ্যাঠার ছেলে, পিতামহ ভীষ্ম, অন্যান্য গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনদের

বধ করবো? না জানি আমরা এই সংসারে কতদিনই বা থাকবো? এইজন্য এইভাবে পাপ করে পাওয়া 'রাজ্য সুখ' অপেক্ষা ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করা শ্রেয়! তাই আমি কোন মতেই যুদ্ধ করে মহাপাপের ভাগী হতে পারব না। এই চিন্তা করে অর্জুন ধনুষ-বান নামিয়ে রেখে রথের পিছনে গিয়ে বসে পড়ে। অর্জুনের এমন দশা থেকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন - হে অর্জুন! দেখো সামনে কোন যোদ্ধাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। তখন অর্জুন উত্তর দেয় - হে কৃষ্ণ! আমি কোন কিছুর বিনিময়ে এই যুদ্ধ করবো না। নিজের মনের বিচার এবং উদ্দেশ্য যা মনে আসছিল তা সব শ্রীকৃষ্ণকে জানায়। ঠিক তখনই শ্রীকৃষ্ণের শরীরে কাল ভগবান প্রবেশ করে, ঠিক যেমন কোন প্রেত অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে কথা বলে, সেইরূপ শ্রী কৃষ্ণের শরীরে কাল প্রবেশ করে "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান" যুদ্ধ করার প্রেরণা দেওয়ার জন্য দেয় এবং সেই সাথে কলিযুগে বেদের জ্ঞান জানা ব্যক্তি থাকবে না, তাই তিনি চার বেদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা সারাংশ, গীতা জ্ঞান রূপে ১৮ অধ্যায়ে ৭০০ শ্লোকে শোনায়। শ্রীকৃষ্ণ তো জানেন'ই না, যে তিনি গীতা জ্ঞানে কি বলেছিলেন।

{ ব্রহ্ম-কুমারী পন্থীরা এই কালকে নিরাকার শিব বাবা বলে থাকেন! তারা আরও বলেন যে, এই গীতার জ্ঞান শিব বাবা কোন বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করে বলেছিলেন। এই শিব বাবা'ই ব্রহ্মকুমারী পন্থীদের পুজ্যদেব।}

❖ কয়েক বছর পর বেদব্যাস ঋষি এই অমৃতময় গীতা জ্ঞানকে সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী লিপিতে লেখেন। পরে বিভিন্ন অনুবাদকরা নিজেদের বিচার বুদ্ধি অনুসারে এই পবিত্র গ্রন্থের হিন্দি এবং অন্যান্য আরো ভাষায় অনুবাদ করেন যা বর্তমানে গীতা প্রেস গোরক্ষপুর (UP) থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলির ফটোকপি এই পুস্তকের 190 থেকে 320 পৃষ্ঠার মধ্যে দেওয়া আছে।

প্রশ্ন:- আজ (সন্ ২০১২) পর্যন্ত তো আমরা এটা শুনে আসছি যে, পবিত্র গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কিন্তু আজ আপনি বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের শরীরে কাল প্রবেশ করে গীতার জ্ঞান বলেছেন! এমনকি শ্রীকৃষ্ণও জানতেন না যে, তিনি গীতা'র জ্ঞানে কি বলেছিলেন? এটি অসত্য মনে হচ্ছে! কোন প্রমাণ থাকলে দেখান।

উত্তর :- আপনাকে অনেক অনেক প্রমান দেখানো হবে যাতে স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে যাবে যে, গীতা শাস্ত্রের জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের নয় বরং ওনার শরীরে "কাল" প্রবেশ করে বলেছিলেন।

সর্বপ্রথম গীতা থেকে প্রমাণিত করছি...

❖ **প্রমাণ নং.১** :- যখন গীতা জ্ঞানদাতা গীতার ১০ নং অধ্যায়ে নিজের বিরাট রূপ দেখিয়ে দেয়, তখন তা দেখে অর্জুন ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। এখানে এটা বলা প্রয়োজন যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের শালা ছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের বোন সুভদ্রাকে অর্জুন বিবাহ করেছিলেন।

গীতা জ্ঞান দাতা যখন নিজের ভয়ঙ্কর হাজার বাহুযুক্ত বিরাট রূপ দেখান তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করেন, হে দেব! আপনি কে? (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩১)।

❖ হে সহস্র বাহু (হাজার হাত যুক্ত প্রভু)! আপনি আপনার চতুর্ভুজ রূপে দর্শন দিন (কারণ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মনে করতেন, কিন্তু ওই সময় শ্রীকৃষ্ণের শরীর থেকে কাল বাইরে এসে নিজের অপার বিরাট রূপ দেখিয়েছিলেন।) আমি ভীত সন্ত্রস্ত, আপনার এই রূপকে আমি সহ্য করতে পারছি না। (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৬)

❖ **বিচার করুন পাঠকগন** :- কেউ কি নিজের শালাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, হে মহানুভব! বলুন আপনি কে? কখনোই না। এক সময় এক ব্যক্তির মধ্যে প্রেতাত্মা প্রবেশ করে কথা বলছিল, সেই সময় সাথে থাকা অন্য ব্যক্তিরা তাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কে বলছেন? তখন ওই প্রেত উত্তর দেয় আমি তোর মামা বলছি। আমি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলাম। একই রকম ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে কাল প্রবেশ করে গীতা জ্ঞান বলেছিলেন।

প্রমান নং ২. :- গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ২১ এ অর্জুন বলছেন, আপনি তো দেবতাদের সমূহকে গ্রাস করছেন, যারা আপনার প্রতি ভয়ভীত হয়ে হাত জড়ো করে আপনারই স্তুতি করছে। মহর্ষী ও সিদ্ধ সমুদায়গণ আপনার কাছে তাদের রক্ষার্থে মঙ্গল কামনা করছে। গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেন যে, হে অর্জুন! আমি বড় কাল, আমি এখনই প্রবৃত্ত হয়েছি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শরীরে আমি এখন প্রবেশ করেছি। আমি উপস্থিত সকল ব্যক্তিদেরকে নাশ করবো! বিপক্ষের সর্বসেনা তুই যুদ্ধ না করলেও ওরা সবাই নষ্ট হয়ে যাবে! এতেই প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞান তো শ্রীকৃষ্ণের শরীরে কাল প্রবেশ করে বলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আগে কখনোই বলেনি যে, আমি কাল বলছি। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে কেউ ভয় পেতেন না, পরিবর্তে গোপীরা, রাখাল বালকরা এবং পশু-পাখিরা সবাই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে আনন্দ পেত। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি কাল ছিলেন? না, শ্রীকৃষ্ণ কাল ছিলেন না। তাই গীতা জ্ঞানদাতা "কাল" যিনি শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে 'গীতা শাস্ত্রের' জ্ঞান দিয়েছিলেন অর্থাৎ গীতা জ্ঞান দেওয়ার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরীরকে ব্যবহার করেছিলেন।

❖ **প্রমাণ নং ৩.** :- গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭ এ গীতা জ্ঞান দাতা বলেছেন, হে অর্জুন! আমি প্রসন্ন হয়ে নিজের শক্তি দিয়ে তোমার দিব্য দৃষ্টি খুলে দিয়ে আমার এই বিরাট রূপ দেখিয়েছি! এই বিরাট রূপ তুমি ছাড়া এর আগে কেউ কখনো দেখেনি।

❖ **বিচার্য বিষয়** :- প্রিয় পাঠকগণ! মহাভারত গ্রন্থে এক প্রকরণে উল্লেখ আছে, যে সময় শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের সভায় উপস্থিত দুই পক্ষকে বলেন যে, "তোমরা (কৌরব এবং পাণ্ডবের) নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে সম্পত্তি ভাগ করে নাও। যুদ্ধ করা শোভা পায় না। পাণ্ডবেরা বলে আমাদের কেবল পাঁচটি গ্রাম দিয়ে দিন, যাতে আমরা জীবন নির্বাহ করতে পারি।" দুর্যোধন এই সামান্য দাবি টুকুও না মেনে নিয়ে বলে, যদি জায়গা নিতে চাও তাহলে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে এসে যুদ্ধ করে নিতে হবে। এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে দুর্যোধনকে বলে, এই পৃথিবী নাশ করার জন্য তোর জন্ম হয়েছে, তুই এই কুলের নাশ করেই ছাড়বি! কোথায় অর্ধেক রাজ্য আর কোথায় পাঁচটি গ্রাম, একটু তো বিবেক রাখ!

শ্রী কৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনে রাজা দুর্যোধন ক্রোধের আগুনে জ্বলে ওঠে। সভায় উপস্থিত নিজের ভাই এবং মন্ত্রীদেরকে আদেশ দেয়, যাদব শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করো! সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিরাট রূপ দেখান। সভাতে উপস্থিত সভাসদগণ ওই বিরাট রূপ দেখে ভয়ভীত হয়ে কেউ চেয়ারের নিচে লুকিয়ে যায়, তো কেউ চোখে হাত রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ে। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সভা ছেড়ে চলে যান এবং নিজের বিরাট রূপ সমাপ্ত করে নেন।

এখন সেই কথাটির উপর বিচার করি, যেটি গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭ এ গীতা জ্ঞান দাতা বলেছিলেন যে, হে অর্জুন! আমার এই বিরাট রূপ তুই ছাড়া পূর্বে অন্য কেউ দেখেনি। যদি শ্রীকৃষ্ণ গীতা জ্ঞান বলতেন তাহলে এটা কখনোই বলতেন না যে, আমার বিরাট রূপ তুই ছাড়া এর পূর্বে কেউ দেখেনি। কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিরাট রূপকে কৌরব এবং সভাসদগণকে আগেই দেখিয়েছিলেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ বলেননি, ওনার শরীরে প্রেতবত প্রবেশ করে কাল (ক্ষর পুরুষ) বলেছিলেন। এটি তৃতীয় প্রমাণ সিদ্ধ হল।

❖ **প্রমাণ নং ৪ :-** শ্রী বিষ্ণু পুরাণের (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) ২৩৩ নং পৃষ্ঠার প্রমাণ আছে যে, একসময় দেবতা ও রাক্ষসদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। দেবতারা পরাজিত হয়ে সমুদ্রের তীরে গিয়ে লুকায় এবং সেখানে তপস্যায় ভগবানের স্তুতি করতে লাগে। কালের বিধান আছে অর্থাৎ কাল প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে যে, “আমি আমার বাস্তবিক ‘কাল রূপে’ কাউকে দর্শন দেব না! নিজের যোগ মায়ায় লুকিয়ে থাকবো।” (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪ থেকে ২৫) এই জন্য কাল (ক্ষর পুরুষ) কখনো বিষ্ণু রূপে দর্শন দেয়, আবার কাউকে শঙ্কর বা ব্রহ্মা রূপে দর্শন দেয়।

দেবতাদেরকে বিষ্ণুরূপে দর্শন দিয়ে বলে যে, আমি তোমাদের সংকটের বিষয়ে জানি। তোমরা পুরঞ্জ্য রাজাকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করো। আমি ওই শ্রেষ্ঠ রাজার শরীরে প্রবেশ করে রাক্ষসদের নাশ করে দেব। (অধিক জানার জন্য পড়ুন ‘বিষ্ণু পুরাণ’)

❖ **প্রমাণ নং ৫:-** শ্রী বিষ্ণু পুরাণের ২৪২ নং পৃষ্ঠাতে প্রমাণ আছে যে, একবার নাগ-বংশীয়দের এবং গন্ধর্বদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। গন্ধর্বরা নাগদের রাজ্য দখল করে সমস্ত ধন-সম্পদ লুটে নেয়। তখন নাগরা ভগবানের স্তুতি শুরু করে, তখন ঐ কাল ভগবান বিষ্ণুর রূপ ধারণ করে প্রকট হয়ে বলে তোমরা পুরুকুতস্ রাজাকে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি করো আমি পুরুকুতস্ রাজার শরীরে প্রবেশ করে গন্ধর্বদের নাশ করে দেব। ঠিক এমনটাই হয়।

উপরোক্ত বিষ্ণু পুরাণের এই দুটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয় (অর্থাৎ প্রমাণিত হয়) যে, কাল ভগবান (ক্ষর পুরুষ) এইভাবে অব্যক্ত (গুপ্ত) থেকে সমস্ত কাজ করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ইনি শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন।

❖ **প্রমাণ নং ৬:-** মহাভারত গ্রন্থের (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর (U.P) থেকে প্রকাশিত) দ্বিতীয় ভাগ ৬৬৭ নং পৃষ্ঠাতে লেখা আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধের পর রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, হে ভগবান! আপনি গীতা জ্ঞান পুনঃরায় আরও একবার শুনিয়ে দিন, সেই জ্ঞান আমি ভুলে গিয়েছি। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “হে অর্জুন! তুই বড়ো বুদ্ধিহীন, বড়ো শ্রদ্ধাহীন। তুই ঐ অমূল্য জ্ঞানকে কেন ভুলে গিয়েছিস? এখন আমি আর ঐ জ্ঞানকে পুনঃরায় শোনাতে পারবো না, কারণ ঐ সময় আমি যোগযুক্ত হয়ে গীতা জ্ঞান শুনিয়েছিলাম”।

❖ **বিচার করুন:-** যুদ্ধের সময় অশান্ত পরিবেশে যদি যোগযুক্ত হওয়া যায়, তাহলে শান্ত পরিবেশে যোগযুক্ত হওয়া কি কঠিন ছিল? আসলে ‘কাল’ শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে ঐ গীতা জ্ঞান দিয়েছিলেন।

❖ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং গীতার জ্ঞান মনে নেই, যদি উনি প্রকৃত বক্তা হতেন, তাহলে তার সমস্ত জ্ঞান মনে থাকতো। শ্রোতাদের তো প্রথমবার ৪০ শতাংশ জ্ঞান মনে থাকে। এটা থেকে প্রমাণিত হয় গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে কাল (ক্ষর পুরুষ) প্রবেশ করে বলেছিলেন। উপরোক্ত প্রমাণগুলিতে স্পষ্ট হয় যে, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ বলেননি। উনি তো জানেন'ই না যে, উনি কি বলেছিলেন! শ্রীকৃষ্ণের শরীরে কাল পুরুষ (ক্ষর পুরুষ) প্রবেশ করে গীতা 'জ্ঞান' বলেছিলেন।

প্রশ্ন ২:- 'কাল পুরুষ' কে?

উত্তর :- এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কৃপা করে 124 নং পৃষ্ঠায় "সৃষ্টি রচনা" অংশ পড়ুন।

প্রশ্ন ৩:- কাল ভগবান অর্থাৎ বহ্ম কি অবিনাশী, না তার জন্ম-মৃত্যু হয় ?

উত্তর :- জন্ম-মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন ৪:- গীতাতে এ বিষয়ে কোথায় প্রমাণ আছে?

উত্তর:- শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ এ গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, আমারও জন্ম-মৃত্যু হয়, আমি অবিনাশী নই! আরো বলেছেন, হে অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীতে হয়েছে সেই সমস্ত জন্মের কথা তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। তুমি, আমি আর এই সমস্ত রাজা ও সৈনিকরা আগেও ছিল, পরেও থাকবে এটা ভেবো না যে, আমরা কেবল বর্তমানেই আছি। আমার উৎপত্তিকে দেবতা ও ঋষিগণ কেউই জানে না, কারণ এরা প্রত্যেকেই আমার থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয় গীতা জ্ঞানদাতা কালপুরুষ অবিনাশী নয়, এইজন্য একে ক্ষরপুরুষ (নাশবান প্রভু) বলা হয়।

প্রশ্ন ৫ :- ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব কি অবিনাশী ?

উত্তর :- না এরা নাশবান, এদেরও জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাতা-পিতা আছে।

প্রশ্ন ৬ :- ত্রিদেবের মাতা-পিতার কোন প্রমাণ দেখান, তাদের নামও বলুন।

উত্তর :- শ্রীদেবী মহাপুরাণ (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) এর তৃতীয় স্কন্দে ১২৩ নং পৃষ্ঠায় শ্রী বিষ্ণু নিজের মাতা দুর্গার স্তুতি করে বলছেন যে, হে মাতা! আপনি শুদ্ধ স্বরূপা, এই সমস্ত সংসার আপনার থেকেই উদ্ভাসিত হচ্ছে, আমরা আপনার কৃপায় বিদ্যমান, আমি ব্রহ্মা আর শঙ্কর তো জন্ম-মৃত্যুতেই আছি, আমাদের তো আবির্ভাব (জন্ম) এবং তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে, আমরা অবিনাশী নই। আপনিই জগৎ-জননী আর প্রকৃতি ও সনাতনী দেবীও আপনি। ভগবান শঙ্কর বললেন, হে মাতা! বিষ্ণুর পর উৎপন্ন হওয়া ব্রহ্মা যখন আপনার পুত্র, তাহলে তারপরে উৎপন্ন আমি তমোগুণী লীলা করা শঙ্কর কি আপনার সন্তান হলাম না? অর্থাৎ আমাকেও উৎপন্নকারী আপনিই। দেবী মহাপুরাণের এই উল্লেখ থেকে এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, শ্রী দুর্গাই (অষ্টাঙ্গী) ব্রহ্মা - বিষ্ণু ও শঙ্করের জন্ম দেওয়া মাতা। অর্থাৎ এই তিন দেবতাই নাশবান।

শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের পিতা কে?

প্রমাণ:- শ্রী শিব মহাপুরাণে (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) এনাদের পিতার বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া আছে। শ্রী শিব মহাপুরানের রুদ্র-সংহিতা খন্ডের ১০০ থেকে ১১০ পৃষ্ঠার মধ্যে নিম্ন প্রকরণ উল্লেখ আছে। নিজের পুত্র নারদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ব্রহ্মা বললেন যে, হে পুত্র! তুমি সৃষ্টির উৎপত্তি কর্তার বিষয় যে প্রশ্ন করেছো তার উত্তর শোনো.....

সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল এক "সদ্ ব্রহ্ম"- ই ছিলেন। সব স্থানে শুধু প্রলয় আর প্রলয় ছিল। তখন ওই নিরাকার পরমাত্মা নিজের স্বরূপ শিবের মতো ধারণ করেন। তাঁকে তখন "সদাশিব" বলা হত। ঐ সদাশিব নিজের শরীর থেকে একজন স্ত্রীকে সৃষ্টি করলেন। তিনি ছিলেন দূর্গা, জগদম্বিকা, প্রকৃতি দেবী এবং ত্রিদেব (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) জননী। এনার আটটি বাহু ছিল এনাকে শিবাও বলা হয়।

❖ **"শ্রী বিষ্ণুর উৎপত্তি"** :- সদাশিব আর শিবা (দূর্গা) পতি-পত্নী রূপে থেকে এক পুত্রের জন্ম দেয় এবং তার নাম বিষ্ণু রাখেন।

❖ **"শ্রী ব্রহ্মার উৎপত্তি"** :- শ্রী ব্রহ্মা বলেছেন, যেভাবে শিব আর শিবের সংযোগে (ভোগ-বিলাসী) বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়েছে, সেইভাবে শিব আর শিবা আমারও উৎপত্তি করেছেন।

বিঃ দ্রঃ:- এখানে কাল ব্রহ্মকে শিব আর দূর্গাকে শিবা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রিয় পাঠকগণ এই রুদ্র-সংহিতা খন্ডে শঙ্করের উৎপত্তি প্রকরণ নেই; এটা অনুবাদ কর্তার ভুল। এমনিতেই দেবী পুরাণে স্বয়ং শ্রী শঙ্কর স্বীকার করছেন যে, আমার জন্ম দূর্গা (প্রকৃতি) দেবীর থেকেই হয়েছে।

❖ **শ্রী শংকরও শিব আর শিবার পুত্র:-** শ্রী শিব মহাপুরানের বিধেশ্বর সংহিতা খন্ডের ২৪ থেকে ৩০ নং পৃষ্ঠার মধ্যে প্রমাণ আছে:- এক সময় শ্রী ব্রহ্মা ও শ্রী বিষ্ণুর মধ্যে এই কথা নিয়ে যুদ্ধ লেগে যায় , শ্রী ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলেন- আমি তোর পিতা, কারণ এই সংসার আমার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, আমি সমস্ত প্রজার পিতা অর্থাৎ প্রজাপিতা। এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলেন, আমি তোর পিতা, কেননা তুই আমার নাভি কমল থেকে উৎপন্ন হয়েছিস। এই কথায় তর্ক-বিতর্ক করে ক্রোধিত হয়ে একে অপরকে মারার জন্য যুদ্ধ শুরু করেন। ঠিক সেই সময় সদাশিব অর্থাৎ কাল ব্রহ্ম ঐ দুজনের মাঝখানে একটি সাদা রঙের প্রকাশমান স্তম্ভ খাড়া করে দেন, তারপর নিজেই শঙ্করের রূপ ধারণ করে প্রকট হয়ে ওনাদেরকে বলেন, তোমরা কেউই কর্তা (প্রভু) নও!

হে পুত্রগণ! তোমাদেরকে আমি জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি রূপী দুটি কাজ দিয়েছি। সেই রূপ শংকর আর রুদ্রকে আরো দুটি কাজ সংহার ও তিরোগতি দিয়েছি। বেদে আমাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। আমার পাঁচ মুখ, এক মুখ থেকে অকার (অ), দ্বিতীয় মুখ থেকে ওকার (ও), তৃতীয় মুখ থেকে মকার (ম), চতুর্থ মুখ থেকে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) এবং পঞ্চম মুখ দিয়ে নাদ (শব্দ) প্রকট হয়েছে। এই পাঁচ অব্যয় এক হয়ে একটি অক্ষর বিশিষ্ট ওঁম্ (ওঁ) তৈরি হয়েছে, এটিই আমার মূল মন্ত্র।

উপরোক্ত শিব মহাপুরাণের এই প্রকরণ থেকে এটি সিদ্ধ হয় যে, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং

শ্রী শঙ্করের মাতা দূর্গাদেবী (অষ্টাঙ্গী দেবী) এবং পিতা সদাশিব অর্থাৎ "কালব্রহ্ম" যিনি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে বলেছিলেন। এনাকে ক্ষরপুরুষ, ক্ষর ব্রহ্মও বলা হয়। এই একই প্রমান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক নং ৩ থেকে ৫ এ আছে যে, রজ্ (রজগুণ ব্রহ্মা), সত্ত্ব (সত্ত্বগুণ বিষ্ণু), তম্ (তমোগুণ শিব) এই তিনগুণ প্রকৃতি অর্থাৎ দূর্গা দেবী থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রকৃতি তো সকল জীবকে উৎপন্নকারী মাতা। আমি (গীতা জ্ঞান দাতা) সকল জীবের পিতা। আমি দূর্গার গর্ভে বীজ স্থাপন করি, যার ফলে সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন ৭:- রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুনী যে শঙ্কর তার প্রমাণ এখানে কোথায় আছে?

উত্তর: ১. শ্রী মার্কন্ডে পুরাণের (সচিত্র মোটা টাইপ গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) ১২৩ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুনী শঙ্কর ব্রহ্মের তিনটি প্রধান শক্তি। এরাই তিন দেবতা এবং এই তিনগুণ।

২. শ্রীদেবী মহাপুরাণ সহ সংস্কৃত ও হিন্দি অনুবাদ (শ্রী বেঙ্কেটেশ্বর প্রেস মুম্বাই থেকে প্রকাশিত) এর তৃতীয় স্কন্দের ৫ নং অধ্যায়ের ৮ নং শ্লোকে লেখা আছে যে, শঙ্কর ভগবান বলছেন, হে মাতা! যদি আপনি আমার উপর দয়ালু হন, তাহলে আমাকে তমোগুণ যুক্ত, ব্রহ্মাকে রজগুণ যুক্ত এবং বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণ যুক্ত কেন বানিয়েছেন?

উপরোক্ত এই বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ শঙ্কর।

প্রশ্ন ৮:- পরমাত্মাকে অজন্মা, অজর-অমর বলা হয়, কিন্তু উপরোক্ত বিবরনে প্রমাণিত হয় যে, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শঙ্কর এই তিন দেবতাই নাশবান! তাহলে অবিনাশী পরমাত্মা কে? তাহলে কি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর এবং কালব্রহ্ম কেউই পরমাত্মা নয়? কৃপা করে প্রমাণ সহিত বলুন:-

উত্তর:- সর্বপ্রথম এটা স্পষ্ট করি যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর পরমাত্মা কি না। এটি তো আপনি আপনার প্রশ্নের মধ্যেই সিদ্ধ করে দিয়েছেন যে পরমাত্মা তো অজন্মা অর্থাৎ যার কখনো জন্ম হয় না, তাকেই পরমাত্মা বলে। পূর্বোক্ত বিবরণ ও প্রমাণের মাধ্যমে এটি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শঙ্করের মাতা পিতা আছে। ব্রহ্মও নাশবান এনারও জন্ম হয়েছে। এতে স্বয়ংসিদ্ধ হয় যে, এনারা কেউই পরমাত্মা নন। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে অবিনাশী কে? এর উত্তর শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা থেকে প্রমাণিত করছি যে, সেই অবিনাশী পরমাত্মা গীতা জ্ঞানদাতা (ব্রহ্ম) থেকে অন্য কেউ। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২-এ গীতা জ্ঞানদাতা নিজের স্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, আমারও উৎপত্তি হয়েছে, আমিও জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করি, হে অর্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম অতীত হয়েছে, আমিও নাশবান! গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭ তে ও বলেছে যে, অবিনাশী বলে তো তাকেই জানো, যাকে কেউ মারতে সক্ষম নয়! আর যে পরমাত্মা

সকল সৃষ্টির রচনা করেছেন, অবিনাশী পরমাত্মার এটিই প্রথম প্রমাণ।

❖ প্রমাণ নং ২ :- শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ - ১৭ তে তিন পুরুষের (প্রভুর) কথা বলা হয়েছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে বলেছে যে, এই লোকে দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ:- ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ। এই দুই প্রভু এবং এনাদের অন্তর্গত সকল প্রাণী নাশবান, আত্মা তো প্রত্যেকেরই অমর। আবার গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলেছে যে, উত্তম পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম তো অন্য কেউ, যাকে পরমাত্মা বলা হয়। যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারন-পোষণ করেন, তিনি বাস্তবে অবিনাশী।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯ এ বলা হয়েছে যে, সাধক কেবল জরা (বৃদ্ধাবস্থা), মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে, সে তত্ ব্রহ্মকে জানে, অর্থাৎ সকল কর্ম ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পর্কে পরিচিত। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১ এ অর্জুন জিজ্ঞাসা করে যে, “তত্ ব্রহ্ম” কি? গীতা জ্ঞান দাতা গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ এ উত্তর দেন যে, তিনি “পরম অক্ষর ব্রহ্ম” অর্থাৎ পরম অক্ষর পুরুষ।(পুরুষ বলো বা ব্রহ্ম) গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে যে “উত্তম পুরুষঃ তু অন্যঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃত” বলেছেন যে, তিনি “পরম অক্ষর ব্রহ্ম,” এনাকেই পুরুষোত্তম বলা হয়েছে।

“সন্দেহের সমাধান”

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৮ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে যে, আমি আমার ২১ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব প্রাণী থেকে উত্তম অর্থাৎ সর্ব শক্তিমান। তাই লোকবেদে অর্থাৎ প্রচলিত কথার আধারে আমি পুরুষোত্তম হিসাবে প্রসিদ্ধ। বাস্তবে পুরুষোত্তম তো গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে স্পষ্ট করে দিয়েছে। উত্তম পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম তো ক্ষর পুরুষ (গীতা জ্ঞানদাতা) এবং অক্ষর পুরুষ (যিনি ৭ শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী) থেকে ভিন্ন অন্য কেউ, তিনিই পরমাত্মা নামে পরিচিত। তিনিই সকলের ধারণ-পোষণকারী, বাস্তবে অবিনাশী। তিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মালিক সমস্ত জগতের সৃজনহার “পরম অক্ষর ব্রহ্ম” অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা।

প্রশ্ন ৯ :- অক্ষর শব্দের অর্থ অবিনাশী। তাহলে আপনি গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে অক্ষর পুরুষকে কেন নাশবান বলেছেন? অনুগ্রহ করে বলুন।

উত্তর:- এটা সত্য যে “অক্ষর” এর অর্থ অবিনাশী হয়। কিন্তু জায়গা বিশেষে অন্য অর্থ হয়। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে বলা হয়েছে যে, ক্ষর ও অক্ষর এই দুই প্রকার পুরুষ (প্রভু) এই লোকে আছে, এরা দুজন এবং এনাদের অন্তর্গত যত জীব আছে, তারা সকলেই নাশবান, আত্মা তো কারোরই বিনষ্ট হয় না। তারপর গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পুরুষোত্তম তো উপরোক্ত দুই প্রভু হতে ভিন্ন তিনিই অবিনাশী, তিনিই বাস্তবে সকলের পালন-পোষণকারী অবিনাশী। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ এ তত্ ব্রহ্মকে পরম অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়েছে। অক্ষরের অর্থ অবিনাশী, কিন্তু এখানে পরম অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এই থেকে বোঝা যায় যে, অক্ষরের পরেও পরম অক্ষর ব্রহ্ম আছে, তিনিই বাস্তবে অবিনাশী।

❖ **প্রমাণ :-** যেমন ব্রহ্মার বয়স ১০০ বছর বলা হয়েছে, দেবতাদের বছর কত

সময় হয়? শোনো! চার যুগের (সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগ) সময় কালকে এক চর্তুযুগ বলা হয়। যেখানে মানুষের ৪৩,২০,০০০ (তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার) বছরের সমান হয়। এইরূপ তৈরি হওয়া ১০০৮ চর্তুযুগ সময়কাল নিয়ে ব্রহ্মার একদিন হয় আর এতটাই সময়কাল নিয়ে এক রাত্রি সম্পন্ন হয়। এইভাবে ৩০ দিন রাত্রি মিলিয়ে এক মাস এবং ১২ মাসে ব্রহ্মার এক বছর সম্পন্ন হয়। এইভাবে ১০০ (একশত) বছর সময়কাল নিয়ে ব্রহ্মার আয়ু। শ্রী বিষ্ণুর আয়ু শ্রী ব্রহ্মার আয়ুর ৭ গুণ = ৭০০ বছর শ্রী শঙ্করের আয়ু শ্রী বিষ্ণুর আয়ুর ৭ গুণ বেশি = ৪৯০০ বছর। ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষ) আয়ু = ৭০ হাজার শঙ্করের মৃত্যুর পর এক ব্রহ্মের মৃত্যু হয়, অর্থাৎ ক্ষরপুরুষের মৃত্যু হয়। এতটা সময়কাল নিয়ে অক্ষর পুরুষের এক যুগ সম্পন্ন হয়।

অক্ষর পুরুষের আয়ু :- গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭ তে বলা হয়েছে যে:-

সহঁস্র যুগ পর্যন্তম্ অহঃ যত্ ব্রহ্মণঃ বিদুঃ।

রাত্রিম্ যুগ সহঁস্রান্তম্ তে অহোরাত্রা বিদঃ জনাঁঃ॥(১৭)

অনুবাদ:- আজ পর্যন্ত কোনো অনুবাদকর্তাই এই শ্লোকের সঠিক অনুবাদ করতে পারেনি। প্রত্যেকেই ব্রহ্মার আয়ু এক হাজার চর্তুযুগ লিখে রেখেছে, এটা ভুল। (দেখুন এই পুস্তকের গীতা অংশে, গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ১৭ নং শ্লোকের ফটোকপিতে)

মূল পাঠে "সহস্রযুগ" লেখা আছে, সহস্র চর্তুযুগ লেখা নেই। তাই গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭ এর অনুবাদ এইরকম হবে:- (ব্রহ্মণঃ) অক্ষর পুরুষের (যত) যে (অহঃ) একদিন তা (সহস্রযুগ প্রয়ন্তন) এক হাজার যুগ পর্যন্ত সময়কাল আর (রাত্রিম্) রাত্রির সময় ও (যুগ সহস্রান্তম্) এক হাজার যুগ অবধি সময়কাল, যে পুরুষ এটি (বিদুঃ) জানে, (তে) সেই (জনা) ব্যক্তি (অহোরাত্র) দিন-রাত্রির বিষয়ে (বিদঃ) জানেন।

ভাবার্থ:- এই শ্লোকে "ব্রহ্মা" শব্দ মূল পাঠে নেই, আর "চতুর যুগ" শব্দও মূল পাঠে নেই, এখানে "ব্রহ্মণঃ" শব্দ আছে, যার অর্থ সচিদানন্দ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষরব্রহ্ম হয়। কিন্তু বিষয় প্রকরণ অনুসারে ব্রহ্মণঃ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম থেকে অন্য পরব্রহ্মও (অক্ষর ব্রহ্ম) হয়।

❖ **প্রমাণ:-** গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ ব্রহ্মণঃ শব্দের অর্থ সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্ম করেছে, যা অনুবাদকরা ঠিক করেছেন। এই গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭ তে আয়ুর বিষয়ে প্রকরণ আছে। এজন্য এখানে "ব্রহ্মণ" = শব্দের অর্থ "অক্ষর ব্রহ্ম" হয়। এখানে অক্ষর পুরুষের আয়ুর তথ্য দিয়েছে। অক্ষর পুরুষের একদিন উপরোক্ত এক হাজারযুগ অবধি সময়কাল নিয়ে হয়। {৭০ হাজার শিবের মৃত্যুর পর একটি ক্ষর পুরুষের মৃত্যু হয়। সেই সময়কাল অক্ষর পুরুষের এক যুগ।} এইরূপ এক হাজার যুগে অক্ষর পুরুষের একদিন হয়, এবং এতটাই সময় কাল এক রাত্রি হয়। এইভাবে ৩০ -দিনে এক মাস, ১২ মাসে এক বছর। এই ভাবেই ১০০ বছর অক্ষর পুরুষের আয়ু সম্পূর্ণ হলে তাঁর মৃত্যু হয়। এই জন্য গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ উভয়কেই নাশবান বলেছে। গীতা অধ্যায় ১৫

শ্লোক ১৭ তে যে, আসল অবিনশ্বর পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে, তিনিই বাস্তবে অবিনশ্বর। যিনি সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হওবার পরেও অবিনাশী থেকে যান।

প্রমাণ:- গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০ থেকে ২২ পর্যন্ত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ঐ পরম অক্ষর ব্রহ্ম সর্বপ্রাণী নষ্ট হওয়ার পরেও কখনোই নষ্ট হন না।

উদাহরণ:- যেমন সাদা চিনেমাটির কাপ-প্লেট হাত থেকে পাকা মেঝেতে পড়ে গেলে ভেঙে যায় অর্থাৎ নাশবান। এইরূপ স্থিতি 'ক্ষর' পুরুষের জানো।

২. দ্বিতীয়, স্টিলের কাপ- প্লেট, যা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না, অনেক সময় পরে মরচে লেগে নষ্ট হয়ে যায়। চিনামাটির তৈরী কাপ-প্লেটের তুলনায় স্টিলের তৈরি কাপ-প্লেট স্থায়ী মনে হলেও একদিন না একদিন মরচে লেগে অবশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। এইরূপ স্থিতি অক্ষর পুরুষের জানো।

৩. তৃতীয় সোনার তৈরি কাপ-প্লেট যা কখনোই মরচে লাগেনা। আর নষ্টও হয় না। এই স্থিতি পরম অক্ষর ব্রহ্মের জানো। ইনিই বাস্তবে পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মা। এই জন্য প্রকরণ অনুসারে অক্ষর শব্দের অর্থ নাশবানও হয়, বাস্তবে অক্ষরের অর্থ অবিনাশী।

উদাহরণ:- গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১১ এর মূল পাঠ :-

যত্ অক্ষরম্ বেদ বিদঃ বদন্তি বিশন্তি যত্ যতয়ঃ বীতরাগাঃ

যত্ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যম চরন্তি তত্ তে পদম্ সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে (১১)

অনুবাদ:- এই শ্লোকে "অক্ষর"-শব্দ পরমাত্মার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, (বেদ বিদঃ) তত্ত্বদর্শী সন্ত অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য ভালোভাবে জানা মহাত্মা (য়ত্) যাকে (অক্ষরম্) অবিনাশী (বদন্তি) বলে। যে (যদ্যয়ঃ) সাধনারতঃ (বীতরাগা) আসক্তি রহিত সাধক (য়ত্) যে লোকে প্রবেশ (বিশান্তি) করে, আর যে (যত্) পরমাত্মাকে (ইচ্ছন্তঃ) চায়, সেই সাধক (ব্রহ্ম চর্যম) ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ শিষ্য পরম্পরায় (চরন্তি) আচরণ করে (তত্) সেই (পদম) পদকে (তে) তোর জন্য আমি (সংগ্রহেন) সংক্ষেপে (প্রবক্ষে) বলছি। এই শ্লোকে "অক্ষরের" অর্থ অবিনাশী পরমাত্মা করেছে যা সঠিক।

কবীরদেব সূক্ষ্মবেদে বলেছেন যে:-

গুরু বিন কাহু ন পায়া জ্ঞানা, জ্যোঁ থোথা ভুস ছিড়ে মূঢ় কিসানা।

গুরু বিন বেদ পড়ে জো প্রাণী, সমঝে না সার রহে অজ্ঞানী॥

প্রশ্ন ১০:- আপনি কোন মুক্তিকে পূর্ণ মোক্ষ মনে করেন?

উত্তর:- গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বর্ণনা আছে যে, তত্ত্বদর্শী সন্ত প্রাপ্তির পরে তত্ত্বজ্ঞান রূপী অস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকে কেটে অর্থাৎ ভালোভাবে তত্ত্বজ্ঞান বোঝার পরে পরমেশ্বরের ঐপরম পদের সতলোকের খোঁজ করা দরকার। যেখানে যাওয়ার পরে সাধক এই জগৎ সংসারে আর কখনো ফিরে আসে না অর্থাৎ সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না। যে পরমাত্মার সকলের সৃষ্টি করেছেন, কেবল ওনারই ভক্তি-পূজা করো। একেই পূর্ণ মোক্ষ বা পূর্ণ মুক্তি বলে, যা প্রাপ্তির

পরে আর পুনর্জন্ম হয় না। জন্ম-মৃত্যুর চক্র চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়।

প্রশ্ন ১১:- গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্মের ভক্তি তে কি পূর্ণ মুক্তি সম্ভব?

উত্তর:- না।

প্রশ্ন ১২:- গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে উল্লেখ আছে, গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, হে অর্জুন! আমাকে প্রাপ্ত করার পরে আর পুনর্জন্ম হয় না। তাহলে আপনি কি করে বলছেন যে, ব্রহ্মের ভক্তিতে মোক্ষ সম্ভব নয়?

উত্তর:- শ্রীদেবী মহাপুরাণ (সচিত্র মোটা টাইপ কেবল হিন্দি গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) এর সপ্তম স্কন্দে পৃষ্ঠা নং ৫৬২ - ৫৬৩ তে প্রমাণ আছে যে, শ্রী দেবী রাজা হিমালয়কে জ্ঞান-উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, হে রাজন! অন্য সবকিছু ছেড়ে দাও, এমনকি আমার ভক্তিও ছেড়ে শুধুমাত্র এক ওঁম্ -নামের জপ করো, "ব্রহ্ম" -প্রাপ্তির এটাই একমাত্র মন্ত্র। এর মাধ্যমে সংসারের ওপারে যে ব্রহ্ম আছে তাকে প্রাপ্ত করো। তোমার কল্যাণ হোক। ঐ ব্রহ্ম, ব্রহ্মলোক রূপী দিব্য আকাশে থাকেন।

ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্ম সাধনায় একমাত্র ওঁম্ (ওঁ) নাম জপের বিধান আছে, এই নাম জপ করে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে সাধক ব্রহ্মলোকে চলে যায়। এই গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে বলেছে যে, ব্রহ্মলোক সহিত সমস্ত লোক পুনরাবর্তীশ্ল তে আছে অর্থাৎ ব্রহ্ম লোকে যাওয়া সাধকেরও পুনর্জন্ম হয়। ব্রহ্মের ভক্তিতে পূর্ণ মোক্ষ লাভ হয় না। অনুবাদকর্তা এই গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ -র অনুবাদ (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত গীতাতে এছাড়াও অন্য প্রকাশনের গীতাতে) ভুল ব্যাখা করেছে।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ :-

আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ অর্জুন।

মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

এই শ্লোকের অনুবাদ ভুল করেছে যা এইরকম:- হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্য৻ন্ত সমস্ত লোক পুনরাবর্তীতে আছে অর্থাৎ ওখানে যাওয়ার পরেও সাধককে এই সংসারে পুনরায় ফিরে আসতে হয়। কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত করার পর পুনর্জন্ম হয় না। (এই অনুবাদ ভুল করেছে।) এই পুস্তকের শেষ অংশে গীতা প্রেসের গোরক্ষপুরের প্রকাশিত গীতার ফটোকপি দেওয়া হয়েছে।

এর সঠিক অনুবাদ:- ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক পুনরাবর্তীতে আছে অর্থাৎ ব্রহ্ম লোকে যাওয়া সাধকেরও পুনর্জন্ম হয়, যারা এটা জানে না, হে অর্জুন! আমাকে প্রাপ্ত করার পরেও তাদের পুনর্জন্ম হয়। এই শ্লোকে "বিদ্যতে" শব্দের অর্থ "জানা" হওয়া উচিত। গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ২৩ এ "বিদ্যতে" শব্দের অর্থ "জানা" করা হয়েছে। এখানে এই শ্লোকে "বিদ্যতে" শব্দের অর্থও "জানা" হবে। দেখুন এই পুস্তকে, এই শ্লোকের ফটোকপিতে আরো স্পষ্ট জানার জন্য গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৫ পর্যাপ্ত।

মূল পাঠ:-

মাম্ উপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্।

ন অপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিম পরমাম্ গতাঃ॥ (৮-১৫)

অনুবাদ:- (মাম্) আমাকে প্রাপ্ত করার পরেও (পুনর্জন্ম) পুনর্জন্ম হয়, যা (অশাশ্বতম্) নাশবান জীবনের (দুঃখালয়ম্) দুঃখের ঘর। (পরমাম্) পরম (সংসিদ্ধিম গতাঃ) সিদ্ধিপ্রাপ্ত (মহাত্মনঃ) মহাত্মাগণ (ন অপ্নুবন্তি) পুনর্জন্ম প্রাপ্ত করে না। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৫)

ভাবার্থ:- গীতা জ্ঞান দাতা বলেছেন যে, আমাকে প্রাপ্ত করার পরেও দুঃখের ঘরে ক্ষনভঙ্গুর জীবনে জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে। যে মহাত্মাগণ পরম গতি প্রাপ্ত করেন, তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

❖ **বিচার করুন :-** গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সারাংশ এই প্রকার:- অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছে (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১) যে, তত্ ব্রহ্ম কি? গীতা জ্ঞানদা-তা গীতা অধ্যায় ৮ এর ৩ নং শ্লোকে উত্তর দিয়েছেন যে, তিনি "পরম অক্ষর ব্রহ্ম"।

গীতা জ্ঞানদাতা পুনরায় ৮ নং অধ্যায়ের ৫ এবং ৭ শ্লোকে নিজের ভক্তি করতে বলেছেন এবং গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ৮, ৯, ১০ নং শ্লোকে "পরম অক্ষর ব্রহ্ম" -এর ভক্তি করতে বলেছেন। নিজের ভক্তি করার মন্ত্রের কথা গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ১৩ নং শ্লোকে বলেছেন যে, আমি ব্রহ্ম আমার কেবল এক ওঁম্ (ওঁ) অক্ষর আছে। এই মন্ত্র উচ্চারণ করে জপ করতে করতে কেউ যদি শরীর ত্যাগ করে দেয়, তাহলে সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। পূর্বেই শ্রীদেবী পুরাণ থেকে প্রমাণিত করে এসেছি যে "ওঁ" মন্ত্র জপ করলে ব্রহ্মালোক প্রাপ্তি হয়। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে উল্লেখ আছে, ব্রহ্মা লোকে যাওয়া সাধকেরও পুনর্জন্ম হয়। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ তে ওঁ নামের জপে হওয়া পরমগতির কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮, ৯, ১০ -এ যে সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্ম অর্থাৎ পরম দিব্য পুরুষের ভক্তির কথা বলা হয়েছে, তার মন্ত্রের কথা গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ -এ লেখা আছে।

ওঁ,তৎ, সৎ, ইতি, নির্দেশঃ, ব্রহ্মণঃ, ত্রিবিধঃ,স্মৃতঃ

ব্রাহ্মণাঃ, তেন, বেদাঃ, চ, যজ্ঞাঃ, চ বিহিতাঃ, পুরা॥

অনুবাদ:- সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্মের ভক্তির মন্ত্র হলো ওঁ,তৎ, সৎ। "ওঁ" মন্ত্র ব্রহ্মা অর্থাৎ ক্ষর পুরুষের। "তত্" এই মন্ত্র সাংকেতিক, যা অক্ষর পুরুষের মন্ত্র। "সত্" এই মন্ত্রও সাংকেতিক মন্ত্র, যা পরম অক্ষর ব্রহ্মের। এই তিন মন্ত্রের জপে ঐ পরমম গতি প্রাপ্ত হয়, যা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ -এ বলা হয়েছে, যেখানে যাওয়ার পর সাধক আর কখনো সংসারে ফিরে আসে না।

যদি গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ এর অর্থ সঠিক মানা হয়, যে আমাকে প্রাপ্ত করা ব্যক্তিদের পুনর্জন্ম হয় না তাহলে গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যেখানে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, হে অর্জুন! তোর আর আমার অনেক জন্ম অতিবাহিত হয়েছে, তুই জানিস না কিন্তু আমি জানি। আমার উৎপত্তির বিষয়ে না দেবতারা জানে, না মহ-

র্ষিগণ এমনকি সিদ্ধিগনেরাও জানেনা। বিচার্য বিষয় এই যে, যখন সাধকের ইষ্টেরই জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে, তবে সাধকের কিভাবে মোক্ষ প্রাপ্তি হতে পারে? কিভাবে তাঁর জন্ম-মৃত্যু চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যাবে?

এইজন্য গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ এর যে অনুবাদ আমি করেছি, সেটাই সঠিক যা এই প্রকার- গীতা জ্ঞান দাতা বলেছেন যে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক পু-নরাবর্তীতে আছে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যাওয়া প্রাণীও পুনরায় সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। যারা এই কথা জানেনা, তারা আমার ভক্তি করেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এই জন্যেই তো গীতা জ্ঞান দাতা গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে বলেছেন যে, হে অর্জুন! তুই সর্বভাবে ওই পরমেশ্বরের শরণে যা, ওই পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম অর্থাৎ সত্যলোক প্রাপ্ত করবি। এই একই প্রমান গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ-ও আছে যে, হে অর্জুন! তুই তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করে ওই তত্ত্বজ্ঞান রূপী অস্ত্রদ্বারা অজ্ঞানতাকে কেটে তারপর পরজ্ঞ মেশ্বরের ওই পরম পদের খোঁজ কর, যেখানে যাওয়ার পর সাধক আর এই মৃত্যু লোকের সংসারে কখনো ফিরে আসে না।

যে পরমেশ্বরের থেকে এই সংসার রূপী বৃক্ষের বিস্তার হয়েছে অর্থাৎ যে পর-মেশ্বর এই সংসারের রচনা করেছেন। গীতা জ্ঞানদাতা একমাত্র তাঁর ভক্তি করতে বলেছেন। সেই পরমেশ্বরের থেকেই সমস্ত জগতের কল্যাণ সম্ভব।

❖ উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মের ভক্তিতে পূর্ণ মোক্ষ লাভ হয় না। একমাত্র পূর্ণ পরমাত্মার (পরম অক্ষর ব্রহ্মের) ভক্তিতেই পূর্ণ মোক্ষ সম্ভব।

প্রশ্ন ১৩ :- ওঁম্ (ওঁ) এই মন্ত্র তো ব্রহ্ম জপের মন্ত্র, তাহলে আপনি কেন বলছেন যে, ব্রহ্মের ভক্তিতে পুণ্য মোক্ষ লাভ হয় না ? আপনি বলেছেন যে, গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ "ওঁ তৎ সৎ " এই মন্ত্রে জপে পূর্ণ মোক্ষ লাভ হয়। কিন্তু এই মন্ত্রের মধ্যেও তো ওঁম্ মন্ত্র আছে।

উত্তর:- যেমন ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হওয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয়। প্রথমে প্রথম শ্রেণীতে পড়তে হয়, পরে ধীরে-ধীরে পঞ্চম-অষ্টম, একইভাবে দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হয়। তারপর আরো পড়াশোনা করার পর ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারের ট্রেনিং সফলতার সাথে সম্পন্ন করে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হওয়া যায়। সেই রকম শ্রী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ এবং দেবীর সাধনা করতে হয়, আমি স্বয়ং করি এবং আমার সমস্ত অনুগামীদেরকেও করাই। এটি তো পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা অর্থাৎ সাধনা জানো, অন্যভাবে বললে এটি পাঁচ কমল খোলার সাধনা মন্ত্র আর ব্রহ্মের সাধনা দশম শ্রেণীর শিক্ষা জানো অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সাধনায় ওঁম্ (ওঁ) মন্ত্র জপ করতে হয়। এরপর অক্ষর পুরুষের সাধনাকে ১৪ তম শ্রেণীর শিক্ষা অর্থাৎ সাধনা জানো, যেখানে "তত্" মন্ত্রের জপ আছে। "তত্" মন্ত্র তো সাংকেতিক, প্রকৃত মন্ত্র তো আলাদা যা কেবল উপদেশীকেই বলা হয়।

পরম অক্ষর পুরুষের সাধনা ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারি শিক্ষার পড়া অর্থাৎ সাধনা জানো, যা "সত্" শব্দের দ্বারা করতে হয়। এই "সত্" মন্ত্রও সাংকেতিক। প্রকৃত

মন্ত্রে'র থেকে ভিন্ন যা কেবল উপদেশীকে বলা হয়ে থাকে। একে সারনামও বলা হয়।

এইজন্য একাকী "ব্রহ্ম"-এর নাম ওঁম্ "ওঁ" মন্ত্রে পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) সম্ভব নয়। "ওঁ" নামের জপ ব্রহ্মের। এঁর সাধনার ফল স্বরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম লোকে যাওয়া সাধকেরও পুনার্জন্ম হয়। যদি পুনর্জন্ম হয়, তাহলে তার মোক্ষ লাভ হয়নি। যার বিষয় গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ -এ বলেছে যে, পরমাত্মার ঐ পরম পদের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধককে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত করে এই সংসারে আর ফিরে আসতে হয় না। সেই পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) কেবলমাত্র পূর্ণ গুরুর শরণে এসে শাস্ত্রানুকূল সৎভক্তি করেই পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে এই পৃথিবীতে আমার (সন্ত রামপাল দাস) ব্যতীত অন্য কারো কাছে এই সদ্-ভক্তি নেই।

প্রশ্ন ১৪:- পরমাত্মা এক না অনেক?

উত্তর:- সর্বকুলের মালিক একজন অর্থাৎ পরমাত্মা একজন।

প্রশ্ন ১৫:- সেই পরমাত্মা কে? যিনি সর্ব সৃষ্টির মালিক, কোথায় তাঁর প্রমাণ?

উত্তর:- সেই পরমাত্মা হলেন "পরম অক্ষর ব্রহ্ম" যিনি সকল সৃষ্টির মালিক।

প্রমাণ:- শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ এবং ১৬-১৭ তে আছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ এর সারাংশ এবং ভাবার্থ হল এই যে, এই সংসারকে উল্টোভাবে ঝুলে থাকা অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো জানো। এই বৃক্ষের মূল (শিকড়) তো উপরে, নিচে তিন গুণ রূপী শাখা আছে জানো। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ -এ এটাও স্পষ্ট করা আছে যে, তত্ত্বদর্শী সন্তের (সাধুর) পরিচয় কী? তত্ত্বাদর্শী সন্ত তিনি, যিনি এই সংসার রূপী বৃক্ষের সর্বাঙ্গের (প্রতিটা বিভাগের) বর্ণনা পৃথক-পৃথক ভাবে বলেন।

বিশেষ:- এই পুস্তকে যে বেদ মন্ত্রের ফটোকপি দেওয়া হয়েছে, তার অনুবাদ আর্য সমাজের আচার্য ও মহর্ষি দয়ানন্দের দ্বারা করা হয়েছে এবং "সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভা দিল্লি থেকে প্রকাশিত। যেখানে উল্লেখ আছে, পরমেশ্বর স্বয়ং সশরীরে প্রকট হয়ে কবিদের মতো আচরণ করে সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান শোনান। (প্রমাণ ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬ - ২৭, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮২ মন্ত্র ১-২, সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬-২০, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৫ মন্ত্র ২, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ২০ মন্ত্র ১, ঋগ্বেদ মন্ডল ৫৪ মন্ত্র ৩ -এ) এই সমস্ত মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা সকল ভুবনের অর্থাৎ সমস্ত লোকের উপরের লোকে (ধামে) বিরাজমান আছেন। যখন যখন পৃথিবীতে অজ্ঞানতার বৃদ্ধির কারণে অধর্ম বেড়ে যায় তখন পরমাত্মা স্বয়ং সশরীরে পৃথিবীতে এসে প্রকট হয়ে নিজের যথার্থ আধ্যাত্ত্মিক জ্ঞানের প্রচার লোকোক্তি, শব্দ, চতুষ্পদ শ্লোক, দোঁহা ও কবিতার মাধ্যমে কবিদের মতো আচরণ করে ঘুরে-ঘুরে প্রচার করেন। এইজন্য তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবির উপাধিও লাভ করেন। কৃপা করে দেখুন উপরোক্ত মন্ত্রের ফটোকপি এই পুস্তকের 100 থেকে 114 নং পৃষ্ঠায়।

পরমাত্মা নিজের মুখকমলে যে জ্ঞান বলে শুনিয়েছিলেন তাকে সূক্ষ্মবেদ বলা হয়। তাকে "তত্ত্বজ্ঞান" ও বলা হয়। তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করার কারণে পরমাত্মাকে "তত্ত্বদর্শী সন্ত " ও বলা হয়। ওই তত্ত্বদর্শী সন্ত রূপে প্রকট হওয়া পরমাত্মা সংসারী-রূপী বৃক্ষের সর্ব ভাগের বর্ণনা এইভাবে বলেছেন:-

কবীর, অক্ষর পুরুষ এক বৃক্ষ হৈ, ক্ষর পুরুষ বাকি ডার।

তীনোঁ দেবা শাখা হৈঁ, পাত রূপ সংসার॥

ভাবার্থ:- বৃক্ষের যে অংশ মাটির উপরে দেখা যায়, তাকে কান্ড বলা হয়। যেমন এই সংসার রূপী বৃক্ষের কাণ্ডকে অক্ষর পুরুষ মনে করো। কাণ্ড থেকে যে মোটা ডাল বের হয়, তাকে ক্ষরপুরুষ জানো। এই ডাল থেকে যে তিন শাখা বের হয়েছে, তাদেরকে তিন দেবতা (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) মনে করো এবং এই শাখা থেকে যে উপশাখা বা পাতা বের হয়েছে, তাকে এই সংসার মনে করো। এই সংসার রূপী বৃক্ষের উপরোক্ত ভাগ গুলি যা মাটির উপরে দেখা যায়। আসল মূল (শিকড়) তো মাটির নিচে থাকে, যেখান থেকে সম্পূর্ণ বৃক্ষের পোষন হয়। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তে তিন পুরুষের বিষয়ে বলা হয়েছে। আবার গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে দুই পুরুষের কথা বলেছে, "এক ক্ষরপুরুষ এবং দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ", এই দুজনের স্থিতি উপরের বাণীতে বর্ণনা করা হয়েছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তেও বলা হয়েছে যে, ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ দুজনেই নাশবান। এই দুই প্রভুর অন্তর্গত যত প্রাণী আছে, তাঁরাও সবাই নাশবান কিন্তু আত্মা তো অবিনাশী অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু হয় না। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলেছে যে, উত্তম পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম তো এই ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ থেকে ভিন্ন, যাকে পরমাত্মা বলা হয়। এই প্রভুর বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে, যাকে "পরম অক্ষর ব্রহ্ম" বলা হয়েছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে এই প্রভুরই বর্ণনা আছে; যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারন-পোষণ করেন। ইনিই বাস্তবে অবিনাশী পরমেশ্বর। মূল (শিকড়) থেকেই বৃক্ষের ভরন-পোষণ হয়, সেই রূপ সকলের পালন-পোষণকারী হলেন পরম অক্ষর ব্রহ্ম। যেমনটি পূর্বে গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১-৪ বলা হয়েছে যে, উপরে মূল (শিকড়) যুক্ত, নিচে শাখা বিশিষ্ট এই সংসার রূপী বৃক্ষ যার ধারণ-পোষণ মূলের (শিকড়ের) মাধ্যমে হয়ে থাকে। এইজন্য পরম অক্ষর ব্রহ্ম যিনি এই সংসার রূপী বৃক্ষের মূল (শিকড়), ইনিই সর্বপুরুষের (প্রভুদের) পালনকর্তা এবং সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ সৃজনহার। ইনিই সর্ব কুলের মালিক।

প্রশ্ন ১৬:- রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ শিবের পূজা (ভক্তি) করা কি উচিত?

উত্তর:- না।

প্রশ্ন ১৭:- কোথায় প্রমাণ আছে যে রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ শিবের পূজা (ভক্তি) করা উচিত নয়?

উত্তর:- শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২-১৫, ২০-২৩ এবং গীতা অধ্যায়

৯ শ্লোক ২৩-২৪, গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২-১৫ তে প্রমাণ আছে যে, যে ব্যক্তি রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ শিবের ভক্তি করে, সে রাক্ষস স্বভাব ধারণকারী মানুষের মধ্যে নীচ, দূষিত কর্ম করা মূর্খ আমাকেও ভজে না! (এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২-১৫ তে আছে। আবার গীতা অধ্যায় ৭ এর শ্লোক ২০-২৩ এবং গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৩-২৪ এ এটাই বলা হয়েছে এবং ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ এবং পরম অক্ষর পুরুষের বর্ণনা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তে করা হয়েছে), আমাকে ছাড়া শ্রী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শ্রী শিব এঁনারা “অন্য দেবতাদের” মধ্যে পড়ে। এই দুই অধ্যায়ে (গীতা অধ্যায় ৭ এবং অধ্যায় ৯) উপরে লেখা শ্লোকে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, যে সাধক যে উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য দেবতাদের ভজনা করে, সে তাকে ভগবান মনে করে ভজনা করে। আমি ওই দেবতাদের কিছু শক্তি প্রদান করে রেখেছি। আমার বিধান অনুসারে ওই দেবতাদের সাধনা করা সাধকদের কিছু স্বল্পস্থায়ী লাভ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ওই অল্প বুদ্ধিযুক্ত সাধকদের এই স্বল্প স্থায়ী ফল নাশবান হয়! দেবতাদের পূজা করা সাধকরা, দেবলোকে যায়। আমার পূজা করার সাধক আমাকে প্রাপ্ত করে।

গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ - ২৪ এ বলা হয়েছে যে, শাস্ত্র বিধিকে ত্যাগ করে যে সাধক নিজের ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করে, অর্থাৎ যারা দেবতাদের, পিতরদের, যক্ষ, ভূত-ভৈরবের ভক্তি করে এবং মনোকল্পিত মন্ত্র জপ করে, না তাদের সুখ প্রাপ্তি হয়, না সিদ্ধি প্রাপ্তি এবং না তাদের গতি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এই কারণে তোর জন্য হে অর্জুন! কর্তব্য (যে ভক্তি করা উচিত) আর অকর্তব্য (যে ভক্তি করা উচিত নয়) এই ব্যবস্থা শাস্ত্রই তার প্রমাণ। গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ১ এ অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন, হে কৃষ্ণ! (কারণ অর্জুন মনে করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ গীতা জ্ঞান শোনাচ্ছিলেন, কিন্তু আসলে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে কাল (ব্রহ্ম প্রেতের মতো প্রবেশ করে গীতার জ্ঞান বলেছিলেন যা পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে)। যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধিকে ত্যাগ করে অন্য দেবী-দেবতাদের পূজা করে, সে কেমন স্বভাবের হয়? গীতা জ্ঞানদাতা উত্তর দিয়েছেন যে, সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেবতাদের পূজা করে। রাজসিক ব্যক্তি যক্ষ ও রাক্ষসদের পূজা করে আর তামসিক ব্যক্তি ভূত-প্রেত প্রভৃতির পূজা করে, এই সমস্ত পূজা শাস্ত্র বহির্ভূত পূজা-কর্ম। আবার গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ৫-৬ এ বলা হয়েছে, যে মানুষ শাস্ত্রবিধি রহিত কেবল মনোকল্পিত ঘোর তপস্যা করে, তারা দম্ভী (ঢোঙ্গী) হয়। তারা শরীরের কমলে অর্থাৎ চক্রে বিরাজমান শক্তিদেরকে এমনকি আমাকেও কষ্ট দেয়!

পরমেশ্বর কবির্দেব সূক্ষ্মবেদে বলেছেন:-

“কবীর, মাঈ মসানী সেঢ় শীতলা ভৈরব ভূত হনুমন্ত।
পরমাত্মা সে ন্যারা, রহৈ, জো ইনকো পূজন্ত॥
রাম ভজৈ তো রাম মিলৈ, দেব ভজৈ সো দেব।
ভূত ভজৈ সো ভূত ভবৈ, সুনো সকল সুর ভেব॥”

এই বাণী থেকে স্পষ্ট হয় যে, ব্রহ্মা (রজগুণ), বিষ্ণু (সত্ত্বগুণ) এবং শিবের (তমোগুণ)

পূজা (ভক্তি) করা উচিত নয় এবং এর সাথে সাথে ভূত, পিতরের পূজা (শ্রাদ্ধ কর্ম, ১৩ দিনের কাজ, পিন্ডদান, সর্ব প্রেত পূজা), ভৈরব এবং হনুমানেরও পূজা করা উচিত নয়!

প্রশ্ন ১৮:- ক্ষর পুরুষের (ব্রহ্মের) পূজা করা উচিত কি না?

উত্তর:- যদি পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) চান, যা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বলা হয়েছে যে, "তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির পর পরমেশ্বরের ওই পরম পদের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধক পুনঃরায় কখনো এই সংসারে জন্ম নিয়ে ফিরে আসে না।" এইজন্য "সংসার রূপী বৃক্ষের" ডাল অর্থাৎ ক্ষরপুরুষের (ব্রহ্মের) পূজা (ভক্তি) করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ১৯:- পূর্বকালে যত ঋষি-মুনিগণ ছিলেন, তারা সকলেই বহ্ম সাধনা করতেন এবং করাতেন। "ওঁম্" (ওঁ) নামকে সবচেয়ে বড়ো এবং উত্তম মন্ত্র জপ বলতেন, তাঁরা কি তাহলে অজ্ঞানী ছিলেন? ব্রহ্মের ভক্তি যদি উত্তম না হয়, তাহলে এ বিষয়ে গীতা থেকে কোনো প্রমাণ বলুন।

উত্তর:- পূর্বে বলা হয়েছে যে, যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরমাত্মা (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) স্বয়ং পৃথিবীর উপর সশরীরে প্রকট হয়ে নিজ মুখকমলে ঠিক-ঠিক বলেন। প্রমাণের জন্য দেখুন বেদ মন্ত্র, এই পুস্তকের 100 নং পৃষ্ঠায়। পরম ঈশ্বরের দ্বারা বলা জ্ঞানকে সূক্ষ্মবেদ (তত্ত্বজ্ঞান) বলা হয়। এই তত্ত্বজ্ঞানে পরমাত্মা বলেছেন :-

গুরু, বিন কাহু না পায়া জ্ঞানা, জোঁ থোথা ভুস ছড়ে মূঢ় কিসানা।

গুরু বিন বেদ পঢ়ে জো প্রাণী, সমঝে না সার রহে অজ্ঞানী॥

যে সমস্ত ঋষি ও মহর্ষিগণ সত্‌গুরু পাননি, তাদের দশা এইরকম ছিল যে, তারা বেদ পড়তেন কিন্তু বেদের মূল জ্ঞানকে বুঝতে পারতেন না। উদাহরণের জন্য শ্রীদেবী পুরাণ (সচিত্র মোটা টাইপ, হিন্দি গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) এর ৪১৪ নং পৃষ্ঠায় (চতুর্থ স্কন্দে) লেখা আছে যে, সত্যযুগের ব্রাহ্মণরা (মহর্ষিগণ) বেদের পূর্ণ বিদ্বান ছিলেন, আর শ্রী দেবীর (দূর্গার) পূজা করতেন।

❖ **বিচার করুন:-** শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা হলো চার বেদের সারাংশ। আপনারা সবাই তো গীতা পড়েন, গীতার মধ্যে কোথাও দেখেছেন কি, শ্রী দেবীর পূজা করার কথা উল্লেখ আছে? এই প্রকার চার বেদের কোথাও লেখা নেই যে, দূর্গার (শ্রী দেবীর) পূজা করো, তাহলে ওই ঋষি মুনিরা বেদের কি বুঝেছেন? কি ধরনের বিদ্বান ছিলেন সত্য যুগের মহর্ষিরা? ওই মহর্ষিদেরই মনোকল্পিত বিধান ছিল যে, (ওঁ) ওঁম্ নাম সবচেয়ে বড়ো অর্থাৎ উত্তম যারা বলতেন যে, ব্রহ্ম পূজা (ভক্তি) সর্বশ্রেষ্ঠ; প্রিয় পাঠকগণ! যারা ব্রহ্মকে নিজের ইষ্টদেব মেনে পূজা করতেন, তারা অজ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের এই ব্রহ্ম সাধনা তাঁদের অনুদ ত্তম গতি প্রদানকারী ছিল!

গীতায় প্রমাণ:- শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ - ১৫ তে বলা হয়েছে যে, যাঁরা তিন গুণের (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ শঙ্কর) পূজা করেন তাঁরা রাক্ষস স্বভাব ধারণকারী মানুষের মধ্যে নীচ দূষিত কর্ম করা মূর্খরা আমাকেও ভজনা করে না! এই কথা গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং বলেছেন; আবার গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৬-১৮ পর্যন্ত গীতা জ্ঞানদাতা (ব্রহ্ম) বলেছেন যে, আমার ভক্তি চার প্রকার ভক্ত করে। অর্থাথী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। তারপর বলেছেন যে, জ্ঞানী আমার ভালো লাগে;

জ্ঞানীকে আমি ভালোবাসি। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮) এই শ্লোকে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, এই জ্ঞানী আত্মা উদার (ভালো) তো বটেই, কিন্তু এরা সবাই আমার অনুত্তম গতি অর্থাৎ খারাপ গতিতে আশ্রিত আছে! এই শ্লোকে (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮) গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম স্বয়ং স্বীকার করছেন যে, আমার ভক্তিতে হওয়া গতি অর্থাৎ গন্তব্য অনুত্তম (অশ্রেষ্ঠ = খারাপ)।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৯ এ বলেছেন যে:-

বহুনাম্, জন্মানাম্, অন্তে, জ্ঞানবান্, মাম্, প্রপদ্যতে,
বাসুদেবঃ, সর্বম্, ইতি, সঃ, মহাত্মা, সুদূর্লভঃ॥

অনুবাদ:- গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম বলেছেন যে, আমার ভক্তি বহু-বহু জন্মের পর কোন কোন জ্ঞানী আত্মা করে থাকে, অন্যথায় অন্য দেবী-দেবতা এবং ভূত-পিতরের ভক্তি করে জীবন নাশ করতে থাকে। গীতা জ্ঞানদাতা নিজের ভক্তিতে হওয়া লাভ অর্থাৎ গতিকেও গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে অনুত্তম (অশ্রেষ্ঠ) বলে দিয়েছেন। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৯ এ বলেছেন যে:-

এই জ্ঞান বলা মহাত্মাকে পাওয়া খুবই দুর্লভ! যে কিনা বলেন, “বাসুদেব”-ই হলেন সবকিছু। ইনিই সকলের সৃজনহার। ইনিই পাপ নাশক, পূর্ণ মোক্ষদায়ক, কেবলমাত্র ইনিই সকলের পূজার যোগ্য। ইনি-ই (বাসুদেব) সর্ব কুলের মালিক পরম অক্ষর ব্রহ্ম। কেবল এঁনারই ভক্তি করো, অন্য কারো ভক্তি করার প্রয়োজন নেই!

গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ংও বলছেন যে, “হে অর্জুন! তুই সর্ব ভাবে ওই পরমেশ্বরের শরণে যা; ওই পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম (সত্যলোক) প্রাপ্ত করবি”। (এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে আছে) পুনঃরায় গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, “যে পরমেশ্বরের থেকে সম্পূর্ণ প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে, যার থেকে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ; ঐ পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্ম করতে করতে পূজা করেও মানুষ পরমসিদ্ধি লাভ করেন। আবার গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বলা হয়েছে যে, তত্ত্বজ্ঞানকে বোঝার পর পরমেশ্বরের ওই পরম পদের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধক এই সংসারে আর কখনো জন্ম নিয়ে ফিরে আসে না, যে পরমেশ্বর থেকে এই সংসার রূপী বৃক্ষের বিস্তার লাভ হয়েছে অর্থাৎ যে পরমেশ্বর সবকিছু রচনা করেছেন কেবল তাঁরই পূজা করো। এতেই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব কালের ঐ ঋষিগণ বেদের গুঢ় রহস্যকে বুঝতে পারেননি, তাঁরা অজ্ঞানী ছিলেন।

প্রশ্ন ২০ :- গীতা জ্ঞানদাতা নিজের গতিকে অনুত্তম কেন বলেছেন?

উত্তর :- গীতা জ্ঞানদাতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ এ বলেছেন যে, হে অর্জুন! তোর আর আমার বহু জন্ম অতিবাহিত হয়ে গেছে। তুই জানিস না, আমি জানি। আমার উৎপত্তিকে ঋষি-মহর্ষি ও দেবতারাও জানেনা। তুই আর আমি এবং এই রাজা ও সৈনিকদের পূর্বে অনেকবার জন্ম হয়েছে, পরেও জন্ম হবে। প্রিয় পাঠকগণ বিচার করুন! যেখানে ব্রহ্ম স্বয়ং বলছেন যে, আমারও জন্ম-মৃত্যু হয়, তাহলে ব্রহ্ম পূজারীদের গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ উল্লেখ করা গতি (মোক্ষ) কিভাবে প্রাপ্ত হবে? এটা

কখনোই সম্ভব নয় অর্থাৎ কোনমতেই জন্ম-মৃত্যু চিরকালের জন্য সমাপ্ত হবে না! যতক্ষণ জন্ম-মৃত্যু আছে, ততক্ষণ পরম শান্তি হতে পারে না। সেই জন্য গীতা জ্ঞানদাতা নিজের অসামর্থ্যতা ব্যক্ত করেছেন! গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে বলেছেন যে, পরম শান্তির জন্য ওই পরমেশ্বরের (পরম অক্ষর ব্রহ্মের) শরণে যা, ওনারই কৃপায় তুই পরম শান্তি এবং সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত করবি। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ ও ৭ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, আমার ভক্তি করলে যুদ্ধও করতে হবে। যেখানে যুদ্ধ, সেখানে শান্তি হতে পারে না; পরম শান্তি তো অনেক দূরের কথা। এই জন্য গীতা জ্ঞানদাতা নিজের গতিকে (ওঁ - নামের জপে হওয়া লাভ) অনুত্তম (অশ্রেষ্ঠ) বলেছেন।

প্রশ্ন ২১ :- আপনি ১৩ নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, শ্রী দেবী, ক্ষর ব্রহ্ম এবং অক্ষর ব্রহ্মের সাধনা করতে হবে। আবার এখন বলছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এরা সবাই অন্য দেবতা, ক্ষর ব্রহ্ম পূজার (ভক্তির) যোগ্য নয়! কেবল এক পরম অক্ষর ব্রহ্মেরই পূজা (ভক্তি) করা উচিত?

উত্তর:- এই কথা আমি বলছি না, আপনার সদগ্রন্থ বলছে, প্রথমতঃ এটাই স্পষ্ট করি যে পূজা ও সাধনার মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

❖ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছাকে পূজা বলা হয় এবং তা প্রাপ্তি করার প্রচো-ষ্টাকে সাধনা বলা হয়।

উদাহরণ:- যেমন আমাদের জলপ্রাপ্ত করতে হবে। এটি আমাদের পূজ্য বস্তু, জল প্রাপ্তির জন্য আমাদের হ্যান্ড পাম্প লাগাতে হবে, হ্যান্ড পাম্প লাগানোর জন্য যে যে উপকরণ প্রয়োগ করতে হবে- যেমন মাটির গভীরে পাইপ প্রবেশ করাতে হবে এটাই প্রচেষ্টা। তেমনি পরমেশ্বরের সেই পরমপদ প্রাপ্ত করাই আমাদের ইচ্ছা, যেখানে যাওয়ার পর সাধক পুনঃরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। আমাদের প্রাপ্য (পূজ্য) পরমেশ্বর এবং ওনার সনাতন পরমধাম। ওনাকে প্রাপ্ত করার জন্য করে থাকা নাম জপ, হবন যজ্ঞ প্রভৃতি হল সাধনা। ওই সাধনার ফলে পূজ্য বস্তু পরমাত্মা প্রাপ্তি হবে। যেমন ১৩ নং প্রশ্নের উত্তরে সুস্পষ্ট করা হয়েছে, ওটাই সঠিক উদাহরণ। ওই পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি করার জন্য তিনবারে দীক্ষা ক্রমানুসারে পূরণ করতে হবে।

১. প্রথম নাম দীক্ষায় = ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ ও শ্রী দেবীর মন্ত্রের সাধনা দেওয়া হয়।

২. দ্বিতীয়বার, ক্ষর ব্রহ্ম ও অক্ষর ব্রহ্মের দুই অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রের জপ দেওয়া হয়। এই দুই মন্ত্রকে সন্তগন "সতনাম" বলে। গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ -এ তিন নাম আছে, "ওম্-তত্-সত্" এই সতনামে দুই অক্ষর আছে, এক "ওম্" (ওঁ) দ্বিতীয় "তত্"। (এগুলি সাংকেতিক অর্থাৎ গুপ্ত নাম যা কেবল দীক্ষা প্রাপ্তির সময় উপদেশিকে বলা হয়।)

৩. তৃতীয়বারে সার নামের দীক্ষা দেওয়া হয়, যে মন্ত্রকে গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ -এ "সত্" বলা হয়েছে, এটিও সাংকেতিক। দীক্ষা দেওয়ার সময় উপদেশিকে বলা হয়। এইভাবে পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন ২২:- যে সাধনা পূর্বে আমরা করছিলাম, সেগুলি কি ত্যাগ করতে হবে?

উত্তর:- যদি শাস্ত্রবিধি রহিত হয় তাহলে ত্যাগ করতে হয়। যে গুরুর দীক্ষা দেওয়ার অধিকার নেই এমন গুরু থেকে যদি দীক্ষা নিয়ে থাকেন, তাহলে কোন লাভ হবে না। পূর্ণ গুরুর থেকে সত সাধনার দীক্ষা নিতে হবে।

প্রশ্ন ২৩:- গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৭ এবং অধ্যায় ৩ শ্লোক ৩৫ -এ বলা হয়েছে যে:-

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম বিগুনঃ পরধর্মাত স্বনুষ্ঠিতাত্।

স্বধর্ম নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ (গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৩৫)

ভালো আচরণ করা অন্যের ধর্ম থেকে নিজের গুণ রহিত ধর্ম অতি উত্তম। নিজের ধর্মে মৃত্যুও কল্যাণ কারক তবুও অন্যের ধর্ম ভয়াবহ।

উত্তর:- এই অনুবাদ ভুল। যদি এই কথা সত্য হয় যে, নিজের ধর্ম গুণ রহিত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়, তাহলে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞানে ১৮ অধ্যায় ৭০০ শ্লোকের কি প্রয়োজন ছিল? শুধুমাত্র এই একটা শ্লোকই যথেষ্ট ছিল যে, আপনি যেমন সাধনা করছেন, করতে থাকুন, যদি তা গুণ রহিত (ফলবিহীন) হয় তাও ভালো। তাহলে কেন বলেছে গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ - ১৫ তে যে, রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ শিবের পূজা যারা করে তারা রাক্ষস স্বভাব ধারণকারী মানুষের মধ্যে নীচ, দূষিত কর্ম করা এই মূর্খ লোকেরা আমাকেও ভজনা করে না। গীতা জ্ঞানদাতা ওই সাধকদেরকে তাদের ধর্ম অর্থাৎ ধার্মিক সাধনা ত্যাগ করতে বলেছেন এবং গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২০ - ২৩ এ বলেছেন যে, যারা আমার পূজা না করে অন্য দেবী-দেবতাদের পূজা করে, তারা অজ্ঞানী। তাদের এই সাধনায় ক্ষণ স্থায়ী সুখ (স্বর্গ) প্রাপ্তি হয়। তারপর নিজের ধার্মিক পূজা অর্থাৎ ধর্মকেও ত্যাগ করতে বলেছেন। পূর্ণ লাভের জন্য পরম অক্ষর ব্রহ্মের ধর্ম অর্থাৎ ধার্মিক সাধনা গ্রহণ করতে বলেছেন।

গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৩৫ এর যথার্থ অনুবাদ ঠিক এই প্রকার:-

অনুবাদ:- (বিগুন:- পরধর্মাতস্বনুষ্ঠিতাত্) অন্যের গুন রহিত অর্থাৎ লাভ রহিত ভালো রকমের চমক-প্রদক আকর্ষিত ধর্ম অর্থাৎ ধার্মিক কর্ম অপেক্ষা নিজের (স্বাধর্মঃ) শাস্ত্রবিধি অনুসারে করা ধার্মিক কর্ম (শ্রেয়ান) অতি উত্তম। নিজের (স্বধর্মে) শাস্ত্র বিধি অনুসারে ধর্ম-কর্মের সংঘর্ষে মৃত্যুও (নিধনম্) কল্যাণ কারক (শ্রেয়ঃ)। অন্যের (পরধর্ম) চমক-প্রদক গুণ রহিত ধার্মিক কর্ম ভয়াবহ (ভয়াবহঃ)। ভাবার্থ হল এই যে, যেমন জাগরণ বা দুর্গা পূজা প্রভৃতিতে খুব সাজ-সজ্জার সাথে সুরেলা কণ্ঠে মধুর গান গাওয়া হয়, উদ্দাম নৃত্য। আমাদের শাস্ত্রবিধি অনুসারে ধর্ম-কর্মতে কেবল নাম-জপ অথবা সামান্যভাবে আরতি করা হয়। কোন বেদ বা গীতায় শ্রীর দেবীর পূজা, তথা জাগরণ করার আদেশ নেই। যার কারনে ঐ ধার্মিক কর্ম শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছানুসার আচরণ সিদ্ধ হয়, তাই তা ব্যর্থ। অন্যের শাস্ত্রবিধি রহিত ইচ্ছানুসারে করা ধার্মিক কর্ম দেখতে তো ভালো লাগে, কারণ ওখানে মানুষকে আকর্ষিত করার বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ করা হয়। তাই সত্য সাধনা করা ভক্তরা

ওই ধার্মিক কর্ম দেখে ভয়ভীত হয়ে যায় যে, আমাদের ভক্তি ভুল নয় তো! কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পর এই ভয় সমাপ্ত হয়ে যায়। তাই তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানে বলেছে যে:-

দূর্গা ধ্যান পড়ে জিস বগড়ম, তা সঙ্গতি ডুবৈ সব নগরম্।

দম্ভ করেঁ ডূঙ্গর চঢ়ে, অন্তর ঝীনী ঝুল।

জগ জানে বন্দগী করেঁ, বোবেঁ সুল ববুল।

এইজন্য গুণ রহিত অর্থাৎ লাভ বিহীন ধার্মিক সাধনা ত্যাগ করে শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা করলে কল্যাণ হবে।

প্রশ্ন ২৪:- আমি সনামধন্য সন্ত অভিলাষ দাশের মতামত শুনেছিলাম, ওই সন্ত বলেছিলেন যে, এই সংসার কোন ভগবানের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। এই সংসার পুরুষ-স্ত্রীর সংযোগে সৃষ্টি হয়েছে। তারপর সমাপ্ত হয়ে যায় কোন ভগবান নেই জীবই ব্রহ্ম, জীবই কর্তা অভিলাষ দাসের এই মতবাদ উচিত না অনুচিত?

উত্তর:- এর উত্তর শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ৬ - ১০ এ বিস্তারিত আছে। ওই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যারা অসুর প্রকৃতির লোক তাঁরা বলে যে, এই সংসারে কোন ভগবান নেই, স্ত্রী-পুরুষের মাধ্যমে সব সৃষ্টি হয়েছে, এর কোন কর্তা নেই। এই সমস্ত অজ্ঞানীদের জন্ম এই সংসারে বিনাশ করার জন্য হয়েছে। এই ধরনের মতবাদ ঠিক নয়। বাস্তবতা হলো এটা যে, পরমাত্মাই এই সংসারের সৃজন হার। জীব কখনো ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মের অর্থ প্রভু (স্বামী) হয়। যেমন (১.) ব্রহ্ম (যাকে ক্ষরপুরুষও বলা হয়,) একুশ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। (২.) অক্ষর ব্রহ্ম (যাকে অক্ষর পুরুষও বলা হয়, গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬) ইনিই সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। (৩.) পূর্ণব্রহ্ম (যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ -এ পরম অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়েছে) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। ইনিই কুলের মালিক। তাই এটা বলা কখনোই ঠিক নয় যে, কোন ভগবান নেই সংসার কেবল স্ত্রী-পুরুষ অথবা নর-মাদার সংযোগে উৎপন্ন হয়, সমাপ্ত হয়ে যায়। জীবই কর্তা অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম এই সমস্ত বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে অনুচিত।

প্রশ্ন ২৫:- শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে গীতা জ্ঞানদাতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ এবং ৭ এ বলেছেন যে, যে পুরুষ অন্তিমকালেও আমার স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করে সে আমাকে প্রাপ্ত করে। এই জন্য হে অর্জুন! সবসময় আমার স্মরণ কর আর যুদ্ধও কর, তাহলে আমাকে প্রাপ্ত করবি। এই জন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে বলেছে যে ওই পরমাত্মার শরণে যা। গীতা জ্ঞানদাতা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন যে আমার সাধনার শরণ কর, আর আপনি অন্য পরমাত্মার কথা বলছেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। গীতার অন্য কোথাও কি অন্য কোনো পরমাত্মার ভক্তি সাধনা করার কথা উল্লেখ আছে?

উত্তর:- গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, যে সাধক কেবল জরা (বৃদ্ধাবস্থা) এবং মরণ (মৃত্যু) থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করে, তিনি "তত্ ব্রহ্মের" সাথে ভালোভাবে পরিচিত। অর্জুন গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১ এ জানতে চেয়েছেন যে, "তত্ ব্রহ্ম" কি? উত্তরে গীতা জ্ঞানদাতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ এ বলেছেন যে, তিনি হলেন "পরম অক্ষর ব্রহ্ম" গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ এবং ৭ এ গীতা জ্ঞানদাতা নিজের সাধনা অর্থাৎ স্মরণ করতে বলেছেন। (গীতা জ্ঞান দাতা গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ এবং গীতা

অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫ ও অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ এ নিজের জন্ম-মৃত্যুর কথাও বলেছেন। ওখানে আরো বলেছেন যে, আমার ভক্তিতে পরম শান্তি হওয়া সম্ভব নয়, যুদ্ধও করতে হবে। গীতা জ্ঞানদাতা এখানে একথাও বলেছেন যে, আমার ভক্তিতে জন্ম-মৃত্যু সর্বদাই হতে থাকবে।) তৎক্ষণাতই গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮, ৯ এবং ১০ এই তিন শ্লোকে গীতা জ্ঞানদাতা নিজেকে ছেড়ে অন্য "পরম অক্ষর ব্রহ্মের" ভক্তি করার জন্য বলেছেন যে হে পার্থ! পরমাত্মার সাধনায় অভ্যাসযোগে যুক্ত অন্য কোনো দেব বা প্রভুর প্রতি বিশ্বাস না রেখে অনন্য মনে এক পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস রেখে স্মরণ করলে মানুষ (পরমম্ দিব্যম্ পুরুষম্ য়াতি) ওই পরম অলৌকিক পরমেশ্বরকে অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮)

যে সাধক পরম অক্ষর ব্রহ্মের, যিনি অনাদি, সকলের সঞ্চালক, সূক্ষ্ম থেকে সূ-ক্ষ্মতর, সকলের পালন-পোষণকারী অচিন্ত্য স্বরূপ, সূর্যের সমান প্রকাশমান অবিদ্যার অতি ঊর্ধ্বে শুদ্ধ চিদানন্দের স্মরণ করেন। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৯)

সেই ভক্তি সাধনা যুক্ত সাধকরা অন্তিমকালেও ভক্তির শক্তিতে ভ্রুকুটি দ্বয়ের মধ্যে প্রাণ অর্থাৎ শ্বাসকে ভালোভাবে স্থাপিত করে স্থির মনে স্মরণ করতে করতে ওই অলৌকিক দিব্য পরমপুরুষকে অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে (যিনি গীতা জ্ঞানদাতা থেকে ভিন্ন) প্রাপ্ত হন। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১১ - ২২ এ উল্লেখ আছে। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১১ তে বলা হয়েছে যে, তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ বেদকে সঠিকভাবে জানে অর্থাৎ যাকে অবিনাশী বলা হয়, সেই পরম পদকে তোর জন্য বলছি। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১২ তে বর্ণিত আছে যে, ওই পরমব্রহ্মকে প্রাপ্তি করার জন্য শ্বাসের দ্বারা নাম স্মরণের সাধনা করতে হবে।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, আমি ব্রহ্ম, আমাকে প্রাপ্তি করার জন্য কেবল এক ওঁম্ (ওঁ) অক্ষর আছে, এর স্মরণ (জপ) আজীবন করতে হবে তবেই তাঁরা এই মন্ত্রে হওয়া পরম গতি অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করবে।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে বলেছে যে, ব্রহ্ম লোকে যাওয়া সাধকও পুনরায় এই সংসারে ফিরে এসে জন্ম নেয়, তারপর মারা যায়। এটা পূর্ণ মোক্ষ নয়। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৪ বলেছেন যে, যে সাধক এইভাবে স্মরণ করে তার জন্য আমি অত্যন্ত সুলভ (সহজ লভ্য)।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৫ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, আমাকে পাওয়ার পরেও সর্বদা জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে, যা দুঃখালয়, ক্ষণভঙ্গুর জীবন আর যে সাধক পরম অক্ষর ব্রহ্মের ভক্তি সাধনা করে, তারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত করে অমর লোকে চলে যায়, তাঁরা আর কখনো এই সংসারে জন্ম-মৃত্যুতে ফিরে আসে না। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যাওয়া সমস্ত লোক পুনরাবর্তী-তে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যাওয়া সাধক চিরকাল জন্ম-মৃত্যু চক্রে থাকে। হে অর্জুন! যারা এটা জানে না, তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত করেও জন্ম-মৃত্যুর চক্রে সর্বদাই থেকে যায়, কারণ গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ এ স্বয়ং বলেছেন হে অর্জুন! তোর আর আমার বহু জন্ম অতিবাহিত হয়েছে, পরেও হতে থাকবে। যা তুই জানিস না কিন্তু আমি জানি। আমার উৎপত্তির (জন্মের) বিষয়ে

দেবতারা জানে না, এমনকি মহর্ষিগণ ও সিদ্ধ পুরুষেরাও জানে না। অন্যদিকে পরম অক্ষর ব্রহ্মের ভক্তি করা মহাত্মাগণ পরমসিদ্ধি অর্থাৎ পরম গতি প্রাপ্ত করে, তাঁরা আর কখনো পুনর্জন্ম প্রাপ্ত করে না।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭ তে অক্ষর পুরুষের (পর ব্রহ্মের) দিন রাতের বিষয়ে বর্ণনা আছে। ওখানে বলা হয়েছে যে, পর ব্রহ্মের (ব্রহ্মণঃ) একদিন এক হাজার যুগ সময়কাল নিয়ে হয়। এই রূপ রাত্রিও হয়। পর ব্রহ্ম অর্থাৎ অক্ষর পুরুষের বর্ণনা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে আছে। এছাড়াও ওনার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭, ১৮ এবং ১৯ এ উল্লেখ আছে।

বিঃ দ্রঃ:- অধিক জানার জন্য কৃপা করে পড়ুন প্রশ্ন নং ৯, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭-১৯ পর্যন্ত ওখানে অক্ষর পুরুষের বিষয়ে বলা হয়েছে, এনাকেও অব্যক্ত বলা হয়েছে। এই পুরুষের একদিন সমাপ্ত হওয়ার পর ক্ষর পুরুষের একুশ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণী প্রলয় অর্থাৎ বিনাশ হয়ে যায় এবং রাত্রি সমাপ্ত হওয়ার পর পুনঃরায় সংসারের জীব উৎপত্তি শুরু হয়। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০ তে বলা হয়েছে যে, এই অক্ষর পুরুষ ও অব্যক্ত কিন্তু এই অব্যক্ত থেকেও অন্য যে বিলক্ষণ সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে, তিনি পরম দিব্য পুরুষ অর্থাৎ 'পরম অক্ষর ব্রহ্ম' ইনিই সমস্ত প্রাণীদের (ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ এবং এনাদের অন্তর্গত যত জীব আছে, সকল জীব) বিনাশের পরেও অবিনাশী থেকে যায়।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২১ বলা হয়েছে যে, অব্যক্তকে (অক্ষরকে) অবিনাশী বলা হয় সেই পরম পুরুষের প্রাপ্তিকে পরম গতি বলা হয়। যে সনাতন অব্যক্ত পরম পুরুষের প্রাপ্তির পর এই সংসারে আর কখনো জন্ম-মৃত্যুতে ফিরে আসতে হয় না, সেই ধাম আমার ধাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! প্রথমে আমিও সেখানে ছিলাম, এই জন্য বলেছেন যে, তা আমারও (গীতা জ্ঞান দাতা) পরম ধাম, কারণ গীতার জ্ঞানদাতাও ওই পরম সনাতন ধাম অর্থাৎ সত্যলোক থেকে নিষ্কাশিত হয়েছেন। (এ বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য জানার জন্য পড়ুন সৃষ্টির রচনা অংশ যা এই পুস্তকের 124 থেকে 176 নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে।)

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২২ সুস্পষ্ট ভাবে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, হে অর্জুন! যে পরমাত্মার অন্তর্গত সর্বভূত অর্থাৎ প্রাণী আছে (ক্ষর পুরুষ এবং এর একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণী আর অক্ষর পুরুষ সহ তার সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণী, সেই সাথে পরম অক্ষর পুরুষের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণী।) আর যে পরম অক্ষর পুরুষ হতে সর্ব জগৎ পরিপূর্ণ অর্থাৎ যিনি রচনা করেছেন, যার অধিকার সকলের উপর, সেই সনাতন অব্যক্ত পরম পুরুষকে তো কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত করা যায়। ভাবার্থ হল এই যে, পরম অক্ষর ব্রহ্মের প্রাপ্তির জন্য কেবল তাঁরই ভক্তি পূজা করা উচিত, অন্য কোন প্রভুর উপর আস্থা রাখা উচিত নয়! এটাকেই অনন্য ভক্তি অর্থাৎ পূজা বলা হয়।

কেবল পরম অক্ষর ব্রহ্মের পূজা করাকে অনন্য ভক্তি বলা হয়। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২২ এর সঠিক অনুবাদ করা হয়, তাহলে স্পষ্ট হয় যে:-

পুরুষঃ, স, পরঃ, পার্থ, ভক্ত্যা লভ্যঃ, তু, অনন্যয়া,

যস্য, অন্তঃস্থানি, ভূতানি, যেন, সর্বম, ইদম্, ততম্

অনুবাদ :- (সঃ) ওই (পরঃ) দ্বিতীয় বা অন্য (পুরুষঃ) মানে পরমাত্মা তো অনন্য

ভক্তিতে প্রাপ্ত হবার যোগ্য, যাঁর অন্তর্গত সমস্ত প্রাণী আছে এবং যিনি সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি করেছেন, যিনি সকলের পালনকর্তা। সরলার্থ সমাপ্ত (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২২) এর মূল পাঠে অর্থাৎ সংস্কৃততে লেখা আছে = সঃ পরঃ পুরুষঃ = "পর" এর অর্থ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০ তে অন্য অর্থাৎ অপরজন করা হয়েছে। এখানেও (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২২ এ) যদি অন্য বা অপরজন লেখা হতো তাহলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, গীতা জ্ঞান দাতা অপেক্ষাও অন্য কোনো সমর্থ্য প্রভু আছেন। যার শরণে যাওয়ার জন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং বলেছেন।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে সিদ্ধ হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে অনেক স্থানে নিজ অপেক্ষা অন্য পরমেশ্বরের (পরম অক্ষর ব্রহ্মের) ভক্তি করার জন্য বলেছেন এবং তাতেই পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) সম্ভব হবে। জন্ম-মৃত্যু চক্র চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যাবে।

প্রমাণ:- গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৯ - ২৯, গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬, ৬১, ৬২, ৬৬, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩, ৮, ৯, ১০, ২০ থেকে ২২, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩১ - ৩২, গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১, ৪, ১৭, গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭, ৫৯ গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪, ১৫, ১৯ এবং গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৬ -এ এরই প্রমাণ আছে।

প্রশ্ন ২৬:- আমরা সকল সন্ত এবং আমাদের হিন্দু ধর্মের গুরুদের কাছে তো এটা শুনে আসছি যে, গীতা জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন। আমাদের তো এটাই বলা হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ পরমাত্মা। শ্রী বিষ্ণু স্বয়ং অবতার ধারণ করে দেবকী মাতার গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন। ইনি ছাড়া আর কোন পরমাত্মা নেই। আমরা আপনার সৎসঙ্গ শুনেছি ওখানে আপনি অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলেছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা গীতা জ্ঞানদাতা নয় অন্য কেউ। আপনি যদি এর প্রমাণ শাস্ত্রে দেখাতে পারেন, তাহলে আপনার কথা আমাদের বিশ্বাস হবে অন্যথায় নয়।

উত্তর:- আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্বে অনেক প্রমাণ দেখানো হয়েছে, তার পরেও আপনাদের কিভাবে সন্দেহ থাকে? তার প্রথম কারণ এই যে, হিন্দু ধর্মে ধর্ম গুরুদের নিজের শাস্ত্রের জ্ঞান নেই। যদি জ্ঞান থাকতো, তাহলে উপরোক্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা আপনাদেরকে শোনাতেন না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ধার্মিক গুরু একজন অধ্যাপকের সমতুল্য হন, যে অধ্যাপকের নিজের পাঠক্রমের (সিলেবাস) জ্ঞানই নেই, সেই শিক্ষক অজ্ঞানী সেই সাথে তিনি বিদ্যার্থীদের জীবন নিয়ে খেলা করছেন! কারণ সিলেবাসের বিপরীত জ্ঞান বিদ্যার্থীদের পড়াচ্ছেন। এই ধরনের শিক্ষক থেকে দূরে থাকুন এবং এনাদেরকে ত্যাগ দেওয়াই বিদ্যার্থীদের জন্য মঙ্গল।

আপনাদেরকে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা থেকে অনেক প্রমাণ বলবো যে, পূর্ণ পরমাত্মা গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অন্য, একমাত্র তিনিই উপাসনার যোগ্য কেবল ওনারই ভক্তিতে পূর্ণ মোক্ষ পাওয়া সম্ভব এখানে তার কিছু শ্লোক লিখেছি, আপনারা এগুলিকে গীতাশাস্ত্র থেকে স্বয়ং দেখতে পারেন যা এই পুস্তকের 190 থেকে 320 পৃষ্ঠায় গীতা শ্লোকের ফটোকপি দেওয়া আছে। গীতার যথার্থ অনুবাদ জানার জন্য, আমার দ্বারা অনুবাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার সম্পূর্ণ শ্লোক সহ "গহরী নজর গীতা"

পুস্তক প্রাপ্ত করুন। এই পুস্তক আমাদের Website থেকে ডাউনলোডও করতে পাস্ত রেন।(website এর নাম = www.JagatgururampalJi.org)

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬, ৬১, ৬২, ৬৬ অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৯, ২৯ অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩, ৮, ৯, ১০, ২০, ২১, ২২ অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩১-৩২ অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১, ৪, ১৬, ১৭, অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭, ৫৯ অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪, ১৫, ১৯ অধ্যায় ৫ শ্লোক ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৬ অধ্যায় ৬ শ্লোক ৭ অধ্যায় ১১ শ্লোক ৫৫ অধ্যায় ১২ শ্লোক ১-৫ এই সমস্ত শ্লোকে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে, গীতা জ্ঞানদাতা অপেক্ষা অন্য কোন পূর্ণ পরমাত্মা আছে। ঐ পরমাত্মার বিষয়ে এবং ওনার প্রাপ্তির জন্য যে ভক্তি সাধনা করা উচিত, সে বিষয়ে গীতা জ্ঞানদাতা অনভিজ্ঞ (অপরিচিত)। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ ও ৩৪ এ আছে। গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে (৪/৩২) যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জ্ঞান সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্মের নিজ মুখ কমলে (ব্রহ্মণঃ মুখে) উচ্চারিত বাণীতে আছে। এই বাণী পরমাত্মা স্বয়ং প্রকট হয়ে নিজ মুখ কমলে বলে থাকেন, একে তত্ত্বজ্ঞান বলে, একে সূক্ষ্মবেদও বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে একে মাত্র তত্ত্বদর্শী সন্তই ঐ জ্ঞানকে ভালোভাবে বুঝতে বা জানতে পারে। ঐ জ্ঞানে পূর্ণ পরমাত্মার স্থিতি ও প্রাপ্তির বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে।

(**বিঃ দ্রঃ** :- গীতা অনুবাদকরা গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এর অনুবাদে কিছু ত্রুটি করে ফেলেছেন যেমন, "ব্রহ্মণঃ" শব্দের অর্থ "বেদ" করে দিয়েছেন, যা অনুচিত। "ব্রহ্মণঃ" শব্দের যথার্থ অর্থ গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ -এ করা আছে। "ব্রহ্মণঃ" = সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা)

{ প্রিয় পাঠকদের কাছে বিশেষ নিবেদন:- আপনারা গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত গীতা থেকে প্রমাণ মেলান, বিশেষ করে "পদচ্ছেদ, অন্বয় এবং সাধারণ ভাষায় টীকা সহ" অনুবাদক শ্রী জয় দয়াল গোয়েন্দকা এবং শ্রী রামসুখ দাসের দ্বারা অনুবাদিত গীতা দেখুন। এই "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" পুস্তকে প্রমাণের জন্য যত শ্লোক দেওয়া আছে তার সম্পূর্ণ ফটোকপি, এই পুস্তকের 190 থেকে 320 পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে, যা হিন্দু বিদ্বান সাধু শ্রী জয়দয়াল গোয়েন্দকা দ্বারা অনুমোদিত এবং গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত।}

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ ও ৩৪ এ গীতা জ্ঞান দাতা বলেছেন যে, যে জ্ঞান পরম মাত্মা স্বয়ং নিজে মুখকমলে বলেন, তা তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানে যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য বলা হয়েছে। ঐ জ্ঞানকে তুই তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে জানো। ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তকে দণ্ডবত্ প্রণাম করে, বিনম্রতা-পূর্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞান জানা মহাত্মা তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান বলবেন, এতেই প্রমাণিত হয় যে ; গীতা জ্ঞানদাতার তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে জানা নেই ! এমনকি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়ও সেই তত্ত্বজ্ঞান নেই। যদি গীতা জ্ঞানদাতার সেই তত্ত্বজ্ঞান থাকতো, তাহলে আরো এক অধ্যায় বলে দিতেন।

উপরোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার শ্লোক গুলি থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, গীতা জ্ঞানদাক্ত তা অপেক্ষা অন্য কোন সমর্থ্য অবিনাশী, পূর্ণ-মোক্ষ দাতা, যিনি বাস্তবে "পরমাত্মা" সকলের ধারণ পোষণকারী। যাঁর শরণে যাওয়ার পর সনাতন পরমধাম (শাশ্বত স্থান)

এবং পরম শান্তি প্রাপ্তি হয়। ঐ পরমপদ পাওয়ার পর সাধক আর কখনো এই জগৎরূ সংসারে ফিরে আসে না অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়। এখন উপরোক্ত গীতার শ্লোক থেকে কিছু শ্লোক অনুবাদ করে প্রমাণ করছি:-

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে বলা হয়েছে যে, হে ভারত! তুই সর্ব ভাবে ঐ পরমেশ্বরের শরণে চলে যা, ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত করবি। হিন্দু ধর্মের সাধু-সন্ত মন্ডলেশ্বর ও ধর্মগুরুরা এটা বলে থাকেন যে, এখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজের শরণে আসার জন্য বলেছেন। ঐ ধর্মগুরুদের একথা বলা একেবারেই অনুচিত, কারণ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৭ -এ অর্জুন বলেছেন যে, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি অর্জুন আপনার শরণে আছি আমি আপনার শিষ্য। যা আমাদের জন্য ভালো, সেই উপদেশ আমাকে দিন। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩ -এ গীতা জ্ঞান-দাতা বলেছেন যে, হে অর্জুন! তুই আমার ভক্ত গীতা তে উল্লেখিত এই সমস্ত শ্লোক থেকে স্পষ্ট হয় যে, অর্জুন তো অনেক আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের শরণে ছিলেন। এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ এর ভাবার্থে গীতা জ্ঞানদাতা নিজ অপেক্ষা অন্য পরমেশ্বরের শরণে যেতে বলছেন। এটাও প্রমাণিত হলো যে, গীতা জ্ঞানদাতা অপেক্ষাও অন্য কোন “পরমেশ্বর” আছে।

অন্য প্রমাণ:- গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১ - এর প্রশ্নের উত্তর গীতা জ্ঞানদাতা ঐ অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকে দিয়েছেন যে, তিনি হলেন “পরম অক্ষর ব্রহ্ম”। আবার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ এবং ৭ এ তো নিজের ভক্তি করার জন্য বলেছেন। আবার ঐ অধ্যায়ের ৮, ৯, ১০ নং শ্লোকে পরম অক্ষর ব্রহ্মের ভক্তি করার উপদেশ দিয়েছেন। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ -এ গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং নিজের স্থিতি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যদি আমার ভক্তি করো তাহলে জন্ম-মৃত্যু তোমার এবং আমার চিরকাল হতে থাকবে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ -এ তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয় বলতে গিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি মূলসহ সংসার রূপী বৃক্ষের সকল বিভাগের বিবরণ তত্ত্বত (ভালোভাবে) জানেন, তিনি বেদের তাৎপর্য জানা অর্থাৎ তিনিই হলেন তত্ত্বদর্শী সন্ত (সঃ বেদবিদ্)। আবার গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ বলা হয়েছে যে, তত্ত্বদর্শী সন্ত প্রাপ্তির পর পরমেশ্বরের ওই পরম পদের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধক আর কখনো এই সংসারে জন্ম মৃত্যু-চক্রে ফিরে আসে না। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে এর বর্ণনা করা হয়েছে যে, হে অর্জুন! তুই সর্ব ভাবে ঐ পরমেশ্বরের শরণে চলে যা, ঐ পরমেশ্বরের কৃপাতেই তুই পরম শান্তি ও সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত করবি। এটাই পরম শান্তি কারণ সাধককে ওখানে বার-বার জন্ম নিতে হয় না। চিরকালের জন্য অমর লোকে (সনাতন পরমধামে) নিবাস করে ওখানে নৈষ্কর্ময় মোক্ষ প্রাপ্তি হয় যার ভাবার্থ হল এই যে, সত্যলোকে (সনাতন পরমধমে) কোন কাজ (কর্ম) না করেই সকল সুবিধা এবং সকল বস্তু পাওয়া যায় আর নিজেদের পুণ্য কখনো শেষ হয় না। অন্যান্য যেমন শ্রী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, দুর্গা, ব্রহ্ম এবং পর ব্রহ্মের ভক্তিতেও নৈষ্কর্ময় মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তা কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। প্রত্যেক দেব লোকে এক একটি স্বর্গে (হোটেলে) এই সুবিধা প্রাপ্ত হয় কিন্তু ওখানে প্রাণীদের নিজেদের পুণ্যের প্রতিফলে তা প্রাপ্ত হয়। পুণ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে পুনর্জন্ম এবং মৃত্যুর চক্র আবার আরম্ভ হয়ে যায় (“নৈষ্কর্ময়”

মুক্তির বর্ণনা গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৪ এবং অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৯ এ আছে।)

যে সনাতন পরমধাম এবং শান্তি প্রাপ্তির জন্য সর্বোপরি যে পরমেশ্বরের শরণে যাওয়ার জন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ এবং অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বলা হয়েছে, তিনি গীতা জ্ঞানদাতা অপেক্ষা অন্য কোনো পূর্ণ পরমাত্মা। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ এবং ৭ এ তো গীতা জ্ঞানদাতা নিজের ভক্তি করার জন্য বলেছেন। তার প্রতিফলে দু'জনেরই জন্ম-মৃত্যু হতে থাকবে এইজন্য আবার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮, ৯, ১০ – এ ঐ পরমেশ্বরের ভক্তি করার জন্য বলেছেন, যার বর্ণনা গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ এবং অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ –এ আছে। আবার গীতা অধ্যায় ৮ এরই শ্লোক ১৮ তে বলা হয়েছে যে (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ থেকে ১৭ তে তিন পুরুষের বিষয়ে বলেছে:-

১:-ক্ষর পুরুষ, ইনি স্বয়ং গীতা জ্ঞানদাতা এনাকে ক্ষর ব্রহ্মও বলা হয়। ইনি কেবল ২১ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।

২:- অক্ষর পুরুষ, এনাকে পরব্রহ্মও বলা হয়। ইনি কেবল সাত শঙ্খ্ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।

৩:- পরম অক্ষর পুরুষ, যাঁকে পরম অক্ষর বহ্ম, পরমেশ্বর, সত্যপুরুষ, অবিনাশী পরমাত্মাও বলা হয়, ইনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। এখানে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ৮ নং অধ্যায়ের ৮, ৯, ১০, ২০ এবং ২২ নং শ্লোকে পরম অক্ষর পুরুষের বিষয়ে বর্ণনা আছে। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৮ তে অক্ষর পুরুষের বিষয়ে বর্ণনা আছে।)

যে সময় অক্ষর পুরুষের একদিন সমাপ্ত হয় অর্থাৎ এক হাজার যুগ সময়কাল সমাপ্ত হয়। খেয়াল রাখবেন, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭ এর মূল পাঠে কেবল সহস্র যুগ লেখা আছে, সহস্র চতুর্যুগ নয়। এইজন্য অক্ষর পুরুষের একদিন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ক্ষর পুরুষের সকল প্রাণী এবং অক্ষর পুরুষের কিছু অঞ্চল নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষরে পুরুষ সহ তাঁর একুশ ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণী, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন আবার দিন শুরু হয় (অক্ষর পুরুষের), তখন পুনঃরায় ক্ষরপুরুষ সহ তাঁর সকল প্রাণী নিজ কর্ম অনুসারে উৎপন্ন হতে থাকে এবং মরতে থাকে। আবার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০ –তে বলা হয়েছে যে, কিন্তু এই অব্যক্ত অর্থাৎ অক্ষর পুরুষেরও উপরে (পরঃ) যে অন্য সনাতন অব্যক্ত ভাব অর্থাৎ পরম অক্ষরব্রহ্ম আছেন, সেই পরমেশ্বর তো সকল প্রাণী বিনাশ হয়ে যাওয়ার পরেও অবিনাশী থাকেন। আবার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২১ –এ ওনাকে অবিনাশী অব্যক্ত বলা হয়েছে, ওনাকেই পরমেশ্বর বলা হয়েছে। ওনার ধাম প্রাপ্তিতে পরমগতি অর্থাৎ পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়, যা প্রাপ্তির পর সাধক আর কখনো ফিরে আসে না, এ বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ এবং ১৫ শ্লোক ৪ –এ বলা হয়েছে। গীতা জ্ঞান-দাতা বলেছিলেন যে, সেই ধাম আমার ধাম অপেক্ষা পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এইজন্য তাকে সনাতন পরম ধাম বলা হয়। (বিঃ দ্রঃ :- এই গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২১ –এর অনুবাদে ভুল করেছে এই যে, গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে সেটি আমার পরমধাম। বাস্তবে মুল পাঠে লেখা আছে, “তত্ ধাম পরম্ মম” এখানে “মম” শব্দের নিচে হসন্ত (মম্) নেই। প্রমাণের জন্য ওই গীতা অনুবাদকদের অনুবাদিত গীতার অধ্যায় ৩ শ্লোক ২৩ এ “মম” এর অর্থ করার সময়, মম = “আমার-ও” এই অর্থ করেছে। এইভাবে এই অধ্যায় ৮ শ্লোক ২১ তে মম শব্দের অর্থ আমারও পরমধাম আছে, সঠিক। আবার গীতা অধ্যায় ৮

শ্লোক ২২ এ স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পুরুষঃ সঃ পরঃ = (সঃ) সেই (পরঃ) অন্য (পুরুষঃ) পরমেশ্বর তো অনন্য ভক্তির দ্বারা প্রাপ্তি যোগ্য হন, যাঁর অন্তর্গত সকল প্রাণী। যিনি সকল সংসারের রচনা (উৎপত্তি) করেছেন। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০-২২ এ গীতা জ্ঞানদাতা অপেক্ষা অন্য পরম পুরুষের বর্ণনা আছে, এইজন্য গীতা জ্ঞানদাতা ঐ ধামকে নিজের ধাম বলতে পারেনা। উনি নিজের ধাম অর্থাৎ নিজ লোক অপেক্ষা পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধাম বলেছেন ঐ পরমেশ্বরের ধামকে, এটাই সঠিক অর্থ।

বিচার করুন:- গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০ তে "পরঃ" শব্দের অর্থ "পরে" করা হয়েছে অর্থাৎ অব্যক্ত থেকেও (পরঃ) = পরে অর্থাৎ অন্য সনাতন অব্যক্ত ভাব যুক্ত পরমেশ্বর। এইভাবে গীতার এই অধ্যায় ৮ শ্লোক ২২ এ বলা হয়েছে যে, সেই (সঃ) সেই অন্য (পরঃ) যে পরমেশ্বর (পুরুষঃ) আছেন। তাঁর প্রাপ্তি অনন্য ভক্তি দ্বারা সম্ভব।

এর অন্য প্রমাণ:- গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ - ১৫ তে তিনগুণের (রজগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, এবং তমোগুন শঙ্করের) ভক্তি করা ব্যক্তিদের রাক্ষস স্বভাব ধারণকারী মানুষের মধ্যে নীচ, দূষিত কর্মকরা মূর্খ বলেছে এবং গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে এরা আমাকেও ভজনা করে না। নিজের ভক্তির বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৬ - ১৮ তে বলেছেন যে, আমার ভক্তিতে হওয়া গতি অনুত্তম (অশ্রেষ্ঠ)। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৯ বলেছেন যে, বহু - বহু জন্মের পরে কোনো এক জন্মে সাধক আমার ভক্তি করে,অন্যথায় অন্যান্য দেবী-দেবতার এবং ভৈরব-ভূতদের পূজা করতে থাকে। কিন্তু একথা বলা মহাত্মাকে পাওয়া অতি দূর্লভ, যিনি বলবেন যে, বাসুদেব অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মার বাস (স্থান) সবার উপরে। তিনিই সবকিছু (সর্বম) অর্থাৎ তিনিই পূজার যোগ্য আছেন। ওনারই ভক্তিতে পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) প্রাপ্তি সম্ভব। উনিই সকল সৃষ্টির রচনাকার ও সকলের ধারণ-পোষণকারী। আবার গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯ এ গীতাজ্ঞানদাতা বলেছেন যে, যে সাধক আমার জ্ঞানের আধারে তত্ত্বে দর্শী সন্তের কাছ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত করে, কেবল জরা (বৃদ্ধ অবস্থার দুঃখ) এবং মরণ (মৃত্যুর দুঃখ) থেকে বাঁচার জন্য (চেষ্টা) ভক্তি করে, তাঁরা এই সংসারে সকল বস্তুকে নাশবান মনে করে, কোন ইচ্ছা না রেখে কেবল মোক্ষ (মুক্তির) উদ্দেশ্যে ভক্তি করে। তাঁরা সেই ব্রহ্মকে (তত্ ব্রহ্মকে) জানেন (বিদু) এবং সকল কর্ম ও সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাথে পরিচিত। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯)

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১ অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে, হে ভগবান! (কিম্ তত্ ব্রহ্ম) সেই ব্রহ্ম কে? যাঁকে জানার পর সাধক কেবলই মোক্ষ (মুক্তি) চায়। এই প্রশ্নের উত্তর গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ -এ গীতা জ্ঞানদাতা দিয়েছেন। বলেছেন যে, "তিনি হলেন পরম অক্ষর ব্রহ্ম"। গীতা জ্ঞানদাতা এই পরম অক্ষর ব্রহ্মের বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮, ৯, ১০, ২০, ২১, ২২ -এ বর্ণনা দিয়েছেন যিনি গীতা জ্ঞানা-দাতা থেকে অন্য। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭ বলা হয়েছে যে, যে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ জগতের রচনা করেছেন, যাঁর দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত (অর্থাৎ যাঁর শক্তিতে সকল ব্রহ্মাণ্ড স্থিত আছে) তিনিই বাস্তবে অবিনাশী পরমাত্মা যার নাশ করতে কেউ কখনো সক্ষম নয়। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে ও বলা হয়েছে যে, পুরুষোত্তম তো অন্য কেউ (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে দুই পুরুষের বিষয়ে বলা হয়েছে, ক্ষর পুরুষ

এবং অক্ষর পুরুষ। উত্তম পুরুষ তো এই দুই পুরুষ (প্রভু) থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ তিনিই শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর) যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারন-পোষণ করেন এ কারণে তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনিই বাস্তবে অবিনাশী পরমেশ্বর। (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭), আবার গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৬৯ -এ গীতা জ্ঞানদাতা নিজ অপেক্ষা অন্য পরমাত্মার বিষয়ে বলেছেন। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৩ থেকে এই প্রসঙ্গ চলছিল। যেখানে বলা হয়েছিল যে, 'হে অর্জুন' যে সময় বিভিন্ন লোকের ভ্রমিত করা জ্ঞান থেকে তোর বুদ্ধি যখন পরমাত্মার উপর স্থির হয়ে যাবে তখন তোর যোগ প্রাপ্ত হবে (গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৩), আবার গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৯ তে বলা হয়েছে যে, কিছু ব্যক্তি নিরাহার থেকে (ভোজন ত্যাগ করে) শুধুই ফলাহার বা দুধাহার, করে ফলস্বরূপ কিছু সময়ের জন্য তাদের বিষয়-বিকার নিবৃত হয়ে যায়, কিন্তু সাংসারিক বিষয় বস্তুর আসক্তি দূরীভূত হয় না। শাস্ত্র অনুসার সাধনা করলে সাধকের ঐ অন্য পরমাত্মার সাথে সাক্ষাৎকার হয়, যার ফলে বিষয়-বিকার এবং আসক্তিও দূরীভূত হয়ে যায়। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৯ এর মূল পাঠে "পরম" শব্দ আছে যার অর্থ "পর" অর্থাৎ অন্য হয়। উদাহরণের জন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৩ তে মূল পাঠে, এই "পরম" শব্দ আছে। এখানে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, তিন গুণের (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবের) প্রভাবে সমগ্র সংসার মোহিত হচ্ছে, এদের থেকে অন্য (পরে) আমাকে জানে না। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৩) এখানে পরম্ = পর = অন্য অর্থাৎ দ্বিতীয় হবে। একইভাবে গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৯ এ "পরম" শব্দের অর্থ পর = অন্য অর্থাৎ দ্বিতীয় জানুন, কারণ গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৫৫ এবং গীতা অধ্যায় ১২ - ১৬ এ প্রমাণ আছে। গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৫৫ তে গীতা জ্ঞানদাতা তার সংকেত দিয়েছেন যে (মত্ কর্মকৃত) = আমার জন্য শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি কর্ম করে (মত্ পরম্) অর্থাৎ আমার থেকেও শ্রেষ্ঠ পরমাশ ত্মার ভক্তি করেও আমার ভক্ত (মত্ ভক্ত) আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কারণ যতক্ষণ না তত্ত্বদর্শী সন্তের শরন না মেলে, ততক্ষণ বেদের জ্ঞান অনুসারে "ওঁ" নামের জপ পূর্ণ পরমাত্মার মনে করতে থাকে। যার ফলে সাধক ব্রহ্ম লোকে চলে যায়। এইজন্য গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, আমার ভক্ত আমার থেকে অন্য পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি করেও আমাকে প্রাপ্ত হয় (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৫৫)

আবার গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১ - এ অর্জুন প্রশ্ন করেছেন যে, যে সকল ভক্তা-দের মধ্যে পূর্বে বলা নিয়ম অনুসারে (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৫৫ তে সংকেত আছে) যারা (ত্বম) আপনার ভক্তি করে এবং যারা অবিনাশী অব্যক্ত (অব্যক্তম অক্ষরম) পরমাত্মার ভক্তি করে ("যার বর্ণনা গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০-২২ আছে"), তাদের মধ্যে উত্তম ভক্তি করা ভক্ত কারা? (গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১)

আবার গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ২ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, আমার ভক্ত যারা কেবল আমার প্রতি ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে, তারা (যুক্ততমাঃ মতাঃ) আমার বিচার অনুসারে সঠিক সাধক। (গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ২)

গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৩-৪ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, "যিনি সেই সর্বব্যাপী আছেন তাঁর বিষয়ে আমিও জানি না, যিনি সর্বদা বসে থাকা স্থায়ী,

অচল, অব্যক্ত অর্থাৎ পরোক্ষ অবিনাশী পরম অক্ষর ব্রহ্মের নিরন্তর উপাসনা করে, এবং সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ কামনা করা সাধক, সকলের প্রতি সমান ভাব রাখা সাধক আমাকেই প্রাপ্ত হয়। এর ভাবার্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান গীতা জ্ঞানদাতারও নেই, সেই জ্ঞান একমাত্র তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে আছে। তত্ত্বদর্শী সন্তের শরণ না পাওয়ার কারণে ব্রহ্মের ওম্ (ওঁ) নামকে পরম অক্ষর ব্রহ্মের নাম (মন্ত্র) জপ মনে করে সাধনা করে। যার কারণে কালের জালে থেকে যায়। এইজন্য বলা হয়েছে যে, সেই সাধক আমাকেই (গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর “সোহং” নামের আবিস্কার করে সাধকদের বলেছেন। কিন্তু সারনাম তবুও গুপ্ত রেখেছিলেন। সূক্ষ্মবেদে লেখা আছে :-

সোহং শব্দ হম জগ মেঁ লায়ে। সার শব্দ হম গুপ্ত ছিপায়েঁ

সোহং উপর ঔর সতসুকৃত এক নাম

সব হংসোঁ কি বাস হৈ, নহীঁ বস্তী নহীঁ ঠাম॥

সতগুরু সোহং নাম দে, গুঝ বীরজ বিস্তার।

বিন সোহং সীঝৈ নহীঁ, মূল মন্ত্র নিজ সার॥

“যে সাধক ‘সোহং’ নামের জপ করে সে পর ব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষ যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে প্রমাণ দেওয়া আছে, তার) জপ করে। সারনাম ছাড়া “সোহং” এবং “ওঁ” পূর্ণ মোক্ষ দায়ক নয় “ওঁ” নামের জপ ব্রহ্মের (গীতা জ্ঞানদাতার) তাই এই নাম জপ করলে মহা ইন্দ্রের লোক প্রাপ্তি হয়, যা ব্রহ্ম লোকে অবস্থিত এবং “সোহং” নামের জপের ফলে ব্রহ্মালোকে বানানো নকল সতলোক প্রাপ্তি হয়। এটিও ব্রহ্মালোকে অবস্থিত। তাই সাধক কালের জালে থেকে যায় এবং এই কথা বলতে থাকে “সমস্ত প্রাণীর ভালো হোক”

সর্বে ভবন্তু সখিনঃ সার্বে সন্তু নিরাময়ঃ।

স্বর্গে ভদ্রানি পশয়ন্তু, মা কশিচত্ দুঃখভাগ ভবেত্॥

ভাবার্থ:- “সবাই সুখী হোক, সবাই আরোগ্য লাভ অর্থাৎ সুস্থ হোক, সকলের ভালো হোক, সকলের দুঃখ দূর হোক”। এই মঙ্গলকামনার মন্ত্র জপ করে আশীর্বাদ দেয়, এবং প্রার্থনা করতে থাকে। এই আশীর্বাদ দেওয়ার ফলে সাধকের পুণ্যরূপী ধন এবং ভক্তি ধন সমাপ্ত হয়ে যায়। তত্ত্বদর্শী সন্তের অনুগামীরা এই ভুল কখনো করেনা! এইজন্য বলা হয়েছে যে, ওই পরম অক্ষর ব্রহ্মের সাধকও আমাকেই প্রাপ্ত হয় কারণ সঞ্চিত ভক্তি ধন আশীর্বাদ ও সকলের মঙ্গলকামনায় সমাপ্ত করে দেয়, বাকিটা মহাস্বর্গ (ব্রহ্মালোকে) রূপী হোটেলে খরচা করে পুনরায় জন্ম -মৃত্যুতে এবং চুরাশি লক্ষ প্রাণীর জীবন চক্রে ফিরে আসে।

রাজা জনকের জীবনী থেকে প্রমাণ:-

ত্রেতাযুগে রাজা জনক নামে একজন ধার্মিক রাজা ছিলেন। এনার কন্যা ছিলেন সীতা। যিনি ত্রিলোকীনাথ শ্রীবিষ্ণু অর্থাৎ দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন। সত্যযুগে

রাজা জনকের জীবাত্মা অম্বরীশ নামের একজন রাজা ছিলেন, যিনি শ্রী বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন। সেই সাথে তিনি বেদ অনুসারে "ওঁ" নামের জপ করতেন অর্থাৎ ব্রহ্ম সাধনা করতেন। পরিনাম স্বরূপ রাজা অম্বরীশ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে শ্রী বিষ্ণু লোকের স্বর্গে নিজের ভক্তি ধনে সুখ ভোগ করেছিলেন। তারপর লক্ষ বছর ধরে ব্রহ্মালোকে ব্রহ্ম সাধনার পুণ্য ফল (সুখ) ভোগ করেন। আবার ত্রেতাযুগে রাজা জনক নামের একজন ধার্মিক রাজা হিসাবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা জনক তার জীবনকালে অনেক ধার্মিক যজ্ঞ (ধার্মিক অনুষ্ঠান) করেছিলেন। উনি শ্রী বিষ্ণুর ভক্তি এমনকি ব্রহ্মের সাধনাও করেছিলেন। রাজা জনকের যখন সংসার ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে যাওয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখন স্বর্গ থেকে একটি বিমান এসে রাজা জনককে বসিয়ে আকাশ মার্গে রওনা দেয়। যাত্রা পথে একটি নরক ছিল- যেখানে ১২ কোটি জীবাত্মারা প্রত্যেকেই তার নিজের কর্মদন্ড ভোগ করছিল এবং তাদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। রাজা জনক দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এরা কারা, কোন দুঃখীদের আর্তনাদ? বিমান থামাও, সাথে সাথেই বিমানটি থেমে গেল। দেবদূতেরা বললেন, রাজন! এটি একটি নরক। এখানে প্রাণীরা নিজেদের পাপকর্মের দন্ড (শাস্তি) ভোগ করছে। জনক বললেন, এদেরকে এই নরক থেকে মুক্তি দিন। আমি এদের কষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। দেবদূতেরা বললেন জনক, এখানে আপনার রাজত্ব নেই, এখানে কেবলমাত্র ধর্মরাজের আদেশ চলে। এ কথা শুনে রাজা-জনক বললেন এদেরকে এখনই ছেড়ে দাও অথবা আমাকে এই নরকে ফেলে দাও। দেবদূতেরা বললেন এই সমস্যার সমাধান কেবল ধর্মরাজই করতে পারেন। রাজা জনক বললেন তাহলে আমাকে ধর্মরাজের সাথে কথা বলাও। সেই সময় ধর্মরাজ ওখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং সকল ঘটনা জানার পর বললেন যে, আমি আপনাকে এই নরকে না ফেলতে পারি, না এই ১২ কোটি জীবকে নরক থেকে বের করতে পারি! তবে একটি উপায় বলতে পারি, আপনি (রাজা জনক) আপনার কিছু ভক্তি ধন (পুণ্য এবং মন্ত্র জপের ভক্তিধন) এই ১২ কোটি জীবকে প্রদান করে দিন, তখনই আমি আপনার সাথে এদেরকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেব। রাজা জনক দয়ার বশবর্তী হয়ে নিজের অর্ধেক ভক্তি ধন ঐ ১২ কোটি জীবকে সংকল্প করে দেন। ঐ ১২ কোটি দুঃখী আত্মারা রাজা জনককে দেওয়া পুণ্যের আধারে স্বর্গে চলে যায় আর রাজা জনকও স্বর্গে (বিষ্ণুলোকের স্বর্গে, তারপর ব্রহ্মালোকের মহাস্বর্গে) নিবাস করে নিজের পুণ্য ফল ভোগ করে, যার ফলে তাঁর সমস্ত ভক্তি ধন সমাপ্ত হয়ে যায়।

সারকথা:- যে ১২ কোটি জীবাত্মাকে রাজা জনক নিজের অর্ধেক পুণ্য দান করে দিয়েছিলেন, ধর্মরাজ সেই পুণ্য ১২ কোটি জীবাত্মাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন। ঐ পুণ্যের ফলস্বরূপ ঐ আত্মারা স্বর্গে নিবাস করেছিলেন। তারপর ঐ পুণ্য সমাপ্ত হওয়ার পর পুনঃরায় ঐ নরকে ফেলে দেওয়া হয়! অবশিষ্ট পাপকর্মের শাস্তি ভোগ করানোর জন্য রাজা জনকের সাথে এত বড়ো প্রতারণা হয়! তার অর্ধেক পুণ্য তো দান করেই সমাপ্ত হয়ে যায় আর বাকি অর্ধেক উপরে স্বর্গলোকে ভোগ করে সমাপ্ত হয় এবং পুনরায় জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে আসেন। ঐ একই জনক রাজার জীব -আত্মা কলিযুগে শিখ্ গুরু শ্রী নানকদেব সাহেবের রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী নানক দেবকে সুলতানপুর শহরের বেঈ নদীর ঘাটে পূর্ণ পরমাত্মা এক জিন্দা সাধুবেশে এসে সাক্ষাৎকার

করেন এবং ওনাকে সনাতন পরমধামে (সত্যলোক = সচ্চখন্ড) নিয়ে যান। তৃতীয় দিনে পুনরায় নানক দেবকে বেঈ নদীর ঘাটে ছেড়ে দেন। ওনাকে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের সাথে পরিচয় করান, ওনাকে ওনার পূর্বের কিছু ভালো মানব জন্মের চিত্র দেখান, এরপর নানকদেবকে সত্যনামের (যা দুই অক্ষরের মন্ত্র যার মধ্যে একটি ওঙ্কার (ওঁ) অপরটি গুপ্ত আছে, যা কেবল উপদেশীকে বলা হয়) দীক্ষা প্রদান করেন। তখন শ্রী নানক দেব সাহেবের পূর্ণ মোক্ষ লাভ হয়। যদি পরমাত্মা তত্ত্বদর্শী সন্তের রূপে প্রকট হয়ে তত্ত্বজ্ঞান না বলতেন, তাহলে শ্রী নানক দেবের আত্মার জন্ম মৃত্যু চক্র কখনো সমাপ্ত হতো না। সেই সত্য সাধনা আমার কাছে (সন্ত রামপালজীর কাছে) আছে। প্রসঙ্গ এটাই চলছিল যে, আবেগপ্রবণ হয়ে নিজের ভক্তিধন আশীর্বাদ দিয়ে নষ্ট করা কখনো উচিত নয়। আপনি কখনো কি বুদ্ধিমান ধনবান ব্যক্তিকে নিজের অর্থ (টাকা-পয়সা) অন্য কাউকে বিতরণ করতে দেখেছেন? যদি কাউকে সহায়তা করতে চান তাহলে তাকে অর্থ উপার্জনের পথ দেখান, যাতে ওই গরীব ব্যক্তি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ধনী হতে পারে। এইভাবে পূর্ণ গুরুর শিষ্যরা কাউকে সহায়তা করতে চাইলে তাকে পূর্ণ গুরুর কাছ থেকে নামদীক্ষা নেওয়ার ও ভক্তি ধন সংগ্রহের প্রেরণা দেয়।

গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৫ এ বলা হয়েছে যে, "যাদের আস্থা সচিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের প্রতি আছে এবং যারা তাঁকে জানেন (চেতসা), তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে (ক্লেশঃ) সন্দেহের কারণে জ্ঞানের উপরে ঝগড়া হতে থাকে। ঐ মানব শরীরধারীরা এ কারণে উত্তম গতি প্রাপ্ত না করে দুঃখ দায়ী অধঃগতি প্রাপ্ত করে। ভাবার্থ ঐ একই যে, তত্ত্বদর্শী সন্ত না পাওয়ার কারণে কবীর পন্থীরাও (ঘীসা দাস পন্থী, গরীবদাস পন্থী, দাদু দাস পন্থী, নেকীরাম পন্থী। এদের সবাইকে কবীর পন্থী বলা হয়।) কঠিন তপস্যা করে। ব্রত-মৌনব্রত, এছাড়া আরো অন্য কঠিন সাধনা করে থাকে। এজন্য বলা হয়েছে যে, পূর্ণ পরমাত্মার সাধনা ক্লেশ যুক্ত এবং দুঃখদায়ী হয়। বাস্তবে শাস্ত্র অনুকূল সকল সাধনা অতি সহজ ও সরল।

প্রমাণ:- যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১৫ তে ব্রহ্ম সাধনার বিষয়ে বলা হয়েছে যে:-

বায়ুঃ অনিলম্ অমৃতম্ আথ ইদম্ ভসান্তম্ শরীরম্।

ওমর কৃতম্ স্মর, কিলবে স্মর কৃতুঃ স্মর॥

ভাবার্থ:- ব্রহ্ম সাধনার একমাত্র মন্ত্র ওম্ (ওঁ)। এই নামে পাওয়া অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য "ওঁ" নামের জপ শ্বাস-প্রশ্বাসের (বায়ুঃ অনিলাম্) মাধ্যমে অত্যন্ত মনোযোন গের সাথে শরীর নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (কৃতম্) কাজ করতে করতে জপ (স্মর) করো, বিশেষ ব্যাকুলতার সাথে অর্থাৎ বিলাপের সাথে (কিলবে স্মর) জপ করো, মানব জীবনের মূল কর্তব্য জেনে (কৃতুঃ স্মর) স্মরণ অর্থাৎ জপ কর। (যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১৫)

আবার যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১৭ তে বেদ জ্ঞানদাতা (যিনি গীতা জ্ঞানদাতা তিনিই বেদ জ্ঞান দাতা) বলেছেন যে, ওই পূর্ণ পরমাত্মা তো উপরের লোকে পরোক্ষ অর্থাৎ অব্যক্ত রূপে আছেন। আমিই ব্রহ্ম (অহম্ খম্ ব্রহ্ম ওম্), দিব্য আকাশ রূপী ব্রহ্মলোকে আমিই থাকি, আমার একমাত্র নাম ওঁ। যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০ এ বেদ জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, কেউ তো পরমাত্মাকে জন্ম নেওয়া (সম্ভবাত্) অবতার রূপের সাকার

মনে করে,আবার কেউ অজন্মা (অসম্ভবাত) অর্থাৎ উৎপন্ন না হওয়া নিরাকার মনে করেন। সেই পরমাত্মা জন্ম নেওয়া অথবা না-নেওয়া যেমনই হোক, তাঁর বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান তত্ত্বদর্শী সন্তগন (ধীরানাম্) বলবেন, তাঁর কাছে শোন (শ্রুণুঃ)। (যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০), এই একই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এ আছে যে, পরমাত্মার বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান তত্ত্বদর্শী সন্তই বলে থাকেন। তাঁর খোঁজ করো, তাঁকে নিষ্কপটভাবে এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করে বিনম্রতা পূর্বক প্রশ্ন করলে, সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবে। সূক্ষ্ম বেদেও বলা হয়েছে যে:-

নাম উঠত নাম বৈঠত, নাম সোবত জাগ রে।
নাম খাতে নাম পীতে, নাম সেতী লাগ রে॥

ভাবার্থ:- পরমাত্মার সাধনা কেবলমাত্র নাম জপেই হয়, তাঁর নাম জপ, কাজ করতে করতে করো, ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে করো, সকালে উঠেই শুরু করো আবার খাওয়ার সময় করো অথবা জলপান করার সময় করো অর্থাৎ সকল প্রকারের কাজ করতে করতে নাম স্মরণ করো। ভাবার্থ হল এই যে, হঠযোগ না করে কর্মযোগ করতে করতে সাধনা কর।

"গীতাতে দুই ধরনের জ্ঞান আছে"

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা যদি চার বেদ(ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ) এবং সূক্ষ্মবেদ যা সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্ম অর্থাৎ সত্যপুরুষ স্বয়ং নিজের মুখ কমলে যে তত্ত্বজ্ঞান বলেছেন, যদি তার সাথে না মেলে তাহলে সেই জ্ঞান সঠিক নয়। সেই জ্ঞান গীতা জ্ঞানদাতা নিজের মতামত, যা গ্রহণযোগ্য নয়। গীতা জ্ঞানদাতা এমন অনেক শ্লোক (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক ২, অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮, অধ্যায় ৬ শ্লোক ৩৬, অধ্যায় ৩ শ্লোক ৩১ এবং অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৭০ এ) বলেছেন যে, এই রূপ আমার মতামত অর্থাৎ আমার বিচার। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে ৯৫ শতাংশ যা বেদের জ্ঞান আর বাকি ৫ শতাংশ জ্ঞান গীতা জ্ঞানদাতার নিজের মতামত। যদি সেই জ্ঞান বেদের জ্ঞানের সাথে মিলে যায় তাহলে তা সঠিক, অন্যথায় ব্যর্থ। উদাহরণের জন্য গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৭-৩৮ ই যথেষ্ট। এই শ্লোকে বিপরীত ধর্মী কথা বলেছে গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৭ এ তো লাভ-লোকসানের বিষয়ে বলেছেন যে, তুই যদি যুদ্ধে মারা যাস তাহলে স্বর্গ প্রাপ্তি করবি আর যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিস, তাহলে পৃথিবীর রাজ্য সুখ ভোগ করবি। এইজন্য হে অর্জুন! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৭) আবার গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৮ এ সাথে-সাথেই এর বিপরীত ধর্মী কথা বলেছেন যে, জয়-পরাজয় অর্থাৎ হার-জিত, সুখ-দুঃখকে একই সমান মনে করে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যা। এইভাবে যুদ্ধ করলে তোর পাপ লাগবে না। (গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৮)

গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩৩ এ ও সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, "অতএব তুমি যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও, যশ লাভ করো এবং শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ করো। আমি তোমার সামনে থাকা যোদ্ধাদের আগে থেকেই মেরে রেখেছি তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও।

"পান্ডবদের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞ"

মহাভারত গ্রন্থের একটি প্রকরণে লেখা আছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ভুমিতে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে কোটি-কোটি সৈনিকের মৃত্যু হয়েছিল, কোটি-কোটি বোন বিধবা হয়েছিল, কোটি কোটি শিশু অনাথ হয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে পান্ডবরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল আর কৌরবদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছিল। দিল্লির (ইন্দ্রপ্রস্থের) রাজ সিংহাসনে শ্রী যুধিষ্ঠির কে বসিয়ে শ্রীকৃষ্ণ "দ্বারকায়" চলে গিয়েছিলেন। এরপর প্রতি রাতে রাজা যুধিষ্ঠিরের এর ভয়ঙ্কর - ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আসতে থাকে, যেমন কোন মাথা কাটা ব্যাক্তি রাজমহলে প্রবেশ করছে এমন, কোটি-কোটি অনাথ বাচ্চারা আর্তনাদ করছে, পিতা!-পিতা! বলে, কোটি-কোটি সৈনিকের বিধবা স্ত্রী হায় স্বামী! হায় স্বামী বলে স্বামীর শোকে দুঃখ-যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করতে করতে মাথার চুল ছিঁড়ছে আর তাদের কান্না যেন এই বলছে যে, হে নরপিশাচ রাজা তুই রাজমহলের সুখ ভোগ করার জন্য আমাদের সোহাগ কেড়ে নিয়েছিস। এই অনাথ বাচ্চা গুলোর সাথে আমাদেরকেও মেরে ফেল তাহলে তোর এই রাজ্য সুখ-ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে যাবে। কতদিন থাকবি এই রাজসিংহাসনে? একদিন সকালে রাজা যুধিষ্ঠির স্নান করার জন্য গঙ্গার ঘাটে যায়, সেখানে কয়েক হাজার সংখ্যায় বিধবা মহিলারা বিবাহের চুড়িগুলো (শাঁখা-পলা প্রভৃতি) ভেঙে জল প্রবাহ করতে ওই ঘাটে এসেছিল। তারা বিলাপ করে কাঁদছিল, কেউ কেউ মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, তাদের ছেলে-মেয়েগুলো বিধবা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল কিছু কিছু মহিলাকে অন্য বৃদ্ধ মহিলারা হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে নিয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ সবাই কাঁদছিল। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে রাজা যুধিষ্ঠির স্নান না করে রাজমহলে ফিরে আসে। সারাদিন চোখের সামনে এইসব ভয়ঙ্কর দৃশ্য ভাসতে থাকে। চিন্তায় রাজার ঘুম খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, রাত্রিতে ঘুমানোর সময় ওই একই দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে। রাজা যুধিষ্ঠির না তো ঘুমোতে পারছে আর না তো কাঁদতে পারছে, আর নাতো কিছু খেতে পারছে। রাজা যুধিষ্ঠির কেবল নাম মাত্র আহার করছিলেন, তার বিস্ফারিত চোখে ও মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল দ্রৌপদী কিছুদিন ধরে নিজের বড়ো স্বামীর এই অবস্থা লক্ষ্য করছিল। দ্রৌপদী অনেকবার কারণও জিজ্ঞাসা করে কিন্তু যুধিষ্ঠির উত্তরে বলে কিছু হয়নি-কিছু হয়নি! সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে এবং দিনের পর দিন যুধিষ্ঠিরের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে দ্রৌপদী অন্য পান্ডবদের এ বিষয়ে বললেন। চার পাণ্ডব ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব (রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বিনম্রতাপূর্বক মানসিক অবসাদের কারণ জিজ্ঞাসা করে তখনও যুধিষ্ঠির উত্তর দেয়, কিছু না। যখন বড়ো দাদা জীবিত আছে তখন ছোট ভাইদের কিছু চিন্তা করা উচিত নয়।

তখন অর্জুন বলে হে বড়ো দাদা! আমরা কি এখনো ছোট বাচ্চা? আমরা কি নিজের বড়ো দাদার দুঃখ ভাগ করে নিতে পারি না? আপনি কি আমাদের নিজের ভাই মনে করেন না? এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির চোখে জল চলে আসে, তখন চার ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে সবার মুখে হাত রেখে বলে, এমন শব্দ কখনো উচ্চারণ করবে না। তোমরা শুধু আমার ভাই নও, এমন কোন বিষয় নেই যা আমি তোমাদের কাছে গোপন করব! সহদেব অশ্রু ভরা নয়নে বলে হে বড় দাদা! মনে হচ্ছে আপনি রাজা হয়ে বেইমান ধোকাবাজ হয়ে গিয়েছেন, আমাদের থেকে অবশ্যই কিছু লুকাচ্ছেন। আমাদের চার

ভাইয়ের দিব্যি, আপনি সত্য কথা বলুন! তা না হলে আমরাও অনাহারে থাকবো। ছোট ভাইদের আবদারের (জেদের) কাছে নত হয়ে যুধিষ্ঠির নিরুপায় হয়ে নিজের দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করে। তখন সকল ঘটনা যা যা স্বপ্নে ও গঙ্গার ঘাটে দেখেছিল সবকিছু খুলে বলে। পান্ডবদের গুরু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৭ এবং গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩ এ)

এইজন্য পঞ্চপান্ডব দ্বারকায় পৌঁছায় এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে বড়ো ভাই যুধিষ্ঠিরের অসুস্থতার কথা বলেন এবং এই অসুস্থতার কারণ ও সমাধানের বিষয়ে জানতে চান। শ্রীকৃষ্ণ সবকিছু দেখে শুনে বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের উপর খারাপ আত্মাদের ছায়া পড়েছে এবং যুদ্ধে হত্যা করা বন্ধুঘাতের পাপের প্রতিফল।

সমাধান:- শ্রীকৃষ্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করার বিধান দিলেন। এই যজ্ঞে পৃথিবীর সমস্ত সাধু-সন্ত, ঋষি-মহর্ষি, ব্রাহ্মণ ও নিজেদের আত্মীয়-স্বজন এবং স্বর্গলোকের সমস্ত দেবী দেবতাদেরকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাও। একটি পঞ্চমুখী (পঞ্চানন শঙ্খ) নিয়ে এসে একটি সুসজ্জিত আসনে রেখে দাও। যখন উপস্থিত সকল অতিথিদের ভোজন সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন এই শঙ্খ নিজে থেকেই বাজবে, তবেই তোমাদের এই তিন তাপের সংকট (কষ্ট) সমাপ্ত হবে। যদি শঙ্খ ধ্বনিত না হয়, তাহলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ, সংকট (কষ্ট) দূর হবে না। শ্রীকৃষ্ণের মুখে এ কথা শুনে অর্জুন একেবারে স্তব্ধ হয়েগেল। দুশ্চিন্তায় তার মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো আর ভাবতে লাগলো এই যে, যখন যুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়েছিল তখন, আমি যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় ভগবান যুদ্ধ করার জন্য বারবার প্রেরণা (উৎসাহ) দিচ্ছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তোমার কোন পাপ লাগবে না, তুমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার তো দুই হাতে লাড্ডু আর এখন বলছেন যে, যুদ্ধ করে নরসংহারের পাপ'ই তোমাদের সংকটের (কষ্ট) কারণ। সমাধানের জন্যও এমন বিধান দিয়েছেন যে, যা ঐ সময়ের কোটি কোটি টাকা (বর্তমানে অর্ব-খর্ব টাকা) খরচা হওয়ার ছিল। এই কথা ভেবে অর্জুন তার নিজের চিন্তা ভাবনা, বিষপানের মত নিজের মনের মধ্যে চেপে রাখে যে, যদি আজ আমি শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করি যে, গীতা জ্ঞান দেওয়ার সময় আপনি বলেছিলেন যে, অর্জুন! যুদ্ধ কর, তোমার কোন পাপ লাগবে না। আর এখন ওই যুদ্ধে করা হত্যার পাপ-ই সংকটের (কষ্টের) কারণ বলছেন। একথা শুনে বড়ো ভাই যুধিষ্ঠির এই ভাববে যে, কোটি-কোটি টাকা আমার চিকিৎসায় খরচ হওয়ার ভয়ে অর্জুন এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের সাথে বাদ-বিবাদ করছে, এ আমার চিকিৎসা করাতে চায় না। একথা যদি ঘুণাক্ষরেও বড়ো ভাই যুধিষ্ঠির জানতে পারে তাহলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তবুও নিজের চিকিৎসা করাবে না।

এই বিচার করে অর্জুন যজ্ঞের তিথি এবং স্থান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে যজ্ঞের প্রস্তুতি শুরু করে। এই অশ্বমেধ যজ্ঞে তেত্রিশ (৩৩) কোটি (প্রকার) দেবতা, আটাশি (৮৮) হাজার ঋষি, বারো (১২) কোটি ব্রাহ্মণ, ছাপ্পান্ন (৫৬) কোটি যাদব (অর্থাৎ অর্জুনের শশুর বাড়ির লোকজন), নয়জন নাথ, চুরাশি জন সিদ্ধ মহাত্মা, এছাড়া আরো অনেক সাধারণ জনতা এসেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সহ সকলেই ভোজন গ্রহণ করে নিন য়েছিলেন। কিন্তু শঙ্খ ধ্বনিত হয়নি। তারপর সুদর্শন (সুপচ) সন্তকে সম্মানের সাথে ভোজন বানানোর পর ওই যজ্ঞ সম্পন্ন হয় অর্থাৎ শঙ্খ ধ্বনিত হয়। ঐ সময় করুজ

ণাময় নামে তত্ত্বদর্শী সন্তরূপে পূর্ণ পরমাত্মা প্রত্যেক যুগের মতো সেই যুগেও লীলা করতে এসেছিলেন। সেই সময় ওনার সুদর্শন নামে এক শিষ্য ছিলেন এবং সত্যনামের (সতনাম, যা দুই অক্ষরের একটি ওঁ অপরটি তত্) ভক্তি করতে দিয়েছিলেন। যার কারনে পান্ডবদের ঐ যজ্ঞ সফল হয়েছিল এবং সেই তিন তাপের সংকট (কষ্ট) পাণ্ডবদের নিবারণ হয়েছিল। এই তিন তাপের কষ্ট না তো শ্রীকৃষ্ণের ভোজন গ্রহণ করাতে আর নাই বা ওখানে উপস্থিত মহানুভাবেদের ভোজন করাতে সমাপ্ত হয়েছিল। ভক্ত শ্রী সুদর্শন ঐ পরম অক্ষর ব্রহ্মের অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি করতেন। এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বেদে বলা হয়েছে যে:-

তুম কৌন রাম কা জপতে জাপম্। তাতেঁ কটেঁ না তুম্হরেঁ তীনোঁ তাপম্॥

ভাবার্থ:- আপনি কোন রামের ভক্তির নাম জপ করেন, যাতে আপনার তিন তাপের কষ্টও সমাপ্ত হয় না মোক্ষ (মুক্তি) তো অনেক দূরের কথা। এইজন্য আমার (সন্ত রামপাল দাসের) কাছে সেই সত্য সাধনা আছে, যা দুই অক্ষরের সত্যনাম। আসুন এবং দীক্ষা নিয়ে নিজের আত্মকল্যাণ করান।

এখন ঐ প্রসঙ্গে আসছি এই যে, গীতাতে দুই ধরনের জ্ঞান আছে অর্থাৎ বিপরীত ধর্মী জ্ঞান আছে। প্রথমত গীতা জ্ঞানদাতা যুদ্ধ করানোর জন্য নিজের ছলনার দ্বারা অর্জুনকে ভ্রমিত করেন। যা বেদ বিরুদ্ধ জ্ঞান হওয়ার কারণে এবং অসত্য হওয়ার কারণে আমরা গ্রহণ করব না। এটা গীতা জ্ঞানদাতার নিজের মতামত। এজন্য গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৫ এ বলেছেন যে, ঐ সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের ভক্তি ক্লেশ ও দুঃখ পূর্বক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বেদে লেখা আছে যে, তত্ত্বদর্শী সন্ত পাওয়ার পরে ওই পরমাত্মার (পূর্ণ ব্রহ্মের) ভক্তি কাজ করতে করতে নাম জপের মাধ্যমে করা হয়, এই নাম জপের সাধানা অতি সহজ ও সরল। এতেই প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা নিজের যে মতামত এখানে বলেছেন, যদি তা বেদের (চার বেদ:- ১. ঋগ্বেদ ২. যজুর্বেদ ৩. সামবেদ ৪. অথর্ববেদ এবং পঞ্চম সূক্ষ্মবেদ।) সাথে না মেলে, তাহলে তা ব্যর্থ জ্ঞান। তা গীতা জ্ঞানদাতার নিজস্ব জ্ঞান, তা আমরা গ্রহণ করবো না এবং মানবও না।

অন্য প্রমাণ:- গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৮ থেকে ১৯ পর্যন্ত গীতা জ্ঞানদাতা নিজস্ব মতামত বলেছেন। গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৮ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, আমার প্রতি তোর মন ও বুদ্ধি অর্পণ কর, তাহলে তুই আমাকে প্রাপ্ত করবি। সেই রূপ তুই যদি উপরে থাকা (উর্দ্ধম্) অব্যক্তের ভক্তি করিস, তাহলে তাঁকে প্রাপ্ত করবি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৮)

গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৯ এ বলেছেন যে, যদি আমাকে প্রাপ্ত করার ইচ্ছা হয় এবং তোর মন যদি আমার প্রতি না লাগে, তাহলে হে অর্জুন! অভ্যাসযোগ অর্থাৎ নাম-জপ এবং নিত্যপাঠ ইত্যাদি করে আমাকে প্রাপ্ত করার ইচ্ছা কর।

গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১০ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, যদি নাম-জপ নিত্য পাঠ প্রভৃতি অভ্যাস করতে না পারো, তাহলে আমার জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম কর (মত্ কর্ম পরমঃ)। এইভাবে আমার জন্য শুভ কর্ম করতে-করতেও তুই সিদ্ধি প্রাপ্ত করে ফেলবি।

গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১১ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, যদি আমার দ্বারা বলা

ভক্তি সাধনাতে (মদ্যোগম = মত্ যোগম্) আশ্রিত হয়ে উপরোক্ত সাধনা করতে অসক্ত মর্থ্য হও, তাহলে যতি আত্মার (যতাত্মবান = যত আত্মবান্) মতো হয়ে যাও। "যতি" শব্দের অর্থ, যে পুরুষ নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রী-লোকের প্রতি বিষয়-বিকারে আসক্ত হয় না, তাকে সাধু ভাষায় "যতি পুরুষ" বলা হয়। যেমন শ্রী রামচন্দ্রকে যতি অর্থাৎ সাধু ভাষায় "জতি" বলা হয়ে থাকে। শ্রী সুখদেব = শুকদেব ঋষিকে, যিনি ব্যাসদেবের পুত্র ছিলেন, তাকেও যতি = জতি মনে করা হয় এবং শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে "সতী" মানা হয়। এই জন্য গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, যতাত্মবান অর্থাৎ যতি পুরুষ হয়ে সকল কর্মের ফল ত্যাগ করো। (গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১১)

গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১২ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, নাম জপ, নিত্য-পাঠ প্রভৃতি যা কিছু অভ্যাস করা হয়ে থাকে, তার থেকে শ্রেষ্ঠ হল জ্ঞান অর্থাৎ জিজ্ঞাসু হয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত কর। জ্ঞান থেকে ধ্যান অর্থাৎ হঠযোগ সাধনা করে সমা-ধিস্থ হাওয়াকে এখানে গীতা জ্ঞানদাতার মত অনুসারে ধ্যান বলা হয়েছে। সকল ঋষিগনেরা এই ধ্যান অনুসরণ করতেন, যা বর্তমানে মেডিটেশন (Meditation) নামে পরিচিত। ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হল সকল কর্মের ফল ত্যাগ করা, কারণ ত্যাগ করাতে তৎকালীন শান্তি পাওয়া যায়। (গীতা জ্ঞানদাতার নিজের মতামত)

গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১৩ - ১৪ তে বলেছেন যে, যেসব ব্যক্তি সকল প্রাণীর প্রতি অতি অহিংসা ভাব রাখেন অর্থাৎ দ্বেষভাব রহিত, তারা সকলের মিত্র ও দয়ালু হন, যেমন রাজা জনক ছিলেন। মোহ-মমতা রহিত, অহংকার রহিত হয়ে সুখে-দুঃখে সমানভাবে থাকতেন। যে ক্ষমাশীল সাধক (যোগী) সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে এবং যে যতি (যতাত্মা) পুরুষ দৃঢ় মনের হয় অর্থাৎ আমি গীতা জ্ঞান দেওয়ার সময় যে নিজস্ব মতামত বা যে বেদ জ্ঞান বলেছিলাম, তাকে যে দৃঢ় ভাবে পালন করে এবং যে আমার প্রতি সমর্পিত, সেই ভক্ত আমার অতি প্রিয়।

এইভাবে গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১৫ - ১৯ পর্যন্ত গীতা জ্ঞানদাতা নিজস্ব মতামত বলেছেন, যা ভক্ত সমাজকে কেবল নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়! যেমন উপরে উল্লেখ করা (গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৮ - ১২ পর্যন্ত) বিষয়ে বলেছে যে :-

আমার প্রতি মন লাগাও, যদি আমার প্রতি তোমার মন না লাগে, তাহলে নাম-জপ এবং নিত্য পাঠ প্রভৃতি অভ্যাসের দ্বারা সাধনা করো। অভ্যাসের অর্থ হল বার-বার একই কর্ম করে কোন কিছু সহজে অর্জন করা। এইভাবে নাম-জপ ও নিত্যপাঠ করে আমাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা কর। যদি নাম-জপ ও নিত্যপাট না করতে পারিস তাহলে আমার জন্য অর্থাৎ পরমাত্মার জন্য কর্ম করতে থাক। উদাহরণের জন্য, যেমন ধার্মিক কর্ম করা। কোথাও কম্বল বিতরণ করা, কোথাও ভোজন-ভান্ডারা (লঙ্গর) করানো, কোথাও মন্দির বানিয়ে দেওয়া, কোথাও পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া, পশু-পাখিদের খাওয়ানো প্রভৃতিকে ভগবান প্রাপ্তির জন্য করা 'কর্ম' বলা হয়। এগুলি করলে কিছু সিদ্ধি চলে আসে। প্রিয় পাঠকজন! মনোযোগ সহকারে বিচার করুন, এই শ্লোক গুলিতে এই সকল কর্মের ফলও বলে দিয়েছেন যে, এই সকল কর্মে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তারপর সেই সাধক স্বয়ং ঝাড়-ফুঁক, জন্ত্র-মন্ত্র, আশীর্বাদ এবং অভিশাপ দেওয়ার যোগ্য হয়ে যায় আর ফলস্বরূপ মহাঋষি নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। (গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১০)

“যদি ভগবানের জন্য কর্মও ত্যাগ করতে না পারো, তাহলে যতি (জতি) পুরুষ হয়ে সকল কর্মফল ত্যাগ করো।

বিচার করুন :- যখন ভগবানের জন্য কোন ধার্মিক কর্মই করবে না, তখন এমন কোন্ কর্ম আছে, যার ফল ত্যাগ করবে? একেই বলে মাথা-মুণ্ডহীন জ্ঞান অর্থাৎ যুক্তিহীন উপদেশ। (গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১১) আবার গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১২ তে তো একেবারে সমস্ত সীমা পার করে দিয়েছে। বলেছেন যে, অভ্যাস অর্থাৎ নাম-জপ এবং নিত্যপাঠ রূপী অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ! যা গীতা জ্ঞানদাতার নিজের মতামত, এখানে এই জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান (Meditation) অর্থাৎ একান্ত স্থানে আসনে বসে হঠযোগ পূর্বক (গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ১০ - ১৫ তে বলা বিধি গীতা জ্ঞানদাতার নিজস্ব মতামত) ধ্যান করাই শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অপেক্ষা সকল ধার্মিক কর্মের ফল ত্যাগ করাতে তথ-ক্ষণাৎ শান্তি পাওয়া যায়। গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১১ তে সকল ধার্মিক ক্রিয়া-কর্ম ত্যাগ করার আদেশ দিয়েছে। এইভাবে এই জ্ঞান যা ভক্ত সমাজকে নাস্তিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে! এগুলি গীতা জ্ঞানদাতার শাস্ত্রবিরুদ্ধ জ্ঞান, যার কারনে আজ ভক্ত সমাজ শাস্ত্রবি-ধিকে ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী (মনমর্জি) হয়ে বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্ম করতে থাকে আর নিজের অমূল্য মানব জীবন ব্যর্থ করে চলেছেন। যদি এই জ্ঞান উচিত (সঠিক) হয় এই যে, যদি ভগবানের প্রতি মন না লাগে, তাহলে অভ্যাস (নাম-জপ, নিত্যপাঠ) করো, যদি অভ্যাস না করতে পারো, তাহলে ভগবানের জন্য কর্ম করো, যদি ভগবানের জন্য কর্ম না করতে পারো, তাহলে সকল কর্মের ফল ত্যাগ করে দাও। যদি এমন হয়, তাহলে চার বেদের এবং শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অন্য আরো ৬৫০ টি শ্লোকের (কারণ প্রায় ৫০ টি শ্লোকে গীতা জ্ঞানদাতার নিজের মতামতের জ্ঞান) কি প্রয়োজনীয়তা ছিল। এর চার-পাঁচটি শ্লোক’ই যথেষ্ট ছিল। এইভাবে গীতা জ্ঞানদাতা নিজের মতামত বলেছেন, যা বেদ জ্ঞানবিরুদ্ধ এইজন্য এই জ্ঞান স্বীকার্য নয়। গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ২০ তে নিজের অজ্ঞানতাকে লুকানোর জন্য আবারও বলেছেন যে, হে অর্জুন! কিন্তু যে সাধক শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে (শ্রদ্ধানাঃ) আমার থেকে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে (মত্মরমা = মত্ পরমাঃ) পূজা করে (পর্যুবাসতে), সে আমার অতিশয় প্রিয়। যেমন প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছিল এই যে, গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক ১৪, ১৬, ২০, ২৪, ২৫, ২৬ এ প্রমাণ আছে যে, গীতা জ্ঞানদাতা নিজ অপেক্ষা অন্য প্রভুর বিষয়ে বলেছেন। গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক ১৪ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, পরমাত্মা (প্রভু) কোন মানুষের উপর না কর্তৃত্ব করেছেন, না কর্ম সৃষ্টি করেছেন এবং না তো কর্মফল সংযোগ করেছেন কিন্তু সকল প্রাণী তার নিজের স্বভাব অনুসারে কর্ম করতে থাকে।

গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক ১৫ :- (বিভুঃ) সর্বব্যাপী অর্থাৎ বাসুদেবের (বাসুদেব এর অর্থ যার বাস সর্বত্র) বর্ণনা গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪ - ১৫ তে আছে। ওখানে বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি অন্ন থেকে হয়েছে, অন্ন বর্ষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, বর্ষা ধার্মিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যজ্ঞ শাস্ত্র অনুকূল ধার্মিক কর্ম থেকে উৎ-পন্ন হয়। ধার্মিক কর্ম তো ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষের সৃষ্টি (অক্ষরঃ সম্ উদ্ধ ভবম্) অবিনাশী পরমাত্মা অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের থেকে হয়েছে এটা জানো। এতেই সিদ্ধ হয় যে, (সর্বগতম্ ব্রহ্ম) সর্বব্যাপী পরমাত্মা অর্থাৎ “বিভুঃ” সর্বব্যাপী পরমেশ্বর না কারোর পাপকর্ম এবং না কারো শুভ কর্ম গ্রহণ করে। ঐ

পরমাত্মার থেকে সকল (জন্তবঃ) জীব-জন্তু এবং মানুষ মোহিত হচ্ছে।

গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক ১৬ এবং ১৭ পড়লে আপনি স্পষ্ট ভাবে জানতে পারবেন এই যে, গীতা জ্ঞানদাতা নিজেকে ছেড়ে অন্য পরমেশ্বরের বিষয়ে বলেছেন। এইভাবেই গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক ২০, ২৪, ২৫ ও ২৬ এর যে অনুবাদ অন্য অনুবাদকরা করেছে, তা থেকেও এর সরলার্থ সহজে বুঝতে পারবেন।

একইভাবে গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ৭ এ সুস্পষ্ট ভাবে "পরমাত্মা" মূল পাঠে লেখা আছে, যা গীতা জ্ঞানদাতা থেকে ভিন্ন অন্য "পরমাত্মার" হওয়ার প্রমাণ দেয়, কারণ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলা হয়েছে যে, এই অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকে বর্ণিত দুই পুরুষের অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের থেকে ভিন্ন হলেন উত্তম পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম (পর্র-মাত্মা ইতি উদাহৃত) যাকে পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। তিনিই তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারন-পোষণ করেন; তিনি হলেন অবিনাশী পরমাত্মা। এখানেও (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে) "পরমাত্মা" শব্দ আছে। এইভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অমৃত জ্ঞানকে বুঝতে হবে, শুধুমাত্র গীতা পড়লেই আত্ম-কল্যাণ সম্ভব নয়, এর অমৃত জ্ঞান বুঝে সেই অনুসারে নিজে ধার্মিক ক্রিয়া-কর্ম করলে তবেই তিন প্রকারের লাভ প্রাপ্ত হয়, যা গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ এ যে সুখ প্রাপ্তি, সিদ্ধি-শক্তি প্রাপ্তি এবং পরম গতি অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বলা হয়েছে।

এখন আবার সেই প্রসঙ্গের উপর চর্চা করবো, যা প্রশ্ন কর্তা জানতে চেয়েছেন এই যে "গীতায় জ্ঞানদাতা ব্যতীত অন্য পূর্ণ পরমাত্মা এবং গীতা জ্ঞানদাতা নিজেকে ছেড়ে অন্য কোন পরমেশ্বরের শরণে যাওয়ার কথা বলেছেন?

উত্তর চলছে……এটাতো পূর্বেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, "পরম অক্ষর ব্রহ্ম তো গীতা জ্ঞানদাতা ব্যতীত অন্য কেউ, গীত অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে ওই পরমেশ্বরের (পরম অক্ষর পুরুষের) শরণে যাবার জন্য গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং বলেছেন। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২৮, গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৬ - ৭ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে ঐ পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্তির জন্য আমার ভক্তিও করা হয়ে থাকে, যেমন গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ উল্লেখিত "ওম্ (ওঁ) তত্ সত্" এই তিন প্রকার নাম পরম অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্তির জন্য। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ তে গীতা জ্ঞানদাতা নিজের সাধনা করার জন্য কেবল এক অক্ষর বিশিষ্ট "ওম্"(ওঁ) নাম বলেছেন। পূর্ণ পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য "ওম্"(ওঁ) নামের জপও সাধককে করতে হয়। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২৮ এ বলা হয়েছে যে:-যে সমস্ত যোগী অর্থাৎ ভক্তরা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা এই রহস্য সম্পর্কে অবগত হয়ে বেদ অনুসারে ভক্তি করে বা যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠান করে এবং তপ অর্থাৎ শারীরিক-মানসিক কষ্ট সহ্য করেও নিজের ধর্ম-কর্মে দৃঢ় থেকে তপস্যা ও দান করার প্রতিফলে যে পুণ্য লাভ হয় অর্থাৎ ধার্মিক কর্মে যে পুণ্য প্রাপ্তি হয়, সেই ফলকে যে উলঙ্ঘন (অত্যেতি) করে যায় অর্থাৎ ত্যাগ করে যায়, সে (আদ্য) সনাতন (পরম্) অন্য = দ্বিতীয় (স্থানম্) ধামকে প্রাপ্ত করে।

গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৬ এ বলেছে যে, (মত্মরাঃ = মত্ পরাঃ) আমার থেকে অন্য পরমাত্মার ভক্তি করা ভক্তগণ আমার ভক্তির অন্তর্গত সকল প্রকার ভক্তি কর্ম আমাকে অর্পণ করে আমার উপর ছেড়ে দেয়। যারা সেই অনন্য ভক্তি দিয়ে

আমাকে ছেড়ে অন্য পরমাত্মার ভজনা করে।

গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ৭ এ বর্ণিত আছে যে, হে অর্জুন! যে আমার প্রতি মন দিয়েছে, যে আমাকে ভালোভাবে জেনে (আবেশিত) আবেগের সাথে (চেতাসাম্) আমাকে চিনে গেছে, আমাকে জেনে গেছে। সেই সমস্ত ভক্তদেরকে আমি শীঘ্রই সংসার সমুদ্র থেকে (সম্ উদ্ধর্তা = সমুদ্ধর্তা) একই রকম ভাবে উদ্ধার করে দিই। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬ তে বলা হয়েছে যে:-

সর্বধর্মান পরিতয্যম মাম্, একম শরণম্ ব্রজ।

অহম্ ত্বা সর্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

অন্য অনুবাদ কর্তারা এই গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬ এর যে অনুবাদ করেছে, অন্য অনুবাদকরা গীতার এই শ্লোকের অনুবাদ ভুল করেছেন, যেমন :- সম্পূর্ণ ধর্মকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ কর্মকে আমাকে দিয়ে (ত্যাগ করে) তুই শুধু সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের রূপ আমার শরণে (ব্রজ) আয়। আমি তোকে সম্পূর্ণ পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, তুই শোক করিস না।

বিশ্লেষণ :- এখানে অনুবাদ করেছেন যে সম্পূর্ণ ধর্মকে অর্থাৎ কর্তব্য ও কর্মকে আমাকে দিয়ে (ত্যাগ) করে তুই শুধু সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের রূপ আমার শরণে (ব্রজ) আয়। এই অনুবাদ সঠিক নয়।

বিচার করুন :- গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬, ৬২, অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ এবং ১৭ তে অন্য কাউকে সর্বশক্তিমান সকলের আধার পরমাত্মা বলা হয়েছে, যাকে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ এ পরম অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এখানে গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬ তে অনুবাদ কর্তা নিজের ভাবনা অনুসারে মহিমান্বিত করেছেন, যা ব্যর্থ। আবারও বলেছেন যে সম্পূর্ণ কর্ম ফল আমাকে দিয়ে আমার শরণে চলে আয়, এটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। যদি কেউ বলেন - সমস্ত কর্ম আমাকে দিয়ে আমার শরণে চলে আয়, এটাতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, সকল ধার্মিক কর্মের ভক্তি ধন আমাকে দিয়ে অন্যের শরণে চলে যা। এমনিতেই "ব্রজ" শব্দের অর্থ "যাওয়া" হয়, "আসা" অর্থ করা কখনো হতে পারে না। যেমন, ইংরেজিতে "Go" শব্দের অর্থ যাওয়া হয়, এর অর্থ "আসা" করা কখনো উচিত নয়। আবার অন্য প্রমাণ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৭ এ অর্জুন বলেছিলেন ," আমি আপনার শিষ্য, আমি আপনারই শরণে আছি,আমাকে উচিত শিক্ষা দিন।" তারপর গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩ এ বলেছেন, "তুই আমার ভক্ত এবং সখাও তুই।" এখানে গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬তে এই অনুবাদ করা একেবারেই ভুল যে "আমার শরণে চলে আয়" কারণ অর্জুন তো আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের শরণে ছিলেন, যা উপরে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়ার কারণে অনুবাদ কর্তারা অর্থের অনর্থ করে রেখেছেন।

গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে বলেছেন যে "ওই পরমেশ্বরের শরণে যা, ওই পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি এবং সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত করবি"। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬ এ বলেছেন যে "যে পরমেশ্বর থেকে সমস্ত

প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যাঁর থেকে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, সেই পরমেশ্বরের ভক্তি নিজের স্বাভাবিক কর্ম করতে করতে করলে মনুষ্য পরম সিদ্ধি লাভ করে"। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে স্পষ্ট আছে যে, এই অধ্যায়ের শ্লোক ১৬ তে বলা দুই পুরুষ (ক্ষরপুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ) থেকে অন্য কেউ হলেন উত্তম পুরুষ যাকে পরমাত্মা বলা হয়। ওই পরমাত্মাই তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ পোষণ করেন। তিনিই বাস্তবে অবিনাশী পরমাত্মা। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বলা হয়েছে যে,তত্ত্বদর্শী সন্তের শরণ পাওয়ার পর পরমেশ্বরের ওই পরম পদের খোঁজ করা উচিত,যেখানে যাওয়ার পর সাধক আর পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসেন না। যে পরমেশ্বর থেকে এই সংসার রুপী বৃক্ষের প্রবৃত্তি বিস্তার হয়েছে,সেই পরমেশ্বরের ভক্তি করো।

গীতা জ্ঞানদাতা নিজের স্থিতি সম্পর্কে গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ এ সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে,"হে! অর্জুন তোর আর আমার অনেক জন্ম অতিবাহিত হয়েছে, পরেও হতে থাকবে,এই বিষয়ে তুই জানিস না কিন্তু আমি জানি।" যে প্রভু স্বয়ং জন্ম মৃত্যুতে তিনি কিভাবে অবিনাশী হতে পারেন। সুতরাং ওই প্রভুর উপাসকেরাও জন্ম মৃত্যুর চক্রে থাকবে। ব্রহ্মের সাধকরা সেই মুক্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত করতে পারবে না, যা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বলা হয়েছে যেখানে যাওয়ার পর পুনরায় আর জন্ম হয় না। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬ টির সঠিক অনুবাদ এই প্রকার:- "সর্বধর্মান" আমার উপাসনার সমস্ত ধার্মিক কর্ম এবং তার ভক্তিধণ আমাকে (মাম্) ত্যাগ করে (পরিত্যাজ্য) অর্থাৎ তুই কেবল এক (একম্) যার সমান দ্বিতীয় কেউ নয়, সেই অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের (শরণম) শরণে (ব্রজ) যা। (অহম্ ত্বা) আমি তোকে (সর্বপাপেভ্যঃ) সম্পূর্ণ পাপ থেকে (মোক্ষয়িষ্যামি) মুক্ত করে দেব, (মাশুচঃ) তুই শোক করিস না। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬ তে গীতাজ্ঞান দাতা বলেছেন যে, "আমার উপাসনার যে মন্ত্র আছে তার ভক্তি কামাঈ (ধন) আমাকে দিয়ে (ত্যাগ করে) তুই কেবল ওই এক যার সমান অন্য শক্তি নেই, সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের শরণে যা, আমি তোকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেবো, তুই শোক করিস না। (গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬)।

বিশ্লেষণ :- গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ গীতা জ্ঞানদাতা সংকেত দিয়েছেন যে, ওই (ব্রাহ্মণ:) সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্তির জন্য একমাত্র "ওঁ তৎ সৎ" এই তিন মন্ত্রের জপ আছে। এই মন্ত্রের জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ তে নিজের উপাসনার মন্ত্রের বিষয়ে বলেছেন যে, "আমি ব্রহ্ম আমার ভক্তির জন্য একমাত্র ওম অক্ষরের মন্ত্র আছে। যে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে চলে যায় সে আমার পরমগতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। "ওঁম" জপ ব্রহ্মের, এই জপে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, ওম জপের ফলে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পরমগতি লাভ হয়। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে ওম নামের জপে হওয়া পরমতিকে অনুত্তম অশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোক আছে, সেই সমস্ত লোকে যাওয়া সাধক পুনরাবর্তীতে আছে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত যাওয়া সাধক ও পুনরায় জন্ম মৃত্যুতে

থাকে। এইজন্য উপরোক্ত গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬, ৬২, ৬৬ অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এবং ১৭ তে কোনো সমর্থ পরমেশ্বরের শরণে যাওয়ার জন্য বলেছেন। তাঁর জপ মন্ত্র হল "ওঁ তৎ সৎ" (গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ এই তিন মন্ত্র আছে)। এই মন্ত্রে যে "ওঁম" নাম আছে তা ব্রহ্মের জপ মন্ত্র। এই ব্রহ্মকে গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে ক্ষর পুরুষ বলা হয়েছে এবং অপরজনকে অক্ষর পুরুষ বলা হয়েছে। এই অক্ষর পুরুষের জপ মন্ত্র হল 'তত্' যা সাংকেতিক এবং গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭তে বলা হয়েছে যে "উত্তম পুরুষ তু অন্য:" অর্থাৎ পুরুষোত্তম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব শক্তিমান পুরুষ তো এই ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ থেকে ভিন্ন অন্য কেউ যার মন্ত্র 'সৎ',এটিও সাংকেতিক। ওই পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে সাধু ভাষায় 'সত্যপুরুষ' বলা হয়। ওই সত্য পুরুষের পরম পদ অর্থাৎ সনাতন পরম ধামকে সাধু ভাষায় সতলোক বলা হয়, যেখানে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ পূর্ণ মুক্তি (মোক্ষ) পাওয়ার জন্য গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ বলা "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রের জপ করতে হবে। তাছাড়া অন্য কোনও নাম জপে পূর্ণ মুক্তি (মোক্ষ) পাওয়া যাবে না। "তৎ সৎ" এই দুটি অন্য মন্ত্র যা দীক্ষা দেওয়ার সময় উপদেশীকে দেওয়া হয়। 'ওঁ' নামের জপ ব্রহ্ম = ক্ষর পুরুষের,যিনি গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং। ওনার উপাসনার মন্ত্র 'ওঁ' এই ওঁম্ নাম জপের কামাই অর্থাৎ ধার্মিক কর্ম ব্রহ্মকে ত্যাগ (উৎসর্গ) করতে হয়। পূর্বে আমরা তত্ত্বজ্ঞান না জানার কারণে 'ওম' নামের জপ (ভক্তি ধন) ব্রহ্মলোকে গিয়ে সমাপ্ত করে ফেলতাম, যার ফলে পাপকর্ম অর্থাৎ ঋণ (Loan) অবশিষ্ট রয়ে যেত। এই পাপকর্ম ভোগের জন্য নরকে এবং ৮৪ লক্ষ প্রকার প্রাণীর শরীরে কষ্ট পেতে হত।

এখন আমরা 'ওঁম' নাম জপের ভক্তি ধন ব্রহ্মকে উৎসর্গ করে দেব, এর ফল ব্রহ্মলোকে ভোগ করবো না। যার জন্য ক্ষর পুরুষ আমাদের সমস্ত পাপ থেকে অর্থাৎ এই লোকের সমস্ত ঋণ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে দেবেন। এটাই গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬ এর যথার্থ ভাবার্থ। তারপর আমরা 'তৎ' মন্ত্রের জপের ফল অক্ষর পুরুষকে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে (গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অপরজন) উৎসর্গ করে দেব। কারণ পর ব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের এর উপর দিয়ে আমাদের সনাতন পরমধাম (সতলোকে) যেতে হবে। তাই তার লোক দিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের ভাড়া অর্থাৎ ট্যাক্স (Toll tax) দিতে হবে। এইজন্য আমরা 'তৎ' মন্ত্রের জপের ফল অক্ষর পুরুষকে উৎসর্গ করে দেব। তারপর যে 'সৎ' মন্ত্র আছে তা সত্য পুরুষের (পরম অক্ষর ব্রহ্মের) জপ মন্ত্র। এই মন্ত্র জপের কামাই ভক্তি ধন নিয়ে আমরা পরমেশ্বরের ওই পরম পদ অর্থাৎ সনাতন পরম ধাম যাকে সতলোক বলা হয় তা প্রাপ্ত করব, যেখানে যাওয়ার পর সাধক আর কখনো এই সংসারে ফিরে আসে না, পরম শান্তি অর্থাৎ পূর্ণ মুক্তি (মোক্ষ) পদ লাভ করে।এই সম্পূর্ণ ভক্তি সাধনা আমার (সন্ত রামপাল দাসের) কাছে আছে, আসুন এবং নিজের আত্মকল্যাণ করান।

এটি গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬ এর সঠিক অনুবাদ। এই জন্য বলা হয়েছে যে "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত"। উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণ হয় যে পূর্ণ পরমাত্মা হলেন গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অন্য কোন প্রভু। এই জন্য গীতা জ্ঞানদাতাও ওই পূর্ণ পরমাত্মার শরণে যেতে (গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২, ৬৬ তে) বলেছেন। এই অমূল্য

গীতা জ্ঞানকে সঠিকভাবে না বুঝে অজ্ঞানী ব্যক্তিরা উল্টো অর্থ করে রেখেছেন, ওনারা লিখেছেন যে গীতা জ্ঞানদাতা তার নিজের শরণে আসতে বলেছেন।

যেমন এক ব্যক্তি কোনও কাজের জন্য এক মন্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে,"আমার কাজটি করে দেন"। যদিও কাজটি ছিল মুখ্যমন্ত্রী স্তরীয় তাই বুদ্ধিমান মন্ত্রী মশাই ওনাকে ভ্রমিত না করে বলেন, "আপনার এই কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়, যদি আপনি এই কাজ করাতে চান তাহলে আপনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যান, ওনার কৃপায় আপনার সমস্যার সমাধান হতে পারে"। ওই মন্ত্রী এই কথা একটি চিঠিতে লিখে বলেছেন,"আমি এই চিঠিতে যা লিখে দিয়েছি তাই করুন"। ওই চিঠিতে লেখা আছে আপনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যান, ওনার কৃপায় আপনার কাজ বা সমস্যার সমাধান হবে। যদি কোনও ব্যক্তি ওই চিঠির উল্টো অর্থ করে বলে যে মন্ত্রী মশাই মুখ্যমন্ত্রীর শরণে নয়,নিজের শরণে আসার জন্য বলেছেন,তাহলে সেই ব্যক্তি এর ভুল অর্থ করছে। কারণ ব্যক্তিটি মন্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে। সেই প্রকার এই গীতার অমৃত জ্ঞানকে না বুঝে অজ্ঞানি গুরুরা 'ভুল ভাল' অনুবাদ করে পাঠকদের ভ্রমিত করেছেন এবং শিষ্য সহ নিজেরাও কালের জালে ফেঁসে জন্ম মৃত্যুর চক্রে রয়ে যান। এইসব অজ্ঞানী গুরু, সন্ত, মহন্তদের আমরা পূর্ণ বিদ্বান এবং গীতা মনীষী মনে করি।গীতা জ্ঞান - কে দিয়েছিলেন তা পূর্বে প্রশ্ন উত্তরে স্পষ্ট ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, পড়ুন ১ নং প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন ২৭:- পরমাত্মা সাকার না নিরাকার? অব্যক্ত কথার অর্থ নিরাকার হয় কি?

উত্তর :- পরমাত্মা সাকার,নর স্বরূপ অর্থাৎ মানুষের মতো আকার যুক্ত। অব্যক্ত কথার অর্থ নিরাকার নয়, সাকার হয়। যেমন সূর্যের সামনে মেঘ এসে ঢেকে দেয়, ঠিক সেই সময় সূর্য অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। আমরা দেখা না পেলেও সূর্য কিন্তু অব্যক্ত অর্থাৎ সাকারে আছে। যে প্রভু আমাদের সামান্য সাধনায় দেখা দেন না, তাকে অব্যক্ত বলা হয়।

যেমন গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪-২৫ এ গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং নিজেকে অব্যক্ত বলেছেন কারণ তিনি শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে গীতা জ্ঞান বলছিলেন। যখন ব্যক্ত হলেন তখন বিরাট রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। ইনি হলেন প্রথম অব্যক্ত প্রভু যাকে ক্ষরপুরুষ বলা হয়। এনাকে কালও বলা হয়। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭-১৯ পর্যন্ত দ্বিতীয় অব্যক্ত অক্ষর পুরুষের বিষয়ে উল্লেখ আছে। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০ তে বলা হয়েছে যে এই অব্যক্ত অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ অপেক্ষা অন্য সনাতন অব্যক্ত পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম অক্ষর পুরুষ আছেন। এইভাবে এই তিনজন সাকার (নরাকার) প্রভু আছেন। অব্যক্ত কথার অর্থ নিরাকার নয়। ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আমি কখনো কাউকে নিজের বাস্তবিক রূপে দর্শন দেব না।

প্রমাণ :- গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭ - ৪৮ এ বলেছেন,"হে অর্জুন! আমার এই বিরাট রূপ তুই ছাড়া অন্য কেউ কখনো দেখেনি, আমি তোকে অনুগ্রহ করে এই রূপ দেখিয়েছি।"

গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৮ এ বলেছেন,"আমার এই স্বরূপ না তো বেদে

বর্ণিত বিধিতে, না জপ করে, না তপস্যা করে আর না-ই বা যজ্ঞ আদি ক্রিয়া করে দেখা সম্ভব। এই থেকে সিদ্ধ হয় যে ক্ষর পুরুষকে (গীতা জ্ঞানদাতাকে) অর্জুন ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনো ঋষি, মহর্ষি ও সাধক দেখেনি। যার কারণে সবাই একে নিরাকার মেনে নিয়েছে। এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বেদে (তত্ত্বজ্ঞানে) বলা হয়েছে যে

"খোজত খোজত থাকিয়া, অন্ত মেঁ কহা বেচুন।

"ন গুরু পুরা ন সাধনা, সত্য হো রহে জুনমঁ-জুন॥"

এখন গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪-২৫ এ গীতা জ্ঞানদাতা স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন, "আমি নিজের যোগ মায়ার দ্বারা লুকিয়ে থাকি, কারো সম্মুখে আসি না, আমি অব্যক্ত থাকি।" লুকিয়ে থাকেন মানে তিনি নিঃসন্দেহে সাকার। অক্ষর পুরুষ ও অব্যক্ত, এ বিষয়ে উপরে পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রভুর (ক্ষর পুরুষের) এখানে কোন ভূমিকা নেই। ইনি নিজের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সীমিত আছেন। এই জন্য এনাকে কেউ কখনো দেখেনি।

পরম অক্ষর পুরুষ :- অনাদির আদি এই প্রভুর ভূমিকা সর্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান। ইনি সতলোকে থাকেন যা কালের একুশ ব্রহ্মাণ্ড থেকে ১৬ শঙ্খ ক্রোশ দূরে।(এক ক্রোশ=প্রায় তিন কি.মি. হয়) এই প্রভু প্রাপ্তির সাধনা বেদে (চার বেদে) বর্ণিত নেই। যার কারণে এই প্রভুকে কেউ কখনো দেখেনি। যখন এই প্রভু (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) পৃথিবীতে সশরীরে প্রকট হন তখন কেউ এনাকে চিনতে পারে না। তাই পরমাত্মা বলেছেন -

"হম হী অলখ আল্লাহ হৈঁ, কুতুব গোস ঔর পীর।

গরীব দাস খালিক ধনী, হামরা নাম কবীর॥"

"আমি পূর্ণ পরমাত্মা, আমিই হলাম পীর অর্থাৎ সত্য জ্ঞান প্রদানকারী সতগুরু সকল সৃষ্টির মালিক আমি স্বয়ং, আমার নাম হল কবীর।" কিন্তু সকল সাধকগণ, ঋষি-মহর্ষিগণ তাদের হৃদয়ে এই জ্ঞান দৃঢ় করে রেখেছেন যে পরমাত্মা তো নিরাকার, তাকে দেখা তো সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে চলাফেরা করা জোলা (তাঁতি) কবীর একজন সাধারন কবি। সে কিভাবে পরম অক্ষর ব্রহ্ম হতে পারে?

এর সমাধান এরূপ :- এই বিশ্বতে পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করতে চাই এমন বুদ্ধিমান ব্যাক্তিদের প্রত্যেকেই চারবেদ (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ) কে মান্য করেন। বর্তমানে আর্য সমাজের প্রবর্তক মহর্ষি দয়ানন্দকে বেদের পূর্ণ বিদ্বান মানা হয়। এই মহর্ষিরও এই উক্তি যে পরমাত্মা নিরাকার। আর্য সমাজ এবং মহর্ষি দয়ানন্দ বেদের জ্ঞানকে সত্য মনে করেন। ইনি নিজেই হিন্দি ভাষায় বেদকে অনুবাদ করেছেন, যেখানে সুস্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে পরমাত্মা উপরের লোকে থাকেন। সেখান থেকে দ্রুতগতিতে (সশরীরে গমন করে) পৃথিবীতে চলে আসেন। ভালো আত্মাদের সাথে সাক্ষাৎকার করেন এবং তাদেরকে যথার্থ ভক্তি জ্ঞান শোনান। পরমাত্মা তত্ত্ব জ্ঞানকে নিজের মুখ কমলের দ্বারা উচ্চারণ করে করে লোকোক্তি, সাখীঁ,শব্দ দোঁহা এবং চতুষ্পদ শ্লোক রূপে পদ্য আকারে বলেন। যার কারণে তিনি প্রসিদ্ধ কবি উপাধিও লাভ করেন। পরমাত্মা কবিদের মতো আচার-আচরণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করেন এবং আধ্যাত্মিক গুপ্ত মন্ত্রের আবিষ্কার করে ভক্তদেরকে

প্রদান করেন। ভক্তি করার জন্য প্রেরণা যোগান।

প্রমাণের জন্য দেখুন নিম্নে প্রদত্ত বেদ মন্ত্রের ফটোকপি যা এই পুস্তকের 100 নম্বর পৃষ্ঠায়।

ঋকবেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬-২৭, ঋকবেদ মন্ডল নং সুক্ত ৮২ মন্ত্র ১-২, ঋগ্বেদ মণ্ডল নং ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬ থেকে ২০, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৯৫ মন্ত্র ২, ঋগ্বেদ মন্ডল নং সুক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ২০ মন্ত্র ১, এছাড়া আরো অনেক বেদ মন্ত্রে উপরোক্ত প্রমাণ দেওয়া আছে যে পরমাত্মা মানব সদৃশ্য নরাকার।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এবং ৩৪- এ একই প্রমান আছে। গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন,"হে অর্জুন! পরম অক্ষর ব্রহ্ম নিজ মুখ কমলের দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান বলে শোনান। এই সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্মের বাণীতে সম্পূর্ণ যজ্ঞের অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। ওই কথা (তত্ত্বজ্ঞান) জানতে পারলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আবার গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এ বলেছেন,"ওই জ্ঞান তুই তত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে জান।" তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বিনম্রভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সেই তত্তদর্শী সন্ত তোকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

এই প্রমাণ আপনাদেরকে বললাম, আরও একটি বিশেষ বিষয় হল গীতাই চারবেদের সারাংশ। এর মধ্যে সাংকেতিক জ্ঞান অধিক। এছাড়া এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে গীতার মধ্যে সেই তত্ত্বজ্ঞান গীতা জ্ঞান নেই, সেই তত্ত্বজ্ঞান গীতা জ্ঞান থেকে ভিন্ন। সেই জ্ঞান তো কেবল তত্ত্বদর্শী সন্তই জানেন, যাকে পরম অক্ষর ব্রহ্ম স্বয়ং ধরিত্রীতে এসে সাক্ষাৎকার করে গেছেন।

প্রশ্ন ২৮ :- কোন্ কোন্ পুন্যাত্মাদের, মহাত্মাদের সাথে পরমাত্মা দেখা করেছিলেন?

উত্তর :- পরমাত্মা চার যুগে প্রকট হয়ে তত্ত্বজ্ঞান শোনান।

১.সত্য যুগে 'সত্য সুকৃত' নামে প্রকট হয়েছিলেন।

২.ত্রেতা যুগে 'মুণীন্দ্র' নামে।

৩.দ্বাপর যুগে 'করুণাময়' নামে এবং

৪.কলিযুগে 'কবীর' নামে পূর্ণ পরমেশ্বর প্রকট হয়েছিলেন। সূক্ষ্ম বেদে বলা হয়েছে :- সতযুগ মেঁ সতসুকৃত কহ টেরা, ত্রেতা নাম মুনীন্দ্র মেরা।

দ্বাপর মেঁ করুণাময় কাহায়া, কল যুগ নাম কবীর ধরায়া॥

"কে কে পেয়েছিলেন পরমাত্মাকে?"

কলিযুগে পরমেশ্বর যে সমস্ত মহান আত্মাদের কে সাক্ষাৎকার করেছিলেন এবং তত্ত্ব জ্ঞান বলেছিলেন তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করছি :-

"সন্ত ধর্ম দাসের সাথে কবীর পরমেশ্বর -এর সাক্ষাৎকার"

১. শ্রী ধর্মদাস বণিক জাতির একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড়

নিবাসী এই ব্যক্তি খুব ধনী ছিলেন। ছোটবেলা থেকে তিনি ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন যার কারণে তিনি রুপ দাস নামের এক বৈষ্ণব সাধুকে গুরু ধারন করে রেখেছিলেন। হিন্দু ধর্মে জন্ম হওয়াতে গুরু রুপদাস তার শিষ্য ধর্মদাসকে রাম-কৃষ্ণ, বিষ্ণু এবং শিবের ভক্তি করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া একাদশীর ব্রত, তীর্থ ভ্রমণ করা, শ্রাদ্ধ কর্ম এবং পিন্ডদানের সমস্ত ক্রিয়া করতে বলেছিলেন। গুরু রূপদাসের বলা ভক্তি সাধনা ধর্মদাস খুব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। একদিন গুরুদেব রূপদাসের কাছ থেকে আজ্ঞা নিয়ে ধর্ম দাস মথুরা নগরীতে তীর্থ দর্শন তীর্থস্নান করার জন্য এবং গিরিরাজ (গোবর্ধন) পর্বত পরিক্রমা করার জন্য যাত্রা করেছিলেন। সেই সময় পরম অক্ষর ব্রহ্ম একজন জিন্দা মহাত্মার বেশ ধারণ করে মথুরাতে ধর্মদাসের সাথে সাক্ষাৎকার করেন। বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ যে পুকুরে স্নান করতেন, ধর্মদাসও সেই পুকুরে স্নান করে একটি পিতলের ঘটি ভরে জল এনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতলের (শালিগ্রামের) মূর্তির চরণে ঢেলে তা ধুয়ে অন্য পাত্রে ঢেলে চরণামৃত বানিয়ে পান করেন। তারপর শালিগ্রামকে স্নান করিয়ে নিজের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ করেন এবং কিছু জায়গা গোবর দিয়ে লেপন করে তার উপর পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা পাঠ করতে বসেন। এই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম যখন ধর্মদাস করছিলেন তখন দূরে দাঁড়িয়ে মনোযোগ সহকারে জিন্দা বেশধারী পরমাত্মা সবকিছু দেখছিলেন। ধর্মদাস যখন দেখলেন যে এক মুসলমান সন্ত তার ক্রিয়া কর্ম মনোযোগ সহকারে দেখছেন তখন ভাবলেন নিশ্চয়ই ওই সন্ত হিন্দু সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাই ধর্মদাস কিছুটা উচ্চস্বরে গীতা পাঠ শুরু করেন এবং সেই সাথে তার হিন্দি অনুবাদও করতে লাগলেন। এবার জিন্দা বেশধারী পরমেশ্বর সেখান থেকে উঠে এসে ধর্মদাসের নিকটে এসে বসে পড়লেন। ধর্মদাস দেখলেন তার অনুমান সঠিক, সত্যি সত্যিই জিন্দা বেশধারী বাবা আমাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এই জন্য ওই দিন ধর্মদাস শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার আরো কয়েকটা অধ্যায় পড়ে তার অনুবাদ পড়ে শোনান। যখন ধর্মদাসের নিজের দৈনন্দিন ভক্তি কর্ম শেষ হয়ে যায়। তখন পরমাত্মা বলেন, "হে মহত্মা জী! আপনার শুভ নাম কি? আপনি কোন জাতির? আপনি কোথাকার নিবাসী? আপনি কোন ধার্মিক পন্থের সাথে যুক্ত? কৃপা করে বলুন। আপনার জ্ঞান আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে, আমাকেও কিছু ভক্তির জ্ঞান শোনান।"

ধর্ম দাস উত্তর দিলেন :- "আমার নাম ধর্মদাস। আমি বান্ধবগড় গ্রামের বণিক বংশের নিবাসী। আমি বৈষ্ণব পন্থ থেকে দীক্ষিত। হিন্দু ধর্মে আমার জন্ম। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে এবং ভালোভাবে জ্ঞান বুঝে বৈষ্ণব পন্থ্ থেকে দীক্ষা নিয়েছি। আমার গুরুদেবের নাম শ্রীরূপ দাস। আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ। অন্য কেউ আমাকে কখনো ভ্রমিত করতে পারবে না। আমি শ্রীবিষ্ণুর অবতার রাম-কৃষ্ণকে এবং ভগবান শঙ্করেরও পূজা করি। আমি একাদশীর ব্রতও রাখি। এ ছাড়া তীর্থ ধামে যায়, সেখানে দান করি, প্রতিদিন শালিগ্রামের পূজা করি। এই পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার নিত্য পাঠ করি। আমি আমার পূর্ব পুরুষদের যাঁরা স্বর্গবাসী হয়েছেন তাদের শ্রাদ্ধ করি এবং পিন্ডদান করি। আমি কোনো জীব হিংসা করি না, এমনকি মাংস, মদিরা তামাক সেবন

করি না।" কবীর পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন,"আপনি এখন যে গ্রন্থ পাঠ করছিলেন তার নাম কি?"

ধর্মদাস বললেন,"আমি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা পাঠ করছিলাম। আমি সর্বদা শুদ্ধ থাকি কখনো শুদ্রদের কাছে আসতে দিই না।"

প্রশ্ন ২৯ (জিন্দা বাবা রূপে কবীর পরমেশ্বর):- আপনি কি নাম জপ করেন?

উত্তর (ধর্মদাস):- আমি প্রতিদিন হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরে-হরে, ওম নমঃ শিবায়, ওম ভগবতে বাসুদেবায় নম:, রাধে-রাধে শ্যাম মিলাদে, গায়ত্রী মন্ত্রের জপ ১০৮ বার করে করি। এছাড়া বিষ্ণু সহস্র নামের জপও করি।

প্রশ্ন ৩০ (জিন্দা বাবা) :- হে মহত্মা ধর্ম দাস! গীতার জ্ঞান কে দিয়েছেন?

উত্তর (ধর্মদাস) :- “সর্বশক্তিমান সব কুলের মালিক শ্রী বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন।”

প্রশ্ন ৩১ (জিন্দা বাবা রূপী পরমাত্মা) :- আপনার পুজ্য দেব শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু, তার দেওয়া ভক্তি জ্ঞানই হল গীতা শাস্ত্র।

হে ধর্মদাস! এক কৃষকের বৃদ্ধ অবস্থায় এক পুত্র সন্তান প্রাপ্তি হলো। কৃষক মনে মনে চিন্তা করে "আমার আমার এই পুত্রের বড় হয়ে কৃষিকাজ করার উপযুক্ত হওয়ার আগেই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে"। তাই কৃষক নিজের কৃষিকাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ একটি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে নিজের পুত্রকে বলেন,"পুত্র, যখন তুমি বড় হয়ে যাবে তখন তুমি আমার লেখা এই কৃষি কাজের বিবরণ বারবার পড়বে এবং সেই অনুসারে কৃষিকাজ করবে।" কিছুদিন পরে কৃষকের মৃত্যু হয়ে যায়, পুত্র প্রতিদিন পিতার লেখা কৃষিকাজের বিবরণ পাঠ করতে লাগে। কিন্তু কৃষিকাজে বীজ বপন করা, সেচাই করা প্রভৃতি সবকিছুই পিতার লেখা বিবরণের উল্টো করতে থাকে,তাহলে কি ওই কৃষক পুত্র কৃষি কাজে সফলতা প্রাপ্ত করতে পারবে ?

উত্তর (ধর্ম দাসের):- এইভাবে কার্য করলে ওই কৃষকপুত্র তো নির্ধন হয়ে যাবে, তাকে তো পিতার লেখা কৃষিকাজের বিবরণ অনুসারে প্রতিটি কাজ করা উচিত। এই কৃষক পুত্র তো মূর্খের মতো কাজ করছে।

প্রশ্ন ৩২ (জিন্দা বাবা রূপী ভগবানের):- হে ধর্মদাস! গীতাশাস্ত্র আপনার পরম পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর অনুভব এবং আপনার জন্য আদেশ এই যে গীতা শাস্ত্র তে লেখা তাঁর অনুভব পড়ে সেই অনুসারে ভক্তি করলে তবেই মুক্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত করবে। আপনি কি গীতায় লেখা শ্রী কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে ভক্তি করছেন? আপনার গুরুদেব আপনাকে যে মন্ত্র জপ করার জন্য দিয়েছেন তা কি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে লেখা আছে। (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, ওম নমঃ শিবায়, ওম ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ, রাধে রাধে শ্যাম মিলাদে, শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম। একাদশীর ব্রত, শ্রাদ্ধ কর্ম, পিণ্ডদান করা গীতা শাস্ত্রে কি উল্লেখ আছে?)

উত্তর (ধর্ম দাসের):- না, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কোনো আদেশ নেই।

প্রশ্ন ৩৩ (কবীর পরমেশ্বরের):- তাহলে আপনি তো ওই কৃষক পুত্রের মত কাজ করছেন। আপনিও সেই পিতার আদেশ অমান্য করে মনমর্জি বিধিতে কৃষিকাজ করে মূর্খতার প্রমাণ দিচ্ছেন। যাকে আপনি নিজেই মূর্খ বলছেন আপনি স্বয়ং চিন্তা করে দেখুন আপনি কি ওই কৃষক পুত্রের চেয়ে কোনো অংশে কম?

ধর্মদাস বললেন, "হে জিন্দা আপনি মুসলমান ফকির। তাই আপনি আমাদের হিন্দু ধর্মের ক্রিয়াকর্ম ও সাধনার মন্ত্রকে ভুল বলছেন।"

উত্তর (জিন্দা বেশধারী কবীর পরমেশ্বরের):- হে স্বামী ধর্মদাস! আমি নিজে থেকে কিছু বলছি না, আপনার ধর্মগ্রন্থই বলছে যে আপনার ধর্মের ধর্মগুরু আপনাকে শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমর্জি আচরণ করাচ্ছেন যা আপনার গীতার ১৬ নং অধ্যায়ের ২৩-২৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, হে অর্জুন! যে সাধক শাস্ত্র বিধিকে ত্যাগ করে ইচ্ছামত (মনমর্জি) আচরণ করে অর্থাৎ ইচ্ছামতো মন্ত্র জপ করে, মনমর্জি শ্রাদ্ধ কর্ম,পিন্ডদান এবং ব্রত আদি কর্মকাণ্ড করে, তার না কোনো সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, না কোন সুখ প্রাপ্তি হয় এবং না তার পরম গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয়। এইজন্য এগুলো সম্পূর্ণ ব্যর্থ। গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪-এ গীতাজ্ঞান দাতা বলেছেন, হে অর্জুন! তোর জন্য কর্তব্য অর্থাৎ যে ভক্তি কর্ম করা উচিত এবং অকর্তব্য (যে ভক্তি কর্ম করা উচিত নয়) তার ব্যবস্থা শাস্ত্রই প্রমাণ। ওই শাস্ত্র গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে শাস্ত্রতে বলা ভক্তি কর্ম করলে তবেই লাভ প্রাপ্ত হবে।

ধর্মদাস :- হে জিন্দা! তুই নিজের মুখ বন্ধ কর আমি আর শুনতে চাই না। জিন্দা রূপে উপস্থিত পরমেশ্বর বললেন, "হে বৈষ্ণব মহাত্মা ধর্মদাসজী ! সত্য সর্বদা নিম পাতার মতো তেতো লাগে কিন্তু রোগী ব্যাক্তিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পান করতে হয়। এই তেতো ঔষধি রোগীকে রোগ মুক্ত করে। যদি আমার কথাই আপনার রাগ হয় তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।" এই কথা বলে জিন্দা রুপধারী পরমাত্মা অন্তর্ধ্যান হয়ে গেলেন। এই দৃশ্য দেখে ধর্মদাস অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যান আর চিন্তা করতে লাগেন 'ইনি কোনো সাধারণ সন্ত নয়। ইনি মনে হয় পূর্ণ বিদ্বান ও সিদ্ধ পুরুষ। মুসলমান হয়েও হিন্দু শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান আছে। ইনি কোনো দেবতা হতে পারেন।' ধর্মদাস মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, "সত্যিই তো আমি গীতা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করছি।" কিন্তু অহংকারের বশবর্তী হয়ে হয়ে সত্যকে স্বীকার করছিলেন না। যখন পরমাত্মা অন্তর্ধ্যান হয়ে গেলেন তখন ধর্মদাস সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে বলতে লাগলেন, "আমার ভক্তি গীতা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। আমি ভগবানের আদেশ অমান্য করছি। আমার গুরুদেব শ্রীরূপদাসেরও বাস্তবিক ভক্তিবিধির জ্ঞান নেই। এখন তো এই ভক্তি করা বা না করা দুটোই সমান অর্থাৎ ব্যর্থ।" অত্যান্ত দুঃখী হয়ে ধর্মদাস এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন আর হৃদয় থেকে বলতে লাগলেন, "আমি খুব নির্বোধ। সকল সত্য প্রমাণ দেখেও এক পরমাত্মা তুল্য মহাত্মাকে নিজের অজ্ঞানতা এবং জেদের কারণে হারিয়ে ফেললাম। হে পরমাত্মা! আরেকবার ওই তত্ত্ব জ্ঞানী সন্তের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন। আমি আমার অহংকার ত্যাগ করে বিনম্রভাবে সমস্ত সত্য জ্ঞান শুনবো।" ধর্মদাস সারাদিন ব্যাকুল হয়ে ঘুরে ফিরে সন্তের দেখা না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে রাত্রিতে শুয়ে পড়লেন। সারারাত না ঘুমিয়ে এ পাস ও পাস করতে থাকেন আর মনে মনে ভাবতে

থাকেন "হে পরমাত্মা! এটা কি হয়ে গেল, এখন আমি কি করি, সকল সাধনা তো আমি শাস্ত্রবিরুদ্ধ করছি। ওই দেবদূত তো আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমার বয়স এখন ৬০ বছর হয়ে গিয়েছে, জানিনা ওই দেবতার (জিন্দাবাবার) দেখা আবার পাবো কিনা।" পরের দিন সকালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলেন। ঐদিন কোনো ভক্তি ক্রিয়া না করে প্রথমে ভোজনের জন্য রান্না শুরু করলেন। রান্নার জন্য আগের দিন কিছু কিছু কাঠ এনে রেখেছিলেন। সেগুলো আগুনে জ্বালিয়ে রান্না করতে লাগলেন। তার মধ্যে একটি মোটা গাছের ডালের ভিতরের অংশ ফাঁপা ছিল, সেখানে অনেক পিঁপড়ের বাসা ছিল।

যখন এই কাঠ জ্বলতে জ্বলতে ছোট হয়ে গেল তখন তার পেছনের অংশ থেকে কিছু তরল পদার্থকে ধর্মদাস জ্বলতে দেখলেন। পিঁপড়ে গুলি প্রাণ বাঁচাতে বার হওয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু তারা ওই তরল পদার্থে পড়ে মারা যাচ্ছিল, কিছু পিঁপড়ে কাঠের উপর দিকে বেরোতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মরছিল। যখন ধর্মদাস এই দৃশ্য দেখলেন তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই কাঠ তো অনেকটাই জ্বলে গেছে, অনেক পিঁপড়েও জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছে সাথে সাথেই ধর্মদাস আগুন নিভিয়ে দিলেন আর ভাবতে লাগলেন, "এই পাপ যুক্ত ভোজন আমি খাব না, কোনো সাধু-সন্তকে ভোজন করিয়ে আমি উপবাস থাকব। এতে আমার পাপ কম হয়ে যাবে।" এই কথা ভেবে সব ভোজন একটি থালাতে রেখে সাধু-সন্তের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। কবীর পরমেশ্বর এক অন্য হিন্দু সাধুবেশ ধারণ করে একটি গাছের নিচে বসেছিলেন। ধর্মদাস যখন সাধুকে দেখতে পেলেন তখন তাঁর সামনে ভোজনের থালা রেখে বললেন, "হে মহাত্মা! আপনি ভোজন গ্রহণ করুন।" সাধু রূপধারী পরমাত্মা বললেন, "দাও ধর্মদাস! খুব ক্ষুধা পেয়েছে।" সাধুকে তার নিজের নাম ধরে সম্বোধন করতে দেখে ধর্মদাস অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন কিন্তু তেমন গুরুত্ব দিলেন না। সাধু রূপে বিরাজমান পরমাত্মা নিজের কমন্ডলু থেকে কিছু জল হাতে নিয়ে কিছু বানী উচ্চারণ করে থালাতে রাখা ভোজনের উপর ছিটিয়ে দিলেন। সাথে সাথেই সমস্ত ভোজন পিঁপড়েতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। পিঁপড়েতে থালা কালো হয়ে গেল এবং পিঁপড়ে গুলি নিজের ডিমগুলি মুখে নিয়ে থালা থেকে বাইরে বার হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। পরমাত্মাও আগের মত ওই জিন্দা মহাত্মার রূপ ধারণ করে নিলেন এবং বললেন, "হে বৈষ্ণব সাধু ধর্মদাস! আপনি তো বলেছিলেন যে আপনি কোন জীব হিংসা করেন না কিন্তু এখন দেখছি আপনার থেকে কসাইও অনেক ভালো, আপনি একসাথে কোটি কোটি জীবের হত্যা করেছেন।" একথা শুনে ধর্ম দাস তৎক্ষণাৎ জিন্দা বাবার চরণে শুয়ে পড়লেন এবং পূর্ব দিনে হওয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন হে প্রভু আমার মত অজ্ঞানীকে আপনি ক্ষমা করে দিন আমার তো সবকিছুই বৃথা কারণ আমার পূর্বে করা সাধনা সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্র বিরুদ্ধ এই সাধনা করে কোন লাভ হবে না, তা আপনি গীতা থেকে প্রমাণ করে দিয়েছেন। এখন আমি শাস্ত্র অনুসার সাধনা কোথায় গেলে পাব, তা কেবল আপনি বলতে পারেন। আমি এখন আপনার থেকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান শুনতে ইচ্ছুক। কৃপা করে এই দাসের উপর দয়া করুন, আমাকে সেই তত্ত্বজ্ঞান শোনান যাতে আমার মোক্ষ লাভ হয়।

"গীতা অনুসারে ব্রত (উপবাস) কেমন হয়?"

পরমেশ্বর (জিন্দা সাধুরূপে) বললেন :- হে ধর্মদাস! আপনি তো একাদশীর ব্রত পালন করেন কিন্তু শ্রীমৎ ভাগবত গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ১৬ তে নিষেধ করা আছে। হে অর্জুন! এই যোগ (ভক্তি) না তো অধিক ভোজনকারী ব্যক্তির জন্য আর না তো একেবারে অনাহারে থাকা ব্যক্তির জন্য অর্থাৎ এই ভক্তি না কোনো উপবাস (ব্রত) রাখা ব্যক্তির জন্য, না অধিক ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তির জন্য, না অধিক জেগে থাকা ব্যক্তির জন্য সফল হয়। এই শ্লোকে ব্রত রাখা সম্পূর্ণরূপে মানা করা আছে। দেখ নিজের গীতা খুলে। শ্রীধর্মদাসের তো গীতার শ্লোক গুলি মুখস্ত ছিল কারণ প্রতি দিন তিনি গীতা পাঠ করতেন, তারপরেও জিন্দা বাবার কথামতো গীতা খুলে ধর্মদাস অধ্যায় ৬ নং অধ্যায় ১৬ নং শ্লোক পাঠ করলেন এবং স্বীকার করে বললেন,"হে জিন্দাবাবা আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন আপনাকে তো পরমাত্মার স্বরূপ মনে হচ্ছে।"

"গীতা অনুসারে শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদান কেমন হয়?"

আপনি তো শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদানও করেন। এ বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৫ এ সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যারা ভূতের পূজা করে, তারা ভূতের যোনি প্রাপ্ত করে অর্থাৎ ভূত হয়ে যায়। শ্রাদ্ধ করা, পিন্ডদান করা এগুলি সব ভূত পূজার অন্তর্গত যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ সাধনা।

"শ্রাদ্ধ-পিণ্ড দানের বিষয়ে রুচী ঋষির বেদ মত (সিদ্ধান্ত)"

মার্কন্ডেয় পুরানে "রুচী ঋষির জন্ম" নামক একটি কাহিনীর উল্লেখ আছে। রুচী নামের এক ঋষি ছিলেন। তিনি ব্রহ্মাচর্য পালন করে বেদ অনুসারে সাধনা করছিলেন। উনি বিবাহ না করে সাধনাতে মনোযোগ দিয়েছিলেন। রুচী, ঋষির, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পিতর যোনিতে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট ভোগ করছিলেন। হঠাৎ একদিন রুচী ঋষির চারজন পূর্বপুরুষ প্রেত হয়ে রুচী ঋষিকে দর্শন দিয়ে বললেন, "পুত্র! তুমি বিবাহ কেন করনি ? তুমি বিবাহ করে আমাদের শ্রাদ্ধ করো।" তখন রুচী ঋষি উত্তর দেন, "হে পিতামহ! বেদ শাস্ত্রে এই শ্রাদ্ধ আদি কর্মকাণ্ডকে অবিদ্যা বলা হয়েছে, মূর্খের কার্য বলা হয়েছে। তাহলে আপনি আমাকে কেন এমন কর্ম করতে বলছেন?"

পিতরগণ (প্রেতগণ) বললেন,"এ কথা সত্য যে শ্রাদ্ধ আদি কর্মকাণ্ডকে বেদ শাস্ত্রে অবিদ্যা অর্থাৎ মূর্খের কার্যই বলা হয়েছে।" তারপর ওই পিতরগণ বেদ শাস্ত্র বিরুদ্ধে জ্ঞান শুনিয়ে রুচী ঋষিকে ভ্রমিত করে দেন কারণ মোহ মমতা হল অজ্ঞানতার মূল। মার্কন্ডেয় পুরাণের এই প্রকরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে বেদ শাস্ত্রে এবং বেদের সংক্ষিপ্ত রূপ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদান প্রভৃতি ভূত পূজার কর্মকাণ্ডকে নিষেধ করা হয়েছে যা করা কখনোই উচিত নয়। ওই ঋষির মূর্খ পূর্বপুরুষগণ নিজের বংশের পুত্রকে শ্রাদ্ধ কর্ম করার জন্য বিবাহ করতে বাধ্য করেন। তারপর রুচি ঋষি এক রৈচ্য নামের এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। শ্রাদ্ধ করে নিজে এবং নিজের পুত্রকেও পাপের ভাগী করেন।

আপনি যে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন তা যজুর্বেদ অধ্যায় ৩৬ মন্ত্র ৩ এ উল্লেখ আছে যার পূর্বে "ওম" অক্ষর নেই। যদি "ওম" অক্ষর এই বেদ মন্ত্রের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে পরমাত্মার অপমান হয় কারণ "ওম" অক্ষর তো ব্রহ্মোর জপ মন্ত্র কিন্তু যজুর্বেদ অধ্যায় ৩৬ মন্ত্র ৩ এ পরম অক্ষর ব্রহ্মোর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কোন অজ্ঞানী

ব্যাক্তি পত্রে লেখার সময় প্রধানমন্ত্রীর জায়গায় শ্রদ্ধেয় 'মুখ্যমন্ত্রী' লেখেন তাহলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর অপমান করছেন। এখন রইল কথা এই যজুর্বেদ অধ্যায় 36 মন্ত্র ৩ এ উল্লেখিত মন্ত্র যা বারবার জপ করার উপদেশ দেওয়া হয়, এই ক্রিয়া কখনোই মোক্ষদায়ক নয়। মন্ত্রের মূল পাঠ এইরকম :-

ভূর্ভব: স্ব: তত্ সবিতু বরেনিয়ম্ ভৃগো দেবস্য ধীমোহি ধীয়ো যো ন: প্রচোদয়াত।

অনুবাদ :- (ভূ:) স্বয়ম্ভু পরমাত্মা পৃথিবী লোককে (ভব:) গোলক প্রভৃতি অন্যান্য ভবন সমূহকে বচনশক্তিতে প্রকট করেছেন এবং (স্ব:) স্বর্গলোক প্রভৃতি সুখ দায়ী ধামকে সৃষ্টি করেছেন। (তত্) সেই (সবিতু:) সকল সৃষ্টির জনক হলেন পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা (বরেনীয়ম) সমস্ত সাধকের বরণের যোগ্য অর্থাৎ প্রভু প্রেমী আত্মাদের ভক্তির যোগ্য। (ভৃগো) তেজোময় অর্থাৎ প্রকাশমান (দেবস্য) পরমাত্মার (ধীমোহি) উচ্চ বিচার সম্পন্ন অর্থাৎ অত্যন্ত বিচক্ষণ ভাবে (ধী য়ো নঃ প্রচোদয়াত) যারা বুদ্ধিমানের মতো বিচার করে, সেই বিবেকশীল ব্যক্তিরা মুক্তির (মোক্ষের) অধিকারী হয়।

ভাবার্থ :- পরমাত্মা স্বয়ম্ভু, যিনি ভূমি গোলক প্রভৃতির এবং স্বর্গলোকের রচনা করেছেন। ওই তেজময় পরমেশ্বর এর ভক্তি শ্রেষ্ঠ ভক্তদের এই ভেবে করা উচিত যে, পুরুষোত্তম (সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু) সকল প্রভুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব সুখদাতা সেই প্রভুর ভক্তি করো।

উপরোক্ত মন্ত্রের এটাই বাংলা অনুবাদ এবং ভাবার্থ। এর সংস্কৃত অথবা হিন্দি অনুবাদ পাঠ করতে থাকলেও কখনো মোক্ষ লাভ হবে না কারণ এই মন্ত্র তো পরমাত্মার মহিমা বর্ণনার একটি অংশ অর্থাৎ হাজার হাজার বেদ মন্ত্রের মধ্যে যজুর্বেদ অধ্যায় ৩৬ মন্ত্র সংখ্যা ৩ এর একটি মন্ত্র মাত্র। যদি কেউ চারটি বেদও পাঠ করতে থাকে তবুও মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। মুক্তি (মোক্ষ) তো তখন হবে যখন আমরা বেদে বর্ণিত জ্ঞান অনুসারে ভক্তি সাধনা করবো।

উদাহরণ :- যেমন বিদ্যুতের মহিমা হল বিদ্যুৎ অন্ধকারকে আলোয় রূপান্তরিত করে, বিদ্যুৎ পাম্প চালাতে সাহায্য করে যাতে ফসলে জল সেচ করা যায়, বিদ্যুৎ আটা পেশাই করে প্রভৃতি আরো অনেক গুণের অধিকারী হল বিদ্যুৎ। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন বিদ্যুতের এই লিখিত গুণাবলী পাঠ করতে থাকে, তাহলে কি সেই ব্যক্তি বিদ্যুতের লাভ প্রাপ্ত করতে পারবে? লাভ তো তখনই প্রাপ্ত হবে যখন বিদ্যুতের সংযোগ ঠিকভাবে নেওয়া হবে। বিদ্যুতের সংযোগ কিভাবে পাওয়া যাবে তা জানা প্রয়োজন। তারপর বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়ার পর বিদ্যুতের লাভ প্রাপ্ত হওয়া শুরু হবে। কেবল বিদ্যুতের মহিমা গাইলেই কোন লাভ হবে না।

একই রকম ভাবে বেদ মন্ত্রতে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতাতে (যা চার বেদের সারাংশ) যে মোক্ষ প্রাপ্তির জ্ঞান বলা আছে, সেই অনুসারে আচরণ করলে মোক্ষ লাভ অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রাপ্তি হবে।

প্রশ্ন ৩৪ (শ্রী ধর্মদাসের) :- হে জিন্দা! আমি তো এটাও জানি না যে, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় কোথায় মোক্ষ প্রাপ্তির জ্ঞান আছে? আমি প্রতিদিন গীতা পড়লেও গীতার অর্থ বুঝতে পারিনি। আমাদের ধর্মগুরুরা যে ভক্তিবিধি বলেছেন তা আমরা শ্রদ্ধার সাথে

করে আসছি। বহু বহু বছর ধরে চলে আসা এই শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভক্তির প্রচলন সকল ভক্ত সমাজের কাছে সত্য বলে মনে হতে লাগে। এখন আমার প্রশ্ন এই যে, মুক্তির জন্য গীতাতে লেখা ভক্তিবিধি কি পর্যাপ্ত?

উত্তর (জিন্দাবাবার) :- গীতাতে কেবলমাত্র ব্রহ্ম স্তরীয় ভক্তি বিধি লেখা আছে। পূর্ণ মুক্তি (মোক্ষের) জন্য তো পরম অক্ষর ব্রহ্মের ভক্তি করতে হবে। গীতাতে পূর্ণ বিধি নেই কেবল সংকেত দেওয়া আছে। যেমন গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ বলা হয়েছে যে, সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্তির জন্য "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্রের নির্দেশ আছে। এই মন্ত্রের জপের বিধি তিন প্রকার। এই মন্ত্রতে যে ওঁ অক্ষর আছে তা স্পষ্টভাবে ক্ষরপুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মের, কিন্তু "পরব্রহ্মের" (অক্ষর পুরুষের) যে তত্ মন্ত্র আছে, তা সাংকেতিক। এই মন্ত্র উপদেশিকে কেবল তত্ত্বদর্শী সন্তই বলবেন। তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছেই পূর্ণ মুক্তির (মোক্ষের) মার্গ আছে, যা না তো বেদ শাস্ত্রে, না গীতাতে, না পুরানে আর না কোনও উপনিষদে আছে। তত্ত্বজ্ঞানের সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য গীতা এবং বেদ সহযোগী, যে ভক্তি বিধি বেদ গীতাতে আছে, তা তত্ত্বজ্ঞানেও আছে। সূক্ষ্ম বেদে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে, বেদ এবং গীতাতে বলা ভক্তিবিধি তো আছেই, এছাড়াও পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তির (মুক্তির) সাধনাও আছে। উদাহরণের জন্য মনে করুন, দশম শ্রেণীর পাঠক্রম ভুল নয় কিন্তু অসম্পূর্ণ। B.A, M.A পাঠ্যক্রমের মধ্যেও দশম শ্রেণীর জ্ঞানও থাকে কিন্তু তারপরেও আরো জ্ঞান দেওয়া থাকে। বেদ-গীতা এবং সূক্ষ্মবেদের জ্ঞানের মধ্যে এতটাই পার্থক্য মনে করুন।

প্রশ্ন ৩৫ (শ্রী ধর্ম দাসের) :- গীতা এবং বেদের কোথায় প্রমাণ আছে যে, একমাত্র তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছেই পূর্ণ মুক্তি (মোক্ষ) মার্গের জ্ঞান আছে, বেদ ও গীতাতে এমন কোথাও নেই। হে প্রভু জিন্দা বাবা! আপনি আমার সন্দেহের সমাধান করুন। আপনার জ্ঞান আমার হৃদয়ে ছুঁয়ে যায় এবং সত্য মনে হয় কিন্তু বিশ্বাস তো তখনই হবে যখন আপনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাবেন।

উত্তর (জিন্দা বেশ ধারী পরমেশ্বরের) :- গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ২৫ থেকে ৩০ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, "হে অর্জুন! সমস্ত সাধকরা নিজের-নিজের সাধনা ও ভক্তিকে পাপ নাশক অর্থাৎ মোক্ষ প্রদানকারী মনে করে সাধনা করে। যদি তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যেত যে, তারা যে ভক্তি করছে, তা শাস্ত্রানুকূল নয়, তাহলে তারা সেই সাধনাই ছেড়ে দিত। যেমন কোনো সাধক দেবতাদের পূজারূপী যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠান করাকেই পূজা মনে করেন। অন্যান্য সাধকরা ব্রহ্ম পর্যন্ত পূজা করেন। কেউ কেউ কেবল অগ্নিতে ঘি প্রভৃতি দ্রব্য স্বাহা করে অনুষ্ঠান করে, যাকে হবন যজ্ঞ বলা হয়। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ২৫)।

❖ অন্য যোগীজন অর্থাৎ ভক্তগণ চোখ, কান, মুখ বন্ধ করে বিভিন্ন ক্রিয়া করে এবং সেই ক্রিয়ার মধ্যেই নিজের মানব জীবন হবন অর্থাৎ সমাপ্ত করে দেন। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ২৬)

❖ অন্যান্য যোগীগন অর্থাৎ ভক্তগণ নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর ধ্যান কেন্দ্রীভূত করে সাধনা করেন, এইভাবে তারা তাদের আত্ম সংযম সাধনারূপী অগ্নিতে নিজের মানবজীবন হবন অর্থাৎ মানব জীবন সমাপ্ত করে দেন, একে তারা জ্ঞানদীপ মনে করেন

অর্থাৎ নিজের সাধনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ২৭)

❖ কিছু সাধকগণ দ্রব্য অর্থাৎ ধন থেকে হওয়া যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠান করেন যেমন ভোজন ভান্ডারা করানো, কাপড় কম্বল বিতরণ, অথিতিশালা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, এই সকল যজ্ঞ করে কিছু যোগীজন তপস্যা করেন, কেউ যোগাসন করেন এবং এগুলিকে পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধনা মনে করেন। অনেক সাধক অহিংসা প্রভৃতি তীব্র ব্রত সাধনা করেন। যেমন মুখে পটি বেঁধে খালি পায়ে চলাফেরা করা, বহুদিন উপবাস রাখা প্রভৃতি। অন্য যোগীজন অর্থাৎ সাধকরা স্বাধ্যায় অর্থাৎ প্রতিদিন বেদের মতো গ্রন্থ থেকে কিছু মন্ত্র (শ্লোক) পাঠ করা, এগুলিকে জ্ঞান যজ্ঞ বলা হয়, এগুলি করতে থাকেন এবং এই সমস্ত ক্রিয়া কর্মকে মোক্ষ প্রদানকারী মনে করেন (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ২৮)।

❖ অন্যান্য যোগীগন অর্থাৎ ভক্তগণ প্রাণবায়ুকে (শ্বাসকে) অপান বায়ুতে পৌঁছানোর ক্রিয়া করে আবার কেউ কেউ এর বিপরীত অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে স্থাপিত করার ক্রিয়া করে অনেক সাধক অল্প আহারী থাকে। কিছু সাধক বিভিন্ন যোগ ক্রীড়া করে ,যেমন প্রাণায়ামে লিন হয়ে প্রাণ - অপানের গতিকে রুদ্ধ করে অল্প শ্বাস গ্রহণ করে। এই ক্রিয়াতে নিজের মানবজীবন হবন অর্থাৎ সমর্পিত করে দেয়। এই সমস্ত ক্রিয়া করে উপরোক্ত (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ২৫ - ৩০) সাধকগণ নিজের নিজের ধার্মিক যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানকে পাপ নাশকারী বলে মনে করে ভক্তি সাধনা করতে থাকে (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ২৯ - ৩০)

❖ যদি সাধকের সাধনা শাস্ত্রানুকূল হয়, তাহলে হে কুরু শ্রেষ্ঠ অর্জুন! এই যজ্ঞ থেকে অবশিষ্ট অমৃত ভোগ যে সাধকরা গ্রহণ করবে অর্থাৎ ভক্ষন করবে, সেই সাধকরা সনাতন ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করবে আর যে পুরুষরা অর্থাৎ সাধকরা শাস্ত্রানুকূল সাধনা অর্থাৎ যজ্ঞ করবে না, তাদের জন্য তো এই পৃথিবী লোকও সুখদায়ী নয়, তাহলে পরলোক কি করে সুখকর হতে পারে অর্থাৎ ওই শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করা সাধকের কোন লাভ প্রাপ্তি হবে না। এরই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ ও ২৪ এ উল্লেখ আছে। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩১)

❖ গীতা জ্ঞানদাতা উপরের ২৫-৩০ নং শ্লোকের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, যে সাধক যেমন ভক্তি সাধনা করছেন সেটাকেই সে মোক্ষদায়ী এবং সত্য মনে করে করছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এ বলা হয়েছে যে, যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞান (ব্রহ্মণ: মুখে) পরম অক্ষর ব্রহ্ম স্বয়ং নিজের মুখ কমলের মাধ্যমে বলেছেন। সেটাকেই সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্মের অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের বাণী বলা হয়েছে। আর এটাকে তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয় এবং এটাকেই পঞ্চম বেদ (সুক্ষবেদ)ও বলা হয়। ওই তত্ত্বজ্ঞানে সম্পূর্ণ ভক্তিবিধি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এই তত্ত্ব জ্ঞান জানার পর সাধক সম্পূর্ণ পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ লাভ করেন।

বিঃ দ্রঃ :- গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এর অনুবাদে সকল অনুবাদকরা প্রায় একই রকম ভুল করে রেখেছেন। 'ব্রহ্মণঃ' শব্দের অর্থ বেদ করে রেখেছেন। 'ব্রহ্মণঃ মুখে' এর অর্থ 'বেদের বাণীতে' করে দিয়েছেন যা সম্পূর্ণ ভুল। এই একই অনুবাদকরা গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩-এ এই 'ব্রহ্মণঃ' শব্দের অর্থ “সচ্চিদানন্দ

ঘনব্রহ্ম” করেছেন যা যথার্থ অনুবাদ। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২-এ ও ব্রহ্মান ঃ শব্দের অর্থ সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ ‘পরম অক্ষর ব্রহ্ম’ করা উচিত। প্রমাণের জন্য দেখুন গীতার উপরোক্ত শ্লোক গুলির ফটোকপি এই পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা **১৭২-৩১৩** তে।

❖ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, ঐ জ্ঞানকে (যে জ্ঞান পরমাত্মা নিজের মুখ কমলে বলে শোনান, সেই তত্ত্বজ্ঞানকে) তুই তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে বুঝে নে। ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে ছলকপটতা ছেড়ে বিনম্রতাপূর্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত তোকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

❖ এতেই প্রমাণিত হয় যে, গীতাতে দেওয়া জ্ঞান সম্পূর্ণ নয় কিন্তু ভুলও নয়। পূর্ণ মুক্তি (মোক্ষ) মার্গের জ্ঞান গীতা জ্ঞানদাতার নিজেরও নেই, কারণ সেই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে গীতা জ্ঞানদাতাও জানেন না, যে তত্ত্বজ্ঞান পরমাত্মা (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) স্বয়ং নিজের মুখ কমলে বলেন। ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে জানার জন্য বলেছেন।

❖ একই প্রমান যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০ এ আছে। বলা হয়েছে যে, পরম অক্ষর ব্রহ্মকে কেউ তো ‘সম্ভবাত’ অর্থাৎ শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের মত জন্ম নেওয়া সাকার মনে করে, আবার কেউ কেউ ‘অসম্ভবাত’ জন্ম না নেওয়া নিরাকার বলে মনে করেন। পরমেশ্বরের জন্ম নেওয়া আর না নেওয়ার বিষয়ে বাস্তবে কোনটা সঠিক, সেই জ্ঞান ‘ধীরানাম’ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত-ই বলতে পারেন, তার কাছ থেকে শোনো।

প্রশ্ন ৩৬ (শ্রী ধর্মদাসের) :- হে প্রভু! হে জিন্দা বাবা! তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয় কি এবং কোন প্রমাণিত শাস্ত্রে এর প্রমাণ আছে? আপনার এই জ্ঞান আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করছে। গীতার এক একটা শব্দের যথাযথ ভাবার্থ আপনার মুখ কমলে শুনে বহু যুগের তৃষ্ণার্ত আমার এই আত্মার কিছু তৃপ্তি হচ্ছে, আত্মা প্রফুল্লিত হচ্ছে।

উত্তর (জিন্দা পরমেশ্বরের) :- শুনুন! তত্ত্বদর্শী সন্ত অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানী সদগুরুর প্রাথমিক লক্ষণ :-

গুরুকে লক্ষণ চার বখানা, প্রথম বেদ শাস্ত্র কো জ্ঞানা (জ্ঞাতা)।

দুজে হরি ভক্তি মন কর্ম বাণী, তীসরে সমদৃষ্টি কর জানী।

চৌথে বেদ বিধি সব কর্মা, য়হ চার গুরু গুন জানো মর্মা।

কবীর সাগরে "জীব ধর্ম বোধ" অধ্যায়ের ১৯৬০ পৃষ্ঠায় এই অমৃত বাণী অঙ্কিত আছে।

ভাবার্থ :- যে তত্ত্বদর্শী সন্ত (পূর্ণ সদগুরু) হবে তার মধ্যে চারটি প্রধান গুণ থাকবে :-

১. তিনি বেদ সহ অন্য সকল গ্রন্থের পূর্ণ জ্ঞানী হবেন।

২. তিনি স্বয়ং মন কর্ম বচন দিয়ে ভক্তি করবেন এবং করাবেন, শুধুমাত্র বক্তা হয়ে উপদেশ দেবেন না। ওনার কথা এবং কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

৩. তিনি তার সমস্ত শিষ্যদের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন। কখনো ছোট বড় ভেদাভেদ করেন না।

৪. তিনি সকল ভক্তি কর্ম বেদ শাস্ত্র অনুসারে করেন এবং করান অর্থাৎ শাস্ত্রানুকূল ভক্তি সাধনা করেন এবং করান। উপরে প্রদত্ত এই প্রমাণ তো সূক্ষ্ম বেদে আছে যা পরমেশ্বর স্বয়ং নিজের মুখ কমলে বলেছেন। এখন আপনাদের কে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা থেকে প্রমাণ দেখাবো। তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচিতি (চিহ্ন) কি?

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ এ সুস্পষ্ট করা হয়েছে :-

উর্ধ্ব মূলম্ অধঃ শাখম্ অশ্বত্থম্ প্রাহুঃ অব্যয়ম।

ছন্দাসি য়স্য প্রণানি, য়ঃ তম্ বেদ সঃ বেদবিদ॥

অনুবাদ :- উপরে মূল (শিকড়) বিশিষ্ট নীচে তিন গুণ রুপী শাখা বিশিষ্ট উল্টোভাবে ঝুলে থাকা সংসার রুপী অশ্বস্থ বৃক্ষ জানো, একে অবিনাশী বলা হয়। কারণ এর উৎপত্তি প্রলয় চক্র সদা চলতে থাকে। এই কারণে একে অবিনাশী বলা হয়েছে। এই সংসার রুপী বৃক্ষের মূল পাতা পর্যন্ত বিভিন্ন ছন্দ অর্থাৎ ভাগ (পার্টস) আছে। (য় ত্বম বেদ) যিনি এই সংসার রূপী বৃক্ষের সর্বভাগ কে তত্ত্বের আধারে জানেন, (সঃ) তিনি (বেদবিত) বেদের তাৎপর্য জানা অর্থাৎ তিনিই হলেন তত্ত্বদর্শী সন্ত। যেমনটি গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এ বলা হয়েছে যে, পরম অক্ষর ব্রহ্ম স্বয়ং পৃথিবীতে প্রকট হয়ে নিজ মুখ কমলে তত্ত্বজ্ঞান বিস্তারিতভাবে বলেন। পরমেশ্বর নিজের বাণীতে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে বলেছেন যে :-

কবীর অক্ষর পুরুষ এক পেড় হৈঁ, ক্ষরপুরুষ বাকী ডার।

তিনোঁ দেবা শাখা হৈঁ, পাত রূপ সংসার॥

ভাবার্থ :- মাটির উপরে বৃক্ষের যে অংশ থাকে, তাকে কান্ড বলা হয়। কান্ডকে মনে করুন অক্ষর পুরুষ, কাণ্ড থেকে কয়েকটি মোটা ডাল বের হয়, তার মধ্যে একটি মোটা ডাল কে ক্ষর পুরুষ জানুন। ঐ ডাল থেকে তিনটি শাখা বের হয়, তাদেরকে ত্রিদেব (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু এবং তমোগুন শিব-শংকর) মনে করুন আর এই শাখাতে যে অসংখ্য পাতা যুক্ত থাকে, সেই পাতাগুলিকে সংসার জানুন।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১-৪ এ সাংকেতিক বিবরণ আছে। এই সংকেতগুলিকে তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। চলুন - প্রথমে গীতা জ্ঞানের আধারে জানি।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ২ এ বলা হয়েছে যে, এই সংসার রূপী বৃক্ষের তিনটি গুণ (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুন শংকর) রুপী শাখা আছে। এই শাখা উপর (স্বর্গলোক) থেকে নিচে (পাতাল লোক) ছড়িয়ে আছে।

বিঃ দ্রঃ :- রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুন হলেন ভগবান শংকর। এই প্রমাণ দেখুন ৭ নং প্রশ্নের উত্তরে। তিনটি শাখা উপরে-নীচে ছড়িয়ে আছে। এই কথার তাৎপর্য হল শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান পৃথিবী লোকে দাঁড়িয়ে বলা হয়েছিল। তিন দেবতার সত্তা এই তিন লোকে আছে। যেমন ১.পৃথিবী লোক ২.স্বর্গলোক ৩.পাতাল লোক। এঁনারা তিনজন এই তিন লোকের এক একটি বিভাগের মন্ত্রী। রজগুণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রী ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রী বিষ্ণু এবং তমোপণ বিভাগের মন্ত্রী হলেন শ্রী শিব।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৩ এ বলা হয়েছে যে, হে অর্জুন! এই সংসার রূপী বৃক্ষের যেমন স্বরূপ আছে তা এখানে (বিচারকালে) অর্থাৎ তোর আর আমার এই গীতা জ্ঞানের আলোচনায় পাওয়া যাবে না, অর্থাৎ আমি বলতে পারব না, কারণ এর আদি এবং অন্তিম জ্ঞান আমারও জানা নেই। এইজন্য এই অতি দৃঢ় মূল বিশিষ্ট অর্থাৎ যে সংসাররূপী বৃক্ষের মূল আছে। (সেই মূলরূপী পরমাত্মাও অবিনাশী এবং ওনার স্থান সত্যলোক, অলখলোক, অগমলোক এবং অকহলোক, এই চারটি উপরের লোক (ধাম) ও অবিনাশী। এই চার লোকে একই পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে বিরাজমান আছেন। এই জন্য একে 'সুদৃঢ় মূলম' অর্থাৎ অতি দৃঢ় মূল বিশিষ্ট বলা হয়েছে।) তাকে তত্ত্বজ্ঞান রূপী অস্ত্র দ্বারা কেটে অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে তত্ত্বজ্ঞান বোঝ।

আবার গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বলা হয়েছে যে, সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত এবং তত্ত্বজ্ঞান পাওয়ার পরে পরমেশ্বরের ঐ পরমপদ অর্থাৎ সত্যলোকের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধক আর কখনো এই সংসারে ফিরে আসে না। যে পরমেশ্বর থেকে এই সংসাররুপী বৃক্ষের প্রবৃত্তি বিস্তার লাভ হয়েছে অর্থাৎ যে পরমেশ্বর সমগ্র সংসার রচনা করেছেন, সেই পরমেশ্বরের ভক্তিবিধি সর্বপ্রথম তত্ত্বদর্শী সন্তের নিকট থেকে বোঝ। গীতা জ্ঞান দাতা পরিষ্কারভাবে এখানে নিজের ভক্তি করতে মানা করেছেন। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তে তিন প্রভুর বিষয়ে উল্লেখ করা আছে। শ্লোক ১৬ তে দুই পুরুষের বিষয়ে বলা হয়েছে। ক্ষরপুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ এই দুজনেই নাশবান। পরবর্তী ১৭ নং শ্লোকে তৃতীয় পরম অক্ষর পুরুষের বিষয়ে বলা হয়েছে যিনি এই সংসার রূপী বৃক্ষের মূল (শিকড়)। তিনিই বাস্তবে অবিনাশী। শিকর (মূল) থেকেই তো বৃক্ষের সকল অংশে "কান্ড,ডাল-শাখা এবং পাতায়" আহার যায়। সেই পরম অক্ষর পুরুষই তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ পোষণ করেন। ঐ (মূল) মালিকের পূজা করা উচিত। এই বিবরণের মাধ্যমে তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয় এবং গীতা জ্ঞানদাতার অল্পজ্ঞতা অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানহীনতা প্রমাণিত হয়।

"জিন্দা বাবার দ্বিতীয় বার অন্তর্ধ্যান হওয়া"

(ধর্মদাস বললেন) হে জিন্দা! আপনি এসব কি বলছেন, ভগবান শ্রী বিষ্ণু কেবল তিন লোকের একটি বিভাগের মন্ত্রী? আপনি ভুল বলছেন, শ্রী বিষ্ণু তো অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। ইনিই শ্রী ব্রহ্মা রূপে উৎপত্তি করেন, বিষ্ণু রূপ ধারণ করে সংসারের পালন করেন এবং শিব রূপে সংহার করেন। ইনিই তো কুলের মালিক। যদি আবারও আপনি শ্রী বিষ্ণুর অপমান করেন তাহলে ভালো হবে না।

কবীর পরমেশ্বর বললেন :-

মূর্খকে সমঝাবতেঁ জ্ঞান গাঁঠি কা জায়।

কোয়লা হোত না উজলা, ভাবেঁ সৌ মন সাবুন লায়॥

একথা বলে জিন্দা রূপধারী প্রভু অন্তর্ধ্যান হয়ে গেলেন। দ্বিতীয়বার পরমেশ্বর

কে হারিয়ে ফেলার অনুশোচনায় ধর্মদাস অত্যন্ত উদাস হয়ে যায়।ভগবান বিষ্ণুর প্রতি এতটা অটুট বিশ্বাস ছিল যে, চোখের সামনে সত্য প্রমাণ দেখেও মিথ্যাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত (রাজি) ছিলেন না।

কবীর, জান বুঝ সাচী তজৈ, করে ঝুট সে নেহ।
তাকি সংগতি হে প্রভু স্বপন মেঁ ভী না দেহ॥

কিছুক্ষণ পর ধর্মদাসের বুদ্ধি কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তখন ধর্মদাস নিজের ভুল বুঝতে পারে যে, সমস্ত প্রমাণ তো গীতা থেকে দেখাচ্ছিলেন। জিন্দাবাবা তো নিজের থেকে কিছুই বলেননি। "আমি সত্যিই অভাগা! যে এমন দেব তুল্য তত্ত্বদর্শী সন্তকে নিজের জেদি ব্যবহারের কারণে হারিয়ে ফেললাম। মনে হয় আমি আর ঐ দেবতার দর্শন পাবো না। আমার জীবন তো ব্যর্থ হয়ে যাবে।" এই কথা চিন্তা করে ধর্মদাস ভয়ে কাঁদতে লাগলেন।খাওয়া-দাওয়াও নাম মাত্র করতে থাকে।সব সময় উদাস হয়ে থাকে এবং মনে মনে কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে থাকে যে, হে দেব! হে জিন্দাবাবা! কৃপা করে একবার দর্শন দিন, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন ভুল করবো না! আমি আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছি। "আমার মত মূর্খের ভালো-মন্দ কথায় কিছু মনে করবেন না। প্রভু আমায় আবার দেখা দিন, আপনার এই জ্ঞান সত্য, আপনি সত্য এবং আপনার এক একটা বচন অমৃত।কৃপা করে দর্শন দিন, না হলে আমি বেশিদিন বাঁচবো না।"

তৃতীয় দিনে কবীর পরমেশ্বর একটি নদীর তীরে একটি বৃক্ষের নিচে বসেছিলেন। আশেপাশের গ্রামের কিছু গরু এই গাছের নিচে বসে জাবর কাটছিল, কিছু গরু নদীর তীরে ঘাস খাচ্ছিল, হঠাৎ ধর্মদাসের দৃষ্টি নদীর তীরে গাছের নিচে পীতম্বর বস্ত্র পড়ে থাকা সাধুর দিকে পড়ল এবং দেখলেন ওনার আশে-পাশে গরু চরছে। দৃশ্যটি দেখে এমন মনে হচ্ছিল যেন, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের লোক থেকে এসে এখানে বসে আছেন! ধর্মদাস উৎসাহের সাথে সেই সাধুর নিকটে গিয়ে দেখলেন, একজন সাধারণ সন্ত বৃক্ষের নিচে বসে আছে, তারপর ভাবলেন চরণ স্পর্শ করে নিজের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। ধর্মদাস যখন সন্তের চরণ স্পর্শ করলেন ও চরণে মাথা রাখলেন, তখন এমন মনে হল যেন তুলো স্পর্শ করেছেন! আবারও চরণে হাত রেখে চরণ টিপতে টিপতে দেখেন কোথাও হাড় নেই। যখনই সন্তের মুখের দিকে দেখলেন, তখন অবাক হয়ে গেলেন দেখলেন যে, সেই জিন্দা বাবা যিনি আগের বেশভূষাতে বসে আছেন। ধর্মদাস এবার চরণ দুটিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন, যাতে তিনি চলে না যান। আর নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। ধর্মদাস বললেন, হে জিন্দা বাবা! আপনিতো তত্ত্বদর্শী সন্ত আর আমি একজন ভ্রমিত জিজ্ঞাসু। যতক্ষণ আমার সন্দেহের সমাধান না হবে, ততক্ষণ আমার অজ্ঞানতা কিভাবে দূরীভূত হবে? আপনি তো মহান দয়াবান আমার মত অজ্ঞানিকে দয়া করুন, আমার অজ্ঞানতা দূর করুন প্রভু!

প্রশ্ন ৩৭ :- (শ্রী ধর্মদাসের) যদি শ্রীবিষ্ণু পরমাত্মা না হন তাহলে পূর্ণ পরমাত্মা কে? কৃপা করে গীতা থেকে প্রমাণ দেখান।

উত্তর :- কৃপা করে পড়ুন ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর, যেখানে জিন্দা রুপধারী পরমেশ্বর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধর্মদাস কে শুনিয়েছেন।

প্রশ্ন ৩৮ :- ধর্মদাস জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে কি শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শংকরের পূজা করা উচিত নয়?

উত্তর (জিন্দাবাবার) :- না করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ৩৯ (শ্রী ধর্মদাসের) :- কৃপা করে গীতা থেকে প্রমাণ দেখান।

উত্তর :- অনুগ্রহ করে ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখুন। এখানে ধর্মদাস কে প্রভু গীতা শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়েছেন,যা দেখে ধর্মদাসের চোখ বিস্ফোরিত হয়ে যায়। ঠিক যেমন কোমায় চলে যাওয়া ব্যক্তির হয়। এখন মিথ্যা বলার তো কোন উপায় নেই তবে স্বীকার করতে এখনো কিছুটা সময় লাগবে।

জিন্দা রূপধারী পরমেশ্বর ধর্মদাসকে সম্মোধন করে বললেন, হে বৈষ্ণব মহাত্মা! আপনি কোন দুনিয়ায় চলে গিয়েছেন? ফিরে আসুন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠা ব্যক্তির মতো ধর্মদাস বললেন, কিছু না কিছু না। সাধু বাবা কৃপা করে জ্ঞান শোনান, যাতে আমার অজ্ঞানতা দূর হয়। এ কথা শুনে কবীর পরমেশ্বর সৃষ্টি রচনার জ্ঞান ধর্মদাস কে শোনালেন। কৃপা করে পড়ুন এই পুস্তকের 124 নং পৃষ্ঠায়।

সৃষ্টি রচনার সম্পূর্ণ জ্ঞান শুনে ধর্মদাসের এমন মনে হতে লাগল যে, সে পাগল হয়ে যাবে! কারণ যে জ্ঞান আজ পর্যন্ত সকল হিন্দু ধর্মগুরু, ঋষিগণ, মহর্ষি ও সন্তগণের কাছ থেকে শুনে আসছিল তা এখন সম্পূর্ণ নিরাধার এবং অপ্রমাণিত মনে হতে লাগলো! জিন্দাবাবা তো হিন্দু সদগ্রন্থ থেকেই সকল প্রমাণ দেখাচ্ছিলেন। সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তাই ধর্মদাস মনে মনে ভাবছিলেন আমি পাগল হয়ে যাবো না তো?

প্রশ্ন ৪০:- (শ্রী ধর্ম দাসের) হে জিন্দা! হিন্দু ধর্মের গুরুগণ এবং ঋষিদের কি শাস্ত্রের কোন জ্ঞান নেই?

উত্তর :- ***(জিন্দাবাবার) এখনো কি এটা বলার কোন অপেক্ষা রাখে?***

"ধর্মদাসের সহিত অন্যান্য সাধু সন্তের জ্ঞান চর্চা"

প্রশ্ন ৪১ :- (শ্রী ধর্মদাসের) ধর্মদাস মনে মনে ভাবলেন, এটা কিভাবে সম্ভব যে, হিন্দু ধর্মের কোন সাধু, সন্ত, গুরু মহর্ষিদের সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান জানা নেই? এই কথা ভেবে ধর্মদাস মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কোন মহামন্ডলেশ্বরের জ্ঞান শোনা উচিত। এক ভবঘুরে ফকিরের কাছে আর কতটুকু আশা করা যায়। এই কথা যখন ধর্মদাস মনে মনে ভাবছিলেন, জিন্দা বেশধারী পরমেশ্বর ধর্মদাসের মনের দোষ জানতে পেরে বললেন যে, আপনি আপনার মহামন্ডলেশ্বরের কাছে গিয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত করুন। এই কথা বলে পরমেশ্বর তৃতীয় বার অন্তর্ধ্যান হয়ে গেলেন। নিজের মনের দোষ ভাবের কথা চিন্তা করে ধর্মদাস লজ্জিত হয়ে গেলেন। এইবার প্রভুর অন্তর্ধ্যানে ধর্মদাস অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন কিন্তু ধর্মদাসের মনে আশা ছিল যে, কোন না কোন মন্ডলেশ্বরের কাছে তত্ত্বজ্ঞান পাওয়া যাবে। যদি জিন্দাবাবার (মুসলমান ফকিরের) জ্ঞানকে তত্ত্ব জ্ঞান মনে করে সাধনা শুরু করি তাহলে এমন মনে হবে যেন আমি ধর্ম পরিবর্তন করেছি! এটা হিন্দু সমাজের অপমান বা নিন্দার কারণ হবে। এইজন্য আমাদের হিন্দু মহাত্মাদের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান জেনে শ্রেষ্ঠ

শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি করাই উচিত হবে। তৃতীয়বার জিন্দাবাবার অন্তর্ধ্যান হয়ে যাওয়াতে ধর্মদাসের উপর তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। কারণ ধর্মদাসের ধারণা ছিল, হিন্দুধর্ম অনেক বড় ও বহু পুরানো ধর্ম, সেখানে কি কোন তত্ত্বদর্শী সন্ত নেই? সেই মতো ধর্মদাস এক বৈষ্ণব সন্ত মন্ডলেশ্বর শ্রী জ্ঞানানন্দ মহারাজের আশ্রমে গেলেন। ঐ সময় হিন্দু সমাজে শ্রী জ্ঞানানন্দ মহারাজ খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কাশী নিবাসী স্বামী রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ওই সময় স্বামী রামানন্দ তার পূর্বের সাধনা ছেড়ে কবীর সাহেবের কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত করে নিজের সমস্ত ঋষি শিষ্যদের ডেকে বলেছিলেন যে, "আমার দেওয়া ভক্তি সাধনার জ্ঞান শাস্ত্র বিরুদ্ধ ছিল! আপনারা সবাই কবীর পরমেশ্বরের থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে নিজের নিজের আত্মকল্যাণ করান।" কিন্তু জাত্যাভিমানের অহংকারে ডুবে থাকা শিষ্যরা জ্ঞানের জায়গায় অজ্ঞানতার ভান্ডার জীবকে সত্য জ্ঞান স্বীকার করতে দেয়নি।

কবীর, রাজ তজনা সহজ হৈ, সহজ ত্রিয়া কা নেহ।

মান বড়াঈ ঈর্ষা,দুর্লভ তজনা য়েহ॥

শ্রী ধর্মদাস শ্রী জ্ঞানানন্দ মহারাজকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, হে স্বামীজি! ভগবান বিষ্ণুর উপর কি কোন প্রভু আছে? শ্রীজ্ঞানানন্দ মহারাজ উত্তর দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং পরমব্রহ্ম পরমাত্মা। ওনার উপরে আর কে হতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ তো স্বয়ং বিষ্ণুই ছিলেন। উনিই তো শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান দিয়েছেন। আপনাকে কে ভ্রমিত করে দিয়েছে? ধর্মদাস জী জিজ্ঞাসা করলেন যে, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১-এ যখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তত্ ব্রহ্ম কে? এর উত্তরে ভগবান গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩-এ বলেন যে, তিনি হলেন 'পরম অক্ষর ব্রহ্ম'। তাহলে এখানে তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে অন্য প্রভুর কথা বলা হল। একথা শুনে স্বামী জ্ঞানানন্দ বললেন, মনে হচ্ছে কাশী নিবাসী, জোলা (তাঁতি) তোর উপর যাদু করেছে। যা যা নিজের কাজ কর! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে বড়ো অন্য কোন প্রভু নেই।

ধর্মদাস বুঝতে পারলেন যে, এর কাছে কোন জ্ঞান নেই,যা জিন্দাবাবা প্রমানের সহিত বলেছিলেন। ধর্মদাস নিরাশ হয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন। ধর্মদাস জানতেন না যে, কাশী নিবাসী জুলাই (তাঁতিই) ছিলেন জিন্দাবাবা। এরপর ধর্মদাস মোহনগিরি নামের এক মহামন্ডলেশ্বরের কাছে গেলেন, এবং ওনার কাছে গিয়ে জ্ঞানচর্চা শুরু করলেন। সর্বপ্রথম তো ধর্মদাস ওনাকে এক টাকা দক্ষিণা দিলেন, যার কারণে মোহনগিরি ধর্মদাসকে নিজের কাছে বসালেন এবং বললেন যে, ভগবান শিব-ই হলেন সকল সৃষ্টির সৃজনহার। ওনার থেকে বড় এই সংসারে আর কোন প্রভু নেই। "ওম্ নমঃ শিবায়" মন্ত্রের জপ করো। একথা শুনে ধর্মদাস প্রণাম করে উঠে পড়লেন। আর মনে মনে বললেন, এনার নাম তো এত প্রসিদ্ধ কিন্তু জ্ঞান এক পয়সারও নেই! এরপর কোন একজন ধর্মদাসকে বললেন, অনেক বড় এক তপস্বী আছেন, যিনি অনেক বছর ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছেন। তার কথামতো ধর্মদাস ওখানে গেলেন। সেই তপস্বী নাথ পরম্পরার সাথে যুক্ত ছিলেন, এবং ভগবান শিবকে সর্বশক্তিমান পরমাত্মা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন কঠিন তপস্যার ফলেই পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়। একথা শুনে ধর্মদাস নিজেই বিবেকপূর্ণ নির্ণয় নেন, যদি এত কঠিন তপস্যা করে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়, তাহলে তা আমার ক্ষমতার বাইরে। ধর্মদাস ওখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে গেলেন। তারপর জানতে পারলেন একজন অনেক জ্ঞানী মহাত্মা কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে পড়াশোনা করে এসেছেন।

তিনি বেদের পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন। ধর্মদাস ঐ মহত্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পরমাত্মা কেমন? উত্তর পেলেন, পরমাত্মা তো নিরাকার। ধর্মদাস আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ নিরাকার পরমাত্মার কি কোন নাম আছে ? উত্তরে বিদ্বান বললেন, ওনার নাম ব্রহ্ম। এবার ধর্মদাস প্রশ্ন করলেন, ওই পরমাত্মাকে কি দেখা যায়? উত্তর পেলেন, কেবল মাত্র পরমাত্মার প্রকাশ দেখা যায়। ওই পরমাত্মা তো নিরাকার, তাহলে তাকে কিভাবে দেখা সম্ভব ?

প্রশ্ন :- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণু কি পরমাত্মা নয়? উত্তর পেলেন, উনি তো সর্গুন দেবতা, পরমাত্মা তো নির্গুণ।

গীতা এবং বেদের জ্ঞানের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? ধর্মদাস প্রশ্ন করলেন, উত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন যে, গীতা হল চার বেদ - এর সারাংশ। ধর্মদাস আবার প্রশ্ন করলেন, ভক্তির জন্য কোন্ মন্ত্র জপ করা উচিত? ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, আপনি গায়েত্রী মন্ত্রের জপ করুন = "ওম্ ভূর্ভবস্বঃ তত্ সবিতুঃ বরেণিয়ম ভৃগোদেবস্য ধীমহি, ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াত্"। ধর্মদাসকে জিন্দা বাবা বলেছিলেন যে, এই গায়ত্রী মন্ত্রে মুক্তি সম্ভব নয়। তাই ধর্মদাস আবার উঠে রওনা দিলেন। তারপর ধর্মদাস এক সাধুর সন্ধান পেলেন যিনি গুহাতে থেকে অনেক অনেক দিন ধরে সাধনা করছেন, এবং খুব কম সময়ের জন্য বাইরে বার হন।তার কাছে গিয়ে ধর্মদাস প্রশ্ন করলেন,ভগবানকে কিভাবে পাওয়া যায়? উত্তর পেলেন, ইন্দ্রিয়ের উপর সংযম রাখুন। এইভাবে পরমাত্মা প্রাপ্তি হবে। নাম জপ করে কোন কিছু হয় না। মিষ্টি কথা বললেই মুখে মিষ্টি অনুভব হয় না। ধর্মদাস সন্তুষ্ট হলেন না। সমস্ত সাধু-সন্তদের সাথে জ্ঞান চর্চা করে ধর্মদাসের অত্যন্ত অনুশোচনা হল এই যে, আমাকে ঐ জিন্দা বাবা একদম সঠিক বলেছিলেন যে, এই যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান কোন ধর্মগুরু বা মন্ডলেশ্বরের কাছে নেই! কোন সন্ত মহত্মার জ্ঞান শাস্ত্র প্রমাণিত নয়! কেউ শাস্ত্রের আধারে ভক্তি করছে না! অথচ ওনার উপর আমার বিশ্বাস হয়নি। এই কথা ভেবে ধর্মদাস কাঁদতে লাগলেন। নিজের অজ্ঞানতার কারণে অনুশোচনা করতে লাগলেন, হে ভগবান! আমি বড় অভাগা, আমি উল্টো-পাল্টা ব্যর্থ প্রশ্ন উত্তর করে পরমাত্মা তুল্য সন্তকে হারিয়ে ফেলেছি। আমার ভাগ্য খুব খারাপ, আমি ঐ পরমাত্মা স্বরূপ জিন্দা মহত্মার উপর বিশ্বাস রাখতে পারিনি। এখন আর ওই অন্তর্যামী আমাকে দর্শন দেবেন না। কারণ আমি ওনাকে অনেকবার অপমান করেছি। এখন আমি কি করি, না বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে, অপরদিকে আত্মহত্যা করা মহাপাপ। ধর্মদাস অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

উত্তর ৪১ :- পরমাত্মা জিন্দা মহত্মার রূপ ধারণ করে একটি বৃক্ষের নিচে বসে পড়লেন। ধর্ম দাসের যখন জ্ঞান ফিরলো তখন ধর্মদাস ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকতে লাগলেন, “হে জিন্দাবাবা! দর্শন দিন। আমি খুব ভেঙে পড়েছি। কোথাও কারো কাছে সত্য জ্ঞান নেই। আপনার প্রতিটি কথা সত্য। হে পরমাত্মা! একবার এই অজ্ঞানী মহামূর্খকে ক্ষমা করে দিন। আপনি জিন্দাবাবা নন। আপনি স্বয়ং পরমাত্মা! আপনি মহাবিদ্বান, আপনার এই সত্য জ্ঞান খন্ডন করার মত কেউ নেই। আমি আজীবন আপনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখব।” এই কথা মনে মনে বলতে বলতে ধর্মদাস রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটি গাছের নিচে কিছু ব্যক্তিদের মাঝে এক সাধুবাবাকে বসে থাকতে দেখলেন। ধর্মদাস ভাবলেন আমি তো অনেক মহা মন্ডলেশ্বরের সাথে দেখা করে এসেছি, যাদের হাজার হাজার শিষ্য ছিল।

তারাই যখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি তাহলে এই ছোট্ট সাধুর কাছ থেকে আমি কি উত্তর পাবো? তারপরেও মনের মধ্যে প্রেরণা হল যে, কিছুটা সময় এখানে বসে বিশ্রাম করা যাক, তারপর ধর্মদাস ধীরে ধীরে সাধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাত্মা! পরমাত্মা কেমন ? সাধুটি উত্তর দিলেন যে, আমিই পরমাত্মা। এ কথা শুনে ধর্মদাস চুপ হয়ে গেলেন। ভাবলেন এই সাধু তো মজা করছে। উনি তো কোন সন্তই নন। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য ব্যক্তিরা চলে গেল। ধর্মদাস যখন উঠে চলে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় সাধু রূপধারী পরমাত্মা বললেন, হে মহাত্মা! আপনার মন্ডলেশ্বরগণ কি বলতে পারেনি পরমাত্মা কেমন? ধর্মদাস অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, এই সাধু কিভাবে জানলেন যে আমি কোথায় কোথায় দৌড়াচ্ছি? এমন অবস্থায় পরমাত্মা সেই জিন্দা বাবার রূপ ধারণ করে নিলেন।ধর্মদাস পরমাত্মার চরণ ধরে অবিরাম কাঁদতে থাকলেন এবং বললেন,হে ভগবান কারো কাছে জ্ঞান নেই। আমি নির্বোধ আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ। আমি অনেক বড় ভুল করেছি।আপনি সৃষ্টি রচনার যে জ্ঞান শুনিয়েছেন,তা অন্য সাধু-সন্তদের জ্ঞানের তুলনায় এতটাই প্রবল যে, সূর্যের সম্মুখে প্রদীপের আলো! সকলেই নিরাধার জ্ঞান দিচ্ছে। পরমেশ্বর ধর্মদাসকে বললেন, আপনি যে সমস্ত বেদের পূর্ণ বিদ্বানদের প্রশ্ন করেছিলেন যে, পরমাত্মা কেমন? তারা উত্তরে বলেছিল, পরমাত্মা নিরাকার। আপনি আবারও প্রশ্ন করেছিলেন, পরমাত্মার কি দর্শন লাভ করা যায়? তখন ওই অজ্ঞানীরা উত্তর দিয়েছিল যে, যখন পরমাত্মা'ই নিরাকার, তখন তাকে দেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেবল মাত্র পরমাত্মার প্রকাশ দেখা যায়।”

❖ **বিচার করুন ধর্মদাস** :- এই ধরনের বিচার তো এমন ব্যক্তি করবে, যেমন কোন এক ব্যক্তি কোন দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন যে, সূর্য দেখতে কেমন? উত্তরে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি বললেন, সূর্য তো নিরাকার। আগন্তুক ব্যক্তিটি আবার প্রশ্ন করলেন, সূর্যকে কি দেখা যেতে পারে? উত্তরে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিটি বললেন, সূর্যকে দেখা সম্ভব নয়, কেবল সূর্যের প্রকাশ দেখা যায়। তখন নেত্রহীন ব্যক্তিকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, সূর্য ছাড়া কি প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ? একই রকম ভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপী নেত্রহীন অর্থাৎ পূর্ণ অজ্ঞানী সন্তই এমন ব্যাখ্যা করে যে, পরমাত্মা নিরাকার কেবল ওনার প্রকাশ মাত্র দেখা যায়! কিন্তু হে ধর্মদাস! কিভাবে কোনো নিরাকার বস্তুর প্রকাশ দেখা যায়? এই প্রকাশ তো পরমাত্মার'ই প্রকাশ। একথা শুনে ধর্মদাস বললেন, হে মহাত্মা! একথা তো আমার মাথায়ও আসেনি। আপনার এই দিব্য যুক্তিতে আমার চোখ খুলে গেছে। যতজন মহামন্ডলেশ্বরের সাথে দেখা হয়েছিল তারা সকলেই মহা অজ্ঞানী ছিল। হে জিন্দা মহত্মা! “যদি আমি আপনার জ্ঞান শোনার পর এই মূর্খদের সাথে সাক্ষাৎ না করতাম, তাহলে কখনো আমার অজ্ঞানতা দূর হতো না। আপনি শত শত প্রমাণ দেখালেও বিশ্বাস হতো না।”

প্রশ্ন ৪২ (ধর্মদাস) :- হে জিন্দাবাবা! আপনি রাগ করবেন না, আমার মনে একটি সন্দেহ আছে, ভগবান বিষ্ণুর ভক্তি করা কি খারাপ?

উত্তর (জিন্দা মহত্মার) :- হে ধর্মদাস! শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৪৬ এ প্রমাণ আছে যে, গীতা জ্ঞানদাতা অর্জুনকে বলেছেন যে, হে অর্জুন! অনেক বড় জলাশয় (দিঘি) প্রাপ্তির পর ছোট জলাশয়ের উপর মানুষের যতটা আস্থা থাকে, ঠিক এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তিবিধি থেকে হওয়া লাভ প্রাপ্তির পর অন্যান্য জ্ঞানের অর্থাৎ

ছোট ভগবানদের প্রতি ততটাই আস্থা থাকে। ছোট জলাশয়ের জল অবশ্যই ভালো কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। যদি এক বছর বর্ষা না হয় তাহলে ছোট জলাশয়ের জল শুকিয়ে যায় এবং সেই জলাশয়ের উপর আশ্রিত ব্যক্তিরা জলের অভাবে কষ্ট পেতে থাকে। চারিদিকে হাহাকার পড়ে যায়। অপরদিকে বড় জলাশয়ের দিঘির জল যদি ১০ বৎসরও বর্ষা না হয় তাহলেও সমাপ্ত হয় না। ফলস্বরূপ যে ব্যক্তি যখন কোন বড় জলাশয়ের সন্ধান পাবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ছোট জলাশয় (ডোবা/পুকুর) ত্যাগ করে বড় জলাশয়ের ধারে বসতি বসাবে। যে সময় কালে এই গীতা জ্ঞান শোনানো হয়েছিল, সেই সময় সকল মানুষজন পুকুরের জলের উপর আশ্রিত ছিল। এজন্য এই উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে সত্ত্বগুন যুক্ত শ্রী বিষ্ণুর ভক্তি আপনার যতই ভালো লাগুক না কেন তা পূর্ণ মুক্তি (মোক্ষ) প্রদায়ী নয়। ভগবান শ্রী বিষ্ণুও নাশবান। ভগবান শ্রী বিষ্ণুরও জন্ম - মৃত্যু হয়। তাহলে এনার সাধকরা কিভাবে অমর হতে পারে? এইজন্য পূর্ণ মোক্ষ অর্থাৎ অমর হওয়ার জন্য অমর পরমাত্মারই ভক্তি করতে হবে।

প্রশ্ন ৪৩ :- হে জিন্দাবাবা! আমি আপনার উপর অবিশ্বাস করেছিলাম, আমি মহাপাপী, আমাকে ক্ষমা করুন।

উত্তর :- (জিন্দা বাবার) হে ধর্মদাস! আমি আপনার মনের এই প্রেরণার উদয় করেছিলাম। যদি আপনি নিজের ধর্ম গুরুদের কাছে না যেতেন এবং জ্ঞানচর্চা না করতেন তাহলে কখনো আমার কথার উপর বিশ্বাস করতেন না। বারবার ঘুরে ফিরে আপনার মনে একটাই প্রশ্ন উঠতো যে, এটা কখনোই হতে পারে না যে, হিন্দু ধর্মের কোন মহর্ষি, মন্ডলেশ্বর বা সন্ত মহন্তদের কাছে কোন তত্ত্বজ্ঞান নেই। কিন্তু এখন তুমি আমার সমস্ত কথার উপর বিশ্বাস করবে। ভেবে দেখো ধর্মদাস যখন গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এবং ৩৪ এ বলেছেন , যে জ্ঞান পরম অক্ষর ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) নিজের মুখ কমলে শোনান, সেটাই তত্ত্বজ্ঞান, (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২) ঐ জ্ঞানকে তুই তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে বোঝ। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪) এটা থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞান প্রদানকারী পরমাত্মারও সেই তত্ত্বজ্ঞান নেই। তাহলে গীতার পাঠকগণ বা এই প্রভুর উপাসকের সেই তত্ত্বজ্ঞান কিভাবে প্রাপ্ত হবে ?

গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৩ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, হে অর্জুন! বিভিন্ন প্রকারের ভ্রমিত করা বচন থেকে সরে গিয়ে তোমার বুদ্ধি যখন এক তত্ত্ব জ্ঞানের উপর স্থির হয়ে যাবে তখন তুমি যোগের (ভক্তির) উপযুক্ত হবে। এই কথার ভাবার্থ হল তখন তুমি ভক্ত হবে। এইজন্য, হে ধর্মদাস! আমি তোমাকে ঐ সব নকল ধর্ম গুরুদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এখন তুমি যোগের উপযুক্ত হবে অর্থাৎ ভক্ত হতে পারবে।

প্রশ্ন ৪৪ (ধর্মদাসের) :– পূর্ণ মুক্তির মোক্ষের জন্য তাহলে কি ভগবান বিষ্ণু ও ভগবান শংকরের পূজা ছাড়তে হবে?

উত্তর (জিন্দাবাবার) :– এই সমস্ত প্রভুদের ছাড়তে হবে না। কিন্তু এদের পূজা করা ছাড়তে হবে।

প্রশ্ন ৪৫ (শ্রী ধর্মদাসের) :– হে জিন্দাবাবা! আমি বুঝতে পারলাম না, এই বিষ্ণু ও শংকর প্রভুদেরকে না ছেড়ে এদের পূজা ছাড়তে হবে, এই বিষয়টা। আমার বুদ্ধি

সংকীর্ণ, আমি মহাঅজ্ঞানী প্রাণী, কৃপা করে বিস্তারিতভাবে বলুন।

উত্তর (জিন্দা মহাত্মার) :– হে ধর্মদাস! আপনি এদের সাধনা শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে করছিলেন,যার কারণে আপনি কোনো লাভ পাচ্ছিলেন না। এই দেবতাদের থেকে লাভ প্রাপ্তির জন্য যে সাধনা আছে, সেই সাধনার মন্ত্র আমার কাছে আছে। ঠিক যেমন কোন এক মহিষকে মহিষ,মহিষ বলে ডাকলে, সে কখনোই আপনার দিকে দেখবে না। তাকে আকর্ষিত করার একটি বিশেষ মন্ত্র হল হুরর্ হুরর্.... । যখন এই মন্ত্র সে শুনবে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত হয়ে আওয়াজ করা ব্যক্তির দিকে দৌড়ে চলে আসবে। অনুরূপভাবে এই সমস্ত শ্রদ্ধেয় দেবতাদেরও নিজ নিজ মন্ত্র আছে। এই সমস্ত মন্ত্রের প্রতিফলে এনারা তৎক্ষণাৎ লাভ প্রদান করেন। প্রিয় পাঠকগণ! সেই মন্ত্র আজ আমার (সন্ত রামপাল দাসের) কাছে আছে। যা পরমেশ্বর গুরুদেবের মাধ্যমে আমাকে প্রদান করেছেন। আপনারা আসুন এবং এই মন্ত্র প্রাপ্ত করুন।

যেমনটি আপনাদের বলেছিলাম (প্রশ্ন নম্বর ৩৬ এর উত্তরে বর্ণনা করেছিলাম) এই যে, এই সংসারকে একটি বৃক্ষ মনে করুন, পরম অক্ষর পুরুষকে এই বৃক্ষের মূল (শিকড়) মনে করুন। অক্ষয় পুরুষকে কাণ্ড জানুন, কান্ড থেকে বের হওয়া মোটা ডালকে ক্ষরপুরুষ এবং এই ডাল থেকে বের হওয়া তিনটি শাখাকে ত্রিদেব (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ শিব) মনে করুন সেই সাথে শাখাতে যুক্ত পাতাগুলিকে সংসার জানুন।

যদি আপনি কোথাও থেকে কোন আমের চারা গাছ নিয়ে এসে লাগাতে চান তাহলে আপনাকে মাটি খুঁড়ে চারা গাছটির মূল শিকড় মাটিতে রোপন করতে হবে এবং চারা গাছটির গোড়ায় নিয়মিত জলসেচ করতে হবে। তারপরে সেই আম গাছ বৃক্ষের রূপ ধারণ করবে এবং বৃক্ষের শাখায় ফল ঝুলবে। এ কারণে কখনো বৃক্ষের শাখা গুলিকে ভেঙে ফেলা হয় না, বা এই শাখা গুলিকে মূলের জায়গায় মাটিতে রোপন করে জল সেচ করা হয়না। অনুরূপভাবে এই সংসার রূপী বৃক্ষের মূল অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ইষ্টদেব রূপে প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করলে তবেই শাস্ত্রানুকুল সাধনা হয়। যা পরম লাভদায়ী হয়ে থাকে। এইভাবে করা ভক্তি কর্মের ফল এই তিন দেবতায় (সংসার রূপী বৃক্ষের শাখা) কর্মানুসারে প্রদান করে থাকেন। এই জন্য এদের পূজা করতে মানা করা হয়। কিন্তু এদেরকে কখনোই ছাড়া সম্ভব নয়। এই কথার প্রমান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৮ থেকে ১৫ তে পূর্ণরূপে দেওয়া আছে। বলা হয়েছে যে:–

❖ হে অর্জুন! তুই শাস্ত্রদ্বারা বিহিত কর্ম কর অর্থাৎ শাস্ত্রে যেমন ভক্তি করতে বলা হয়েছে, ঠিক তেমনি ভক্তি কর্ম কর। যদি তুই ঘর ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যাস অর্থাৎ তুই কর্ম সন্ন্যাসী হয়ে যাস, যেমন একস্থানে বসে হট পূর্ব সাধনা করা, এমন করলে তোর শরীরের পোষন নির্বাহ কিভাবে সম্ভব? এই জন্য কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করতে করতে ভক্তি কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ।(গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৪)

❖ যে সাধক শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে মনমর্জি আচরণ করে অর্থাৎ শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি কর্মের স্থানে অন্য কর্মে লিপ্ত হয়ে মনুষ্য সমুদায় কর্মবন্ধনে

বাধা পড়ে চিরকালের জন্য জন্ম -মৃত্যুর চক্রে রয়ে যায়। এইজন্য, হে কুন্তি পুত্র অর্জুন! শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভক্তি কর্ম যারা করছে,তাদের প্রতি আসক্ত রহিত হয়ে শাস্ত্রানুকূল ভক্তি কর্ম কর।(গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৯)

❖ এই সংসারের রচনা করার পর প্রজাপতি (সকল সৃষ্টির মালিক) সর্বপ্রথম মনুষ্য জাতি সৃষ্টি করার সাথে সাথে যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানের বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তোমরা এইভাবে বলা শাস্ত্র অনুকূল কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও সমৃদ্ধশালী হও। এইভাবে শাস্ত্র অনুসারে করা ভক্তি সাধনা তোমাদের ইচ্ছিত ভোগ (বস্তু) প্রাপ্ত করাবে।(গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০)

❖ এইভাবে শাস্ত্রানুকূল ভক্তি দ্বারা অর্থাৎ সংসার রূপী বৃক্ষের শিকড়ে (মূল অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম কে) জলসেচ করে অর্থাৎ পূজা করে দেবতাদের অর্থাৎ সংসার রূপী বৃক্ষের তিনগুণ রুপি শাখাকে (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুন শিবকে) উন্নত সমৃদ্ধ কর। এই দেবতারা (সংসার রূপী বৃক্ষের শাখা রূপী তিন দেবতা) আপনাদের কে কর্মানুসার ফল দিয়ে সমৃদ্ধ করবে এইভাবে একে অপরকে সমৃদ্ধ করে পরম কল্যাণ অর্থাৎ পূর্ণ মুক্তির অধিকারী হয়ে যাবে।(গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১১)

❖ শাস্ত্রবিধি অনুসারে করা ভক্তিকর্ম অর্থাৎ যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া দেবতা অর্থাৎ শিকড় অর্থাৎ মূল মালিককে (পরম অক্ষর ব্রহ্মকে) প্রতিষ্ঠিত করে ভক্তি কর্ম করার প্রতিফলে ঐ মূল থেকে সমৃদ্ধ হওয়া শাখা (তিন দেবতা) তোমাদেরকে কর্ম অনুসারে না চাইতেও ইচ্ছিত ভোগ (কাঙ্খিত বস্তু) নিশ্চয় প্রদান করতে থাকবেন। যেমন আম চারা গাছটির মূলে জলসেচ করতে করতে চারা গাছটি বৃক্ষ রুপ ধারণ করে। শাখা সমূহকে সমৃদ্ধ করে, তারপর ঐ শাখা গুলিতে নিজে থেকেই ফল ধরতে শুরু হয়। ফল ঝরে ঝরে পড়ে অর্থাৎ উপাসকের কর্ম অনুসারে ধন প্রাপ্ত হতে লাগবে। এটি কেবল উপরোক্ত বিধিতেই সম্ভব। যদি কোন ব্যক্তির ঐ দেবতাদের (শাখা সমূহের) দেওয়া ধনের মধ্যে থেকে কিছু ধন পুনঃরায় দান পুন্যতে না লাগায় অর্থাৎ যারা পুনঃরায় শাস্ত্রানুকূল সাধনা করে না, তারা কেবল নিজের উদরপূর্তি করে অর্থাৎ স্বয়ং ভোগ করতে থাকে। তারা পরমেশ্বরের কাছে চোর। (গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১২)

❖ শাস্ত্রানুকূল ভক্তি বিধিতে সর্বপ্রথম পরমাত্মার ভোগ দেওয়া হয়। ভান্ডারার আয়োজন করা হয়। সর্বপ্রথম পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ইষ্ট দেব রূপে পূজা করে ভোগ প্রসাদ তৈরি করা হয়। তারপর অবশিষ্ট ভোজন বাকি ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ঐ অবশিষ্ট অন্ন সৎসঙ্গে উপস্থিত পুণ্য আত্মারা গ্রহণ করেন। কারণ পুণ্য আত্মারা পরমাত্মার জন্য সময় বের করে ধার্মিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। এইজন্য বলা হয়েছে যে, ঐ যজ্ঞ থেকে অবশিষ্ট অন্ন গ্রহণকারী সন্ত ভক্তগণ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যারা পাপী লোক হয়, তারা তত্ত্বদর্শী সন্তের সৎসঙ্গে যায় না, তাদের কখনো জ্ঞান হয় না। সেই পাপী আত্মারা কেবল নিজের শরীর পোষণ করার জন্যই ভোজন তৈরি করে। বাস্তবে তারা পাপ অন্ন গ্রহণ করছে। কারণ ভোজন গ্রহণ করার পূর্বে আমরা ভক্তগণেরা সর্বপ্রথম পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ভোগ অর্পণ করি। যার ফলে সমগ্র ভোজন পবিত্র প্রসাদ হয়ে যায়। যারা এমনটা করেনা তারা পরমাত্মার চোর। ভগবান কে ভোগ না দেওয়া অন্যকে পাপ যুক্ত অন্য বলা হয়। এইজন্য বলা হয়েছে, যারা ধর্ম-কর্ম শাস্ত্রানুকুল করে না, তারা পাপের ভাগী হয়। (গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৩)

❖ সম্পূর্ণ প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। অন্ন বর্ষা থেকে উৎপন্ন হয়। বর্ষা যজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্র অনুসারে করা ধার্মিক অনুষ্ঠানের ফলে হয়। যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠান শাস্ত্র অনুকূল কর্ম থেকে হয়। (গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪)

❖ কর্ম তো ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষরপুরুষের থেকে উৎপন্ন হয়। কারণ এখানের সকল প্রাণী পূর্বে সনাতন পরমধামে থাকত। সেই সনাতন পরমধামে কোন কর্ম ছাড়ায় সর্বসুখ এবং সমস্ত পদার্থ উপলব্ধ ছিল। এখানকার সকল প্রাণী নিজের ভুলের কারণে ক্ষরপুরুষের সাথে এখানে চলে আসে। এখানে প্রত্যেকের কর্মফলই প্রাপ্ত হয়। কর্ম করেই প্রত্যেকের নির্বাহ হয়। এইজন্য বলা হয়েছে যে, কর্মকে ব্রহ্ম (ক্ষরপুরুষ) থেকে উৎপন্ন জানো, আর ব্রহ্ম অবিনাশী পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে জানো। এরই প্রমাণ অথর্ববেদ কান্ড নম্বর ৪ অনুবাক ১ মন্ত্র নম্বর ৩ এ আছে যে, “ব্রহ্ম ব্রহ্মনঃ উজ্জভার” অর্থাৎ (ব্রহ্মনঃ) সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্ম = পরম অক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) ব্রহ্মকে (উজ্জভার) উৎপন্ন করেছেন। (অধিক জানার জন্য পড়ুন "সৃষ্টি রচনা" এই পুস্তকের 124 নং পৃষ্ঠায়।)

বিঃ দ্রঃ :- গীতা অধ্যায় ৩ এর এই ১৪ নম্বর শ্লোকে "অক্ষর" শব্দের অর্থ অবিনাশী করা হয়েছে,যা সঠিক। কিন্তু যেখানে ক্ষরপুরুষ,অক্ষর পুরুষ এবং পরম অক্ষর পুরুষের বর্ণনা আছে সেখানে অক্ষর পুরুষ এবং ক্ষর পুরুষ দুজনকেই নাশবান বলা হয়েছে। ওখানে অক্ষরের অর্থ যেটা আছে ঠিকই আছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তে বর্ণিত আছে, এখানে "অক্ষর"- এর অর্থ অবিনাশী পরমাত্মা। কারণ সৃষ্টি রচনা থেকে সুস্পস্ট হয় যে, ব্রহ্মের উৎপত্তি সত্য পুরুষই (অবিনাশী পরমাত্মা) করেছিলেন। এই থেকে সিদ্ধ হয় যে, (সর্ব গতম্ ব্রহ্ম) অর্থাৎ যে পরমাত্মার অধিকার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে, যিনি সকলের মালিক, সেই পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞে অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এর ভাবার্থ হল এই যে, পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ইষ্টদেব রূপে প্রতিষ্ঠিত করে ধার্মিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ যজ্ঞ করলে তবেই শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম করা হয় এবং এর প্রতিফলে সাধকের পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত হয়। সর্বোপরি সাধকের মুক্তি (মোক্ষ) লাভ হয়, দেখুন সংসার রূপী চারা গাছের চিত্র এই পুস্তকের 73 - 74 নং পৃষ্ঠায়।

দেখুন 73 নং পৃষ্ঠার চিত্রে এখানে চারাগাছটির শাখা গুলিকে মাটিতে রোপন করা অবস্থায় দেখানো হয়েছে। যারা তিন দেবতার (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুন শিবের) মধ্যে কোন একজনের পূজা করে, তারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে (মনমর্জি) আচরণ করছে। যা গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ -২৪ এ অনুচিত এবং ব্যর্থ বলা হয়েছে। যারা সর্ব গতম্ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের পূজা করে না অথবা ইস্ট দেব রুপে পূজা করে না, তাদের সাধনা ব্যর্থ। শাখা গুলিকে জলসেচ করার ফলে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। অন্য দেবী- দেবতাদের পূজা করা গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫, ২০ থেকে ২৩ এবং গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৩ থেকে ২৪ - এ মানা করা হয়েছে। (পড়ুন ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর)

“দেখুন এই চিত্র” এই পুস্তকের 74 নং পৃষ্ঠায় সোজাভাবে রোপন করা চারা গাছ, যা শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনার প্রতিরূপ, এটি মোক্ষ প্রদায়ী। এই প্রমাণ পবিত্র গীতা গ্রন্থেও আছে।

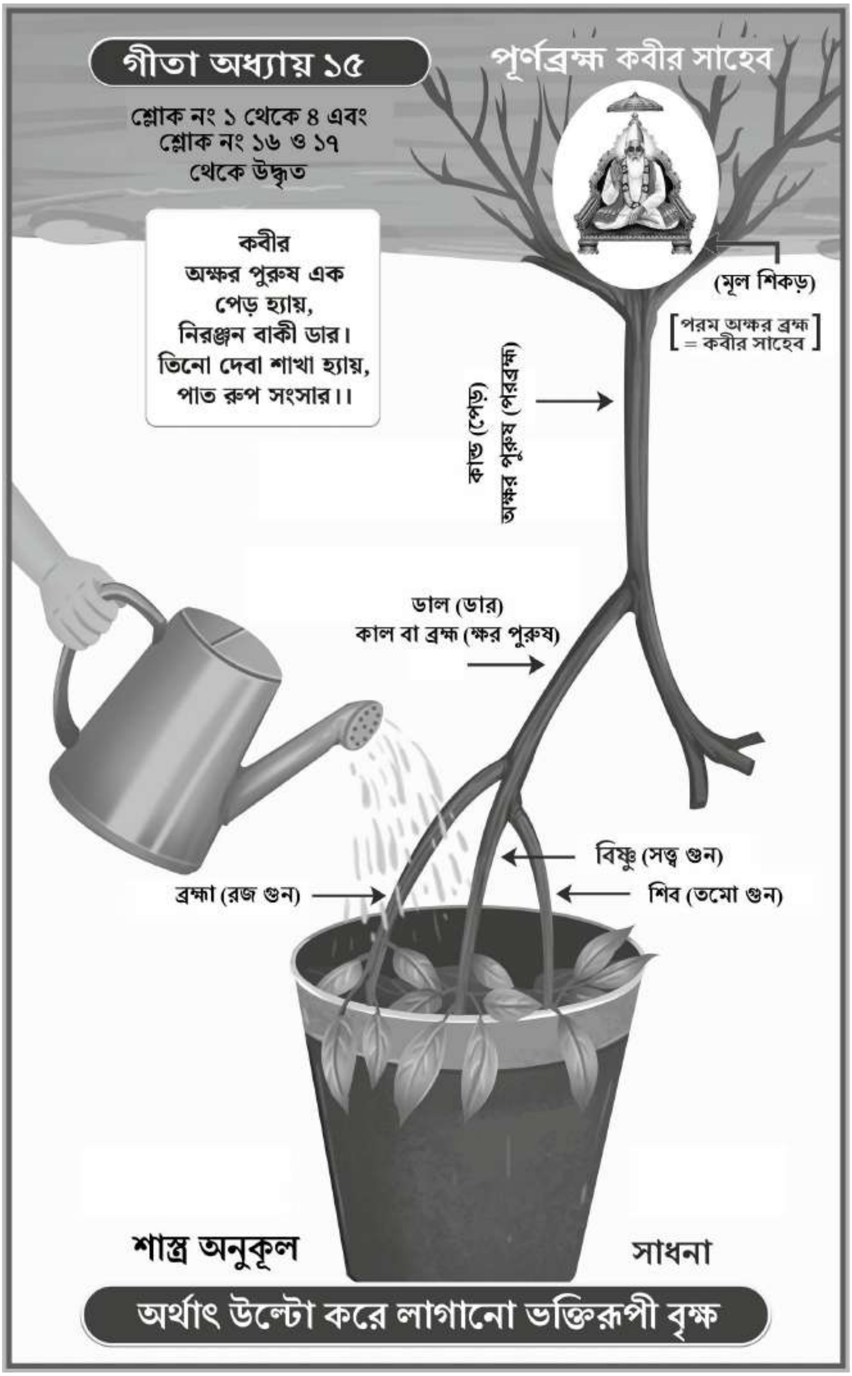
গীতা অধ্যায় ১৫
পূর্ণব্রহ্ম কবীর সাহেব
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
কবীর
অক্ষর পুরুষ এক
পেড় হ্যায়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হ্যায়,
পাত রুপ সংসার।।
(মূল শিকড়)
[পরম অক্ষর ব্রহ্ম = কবীর সাহেব]
কান্ড (পেড়)
অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)
ডাল (ডার)
কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ)
বিষ্ণু (সত্ত্ব গুন)
ব্রহ্মা (রজ গুন)
শিব (তমো গুন)
শাস্ত্র অনুকূল
সাধনা
অর্থাৎ উল্টো করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

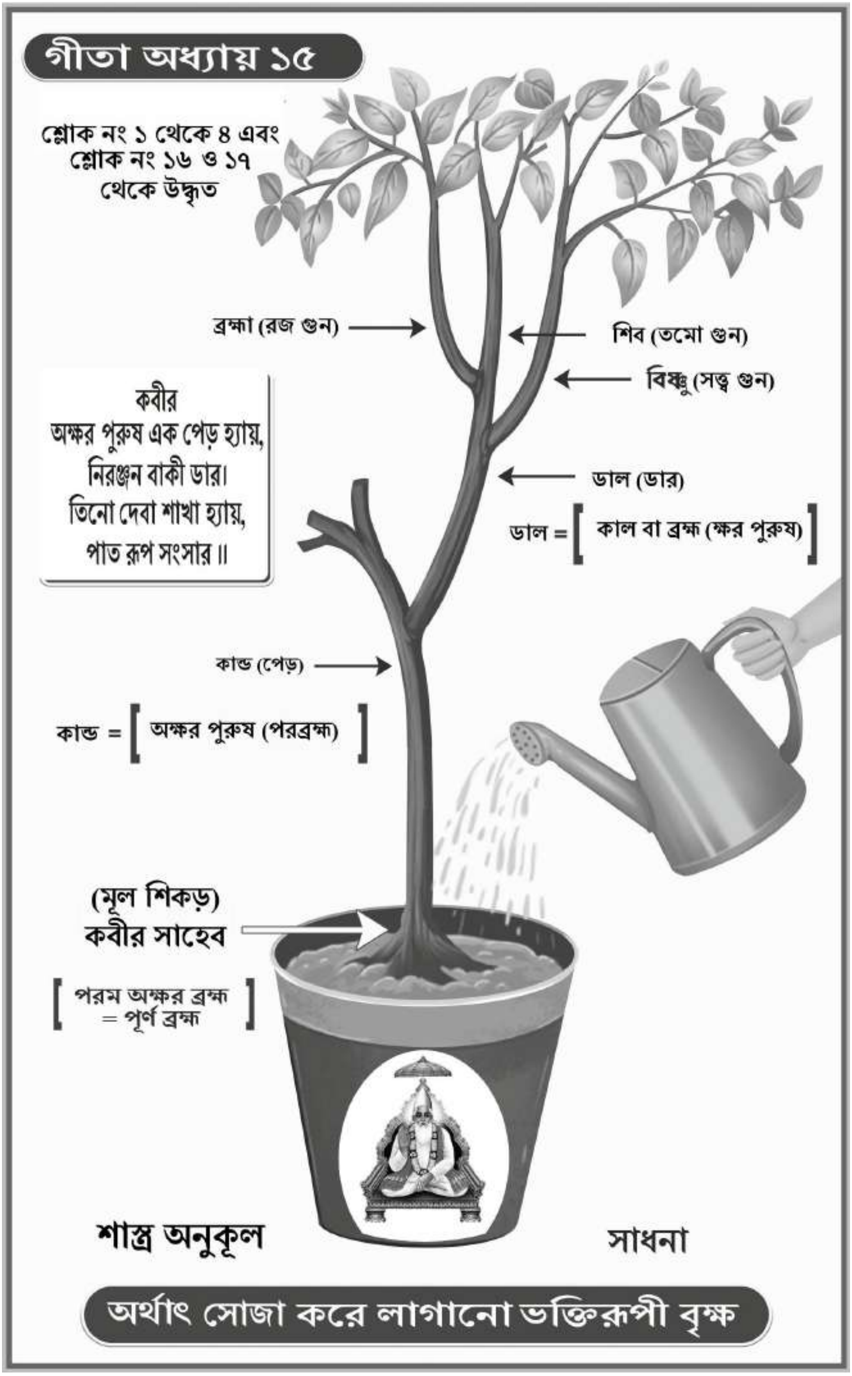
গীতা অধ্যায় ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
ব্রহ্মা (রজ গুন)
শিব (তমো গুন)
বিষ্ণু (সত্ত্ব গুন)
কবীর
অক্ষর পুরুষ এক পেড় হ্যায়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হ্যায়,
পাত রূপ সংসার ॥
ডাল (ডার)
ডাল = [কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ)]
কান্ড (পেড়)
কান্ড = [অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)]
(মূল শিকড়)
কবীর সাহেব
[পরম অক্ষর ব্রহ্ম
= পূর্ণ ব্রহ্ম]
শাস্ত্র অনুকূল
সাধনা
অর্থাৎ সোজা করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

এইজন্য, হে ধর্মদাস! শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রী শিব কে কখনোই ত্যাগ করতে হবে না। এনাদের পূজা, যেভাবে ইষ্টদেব রূপে করছিলে তা ত্যাগ করতে হবে। তবেই ভক্তের পূর্ণ মুক্তি (মোক্ষ) লাভ সম্ভব।

প্রশ্ন ৪৬ (শ্রী ধর্মদাসের) :- হে জিন্দাবাবা! আপনি এই তিন দেবতার (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুন শিবের) ভক্তি করা ভক্তদের দশা তো শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫, ২০ থেকে ২৩ এবং অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৩ - ২৪ এ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণিত করে দিয়েছেন যে, তিনগুণের (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু এবং তমোগুন শিবের) ভক্তি করা ভক্তরা রাক্ষস স্বভাব ধারণকারী মানুষের মধ্যে নীচ, দূষিত কর্ম করা মূর্খরা আমাকেও (গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্মকে) ভজনা করে না। অন্য দেবতাদের পূজা করা ভক্তদের সুখের স্থায়িত্ব (স্বর্গের সময়কাল) ক্ষণিক মাত্র। তারা স্বর্গলাভ করার পর অতি শীঘ্রই পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণ করে। হে মহত্মা! কৃপা করে এই সংসারে ঘটা এমন কোন ঘটনার কথা শোনান, যা দেখে আপনার বলা কথার সত্যতার প্রমাণ মেলে। তিন দেবতার পূজারীরা কেমন ব্যবহার করে, তার উদাহরন নিচে দেওয়া হল।

"হিরণ্যকশিপুরের কথা"

উত্তর (জিন্দা জগদীশের) :- ১. রজগুনী ব্রহ্মার উপাসকের চরিত্র :- হিরণ্যকশিপুর নামের এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। কোন এক কারণে ভগবান বিষ্ণুর (সত্ত্বগুনী) প্রতি তার মনে হিংসা বা রাগের সৃষ্টি হয়। ঐ রাজা কঠোর ভক্তি সাধনা করে রজগুণী দেবতা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করেছিলেন। ভগবান ব্রহ্মা বলেছিলেন, "হে পূজারী! বলো তুমি কি বর চাও? আমি তোমার সাধনায় প্রসন্ন হয়েছি।" এ কথা শুনে হিরণ্যকশিপু বললেন, হে ভগবান! আমাকে এমন বর দিন, যাতে আমার মৃত্যু, না সকালে হয় - না সন্ধ্যায়, না বাইরে হয় - না ভিতরে, না দিনে - না রাত্রে, বারোমাসের কোনো মাসে আমার মৃত্যু যেন না হয়, আমার মৃত্যু যেন আকাশে না হয় আর না মাটিতে, আমাকে না কোনো মানুষ মারতে পারবে আর না-ই বা কোনো পশু - পাখি। একথা শুনে ব্রহ্মা বলেন, "তথাস্তু বৎস।" এরপর থেকেই হিরণ্যকশিপুর নিজেই নিজেকে অমর ভেবে নেন এবং সবাইকে নিজের নামের জপ করতে আদেশ দেন। যারা বিষ্ণুর নাম জপ করতো তাদেরকে প্রাণে মেরে ফেলত। তারই পুত্র প্রহ্লাদ শ্রী বিষ্ণুর ভক্তি করত। তাকে কত-ই না যন্ত্রণা দিয়েছিল। হে ধর্মদাস! সে কথা আপনি ভালোভাবে জানেন। এর ভাবার্থ এই যে রজগুনী ব্রহ্মার ভক্ত হিরণ্যকশিপুরকে রাক্ষস বলা হয়েছে।

"রাবণ এবং ভস্মাসুরের কথা"

২. তমোগুনী শিবের উপাসকদের চরিত্র :- লঙ্কাপতি (রাজা) রাবণ তমোগুনী শিব ভগবানের ভক্তি করেছিলেন। রাবণ নিজের শক্তিতে ৩৩ কোটি দেবী দেবতাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। তারপর, শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা দেবীকে হরণ করেছিলেন। অবশেষে তার কি দশা হয়েছিল, তা আপনি সবকিছু জানেন। তমোগুনী শিব উপাসক রাবণকে রাক্ষস বলা হয়, তার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছিল। সকলের কাছে নিন্দার পাত্র হন।

❖ **অন্য উদাহরণ :-** শ্রী শিবের অন্য এক উপাসক ভস্মাসুরের কথা আপনি শুনেছেন। ভগবান শিবের (তমোগুনী) ভক্তি ভস্মাগিরি করেছিলেন। ভস্মাসুর ১২ বছর ধরে শিবের দরজার সামনে মাথা নিচে, পা উপরে করে (শীর্ষাসন) কঠিন তপস্যা করেছিলেন। একদিন দেবী পার্বতী বললেন, "হে মহাদেব! আপনার ভক্ত কি জন্য এত কঠিন তপস্যা করছে? আপনি সমর্থ্য আপনার ভক্তকে বর প্রদান করুন, প্রভু!" তারপর ভগবান শিব ভস্মাসুরকে জিজ্ঞাসা করেন, "বলো ভক্ত! তুমি কি বর চাও? আমি তোমার প্রতি অতিপ্রসন্ন হয়েছি।" এ কথা শুনে ভস্মাগিরি বললেন, "প্রথমে আপনি আমাকে বচন (কথা) দিন, তারপরে আমি চাইবো।" ভগবান শিব বচন বদ্ধ হলেন। তারপর ভস্মাগিরি বললেন, "আপনার কাছে যে ভস্মাকন্ডা (ভস্মাকড়া) আছে তা আমাকে প্রদান করুন।" ভগবান শিব সেই ভস্মকড়া ভস্মাসুরকে দিয়ে দেন। ভস্মাকড়া হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভস্মাগিরির আসল রূপ সামনে চলে আসে। ভস্মগিরি হাসতে হাসতে বললেন, "সাবধান হয়ে যাও শিব, আমি তোমাকে ভস্ম করে পার্বতীকে আমার স্ত্রী বানাবো।" একথা বলে অভদ্রভাবে হাসতে লাগেন এবং ভগবান শিবকে মারার জন্য তাঁর দিকে দৌড়ে যান। ভগবান শিব এই দুষ্ট ভস্মাগিরির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আগে আগে দৌড়াতে লাগেন। পিছনে পিছনে পূজারী আর সামনে সামনে ইষ্টদেব শিব দৌড়াতে লাগলেন।

বিচার করুন ধর্মদাস! যদি আপনার দেবতা মহাদেব অবিনাশী হতেন তাহলে কখনো মৃত্যুকে ভয় পেতেন না। আপনি তো এনাকে অবিনাশী বলতেন এমনকি অন্তর্যামীও বলতেন। যদি ভগবান শিব অন্তর্যামী হতেন তাহলে আগে থেকেই ভস্মাগিরির মনের নোংরা বিচার জানতে পারতেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, উনি অন্তর্যামী ছিলেন না।

যখন ভগবান শিব আগে আগে দৌড়াছিলেন আর ভস্মাগিরি পিছনে পিছনে তাড়া করছিলেন, ঠিক সেই সময় ভগবান শিব নিজের রক্ষার জন্য পরমেশ্বরকে ডাকলেন, ঐ সময় "পরম অক্ষর ব্রহ্ম" দেবী পার্বতীর রূপ ধারণ করে দুষ্ট ভস্মাগিরির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন, হে ভস্মাগিরি! এসো আমার কাছে এসে বসো। দুষ্ট ভস্মাগিরি বুঝে গিয়েছিলেন যে, এখন আর শিব আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে না। ভস্মাগিরি তো পার্বতীকে পাওয়ার জন্যই এই সব উপদ্রব করছিলেন। হে ধর্মদাস! এসব কথা আপনি সব জানেন। তারপর পার্বতী রূপে পরমাত্মাই ভস্মাগিরিকে গণ্ডহস্ত নাচ নাচিয়ে ভস্ম করে দিয়েছিলেন। তমোগুনী শিব ভগবানের পূজারী ভস্মাগিরি নিজের অপকর্মের কারণে ভস্মাসুর অর্থাৎ ভরমা রাক্ষস নামে পরিচিত। এইজন্য এই তিন দেবতার পূজারীদেরকে রাক্ষস স্বভাব ধারণকারী মানুষের মধ্যে নীচ দূষিত কর্ম করা মূর্খ বলা হয়েছে।

"হরিদ্বারে সাধুদের নরসংহার"

৩. এখন আপনাকে সত্ত্বগুণী শ্রীবিষ্ণু ভগবানের পূজারীদের একটি কাহিনী শোনাব। এক সময় হরিদ্বারে হর কি পৌরিতে কুম্ভ মেলা চলছিল। ঐ মেলা উপলক্ষে তিন গুণের উপাসকরা নিজের নিজের শিষ্য সমুদয়কে নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়ে যায়। গিরি, পুরী, নাগা-নাথ এরা সকলেই তমোগুনী ভগবান শিবের

উপাসক। অপরদিকে বৈষ্ণব সাধুরা সত্ত্বগুনী ভগবান বিষ্ণুর উপাসক। কুম্ভযোগে হর কি পৌরীতে প্রথম স্নান করা নিয়ে দুই সমুদায় ‘নাগা’ এবং ‘বৈষ্ণবদের’ মধ্যে লড়াই ঝগড়া শুরু হয়। এই লড়াইয়ে প্রায় ২৫ হাজার ত্রিগুণের (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু এবং তমোগুন শিবের) পূজারীরা নিজেদের মধ্যে নরসংহার করে মারা যায়। তরোয়াল, ছুরি, কাটারি দিয়ে একে অপরের প্রাণ নিয়ে নেয়। সূক্ষ্ম বেদে বলা হয়েছে যে :-

তীর তুপক তলবার কটারী, জমধর জোর বধাবেঁ হৈঁ।

হর পৈড়ী হর হেত নহীঁ জানা, বহাঁ জা তেগ চলাবেঁ হৈঁ॥

কাটেঁ শীষ নহীঁ দিল করুনা, জগ মেঁ সাধ কহাবেঁ হৈঁ।

জো জন ইনকে দর্শন কুঁ জাবেঁ, উনকো ভী নরক পঠাবেঁ হৈঁ॥

হে ধর্মদাস! উপরোক্ত সত্য ঘটনাগুলি থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, রজগুনী ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণী বিষ্ণু এবং তমোগুনী শিবের পূজা করা ব্যক্তিগন রাক্ষস স্বভাব ধারণকারী মানুষের মধ্যে নীচ দূষিত কর্ম করা মূর্খ, (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫)।

❖ জিন্দা পরমেশ্বরের মুখ কমল থেকে একথা শুনে ধর্ম দাসের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, মাথা ঘুরতে লাগল। মনে সাহস এনে ধর্মদাস বললেন, হে প্রভু! আপনি আমার মতো অজ্ঞানতায় অন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে জ্ঞানচক্ষু দান করেছেন, দাতা। আপনার বলা উপরোক্ত কাহিনীগুলি আমি আগে থেকেই শুনে এবং পড়ে আসছি কিন্তু কখনো বিচার করিনি যে, আমরা ভুল রাস্তায় যাচ্ছি। আপনাকে শত শত ধন্যবাদ, আপনি আমার মত পাপী প্রাণীকে নরকে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন প্রভু!

প্রশ্ন ৪৭ (শ্রী ধর্ম দাসের) :- হে জিন্দা মহাত্মা! আপনি যা বলেছিলেন, তা আমি গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮তে স্বচক্ষে দেখেছি, যেখানে গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম নিজেই নিজের সাধনাতে হওয়া গতিকে অনুত্তম অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বলেছেন। কৃপা করে এমন কোন উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন, কোনো কাহিনী, প্রসঙ্গ শোনান।

উত্তর (জিন্দা বাবা বেশধারী পরমেশ্বরের) :- গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫ এবং ৯, গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ এ গীতা জ্ঞানদাতা (ব্রহ্ম) বলেছেন, “হে অর্জুন! আমার আর তোর বহু জন্ম অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তুই জানিস না কিন্তু আমি জানি।” শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বলেছেন, তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করে পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধক আর কখনো এই সংসারে ফিরে আসে না। যে পরমেশ্বর থেকে এই সংসাররূপী বৃক্ষের প্রবৃত্তি বিস্তার লাভ করেছে অর্থাৎ যে পরমেশ্বর এই সংসার সৃষ্টি করেছেন, সেই পরমেশ্বরের ভক্তি করা উচিত। আবার গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, “হে অর্জুন! তুই সর্বভাবে ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা, ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি এবং সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত করবি।” হে ধর্মদাস! যতদিন জন্ম মৃত্যু হতে থাকবে ততদিন পরম শান্তি হতে পারে না, আর না সনাতন পরম ধাম প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে পরমগতি তো তাকেই বলে যা প্রাপ্তির পর চিরকালের জন্য জন্ম-মৃত্যু সমাপ্ত হয়ে

যায়। এই পরম গতি কখনো ব্রহ্মের সাধনায় লাভ করা সম্ভব নয়। এই জন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, “যে সমস্ত জ্ঞানী আত্মা আছেন তারা আমার বিচারে ভালো কিন্তু তারা সকলেই আমার অনুত্তম (অশ্রেষ্ঠ) গতিতেই লীন হন কারণ তারা আমারই (ব্রহ্মের) ভক্তি করতে থাকেন।” ব্রহ্ম সাধনার জন্য একমাত্র ‘ওঁম’ মন্ত্র আছে। এই মন্ত্র জপ করলে সাধকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, ব্রহ্মলোকে যাওয়া সাধকও পুঃনরায় এই সংসারে ফিরে আসেন। এইজন্য তাদের পরম শান্তি এবং সনাতন পরমধাম কোনোটাই প্রাপ্তি হয় না। তার পরিবর্তে কিছু সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়ে যায়, যার দ্বারা ঋষিগণ চমৎকার করে কারো ক্ষতি করে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। অবশেষে পাপের ভাগী হয়ে ৮৪ লাখ প্রকার প্রাণীর শরীরে কষ্ট ভোগ করতে থাকেন। এই জন্য ব্রহ্ম সাধনায় হওয়া গতিকে অর্থাৎ উপলব্ধিকে অনুত্তম (অশ্রেষ্ঠ) বলা হয়েছে।

“চুনক ঋষি কর্তৃক মান্ধাতা রাজার বিনাশের কথা”

❖ **কথা প্রসঙ্গ :-** গীতা জ্ঞানদাতা (ব্রহ্ম) গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৬ থেকে ১৭ তে বলেছেন, আমার ভক্তি সাধনা সাধারণত চার প্রকার ভক্তরা করে থাকে :- ১.আর্ত (সংকট নিবারণের জন্য) ২. অর্থার্থী (ধন লাভের জন্য) ৩. জিজ্ঞাসু, (যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত করে বক্তা হতে চান) আর ৪. জ্ঞানী (যারা কেবলমাত্র মুক্তি লাভের জন্য ভক্তি করেন) এই চার প্রকার ভক্তদের মধ্যে চতুর্থ নং জ্ঞানী ভক্তই আমার প্রিয়।

❖ **জ্ঞানী আত্মার বিশেষত্ব :-** জ্ঞানী আত্মা তো তারাই যারা জেনে যায় যে, মানব জীবন কেবলমাত্র মোক্ষ লাভ করার জন্যই প্রাপ্ত হয়। তাঁরা এটাও জানেন যে, পূর্ণ মোক্ষের (মুক্তির) জন্য একমাত্র পরমাত্মার ভক্তি করা উচিত। অন্য দেবতাদের (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু এবং তমোগুণ শিবের) ভক্তিতে পূর্ণ মোক্ষ লাভ (মুক্তি) হয় না। ঐ জ্ঞানী আত্মারা গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এবং যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০ এ বর্ণিত তত্ত্বদর্শী সন্তের শরণ না পাওয়ার কারণে, ওনারা বেদ থেকে নিজেরাই নিষ্কর্ষ বের করে ব্রহ্মকে সমর্থ্য পরমাত্মা নির্বাচন করে ওঁম্ মন্ত্রের ভক্তি করেন। এর প্রতিফলে তাঁরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করেন। তাঁরা এটাকেই মোক্ষলাভ হয়েছে বলে মনে করেন।

জ্ঞানী আত্মাগণ পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য কঠোর তপস্যা করে। এক স্থানে বসে ওম্ (ওঁ) নামের জপ করে ঘোর তপস্যা করতে থাকেন, অথচ বেদ এবং গীতাতে হঠযোগ করা, ঘোর তপস্যা করা ব্যাক্তিদেরকে মূর্খ, অহংকারী এবং রাক্ষস বলা হয়েছে। গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৪ থেকে ৯, গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১৭ থেকে ২০ এবং গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ১- ৩)। এদের এই হঠযোগ করার প্রেরণা কিভাবে হয়েছে? শ্রীদেবীপুরাণ (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত সচিত্র (মোটা টাইপ) এর তৃতীয় স্কন্দে লেখা আছে যে ব্রহ্মা নিজের পুত্র নারদকে বলেছিলেন, যখন আমার উৎপত্তি হয় তখন আমি নিজেকে পদ্মফুলের উপরে বসে থাকা অবস্থায় দেখতে পাই। সেই সময় হঠাৎ আকাশবাণী হয় ‘তপ করো’-‘তপ করো’। একথা শুনে আমি এক হাজার বছর পর্যন্ত তপস্যা করি।

হে ধর্মদাস! বেদ তো অনেক পরে সাগর মন্থনের সময় ব্রহ্মা পেয়েছিলেন।

যখন তিনি বেদ পড়লেন তখন যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১৫-তে 'ওঁম্' নামের খোঁজ পেলেন। এই মন্ত্রের জপ আর সেই সাথে আকাশ বাণীতে শোনা হঠযোগ (ঘোর তপস্যা) এই দুটিকে একসাথে নিয়ে ব্রহ্মা স্বয়ং হঠযোগ (ধ্যান) করেছিলেন এবং পরে নিজের সন্তানদের (ঋষিদের) এটা করতে বলেছিলেন। (চতুর্বেদে এবং এরই সারাংশ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে হঠযোগ করে ঘোর তপস্যা করা ব্যক্তিদের রাক্ষস, ক্রুরকর্মী এবং নরাধম অর্থাৎ নীচ ব্যক্তি বলা হয়েছে, এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১৭ থেকে ২০ এবং অধ্যায় ১৭ শ্লোক ১ থেকে ৬)। এই রূপ সাধনা জ্ঞানী আত্মা অর্থাৎ ঋষিগন করতে শুরু করেন। ওই জ্ঞানী আত্মাদের মধ্যে একজন হলেন চুনক ঋষি, যার প্রসঙ্গ এখন শোনাবো। এই ঘটনা থেকে আপনি আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন। :-

চুনক নামে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি কয়েক হাজার বছর ধরে ঘোর তপস্যা করেন এবং সেই সাথে ওঁম (ওঁ) মন্ত্রের জপ করেন। এইভাবে উনি ব্রহ্ম সাধনা করেছিলেন। এদিকে ব্রহ্ম প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন, "আমি কোন প্রকার সাধনায় অর্থাৎ না বেদে বর্ণিত যজ্ঞে, না মন্ত্র জপে, না তপস্যা করার প্রতিফলে কাউকে দর্শন দেব না অর্থাৎ কোন কিছুর বিনিময়ে কখনো আমি কাউকে দর্শন দেব না।" গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৮ এ বলেছেন, "হে অর্জুন! তুই আমার যে রূপের দর্শন করেছিস অর্থাৎ আমার যে কাল রূপ দেখেছিস, সেটাই আমার স্বরূপ। এই রূপের দর্শন না কোনো বেদে বর্ণিত বিধিতে, না কোনো মন্ত্র জপে, না কোনো তপস্যা করে, না কোনো যজ্ঞ করে আর না কোনোরূপ ক্রিয়াকর্ম করে সম্ভব।" গীতা জ্ঞান দাতা গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪-২৫ এ স্পষ্ট করে বলেছেন, "এটাই আমার অবিনাশী বিধান যে আমি কখনো কাউকে কোনোভাবেই দর্শন দিই না। আমি আমার যোগ-মায়ার শক্তিতে লুকিয়ে থাকি। এই মূর্খ লোকেরা আমাকে মনুষ্য রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণ রূপ বলে মনে করছে।" সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেনাদের দিকে সংকেত করে গীতা জ্ঞানদাতা এ কথা বলেছিলেন। এ কথা বলার ভাবার্থ এই, "আমি কাউকে দর্শন দিই না, এখন কেবলমাত্র তোর উপর অনুগ্রহ করে আমার এই বিরাট রূপ তোকে দেখালাম।"

ভাবার্থ :- বেদে বর্ণিত বিধিতে এবং অন্য প্রচলিত ক্রিয়াকর্মে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না। তাই চুনক ঋষিও পরমাত্মা পাননি। তার পরিবর্তে কিছু সিদ্ধি পেয়ে যান। এটাকেই ঋষিগণ ভক্তির চূড়ান্ত উপলব্ধি মেনে নেয়। যে ঋষির কাছে যত বেশি সিদ্ধিশক্তি থাকতো তাকে তত বেশি বড় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ঋষি মনে করা হত। চুনক ঋষিও এমন সিদ্ধি শক্তি যুক্ত উপলব্ধি প্রাপ্ত করেছিলেন।

এক সময় মান্ধাতা নামের এক শক্তিশালী চক্রবর্তী রাজা ছিলেন, যাঁর রাজ্যের বিস্তার সমগ্র পৃথিবীতে জুড়ে ছিল। ওনার প্রায় ৭২ অক্ষৌহিনী সৈনিক ছিল। তিনি নিজের অন্তর্গত রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য একটি ঘোড়ার গলায় পত্র বেঁধে সমস্ত দেশে ঘোরানোর জন্য ছেড়ে দেন এবং শর্ত রাখেন এই যে, যারা মান্ধাতা রাজার গোলামী (অধীনতা) অস্বীকার করবে, তারা যেন এই ঘোড়া বেঁধে রেখে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। সমগ্র পৃথিবীতে কোন রাজার সাহস হয়নি এই ঘোড়া বেঁধে রাখার। এই ঘোড়ার পিছনে পিছনে কিছু সৈনিকও ছিল। ফিরে আসার সময়

যখন ঋষি একথা জানতে পারেন, তখন তিনি গিয়ে সৈনিকদের জিজ্ঞাসা করেন, “কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?” উত্তরে সৈনিকরা বলল, “আমরা সম্পূর্ণ পৃথিবী ঘুরে আসছি কিন্তু কারো এই ঘোড়া বাঁধার সাহস হয় নি, কেউই রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী হয় নি।” একথা শুনে চুনক ঋষি বললেন, “আমি রাজার সাথে যুদ্ধ স্বীকার করছি।” ঋষির কথা শুনে সৈনিকরা বলল, “আরে কাঙ্গাল! তোর কাছে তো খাওয়ার জন্য একটা দানাও নেই, আর তুই যুদ্ধ করবি মহারাজা মান্ধাতার সাথে?” চুনক ঋষি ঘোড়া ধরে নিয়ে গিয়ে একটা গাছে বেঁধে দেন। মান্ধাতা রাজা যখন জানতে পারলেন তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। মান্ধাতা রাজা নিজের ৭২ অক্ষৌহিনী সেনাকে চার ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগে ১৮ অক্ষৌহিনী (কোটি) সেনার সাথে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দেন। অপরদিকে চুনক ঋষি নিজের সিদ্ধি শক্তিতে চারটি পুতুল (বোমা) বানিয়ে রাখেন। ঋষি একটি পুতুলকে (বোমা) ছেড়ে রাজার আঠারো অক্ষৌহিনী সেনাকে ধ্বংস করে দেন। রাজা দ্বিতীয় ভাগের সৈন্যদের পাঠান, ঋষি দ্বিতীয় পুতুল (বোমা) ছেড়ে দিয়ে তাদেরকেও ধ্বংস করে দেন। এইভাবে চুনক ঋষি মান্ধাতা রাজার ৭২ অক্ষৌহিনী সেনাকে নিজের সিদ্ধি শক্তির বলে ধ্বংস করে দেন, যার কারণে জগতে চুনক ঋষির মহিমা ছড়িয়ে পড়ে। এই অঘটন ঘটানোর জন্য চুনক ঋষিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি বলা হয়।

জিন্দা রূপধারী পরমাত্মা বললেন, হে ধর্মদাস! চুনক ঋষি এই যুদ্ধে যত সেনাকে হত্যা করেছিলেন, তার পাপকর্ম চুনক ঋষির সঞ্চিত কর্মে জমা হয়ে যাবে। ঋষি যে এক অক্ষর বিশিষ্ট ওঁম মন্ত্র জপ করেছিলেন, তার প্রতিফলে প্রথমে ব্রহ্মলোকে যাবেন, তারপর ব্রহ্মলোকে নিজের সুখী সময় ব্যতীত করে অবশেষে পৃথিবীতে জন্ম নেবেন। যে হঠযোগ তপস্যা করেছিলেন, তার প্রতিফলে পৃথিবীতে রাজা হবেন। আবার মৃত্যুর পর কুকুর হয়ে জন্ম নেবেন এবং যে ৭২ কোটি সেনা হত্যা করেছিলেন, তারা নিজের বদলা নেবে অর্থাৎ ওই কুকুরের মাথায় যখন কোনো ক্ষত (ঘা) হবে তখন ক্ষতস্থানে পোকা হয়ে ৭২ কোটি সেনা নিজের বদলা নেবে। এই জন্য, হে ধর্মদাস! গীতাজ্ঞান দাতা ব্রহ্ম নিজের সাধনাতে হওয়া গতি অর্থাৎ মুক্তিকে অনুত্তম (অশ্রেষ্ঠ) বলেছেন।

প্রশ্ন ৪৫ (শ্রী ধর্ম দাসের) :- হে জিন্দা বাবা! আমি একবার এক মহামন্ডলেশ্বরকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন পরমেশ্বরের শরণে যাওয়ার জন্য বলেছেন? ঐ মন্ডলেশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও ভগবান নেই। শ্রীকৃষ্ণই হলেন পূর্ণ পরমাত্মা তিনি নিজেই নিজের শরণে আসার জন্য বলেছেন। এটা শুধুমাত্র কথার হেরফের। হে জিন্দা বাবা! আমি অজ্ঞানী আমার সন্দেহের নিবারণ করুন।

উত্তর (জিন্দা পরমেশ্বরের) :- হে ধর্মদাস!

য়ে মালা ডাল হুয়ে হৈঁ মুক্তা। ষটদল উবা-বাঈ বকতা।

আপনার এই মন্ডলেশ্বর এবং শঙ্করাচার্যগন উল্টো-পাল্টা কথা বলে সহজ সরল জনতাদেরকে ভ্রমিত করছে, আর বলছে যে, গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে অর্জুনকে নিজের শরনে আসার জন্য বলেছেন। এটা সম্পূর্ণ

ভুল কারণ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৭ এ অর্জুন নিজেই বলেছিলেন, "হে কৃষ্ণ! এখন আমার বুদ্ধি ঠিকমত কাজ করছে না। আমি আপনার শিষ্য, আমি আপনার শরনে আছি। আমার যাতে কল্যাণ হয়, সেই জ্ঞান আমাকে দিন।" হে ধর্মদাস! অর্জুন তো অনেক আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের শরণে ছিলেন। এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে গীতা জ্ঞানদাতা নিজেই নিজের শরণ থেকে অন্য "পরম অক্ষর ব্রহ্ম" এর শরণে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, "হে অর্জুন! তুই আমার ভক্ত, তাই আমি তোকে এই গীতাজ্ঞান দিয়েছি। গীতা জ্ঞানদাতা অপেক্ষা অন্য পূর্ণ পরমাত্মার প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১১ থেকে ২৮, ৩০, ৩১ এবং ৩৪ এর মধ্যেও আছে।

❖ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক ১ -এ বলেছেন যে, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় আর যে এই ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে জানে তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয় (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১)।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২ এ গীতাজ্ঞান দাতা বলেছেন,"আমি হলাম ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুটি বিষয়ে জানতে পারাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা হয়ে থাকে, এটাই হলো আমার সিদ্ধান্ত"। গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১০ এ বলেছেন, "আমার ভক্তিও অব্যাভিচারিণী হওয়া দরকার"। যেমন অন্য দেবতাদের সাধনাকে গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২ থেকে ১৫ এবং ২০ থেকে ২৩ এ এবং অধ্যায় ৯ শ্লোক নং ২৩ থেকে ২৪-এ ব্যর্থ বলা হয়েছে। কেবলমাত্র ব্রহ্মের ভক্তি করতে বলেছেন। এ বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে অন্য কোনও দেবী-দেবতার প্রতি আসক্ত না হতে। ভাবার্থ হল এই যে, ভক্তি ও মুক্তির জন্য জ্ঞান বুঝতে হবে, বক্তা হওয়ার জন্য নয়। এর বাইরে বক্তা হওয়ার জন্য জ্ঞান শোনা মূর্খতা। পতিব্রতা স্ত্রীর মত কেবলমাত্র আমার উপর আস্থা রেখে ভক্তি করো। অন্য জনতার কাছে বসে বক্তব্য দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। কোনো একান্ত স্থানে বসে ভক্তি করো।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১১ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি রুচি রেখে তত্ত্বজ্ঞান জানার জন্য সদগ্রন্থ দেখা উচিত যা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান। অপরপক্ষে তত্ত্বজ্ঞান উপেক্ষা করে বিভিন্ন কথা কাহিনী শোনা, বলা, শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভক্তি করা, এগুলি সবই অজ্ঞান। পরমাত্মার স্বরূপ জানতে যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাকেই প্রকৃত জ্ঞান বলা হয়।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১২ তে গীতা জ্ঞান দাতা নিজের থেকে অন্য "পরম ব্রহ্ম" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পরমাত্মার বিষয়ে জ্ঞান করান, যে পরমাত্মা (জ্ঞেয়ম্) জানবার যোগ্য, যাকে জানার পর (অমৃতম্ অশ্নুতে) অমরত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ণ মুক্তির অমৃতসম আনন্দ প্রাপ্তি হতে থাকে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করবো। তৎ (তত) সেই দ্বিতীয় অর্থাৎ অন্য (ব্রহ্ম) পরমাত্মাকে না সৎ বলা হয়, না অসৎ বলা হয়। গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩২,৩৪ এ বলেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান আছে। ঐ তত্ত্বজ্ঞান পরমাত্মা স্বয়ং নিজের মুখ কমলে বলে থাকেন। ঐ তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র তত্ত্বদর্শী সন্তই বুঝতে পারেন, ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, ছল-কপটতা ছেড়ে বিনম্রভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, সেই পরমাত্ম

তত্ত্বকে ভালোভাবে জানা ঐ তত্ত্বদর্শী সন্ত তোকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা নিজেই পরমাত্মার সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিষয়ে অপরিচিত। এই জন্য বলেছেন যে, অন্য পরমাত্মা অর্থাৎ যিনি গীতা জ্ঞানদাতা থেকে ভিন্ন। তিনি না-তো সৎ আর না অসৎ। এখানে পরব্রহ্মের অর্থ সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী পরব্রহ্ম অর্থাৎ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৬ তে বলা অক্ষর পুরুষ নয় কারণ কাল লোকে (২১ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে) অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মের কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। এখানে কাল লোকে কেবল কাল পুরুষ এবং দয়ালের ভূমিকা আছে। এই জন্য এখানে (পর মানে অন্য, আর ব্রহ্ম মানে পরমাত্মা) ব্রহ্ম থেকে অন্য পরমাত্মা 'পূর্ণ ব্রহ্মের' বর্ণনা করা হয়েছে।

ভাবার্থ :- গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১২ তে বলেছেন, "আমার থেকে ভিন্ন অন্য যে ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রভু আছেন, তিনি হলেন অনাদি। অনাদি কথার অর্থ হল যার কোনো আদি অর্থাৎ সূচনা নেই, যার কখনো জন্ম হয়নি। গীতা জ্ঞানদাতা হলেন ক্ষরপুরুষ, এনাকে 'ব্রহ্ম' ও বলা হয়ে থাকে। ইনি গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ১২, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৫, ৯ এবং গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ২ এ স্বয়ং স্বীকার করে বলেছেন, "হে অর্জুন! তোর আর আমার বহু জন্ম অতিবাহিত হয়েছে, তুই জানিস না কিন্তু আমি জানি।" এই উক্তিতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে জ্ঞানদাতা উপরোক্ত অনাদি 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ পরমাত্মা নয়। একই সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১২ -তে নিজের থেকে অন্য অবিনাশী পরমাত্মার মহিমা বর্ণনা করেছেন। (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং-১২)

❖ গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম, এনার এক হাজার (সহস্র) বাহু আছে। এনার সহস্র কমল অর্থাৎ হাজার পাপড়ি যুক্ত পদ্মফুল আছে। গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক নং ৪৬ এ অর্জুন বলেছেন, "হে সহস্র বাহু!(হাজার ভুজা যুক্ত প্রভু) আপনি চতুর্ভুজ রূপে ফিরে আসুন।" এই কথায় প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু কেবল ১০০০ ভুজার অধিকারী। এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৩ তে গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে অন্য, সর্বদিকে বিস্তারিত হস্ত, পদ, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, মুখমন্ডল বিশিষ্ট পরমাত্মার মহিমার কথা বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে বলেছেন যে, ঐ পরমাত্মা এই সংসারে সবকিছুকে ব্যপ্ত (বিস্তার) করে অর্থাৎ নিজের শক্তি দিয়ে ধরে রেখেছেন এবং স্বয়ং সত্যলোকে (শাশ্বত-স্থানম্-তিষ্ঠতি) বিরাজমান আছেন। এই থেকে স্পষ্ট হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অন্য সমর্থ্য পরমাত্মা আছেন। তিনি সকল সংসারের সঞ্চালক এবং পালনকর্তা। (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৩)।

❖ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৪ - তে স্পষ্টভাবে গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে অন্য পরমাত্মার জ্ঞান করিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ঐ পরমাত্মা অন্তর্যামী কারণ তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে জানেন। তিনি স্বয়ং ইন্দ্রিয় রহিত অর্থাৎ পরমাত্মার ইন্দ্রিয় মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীদের মত বিকার গ্রস্ত নয়। ঐ পরমাত্মা আসক্তি রহিত অর্থাৎ তিনি এই কাল লোকের (২১ ব্রহ্মাণ্ডের) কোনো বস্তু-পদার্থের উপর আসক্তি রাখেন না কারণ ঐ পরমাত্মার নিজ ধাম সত্যলোক, এই কাল লোকের ক্ষেত্র অপেক্ষা অসংখ্য গুন উত্তম। এই জন্য ওই পরমাত্মাকে আসক্তি রহিত বলা

হয়েছে, তিনি সকলের ধারন পোষণকারী। এরই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৭ তে আছে। ওই পরমাত্মা নির্গুণ হয়েও কিন্তু সর্গুন রূপে এসে নিজের মহত্ব দেখিয়ে থাকেন। যেমন :- যেভাবে আমের গাছ আমের বীজের (আমের আঁটির) ভিতরে নির্গুণ অবস্থায় থাকে, ঐ বীজ কে যখন রোপন করা হয় তখন সেটি প্রথমে চারা আম গাছ হয়। তারপর ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ বড় আম গাছ রূপে পরিণত (সর্গুণ) হয়ে নিজের মহত্ব প্রকট করে। কিন্তু পরমাত্মা সত্যলোকে সিংহাসনে সর্গুণ রূপে বিরাজমান আছেন, কারণ পরমাত্মা নিজের বচনশক্তিতে সমস্ত কিছু রচনা করে মজবুত বিধান বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। ঐ পরমাত্মার বিধান অনুসারে সমস্ত প্রাণী এবং নক্ষত্র সমূহ সৃষ্টি ও ধ্বংস হতে থাকে, জীব নিজের কর্মানুসারে জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত করতে থাকে। পরমাত্মার কোন চিন্তা নেই কিন্তু পরমাত্মা যখন পৃথিবীতে প্রকট হন তখন তিনি সর্বগুণের ভোক্তা হন। যেমন আম গাছকে নির্গুন থেকে সর্গুণ হতে অনেক সময় লাগে কিন্তু পরমাত্মার জন্য কোনও সময়সীমা নেই। কারণ তিনি তো এক পলকের মধ্যে নির্গুণ থেকে সর্গুণ হতে পারেন। যেমন পরমাত্মা যখন এক পলকে সত্যলোকে চলে যান, তখন তিনি আমাদের জন্য নির্গুণ হয়ে যান। তখন আমরা ওনার গুনের লাভ প্রাপ্ত করতে পারি না। পরক্ষনে সত্যলোক থেকে পৃথিবীতে প্রকট হয়ে যান অর্থাৎ সর্গুণ হয়ে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে নিজের গুণের লাভ প্রদান করে থাকেন। এইভাবে পরমাত্মাকে নির্গুণ সর্গুণ বলা হয়েছে। এই উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা ছাড়া অন্য কেউ আছেন যিনি সকলের ধারন পোষণকারী পরমাত্মা।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৫ থেকে ১৬ তে এরই প্রমাণ আছে। গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, যেমন সূর্য আমাদের থেকে অনেক দূরে হলেও পৃথিবীর উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে রাখে। সেইরুপ পরমাত্মা সত্যলোকে বিরাজমান (স্থিত) হয়েও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপর নিজের শক্তির প্রভাব বিস্তার করে রাখেন। তিনি সমস্ত চর-অচর (চরাচর) অর্থাৎ সর্বভুতের (প্রাণী এবং তত্ত্বের) ভেতরে ও বাইরে বিরাজমান আছেন। এইভাবে তিনি অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় আমরা আমাদের চর্ম-দৃষ্টি দিয়ে ওনাকে দেখতে পারি না। এইজন্য তিনি অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং ঐ পরমাত্মাই আমাদের নিকটে আছেন, এমনকি দূরেও উনি স্থিত আছেন। পরমাত্মা তো দূরে সত্যলোকে (শাশ্বত স্থানে) বিরাজমান আছেন, কিন্তু ওনার শক্তির প্রভাব প্রত্যেকের সাথে আছে। (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৫)

❖ যেমন সূর্য দূরে থাকলেও পৃথিবীর ওপর প্রত্যেক প্রাণী তাকে নিজের সাথে দেখতে পায়। উদাহরণ স্বরূপ বেশ কয়েকটা জলভরা কলসী নিয়ে খোলা আকাশের নিচে রাখলে প্রতিটি কলসীর মধ্যে সম্পূর্ণ সূর্য দেখা যাবে, কোথাও টুকরো টুকরো হয়ে দেখা যাবে না। সেই প্রকার পরমাত্মাও প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখা দেন, যদিও পরমাত্মা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিরাজমান আছেন। সেই জন্য ঐ পরমাত্মা জানবার যোগ্য রয়েছেন। ভাবার্থ এই যে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, “আমার থেকে অন্য পরমাত্মার জ্ঞান হওয়া দরকার, তিনি জানবার যোগ্য রয়েছেন। ঐ পরমাত্মা নিজের বিধান অনুসারে সকলের ধারন-পোষণ, উৎপত্তি এবং মৃত্যু ঘটান। বাস্তবে

তিনিই তো 'ব্রহ্মা' (সকলের উৎপত্তিকর্তা), বাস্তবে তিনিই তো 'বিষ্ণু' (সকলের ধারন-পোষণকারী), বাস্তবে শিব-শঙ্কর (সংহারকারী)ও হলেন তিনি। অপরদিকে এখানকার ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব তো কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি বিভাগের কর্তা কিন্তু সেই পরমাত্মা তো অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শংকর রূপে স্বয়ং বিদ্যমান আছেন। যেমন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রীর মত প্রতিটি রাজ্যেও এক একটি গৃহ মন্ত্রী নিযুক্ত থাকে। আবার অনেক সময় দেশের প্রধানমন্ত্রীও নিজের কাছে অন্যান্য বিভাগও রাখেন। ঐ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও গৃহমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীরও ভূমিকা পালন করেন, সেই সাথে তিনি প্রধানমন্ত্রীও হয়ে থাকেন।

এই সকল উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে অন্য সমর্থ পরমাত্মার মহিমা বর্ণনা করেছেন। গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অন্য কোনও পূর্ণ পরমাত্মা আছেন। (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৬) গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৭ তে গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে অন্য পরমাত্মার মহিমা বর্ণনা করেছেন, যা এই প্রকার :-

❖ সেই অন্য পরমাত্মা (পরম ব্রহ্ম) সমস্ত জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি অর্থাৎ তিনি সমস্ত প্রকাশের স্রোত, ঐ অন্য সমর্থ পরমাত্মার শক্তিতেই সবকিছু প্রকাশমান। আর ঐ পরমাত্মার প্রকাশ সকলের থেকে অধিক। ঐ পরমাত্মা মায়া থেকে অতি ঊর্ধ্বে – এমনটা বলা হয়ে থাকে। বাস্তবে তো তিনিই হলেন নিরঞ্জন। গীতাজ্ঞান দাতা যে নিরঞ্জন, তাকে মায়া সহিত জ্যোতি নিরঞ্জন বলা হয়ে থাকে। সেই পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের ভান্ডার, তিনি কেবলমাত্র জানার যোগ্য, (জ্ঞানগম্যম্) তাঁকে তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা পাওয়া সম্ভব।

এই গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৭ তে মূল পাঠে "জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ জ্ঞান গম্যম্" লেখা আছে, যার ভাবার্থ হল (জ্ঞানম্) - পরমাত্মা স্বয়ং পৃথিবীতে প্রকট হয়ে নিজের মুখ কমলে যে তত্ত্বজ্ঞান বলেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানকে 'জ্ঞানম' বলে। এইজন্য তিনি জ্ঞান রূপে আছেন অর্থাৎ তিনি জ্ঞানের ভান্ডার। ঐ পরমাত্মা 'জ্ঞেয়ম্ জ্ঞানগ্যম্' ঐ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জানার যোগ্য এবং ঐ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য। ওই পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান আছেন। যেমন সূর্য বহু দূরে থাকা সত্ত্বেও খোলা আকাশের নীচে থাকা প্রত্যেকটি কলসীর জলের মধ্যে দেখা যায়। বাস্তবে তো সূর্য ঐ কলসীর মধ্যে নেই কিন্তু কলসীর উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে রাখে, এমনকি উষ্ণতা প্রদান করে। তাই সূক্ষ্মবেদে বলা হয়েছে :-

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাঙ্গ ঝুমকরা।
নহীঁ সব বাজীকে খম্ব সুনোঁ রাঙ্গ ঝুমকরা॥
বহ সর্ব ঠাম সব ঠোর হৈ রাঙ্গ ঝুমকরা।
সকল লোক ভরপুর সুনো রাঙ্গ ঝুমকরা॥

এর প্রমাণ আছে গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬১তেও। এখানে বলা হয়েছে যে, হে অর্জুন! শরীর রূপ যন্ত্রে আরোহী হয়ে অন্তর্যামী পরমেশ্বর সমস্ত প্রাণী কে নিজের মায়া অর্থাৎ শক্তির দ্বারা তাদের কর্ম অনুসারে ভ্রমণ করায় অর্থাৎ তাদের সংস্কার অনুসারে ভালো-মন্দ যোনিতে ভ্রমণ করতে থাকে। ঐ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর

সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান আছেন। এইভাবে পরমেশ্বরের মহিমা গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক ১৭ তে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ফলে প্রমাণিত হয় যে গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে অন্য পূর্ণ পরমাত্মার মহিমা বর্ণনা করেছেন। (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৭)।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৮ তে গীতাজ্ঞান দাতা বলেছেন, "এই রূপ ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীর (জ্ঞানম) তত্ত্বজ্ঞান আর জ্ঞেয়ম অর্থাৎ জানবার যোগ্য এমন পরমাত্মার মহিমা আমি সংক্ষেপে বলছি। আমার ভক্ত আগে আমাকেই সর্বে-সর্বা মনে করে আমার প্রতি আশ্রিত ছিল। তাঁরা এই (বিজ্ঞায়) তত্ত্বজ্ঞানের আধারে আমার ভাব অর্থাৎ আমার শক্তির সাথে পরিচিত হয়ে তারপর ঐ পরমাত্মার সমর্থ্য শক্তির সাথে পরিচিত হবে। (উপ পদ্যতে) তারপর ভক্তি করে ঐ সনাতন ভাবকে প্রাপ্ত করবে। (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৮)

❖ একইভাবে গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৯ এ গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে অন্য পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মার মহিমা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন যে, প্রকৃতি আর পুরুষ উভয়ই অনাদি। এখানে প্রকৃতির তাৎপর্য সত্যলোকের প্রকৃতির সাথে রয়েছে, যাকে পরা-শক্তি পরানন্দনী, মহান প্রকৃতি বলা হয়ে থাকে। এখানে পুরুষের অর্থ পূর্ণ পরমাত্মা বলা হয়েছে। এনারা দুজনেই অনাদি। এই প্রকৃতির ভাবার্থ দূর্গার স্ত্রী রূপের মতো স্ত্রীরূপ বিশিষ্ট প্রকৃতি নয়। যেমন সূর্যের সাথে তার প্রকৃতি (উষ্ণতা)ও একই সাথে থাকে, সেই রূপ সত্য পুরুষ এবং ওনার প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি উভয়ই হল অনাদি।

এই প্রকার বিকার আর তিন গুণ যার থেকে উৎপন্ন হয়েছে তিনি হলেন অন্য প্রকৃতি, তার থেকে তিন গুণের উৎপত্তি হয়েছে, এমনটাই জানো। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ৪ ও ৫ -এ দুই প্রকৃতির কথা বলেছেন, এক জড় এবং দ্বিতীয় চেতন দুর্গাদেবী। এখানে দ্বিতীয় প্রকৃতি দুর্গাদেবীর কথা বলা হয়েছে (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ১৯)।

গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২০-র মধ্যেও অন্য (পুরুষ) পরমাত্মার বর্ণনা আছে। গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত গীতার এই শ্লোকের অনুবাদে 'পুরুষ'-র অর্থ জীবাত্মা করেছেন। বাস্তবে এখানে 'পুরুষের' অর্থ হবে পরমাত্মা! গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২০-এর যথার্থ অনুবাদ দেখুন 'গহরী নজর গীতা'-র মধ্যে। আমাদের ওয়েবসাইট এ দেখুন এবং ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট হল :- www.jagatgururampalji.org

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২১-র মধ্যেও অন্য (পুরুষঃ) পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে। এই অনুবাদটি গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এখানে 'পুরুষঃ' এর অর্থ পুরুষ করেছেন। সঠিক অনুবাদ করেছেন। 'পুরুষঃ' এর অর্থ হলো পরমাত্মা। প্রকরণ বস অনুসারে পুরুষের অর্থ মানব করা যেতে পারে কারণ পরমাত্মা মানুষকে নিজের স্বরূপের মতো বানিয়েছেন। এইজন্য বলা হয়ে থাকে যে :-

নর নারায়ণ রূপ হৈ, তু না সমঝ দেহি।

"৮৪ লক্ষ প্রকার জীবের মধ্যে মানবদেহ উত্তম"

গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২২-এর মধ্যেও গীতা জ্ঞানদাতা নিজেকে ছেড়ে অন্য

পরমাত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ণনা করেছেন। গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত গীতার অনুবাদে এই শ্লোকের অর্থ সম্পূর্ণ ভুল করেছেন। (দেখুন এই পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা 191 থেকে 312 পর্যন্ত)।

❖ **যথার্থ অনুবাদ :-** যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা শ্লোক গুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমাত্মা প্রত্যেক জীবের সাথে এমন ভাবে থাকেন, যেভাবে সূর্যকে প্রতিটি কলসীর জলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এবং সূর্য জলকে নিজের উষ্ণতা দিতে থাকে। এই ভাবেই পরমাত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয় কমলে এমন ভাবে থাকেন, যেমন ভাবে সৌর কোষ যন্ত্র যেখানেই লাগানো থাকুক না কেন তা থেকে উষ্ণতা প্রাপ্ত করে সৌরশক্তি (বিদ্যুৎ) সঞ্চয় করে। সেইরূপ পরমাত্মাও প্রতিটি জীবের সাথে থাকেন। এই জন্য গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক ২২-এ বলা হয়েছে যে, ঐ পরমাত্মা সমস্ত প্রভুদেরও স্বামী হওয়াতে উনিই 'মহেশ্বর' সকলের ধারন-পোষণকারী 'ভর্তা' অর্থাৎ প্রতিপালক। সত্যলোকে বসে প্রত্যেকটি প্রাণীর গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য ওনাকে 'উপদৃষ্টা' ও বলা হয়। জীব পরমাত্মার শক্তিতে সমস্ত কাজকর্ম করে থাকে, এই জন্য জীবকে পরমাত্মার অংশ বলা হয়। রামায়নেও বলা হয়েছে যে, জীব অবিনাশী পরমাত্মার অংশ। যার কারণে জীব যখন নিজের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ সুখ-দু:খ ভোগ করে, তখন নিজের অংশ হওয়াতে পরমাত্নারও সেই দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি হয়। সূক্ষ্ম বেদে লেখা আছে :-

"কবীর কহ মেরে জীব কো দুঃখ না দিজো কোয়।
ভক্ত দু:খাএ মৈ দুঃখী মেরা আপা ভী দু:খী হোয়॥"

গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক নং ৫ - ৬ এর মধ্যেও বলা হয়েছে যে, যারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ঘোর তপস্যা করে, তারা পরমাত্মাকে কৃশ করে অর্থাৎ অত্যন্ত কষ্ট দেয়, সেই অজ্ঞানীদের ঘোর নরকে পাঠানো হয়, অর্থাৎ পরমাত্মা দুঃখ অনুভব করেন।

এইজন্য পরমাত্মাকে 'ভোক্তা' বলা হয়। প্রত্যেক প্রাণীকে গুপ্ত রূপে উচিত উপদেশ দেওয়ার জন্য পরমাত্মাকে 'অনুমন্তা' অর্থাৎ আজ্ঞা কর্তাও বলা হয়। (পরমাত্মা শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হল পরম + আত্মা = পরমাত্মা = শ্রেষ্ঠ আত্মা।) যদি কেউ সুখের সাথে সাথে দুঃখ প্রদান করে থাকে অর্থাৎ জীবের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই তাকে ভোগ করিয়ে থাকে, তাহলে তাঁকে 'পরমাত্মা' কখনো বলা হবে না। এমনকি তিনি শ্রেষ্ঠ আত্মাও নন। যেমন এই কাল (ব্রহ্মের) লোকের বিধান অনুসারে কাল ভগবান জীবকে তার কর্ম অনুযায়ী তেমনই ফল প্রদান করেন। এই কারণে ইনি প্রভু (স্বামী) তো বটে কিন্তু 'পরমাত্মা' নন। এই মানব শরীরে (পরঃ) অন্য (পুরুষঃ) পরমাত্মা তো সকল জীবের সাথে অভিন্ন রূপে থাকেন, যেমন সূর্য সবাইকে নিজের শক্তি প্রদান করে থাকে, ঠিক তেমনই অন্য পরামাত্মা উপরোক্ত মহিমা যুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ যখন কোন সৌর শক্তির সাহায্যে বাল্ব জ্বালানো হয়, তখন তার মধ্যে সূর্য স্বয়ং থাকে না কিন্তু সূর্যের শক্তি কাজ করে। পূর্ন পরমাত্মার ভূমিকাও সেইরূপ মনে করো।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২৩ এর মধ্যেও অন্য (পুরুষম্) পরমাত্মার বিষয়ে

বলা হয়েছে। ওখানে বলা হয়েছে, যে সমস্ত সন্ত তত্ত্বজ্ঞানের আধারে (পুরুষম্) পরমাত্মা ও প্রকৃতিকে গুণ সহিত জানে, সেই সাধু সন্তরা সর্বভাবে পরমাত্মার প্রতি লীন (বর্তমান) থাকেন, যার ফলে তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ তাদের পূর্ণ মুক্তি (মোক্ষ) হয়ে যায়।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২৪ এর মধ্যেও ঐ অন্য পরমাত্মার বর্ণনা আছে, যিনি গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অন্য। ওখানে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা সূর্যের মতো জীবাত্মাদের সাথে অভেদ রূপে থাকেন। তাঁকে সাধকগণ সাধনার মাধ্যমে দিব্যদৃষ্টিতে হৃদয়ে দেখতে পারেন, যেমনভাবে টেস্টার দিয়ে বিদ্যুতের উপস্থিতি দেখা যায়, অন্য সাধকগণ জ্ঞান শুনে বিশ্বাসের সাথে পরমাত্মার স্বরূপকে স্বীকার করে নেন। অন্যান্য ভক্তগন (কর্ম যোগেন) পরমাত্মার কর্ম অর্থাৎ লীলা সমূহ দেখে, পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনে যান। যেমন এই সংসারে প্রায় সাত অরব (৭০০ কোটি) জনসংখ্যা আছে অথচ কারো চেহারা (Face) কারোর সাথে মিল নেই। এক কবি বলেছেন :- কঈ অরব বনায়ে বন্দে আঁখ, নাক, হাত লাগায়ে, এক- দুসরে কে নাল কঈ ভী রলদে নহীঁ রলায়ে। এর থেকেও প্রমাণিত হয় যে, কোন সর্বজ্ঞশক্তি আছে। যাকে পরমাত্মা বলা হয়। কিছু ভক্তগণ পরমাত্মার এইরূপ কার্য দেখে পরমাত্মাকে স্বীকার করেন।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২৫-এ বলা হয়েছে যে যারা শিক্ষিত নয়, যারা ধ্যান করতে পারে না, যারা জ্ঞান বুঝতে পারেনা, এমনকি যারা পরমাত্মার সংরচনা অর্থাৎ সৃষ্টি সম্পর্কে শুনে পরমাত্মাকে বুঝতে পারে না, তারা কেবলমাত্র অন্যান্য শিক্ষিত বিদ্বান ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরমাত্মাকে মহিমা শুনে মেনে নেন যে, যখন এই শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা একথা বলেছেন তাহলে অবশ্যই পরমাত্মা আছেন। তারপর, তারা পরমাত্মার উপাসনা করতে শুরু করেন। শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে মেনে নিয়ে উপাসনা করার কারণে এনারাও (নিরক্ষর মানুষজন) এই মৃত্যু লোক (মৃত্যু সংসার) থেকে পার হয়ে যায়।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২৬ এ এটাও বলে দিয়েছে যে, সমস্ত প্রাণী, ক্ষেত্র অর্থাৎ দুর্গার শরীর এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ গীতাজ্ঞান দাতা ব্রহ্মের মিলনের ফলে উৎপন্ন হয়েছে। এখানে মনে রাখবেন, গীতা জ্ঞানদাতা গীতার ১৩ নং অধ্যায় শ্লোক নং ১ -এ বলেছিলেন যে, ক্ষেত্র তো শরীরকে বলা হয় এবং যিনি এই শরীরের বিষয়ে জানেন তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২ এর মধ্যেও বলেছে যে, সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানো। অর্থাৎ গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ। এই কাললোকে (২১ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে) যত প্রাণী উৎপন্ন হয় তারা সবাই দুর্গাদেবী এবং কাল ভগবানের সংযোগে (মিলনে) উৎপত্তি হয় অর্থাৎ সমস্ত নর-নারী কাল প্রেরণায় এই কাললোকে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২৭ এ অন্য পরমাত্মার বিষয়ে উল্লেখ আছে, যিনি গীতা জ্ঞানদাতা অপেক্ষা অন্য কেউ (ভিন্ন) :– যেমন পূর্বে উল্লেখ করা শ্লোকগুলোতে প্রমাণসহ বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে এমন ভাবে বসে আছেন যেমনভাবে সূর্য জলে ভরা কলসির মধ্যে দেখা যায়। একইভাবে

২৭ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বসে আছেন, যখন কোন প্রাণীর শরীর নষ্ট হয়ে যায়, তখনো পরমেশ্বর নষ্ট হন না। যেমন খোলা আকাশের নিচে থাকা জলে ভরা কলসী যখন ফেটে যায় তখন তার জল মাটিতে পড়ে মাটিতে মিশে যায়, অথচ সূর্য আগের মতোই অপরিবর্তিত থাকে। এইরূপ পরমেশ্বর অবিনাশী। যে সন্ত সাধু পরমাত্মাকে এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেন, তিনি সঠিক জানেন অর্থাৎ তিনি হলেন তত্ত্বদর্শী সন্ত (সাধু)। এই শ্লোকের (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২৭) - এর মধ্যেও পরমেশ্বর শব্দ লেখা আছে যা স্পষ্ট ভাবে গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অন্য পরমাত্মার পরিচয় করায়। আসুন জানি, পরমেশ্বর শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ = পরম + ঈশ্বর

ব্যাখ্যা :- 'ঈশ্' শব্দের অর্থ হল, স্বামী, প্রভু, মালিক,। 'বর' শব্দের অর্থ হল, শ্রেষ্ঠ, পতি।

১. ঈশ্ তো গীতা জ্ঞানদাতা "ক্ষরপুরুষ" অর্থাৎ ক্ষরব্রহ্ম কে বলা হয়, যিনি কেবল ২১ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।

২. ঈশ্বর = ঈশ্বর অর্থাৎ ক্ষরপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রভু। যিনি কেবল ৭ শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। এনাকে অক্ষর পুরুষ এবং পরব্রহ্মও বলা হয়।

৩. পরমেশ্বর = ঈশ্বর অর্থাৎ অক্ষরপুরুষ অপেক্ষা পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ,যিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। তাকে পরম অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৩ এ প্রমাণ আছে) গীতা অধ্যায় ১৫, শ্লোক ১৬ - ১৭ তে তিন পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষরপুরুষ -ইনি গীতা জ্ঞানদাতা ইশ, অক্ষর পুরুষ- ইনি ঈশ্বর এবং গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলা হয়েছে যে, (উত্তম পুরুষ) পুরুষোত্তম অর্থাৎ বাস্তবে যিনি শ্রেষ্ঠ প্রভু, তিনি তো উপরের শ্লোকে (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নম্বর ১৬) বলা দুই পুরুষ ক্ষরপুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ থেকে ভিন্ন ও ওনাকেই বাস্তবে পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। বাস্তবে উনি তিন লোকের (ক্ষরপুরুষের ২১ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রকে কাল লোক বলা হয়, অক্ষর পুরুষের ৭ শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রকে পর ব্রহ্মের লোক বলা হয়, এবং উপরের চার লোকের (সত্যলোক, অলখলোক, অগমলোক, অকহলোক) ক্ষেত্রকে অমর লোক অর্থাৎ পরমেশ্বরের লোক বলা হয়। এরূপ তিন লোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।) এই তিন লোকের মধ্যে প্রবেশ করে সকলের ধারণ-পোষণ করেন, উনিই হলেন বাস্তবে অবিনাশী পরমেশ্বর, গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২৭ এ "পরমেশ্বর" শব্দ উল্লেখ আছে যা গীতা জ্ঞানদাতা অপেক্ষা ভিন্ন, সর্বশক্তিমান,সকলের পালনকর্তার বোধক (জ্ঞান করায়)।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২৮ এর মধ্যেও গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অন্য প্রভুর প্রমাণ মেলে। এই শ্লোকে "ঈশ্বর" শব্দ "পরমেশ্বর"- এর বোধক (জ্ঞান করায়)। যেমন "ঈশ" কথার অর্থ স্বামী, বর কথার অর্থ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বাস্তবে সকলের "ঈশ" বা স্বামী হলেন, পরম অক্ষর ব্রহ্ম, উনি শ্রেষ্ঠ ঈশ। এইজন্য "ঈশ্বর" শব্দ প্রকরণ অনুসারে পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান করায়। যদি অন্য ঈশ বা নকল স্বামী না থাকতো তাহলে ঈশ্বর এবং পরমেশ্বর শব্দের কোন প্রয়োজন থাকতো না। এইজন্য এই শ্লোকে ঈশ্বর শব্দ সত্যপুরুষের বোধ (জ্ঞান) করায়। গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ২৮

-এর ভাবার্থ হল এই যে, গীতা জ্ঞানদাতা নিজে বলেছেন, যে সাধক সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখেন (আত্মানম্) নিজের আত্মাকে (আত্মনা) নিজের অজ্ঞান আত্মা দ্বারা নষ্ট করে না অর্থাৎ তিনি পরমাত্মাকে সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে পরমাত্মার সাধনা করতে থাকেন এবং (তত্) তার প্রতিফলে (পরাম্ = পরা) অন্য (গতিম্) গতি অর্থাৎ মুক্তি (য়াতি) প্রাপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ সেই সাধক গীতা জ্ঞানদাতার ভক্তিতে প্রাপ্ত পরম গতি (যা গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ তে বলা হয়েছে) অপেক্ষা অন্য গতি (যা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ এ বলা হয়েছে) তা প্রাপ্ত করে থাকে।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ৩০ এ স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, গীতা জ্ঞানদাতা নিজেকে ছেড়ে অন্য পরমাত্মার মহিমা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সন্ত (সাধু) সমস্ত প্রাণীদের ভিন্ন ভিন্ন স্থিতি হওয়া সত্বেও সকলকে এক সর্বশক্তিমান পরমাত্মার অন্তর্গত বলে মনে করে, তিনি “সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্ম” অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে ফেলেছেন বলে মনে করো। তিনি সৎ ভক্তি করে সেই পরমেশ্বর কে লাভ করেন।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ৩১ এর মধ্যেও গীতা জ্ঞানদাতা নিজের থেকে আলাদা অন্য পরমাত্মার বিষয়ে বলেছেন। এই শ্লোকে “পরমাত্মা” শব্দ আছে। যার স্পষ্ট পরিভাষা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৭ তে বলা হয়েছে যে, উত্তম পুরুষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু আছেন। তিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারন -পোষণ করেন, তিনি বাস্তবে অবিনাশী পরমেশ্বর এবং ওনাকে “পরমাত্মা” বলা হয়। তিনি ক্ষরপুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ থেকে অন্য (সম্পূর্ণ আলাদা)।

এই শ্লোকের (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ৩১) মধ্যেও এই একই প্রমাণ স্পষ্ট আছে যে, সেই পরমাত্মা অনাদি হওয়াতে, নির্গুণ হওয়াতে, প্রতিটি প্রাণীর শরীরে (সূর্য যেমন কলসীতে স্থিত হওয়ার পরেও কোন কিছুই করেনা কারণ পরমাত্মা নিজের শক্তিতেই করেন, যেমন কলসীর জলে সূর্যকে দেখা যায় এবং জল গরম হতে থাকে, এই কাজ সূর্যকে করতে দেখা যায় না কিন্তু সূর্য থেকে আসা উষ্ণতা এই কাজ করে থাকে।) ঠিক একই ভাবে পরমাত্মা কে শরীরে দেখা গেলেও তিনি শরীরের মধ্যে থাকেন না যেমন কলসির জলে সূর্যকে দেখা গেলেও বাস্তবে তা ওখানে থাকে না।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ৩২ এর মধ্যেও একই প্রমান আছে।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ৩৩-এ আত্মা এবং শরীরের স্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক নং ৩৪ এ গীতা জ্ঞানদাতা নিজেকে ছেড়ে অন্য পরমেশ্বরের তথ্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এইভাবে ক্ষেত্র (শরীর) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (গীতা জ্ঞানদাতা) এর ভেদকে জেনে কর্ম করতে করতে ভক্তি করে, কালের অধীনস্থ প্রকৃতি অর্থাৎ কালের জাল থেকে মুক্ত হয়ে যে সাধক জ্ঞান চক্ষু দ্বারা তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ করে,শাস্ত্রের অনুকূল সত্য সাধনা করে এবং তত্ত্বজ্ঞান বুঝে ঐ পরম অর্থাৎ অন্য পরমব্রহ্ম পরমাত্মা কে লাভ করে।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা থেকে আলাদা অন্য পূর্ণ পরমাত্মা আছেন, যার ভক্তি সাধনা করে সাধক সেই পূর্ণ মুক্তি লাভ করে যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ এ বর্ণিত আছে, তত্ত্ব জ্ঞানপ্রাপ্তির পর পরমাত্মার ওই পরম পদের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধক আর কখনো এই সংসারে ফিরে আসে না।

সারাংশ:- উপরোক্ত বিবরণে এবং গীতা অধ্যায় ১৩ তে উল্লেখিত প্রমাণ সমূহ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, গীতা জ্ঞানদাতা থেকে আলাদা কেউ আছেন যিনি পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা। যার শরণে যাওয়ার জন্য গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২, ৬৬ তে বলেছেন। তিনি একমাত্র মোক্ষদায়ক (মুক্তিদাতা), তিনি পূজার যোগ্য, তিনি সকলের রচনাকর্তা এবং তিনি সকলের ধারণ- পোষণকারী সর্ব সুখ্দায়ক প্রভু। কেবল ওনাকেই পরমাত্মা বলা হয়।

প্রশ্ন ৪৯ :- (শ্রী ধর্মদাসের) গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৬ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, আমি অজন্মা এবং অবিনাশী রূপ হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত প্রাণীদের ঈশ্বর হয়েও নিজের যোগমায়ার বলে প্রকট হয়ে থাকি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজেকে সমস্ত প্রাণীদের অবিনাশী ঈশ্বর বলেছেন এবং নিজেকে অজন্মা বলেছেন। এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর (জিন্দা বেশধারী পরমেশ্বরের) :- হে ধর্মদাস! শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান কাল ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে দিয়েছিলেন। গীতার জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের কোন ভূমিকা নেই। কাল ব্রহ্মই গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন। গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম বলেছেন যে, আমার ২১ ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রাণী আছে আমি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রভু (ঈশ্বর)।এরই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৮ এর মধ্যেও আছে। ওখানে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, আমি লোকবেদের (শোনা কথার) আধারে নিজের একুশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পুরুষোত্তম রূপে প্রসিদ্ধ, কারণ আমি এই ২১ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সমস্ত শরীর ধারী প্রাণী এবং অবিনাশী জীবাত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ। বাস্তবে পুরুষোত্তম তো অন্য কেউ, যার বর্ণনা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৭ এর মধ্যে করা হয়েছে।

❖ গীতার অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৬ এর মধ্যে এ কথা বলা হয়েছে যে, আমি (অজঃ) অজন্মা অর্থাৎ আমি তোমাদের মতো জন্মগ্রহণ করি না। আমি লীলার মাধ্যমে প্রকট হই, যেমন গীতা অধ্যায় ১০ এ বিরাট রূপ দেখিয়েছিলেন। আবার এই অধ্যায়ের ২ নং শ্লোকে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আমার উৎপত্তি হয়। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৬ এ বলেছেন (অব্যযাত্মা) যে আমার আত্মা অমর। আবারও বলেছেন যে, (আত্মমায়য়া) নিজের লীলা দ্বারা (সম্ভাবামি) উৎপন্ন হয়ে থাকি। এখানে উৎপন্ন হওয়ার কথা আছে। এই কাল ব্রহ্ম, অক্ষর পুরুষের এক যুগ পার হওয়ার সাথে সাথে মারা যায়। একই সাথে ঐ সময় এক ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ হয়ে যায়। (দেখুন ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর) আবার দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত জীবাত্মা চলে যায়। কাল ব্রহ্মের আত্মাও ওখানে চলে যায় এবং ওখানে পুনরায় যুবা শরীর প্রাপ্ত করে। একইভাবে দুর্গাদেবীর ও মৃত্যু হয় তারপর কাল ব্রহ্মের মতো এনার ও যুবতী শরীর প্রাপ্ত হয়। এইসব কিছু পরম অক্ষর ব্রহ্মের (সত্য পুরুষের) বিধান। তারপর নতুন ব্রহ্মাণ্ডে গিয়ে কাল এবং দুর্গা

পতি পত্নী রূপে নতুন রজগুণ যুক্ত ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন যুক্ত বিষ্ণু এবং তমোগুন যুক্ত শিব উৎপন্ন করে। এইভাবে ঐ ব্রহ্মাণ্ডে আবার সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। এইভাবে এই কাল ব্রহ্মের মৃত্যু এবং জন্মের লীলা চলে। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৯ এর মধ্যেও গীতা জ্ঞানদাতা স্পষ্ট করে বলেছেন যে,আমার জন্ম এবং কর্ম অলৌকিক। বাস্তবে তিনি মরণশীল। আত্মা তো সকল প্রাণীর অমর থাকে। হে ধর্মদাস! আপনার মহা মন্ডলেশ্বর আচার্যদের এবং শংকরাচার্যদের একদমই আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই। এই জন্য অমূল্য শাস্ত্র গ্রন্থ গুলিকে সঠিকভাবে না বুঝে লোকবেদ (গল্প কথা) শোনাতে থাকে। আপনারা দেখুন গীতার ৪ নং অধ্যায়ের শ্লোক নং ৫ এ উনি স্বয়ং বলেছেন যে, হে অর্জুন! তোর এবং আমার বহু জন্ম অতিবাহিত হয়ে গেছে, এইসব জন্মের কথা তুই জানিস না কিন্তু আমি জানি। ওনার অভিপ্রায় উনি উপরে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। “সম্ভবাত্” কথার অর্থ উৎপন্ন হওয়া।

প্রমাণ :- যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০-এর মধ্যেও বলা হয়েছে যে, কেউ তো পরমাত্মাকে (সম্ভবাত্) জন্ম নেওয়া রাম এবং কৃষ্ণের মতো অবতার মনে করে, কেউ (অ-সম্ভবাত্) উৎপন্ন না হওয়া নিরাকার মনে করে, অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত যে সত্য জ্ঞান বলে থাকেন তা শোন। তিনি বলতে পারবেন, পরমাত্মা উৎপন্ন হয় কি হয় না? বাস্তবে পরমাত্মা তো স্বয়ম্ভু! তিনি না কখনো জন্ম নিয়েছেন আর না কখনো জন্ম নেবেন। মৃত্যুর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। অপরদিকে গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং বলেছেন যে, আমার জন্ম - মৃত্যু হয় আমি অবিনাশী নই। অবিনাশী তো একমাত্র পরম অক্ষর ব্রহ্ম।

প্রশ্ন ৫০ (জিন্দা বাবারূপী পরমেশ্বরের) :- আপনি বলেছিলেন যে, আমি শূদ্রকে কাছে বসতে দিই না, সবসময় শুদ্ধ থাকি। এতে ভক্তের কী ক্ষতি হয়?

উত্তর (শ্রী ধর্মদাসের) :- শূদ্র ছুঁয়ে নিলে ভক্ত অপবিত্র হয়ে যায়,পরমাত্মা রুষ্ট হয়ে যায়,আত্ম গ্লানি (অনুশোচনা) হতে লাগে, কারণ আমি উঁচু জাতের বৈশ্য।

“কথা আর কাজের মধ্যে পার্থক্য”

প্রশ্ন ৫১ :- (শ্রী ধর্মদাসের) হে জিন্দা! এই কথা তো সত্য যে, শূদ্রদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখলে ভক্তের পবিত্রতা বজায় থাকে,আপনি কি একথা মানেন না?

উত্তর:- (জিন্দাবাবার) এই শিক্ষা আপনাকে কে দিয়েছে? ধর্মদাস বললেন, আমাদের ধর্ম গুরুরা বলে, আচার্য, শঙ্করাচার্য এবং ব্রাহ্মণগন বলেন। কবীর পরমেশ্বর ধর্মদাস কে বললেন(ওই সময় পর্যন্ত ধর্মদাস জানতেন না যে, তিনি যার সাথে কথা বলছেন তিনি কবীর জোলা) যে, একসময় কবীর জোলা (তাঁতি) তার গুরু রামানন্দ পন্ডিতের সাথে তোতাদ্রিক নামক স্থানে সৎসঙ্গ ভান্ডারা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। ঐ সৎসঙ্গের মুখ্য পণ্ডিত আচার্যদেব তার প্রবচনে বলছিলেন যে, একসময় ভগবান রামচন্দ্র শূদ্র (ভীলনী) শবরীর এঁটো করা কুল খেয়েছিলেন। কারণ ভগবান তো সমদৃষ্টির হয়, তিনি উঁচু-নিচু ভেদাভেদ দেখেন না, উনি কেবল প্রেম ভাবে প্রসন্ন হন। ভক্তদের মধ্যে উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ দেখতে নেই, শ্রদ্ধা দেখতে হয়। অপরদিকে শবরীকে শূদ্র জ্ঞানে (মনে করে) লক্ষ্মণ সেই এঁটো কুল না

খেয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। পরে সেই কুল সঞ্জীবনী, ওষুধি গাছ হয়ে যায়। রাবণের সাথে যুদ্ধের সময় লক্ষ্মণ যখন মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, হনুমান তখন দ্রোণাগিরি পর্বত উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল, যার মধ্যে ওই ফেলে দেওয়া কুল সঞ্জীবনী ঔষধি গাছ রূপে জন্ম নিয়েছিল। ঐ সঞ্জীবনী গাছের ঔষধি খাওয়ানোর পর তবেই লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরেছিল। জীবন রক্ষা হয়েছিল। ভগবানের প্রতি শবরীর এমনই শ্রদ্ধা ছিল। কখনো কারো শ্রদ্ধা ভাবনায় আঘাত করা উচিত নয়। এরপর সৎসঙ্গ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ভোজন ভান্ডারা আরম্ভ হয়। পণ্ডিতরা আগে থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে, স্বামী রামানন্দ ব্রাহ্মণের সাথে কবীর জোলা এসেছে। স্বামী রামানন্দ তাকে নিজের শিষ্য করে নিয়েছে। যদি পণ্ডিত রামানন্দের সঙ্গে জোলা কবীর একসাথে বসে খাবার খায় তাহলে আমাদের (ব্রাহ্মণদের) অপমান হবে। এইজন্য তারা দুই স্থানে ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল। পন্ডিতদের জন্য যে নির্দিষ্ট স্থানে ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানে প্রবেশের জন্য পন্ডিতরা একটি শর্ত রেখেছিল। যারা পণ্ডিতদের স্থানে খাবার খাবে তাদেরকে চারটি বেদের মন্ত্র শোনাতে হবে। যারা মন্ত্র শোনাতে পারবে না, তারা সর্ব সাধারণের সাথে বসে ভোজন করবে। পন্ডিতরা আগে থেকেই জানতো কাশী নিবাসী কবীর জোলা অশিক্ষিত, তাই সে বেদ মন্ত্র মনে করে বলতে পারবে না। সেইমতো পন্ডিতরা চারটি করে বেদ মন্ত্র শুনিয়ে প্রবেশ করতে থাকলেন। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল, ঐ লাইনে কবীর জোলা (তাঁতি) তিনিও দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেদ মন্ত্র বলে শোনানোর জন্য যখন কবীর জীর লাইন আসলো, তখন কিছু দূরে মাঠে একটি মহিষ ঘাস খাচ্ছিল, কবীর জী মহিষটিকে ডাকলেন এবং বললেন, ওহে মহিষ পণ্ডিত! কৃপা করে এখানে আসুন। মহিষটি দৌড়ে দৌড়ে চলে এলো এবং কবীর জীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কবীর জী মহিষটির কোমরের উপর হাত রেখে বললেন, হে বিদ্বান মহিষ! বেদের চারটি মন্ত্র বলে শোনাও। মহিষটি বলতে শুরু করলেন -

১. যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ এর মন্ত্র ৩২ শোনাল। যার ভাবার্থও বলল, যিনি পরম শান্তিদায়ক (উসিগ অসি), যিনি পাপ নাশ করতে পারেন (অংঘারি), যিনি বন্ধনের শত্রু, অর্থাৎ বন্দীছোড় = ব্রম্ভারী, উনি "কবিরসি" অর্থাৎ কবীর। স্বজ্যোতি = স্বয়ং প্রকাশিত অর্থাৎ তেজোময় শরীর ধারী, "ঋতধামা" = সত্যলোক বাসী অর্থাৎ তিনি সত্যলোকে নিবাস করেন। সম্রাটসি = সর্ব ভগবানেরও ভগবান অর্থাৎ সর্ব শক্তিমান সম্রাট অর্থাৎ মহারাজা।

২. ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬ শোনালো যার ভাবার্থ হল, পরমাত্মা উপরের লোক থেকে গতি (প্রস্থান) করে এখানে আসেন এবং পবিত্র আত্মাদের দেখা দেন। পরমাত্মা ভক্তি করা আত্মাদের সমস্ত সংকট দূর করে দেন। তিনি হলেন কর্বিদেব (কবীর পরমেশ্বর)।

৩. ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ বলে শোনালো, যার ভাবার্থ হল এই যে, ("কবিঃ = কবির) কবীর পরমাত্মা স্বয়ং পৃথিবীতে প্রকট হয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেন। একে (কর্বিবাণী) বলা হয়ে থাকে। সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে (তত্ত্বজ্ঞান) কবীর পরমাত্মা লোকাক্তি, দোঁহা, শব্দাবলী চৌপাই এবং কবিতার আকারে কবীর বাণী দ্বারা বলে শোনান।

৪. ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১ বলে শোনালো, যার ভাবার্থ হল এই যে, পরমাত্মা কবিদের মতো আচরণ করে পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ান। তারপর মহিষটি আরো বলতে লাগলো, "ওহে বোকা পণ্ডিতরা! আমার পাশে এই লাইনে আমার পিঠের উপর হাত রেখে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই সেই 'কবীর পরমাত্মা'। যাকে লোকেরা 'কবি' বলে ডাকে। এনার কৃপাতেই আজ আমি মানুষের মতো বেদ মন্ত্র বলে শোনাচ্ছি।"

কবীর পরমেশ্বর বললেন, মহিষ পন্ডিত! আপনি পন্ডিতের ভোজনালয়ে প্রবেশ করে ভোজন গ্রহণ করুন। আমি তো শূদ্র, অশিক্ষিত এইজন্য আমি সর্বসাধারণের সাথে বসে ভোজন করতে যাচ্ছি। ঐ সময় উপস্থিত পন্ডিতরা যারা মহিষের মুখ থেকে বেদ মন্ত্র বলতে শুনেছিল তারা সবাই একত্রিত হয়ে কবীর পরমেশ্বরের চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তখন কবীর পরমেশ্বর বললেন:-

করনী তজ কথনী কথৈঁ, অজ্ঞানী দিন রাত।
কুকর জ্যোঁ ভৌঁকত ফিরেঁ, সুনী সুনাঈ বাত॥

সৎসঙ্গতে বলছিলেন যে, ভগবান রামচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দের সাথে শূদ্র জাতির শবরীর এঁটো কুল খেয়েছিলেন, কোন ভেদাভেদ জ্ঞান করেন নি। আর আপনারা নিজেকে পরমাত্মার থেকেও উত্তম মনে করেন? কেবল মুখেই বলেন, কাজে কিছু করেন না। একজন অন্য জনের শোনা কথা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে বলতে থাকেন। ওখানে উপস্থিত পন্ডিতদের সাথে হাজার হাজার জনসাধারণ কবীর জোলার শিষ্য হয় ও নাম দীক্ষা গ্রহণ করে। তারা প্রত্যেকেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভক্তি ছেড়ে দিয়ে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তি করে নিজেদের আত্মকল্যাণ করান।

হে ধর্মদাস! এই কথা আপনিও বলছিলেন যে, আমি শূদ্রদের কাছে বসতেই দিই না। ধর্মদাস অত্যন্ত লজ্জিত হলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমাত্মার শিক্ষাকে নিজের উপর ব্যঙ্গ মনে করে রেগে গেলেন এবং বললেন, হে জিন্দা! আপনার এই জ্বালাপোড়া কথা ভালো লাগে না, আপনি সভ্য ভাবে কথা বলতেও জানেন না। বলছেন যে, কুকুরের মত শোনা কথায় তোমরা ঘেউ ঘেউ করতে থাকো। এ কথা বলে ধর্মদাস মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। জিন্দা রূপধারী পরমেশ্বর আবার অন্তর্ধ্যান হয়ে গেলেন। চতুর্থবার অন্তর্ধান হয়ে যাওয়াতে ধর্মদাসের বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে ওঠে। মাটিতে বার বার লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। ঐদিন আবারও বৃন্দাবনে ধর্মদাসের সঙ্গে পরমাত্মার বার্তা হয়েছিল। (এইভাবে কবীর পরমেশ্বর সর্বমোট ছয় বার অন্তর্ধ্যান হয়েছিলেন,তারপর ধর্মদাসের বুদ্ধি স্থির হয়।) মথুরা বৃন্দাবন থেকে কাঁদতে কাঁদতে ধর্মদাস নিজের গ্রাম বান্ধবগড়ে ফিরতে লাগলেন। ধর্মদাস ছয় মাসের জন্য তীর্থযাত্রার পরিকল্পনা রেখেছিলেন কিন্তু তিনি ১৫ দিনের মধ্যেই ঘরে ফিরে আসেন। গরীবদাস জী মহারাজ নিজের অমৃত বাণীতে বলেছেন:-

তহাঁ বহাঁ রোবত হৈ ধর্মনী নাগর, কহাঁ গয়ে মেরে সুখ কে সাগর।
অতি বিয়োগ হুয়া হম সেতী, জৈসে নির্ধন কী লুট জায় খেতী।
হম তো জানে তুম দেহ স্বরূপা, হমারী বুদ্ধি অন্ধ গহর কূপা।

কল্প করে ঔর মন মেঁ রোবৈ, দশোঁ দিশা কূঁ বো মঘ জোহৈ।
বেগ মিলো করহূঁ অপঘাতা, মেঁ না জীবূঁ সুনো বিধাতা।

যখন ধর্মদাস বান্ধবগড়ে পৌঁছালেন, তখন তিনি খুব কাঁদছিলেন। ঘরে প্রবেশ করে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে অসহায় হয়ে কাঁদতে লাগলেন। ওনার স্ত্রীর নাম ছিল আমিনী দেবী। নিজের স্বামীর এমন অবস্থা দেখে এবং যথা সময়ের পূর্বে তীর্থযাত্রা থেকে ফিরে এসেছে দেখে মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয়ই কেউ টাকা পয়সা লুট করে নিয়েছে। তাই তীর্থ ভ্রমণে না গিয়ে ফিরে এসেছে। আমিনী দেবী নিরবে ধর্মদাসের পাশে বসলেন এবং নিজের হাত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বললেন, কেন মন খারাপ করছেন, রাস্তায় আপনার টাকা পয়সা কেউ চুরি করে নিয়েছে, তাতে কি হয়েছে,ভগবান তো আপনাকে অনেক ধন দিয়েছে। তীর্থ ভ্রমণের জন্য আপনার যত টাকা লাগে নিয়ে যান। আর তীর্থ যাত্রা শেষ করে ফিরে আসুন, আমি আপনাকে মানা করবো না। কিছুক্ষণ পর নিজের মনকে শক্ত করে ধর্মদাস আমিনী দেবীকে বললেন, যদি আমার টাকা পয়সা ধন চুরি হয়ে যেত, তাহলে আমি আরো নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন আমার যে ধন চুরি হয়ে গেছে,তা আর কখনো আমি ফিরে পাব না। এই ধন আমি নিজের হাতে নিজের মূর্খতার কারণে হারিয়ে ফেলেছি। জিন্দা মহত্মার সাথে হওয়া সমস্ত জ্ঞানচর্চা এবং জিন্দাবাবার কাছ থেকে শোনা সৃষ্টি রচনা সবকিছু আমিনী দেবীকে শোনালেন। সর্ব জ্ঞান প্রমাণের সহিত দেখে আমিনী দেবী বললেন, আপনি তো নিপুন ব্যাপারি ছিলেন, কখনো লোকসানে ব্যবসা করতেন না। সাধুবাবা এত প্রমাণ দিয়ে আপনাকে বুঝিয়েছেন, তাও আপনি তাকে বারবার অপমান করেছেন, বারবার দেখা দিয়েছে বাচ্চাদের মত বুঝিয়েছে কিন্তু আপনি মানেন নি। সাধুবাবার তো রাগ হবেই। ধর্মদাস বললেন, আমিনী জীবনে এই প্রথমবার লোকসানে ব্যবসা করলাম। জানি না এই লোকসান কখনো পূর্ণ হবে কিনা। ঐ ধন ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।

"ধর্মদাসকে সতলোকে নিয়ে যাওয়া"

ছয় মাস অপেক্ষার পরও জিন্দাবাবা আসলেন না।ধর্মদাস জিন্দাবাবার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে পাগলের মতো বিচরণ করতে থাকেন। এভাবে হতাশায় সারাদিন কাঁদতে কাঁদতে ধর্মদাসের শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। একদিন ধর্মদাসকে আমিনী দেবী বললেন, "হে স্বামী! আপনার এই অবস্থা আমি আর দেখতে পারছি না। আপনি বিশ্বাস রাখুন আগে যখন এতবার এসেছেন তাহলে আবারও নিশ্চয় আসবেন।" ধর্মদাস বললেন, "কিন্তু আগে কখনো এত সময় লাগায়নি। মনে হয় আমার মত পাপীর কারণে অনেক রেগে গিয়েছেন। আমি মহামূর্খ আমিনী। এখন আমি ওনার মূল্য বুঝতে পারছি।উনি পরমাত্মার বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। দেখতে একদম সাদাসিধা, কিন্তু মনে কোন অহংকার নেই। আমি এত জ্ঞান কখনো কোথাও শুনিনি।" আমিনী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "উনিতো নিশ্চয় কিছু বলেছেন, কোথায় কোথায় ওনার দেখা পাওয়া যাবে, অথবা কোথায় কোথায় উনি যান?" ধর্মদাস জী বললেন, উনি বলেছিলেন, "যেখানে যেখানে ধর্ম ভান্ডারা (লঙ্গর) হয় সেখানে সেখানে আমি অবশ্যই যাই।

ওখানে উপস্থিত লোকেদের জ্ঞান বোঝায়।” একথা শুনে আমিনী দেবী বললেন, “আপনিও ধর্ম ভান্ডারা করুন তাহলে সাধুবাবা আসতে পারেন।” ধর্মদাস বললেন, “আমি তিন দিনের ভান্ডারা করব।” আগে আমিনী দেবী কৃপণ স্বভাবের ছিলেন। যদি কখনো ধর্মদাস তিন দিনের ভান্ডারা করতেন তখন আমিনী দেবী একদিন পর বিরোধ শুরু করে দিতেন। কিন্তু এই সময় আমিনী দেবী কোন বিরোধ না করে সম্মতি দিয়ে বললেন, “ঠিক আছে আপনি তিন দিনের ভান্ডারা করুন।” ধর্মদাস দূর দুরান্তে সাধু সন্তদের কাছে তিন দিনের ভোজন- ভান্ডারার নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দিলেন। সমস্ত সাধু-সন্তদের নিমন্ত্রণ পাঠানোর পর নির্ধারিত দিনে ভোজন-ভান্ডারা শুরু হয়ে যায়। এইভাবে একদিন পার হয়ে যায়। সাধু মহাত্মারা আসতে থাকেন, জ্ঞান চর্চা হতে থাকে, কিন্তু যে জ্ঞান জিন্দা বাবা বলেছিলেন তার উত্তর এই সাধু মহাত্মাদের কাছে নেই। তা সত্ত্বেও ধর্মদাস সাধুদেরকে প্রশ্ন করতে থাকেন যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবের কি জন্ম-মৃত্যু হয়? উত্তরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই সাধুরা একটাই কথা বলত যে, “এদের কোন মাতা পিতা নেই।” এই কথাই ধর্মদাস বুঝে যেতেন সেই জিন্দাবাবা এখনো আসেননি।অন্য ছদ্মবেশে আসলেও জ্ঞান তো সঠিক শোনাতেন। তৃতীয় দিনে দুপুরবেলা পর্যন্ত জিন্দা বাবাকে না দেখতে পেয়ে ধর্মদাস আত্মহত্যার নির্ণয় নেন। ভক্তি ছাড়া এমন জীবন রাখা বৃথা। পরমাত্মা তো অন্তর্যামী। তিনি জেনে গিয়েছিলেন আজ ভক্ত অবশ্যই মারা যাবে। ঠিক ঐ সময় কিছু দূরে একটি কদম গাছের নিচে জিন্দাবাবার বেশভূষায় একজন সাধুকে ধর্মদাস দেখতে পেলেন। ধর্মদাস দৌড়ে গিয়ে ধ্যান পূর্বক দেখলেন এবং জিন্দা মহাত্মাকে চিনতে পেরে ওনাকে জড়িয়ে ধরলেন। নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে বারবার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন, হে জিন্দাবাবা! আমি আর কখনো এমন ভুল করবো না। আমাকে ক্ষমা করে দিন। তারপর পরমাত্মা ধর্মদাসের সাথে তার ঘরে গেলেন। আমিনী দেবী এবং ধর্মদাস দুজনে মিলে পরমাত্মার খুব সেবা করলেন এবং দুজনে দীক্ষা নিয়ে নিলেন। পরমাত্মা জিন্দা রূপে ওনাদেরকে প্রথম মন্ত্রের দীক্ষা দিলেন। ভক্তদের প্রার্থনা শিকার করে ওনাদের বাগিচায় কিছুদিন থাকলেন। একদিন জ্ঞানচর্চার সময় ধর্মদাসের ভুলের কারণে জিন্দাবাবা আবার অদৃশ্য হয়ে যান। ধর্মদাস নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু জিন্দাবাবা না ফিরে আসার কারণে ধর্মদাস প্রতিজ্ঞা করেন, হে মহাত্মা জী! আপনি দর্শন না দেওয়া পর্যন্ত আমি অন্ন গ্রহণ করব না। ছয় দিন পর্যন্ত অনাহারে থেকে ধর্মদাস অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। উঠে বসার মত শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তারপর পরমাত্মা আবার জিন্দা বাবা রূপে এসে নিজের হাতে ধর্মদাসকে উঠিয়ে খাইয়ে দেন। জিন্দাবাবা কে ফিরে পেয়ে ধর্মদাস প্রথমে জিন্দা বাবার পা ছুঁয়ে চরণামৃত পান করেন। তারপর জ্ঞানচর্চা শুরু হয়।ধর্মদাস জিজ্ঞাসা করলেন, “হে বাবা! আপনি এত জ্ঞান কোথায় পেয়েছেন?”

“পরমেশ্বর বললেন”, আমি কবীর নামে এক সতগুরু পেয়েছি। তিনি কাশী শহরে থাকেন। তিনি পূর্ণ পরমাত্মা, সতগুরু রূপে এসেছেন। কাশী শহরে তাঁতির (জোলা) ভূমিকায় লীলা করছেন। তিনি আমাকে সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই লোক একেবারেই আলাদা। ওখানে যে সুখ আছে তা স্বর্গেও নেই। ওখানে

ফলে ফুলে পরিপূর্ণ বৃক্ষ, সুন্দর বাগান এবং দুধের নদী প্রবাহিত হতে থাকে। সুন্দর সুন্দর নর নারী বিচরণ করে, তারা কখনো বৃদ্ধ হয় না, তাদের কখনো মৃত্যু হয় না, সর্বদা তারা যুবক অবস্থায় থাকে। যারা সৎগুরুর কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান শুনে সত্য নাম প্রাপ্ত করে ভক্তি করে, তারা ঐ পরম ধামকে প্রাপ্ত করে। এই কথার বর্ণনা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ এর মধ্যে আছে। ধর্মদাস এবার জেদ করে বসলেন, বললেন, "হে মহারাজ! আমাকে কৃপা করে ঐ অমর লোক দেখান যাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায়।" পরমেশ্বর বললেন, "আপনি ভক্তি করুন, যখন শরীর ত্যাগ করে উপরে যাবেন তখন সতলোক প্রাপ্ত করবেন।" ধর্ম দাসের অত্যধিক আকুতি - মিনতির পরে পরমাত্মা বললেন, "ঠিক আছে, চলুন আপনাকে সৎলোক নিয়ে যায়।" ধর্মদাসের আত্মাকে শরীর থেকে বের করে পরমাত্মা সত্যলোক নিয়ে গেলেন। সৎলোকে পরমেশ্বরের দরবারে এক দ্বার রক্ষী দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিন্দা বাবা রূপে দাঁড়িয়ে থাকা পরমেশ্বর দ্বার রক্ষীকে বললেন, "ধর্মদাসকে পরমেশ্বরের দর্শন করিয়ে নিয়ে এসো।" দ্বার রক্ষী অন্য এক হংস আত্মাকে (সত্যলোকে ভক্তদেরকে হংস বলা হয়) বললেন, "ধর্মদাস কে নিয়ে পরমাত্মার সিংহাসনের কাছে নিয়ে যাও সত্য পুরুষের দর্শন করিয়ে নিয়ে এসো।" ওখানে অনেক হংস (ভক্ত) এবং হংসী (নারী ভক্তমতি) একত্রিত হয়ে নাচ গান করতে করতে সম্মানের সাথে নিয়ে গেলেন। সমস্ত হংস ও হংসীরা সুন্দর সুন্দর মালা পরিধান করেছিলেন। তাদের শরীরের প্রকাশ ১৬ সূর্যের সমান ছিল। যখন ধর্মদাস সিংহাসনের উপরে বিরাজমান সত্যপুরুষকে দেখলেন তখন সেই একই স্বরূপ ছিল, যা ধর্মদাস পৃথিবীতে জিন্দা বাবার রূপে দেখেছিলেন। কিন্তু এখানে পরমেশ্বরের এক রোম কূপের (শরীরের লোম) প্রকাশ কোটি - কোটি সূর্য ও কোটি কোটি চন্দ্রের প্রকাশের থেকেও বেশি ছিল। জিন্দা রূপে নীচে থেকে যাওয়া পরমাত্মা সিংহাসনে বিরাজমান নিজের অন্য স্বরূপের উপর চামর দোলাতে লাগলেন। ধর্মদাস চিন্তা করলেন জিন্দাবাবা তো এই পরমেশ্বরের সেবক হবেন, যদিও চেহারা দুজনের একই রকম ছিল। কিছুক্ষণ পর সিংহাসনের উপরে বসে থাকা পরমাত্মা দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং জিন্দাবাবা সেই সিংহাসনে বসে পড়লেন। দেখতে দেখতে তেজময় শরীর যুক্ত প্রভু সিংহাসনে বসে থাকা জিন্দাবাবার শরীরের সাথে মিলিয়ে গেলেন। এই দৃশ্য দেখে ধর্মদাস লজ্জায় ডুবে গেলেন। নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী বলে মনে হল, "আমি সত্যিই মহা অপরাধী ব্যাক্তি, আমি পরমেশ্বর কে কতই না দুঃখ দিয়েছি, কতই না অপমান করেছি, তা সত্ত্বেও উনি আমাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করে গিয়েছেন, তবুও আমি বিশ্বাস করিনি।" সতলোকের ভক্তরা ধর্মদাসকে পরমাত্মার দর্শন করিয়ে যখন নিয়ে আসলেন তখন ধর্মদাসের সৎলোকে তিনদিন পার হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ধর্মদাসকে তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় দেখে ধর্মদাসের ঘর পরিবারের লোক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই বান্ধব গড়ে ধর্মদাসের ঘরে জড়ো হয়ে গেলেন। কেউ কেউ ঝাড়-ফুক করাচ্ছিলেন, কেউ কেউ বৈদ্য ডেকে এনে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন কিন্তু সবকিছু ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। সকলেই আশা ছেড়ে দিয়েছিল যে, ধর্মদাস আর কখনো জীবিত হতে পারবে না। তৃতীয় দিনে পরমাত্মা ঐ আত্মাকে শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেন। ধর্মদাসকে অজ্ঞান অবস্থায় ওই বাগিচা

থেকে তুলে ঘরে নিয়ে আসা হয়েছিল, যেখান থেকে ওনাকে পরমাত্মা সৎলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে ধর্মদাস দৌড়ে গিয়ে বাগিচার ঐ স্থানে গেলেন, যেখানে পরমাত্মা জিন্দা বাবার রুপে বসেছিলেন। ধর্মদাস পরমাত্মার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বললেন, "হে প্রভু! এই অজ্ঞানী আত্মাকে ক্ষমা করুন!:-

"অবগুন মেরে বাপ জী, বখসো গরীব নিবাজ।
জো মৈঁ পুত কুপুত হুঁ, বহুর পিতা কো লাজ" ॥

হে প্রভু! আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, আপনি পরমাত্মা, আপনিই পরম অক্ষর ব্রহ্ম। কখনো কখনো আমার আত্মা বলতো যে, পূর্ণব্রহ্ম ছাড়া এমন দুর্লভ জ্ঞান এই পৃথিবীতে আর কেই বা দিতে পারে। কিন্তু পরক্ষনে মনের মধ্যে বিপরীত চিন্তা চলে আসতো। হে সত্য পুরুষ! আপনি আপনার শরীরের ঐ শোভা, যা সতলোকে দেখিয়েছিলাম তা এখানে কেন প্রকট করে রাখেন নি?"

পরমেশ্বর বললেন, "হে ধর্মদাস যদি আমি আমার প্রকাশ যুক্ত শরীরে এই কাল লোকে চলে আসি, তাহলে ক্ষরপুরুষ (যাকে জ্যোতি নিরঞ্জন বলা হয়) অত্যন্ত অস্থির হয়ে যাবে, তাই আমি আমার সমস্ত কাজ গুপ্তভাবে করে থাকি। কাল নিরঞ্জন আমাকে কেবল এক সিদ্ধি যুক্ত সাধু মনে করে কিন্তু এটা জানে না, আমি কে? কোথা থেকে এসেছি?" পরমেশ্বর ধর্মদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন দেখলে আমার দেশ?" উত্তরে ধর্মদাস বললেন, "হে পরমেশ্বর! এই সংসারে এখন আর মন লাগছে না। ঐ পবিত্র স্থানের সামনে কাল নিরঞ্জনের এই সম্পূর্ণ লোক (২১ ব্রহ্মাণ্ড) নরকের মতো মনে হচ্ছে। জন্ম-মৃত্যু তো এখানকার অটল বিধান, ৮৪ লক্ষ প্রকার প্রাণীর শরীরে কষ্ট ভোগ করা তো অনিবার্য। এখানকার প্রত্যেক প্রাণী এই আশায় বেঁচে আছে যে, এখন তার মৃত্যু হবে না কিন্তু তবুও সে কোন না কোন কারণে হঠাৎ করে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে একজন অপর জনের সাথে ছল-কপটতায় কথা বলে কিন্তু আপনার সৎলোকে প্রত্যেকেই সরলতার সাথে প্রেম পূর্বক কথা বলে থাকে এবং ব্যবহার করে থাকে। আমি তিন দিন ধরে ঘুরে ঘুরে এই সবকিছু দেখেছি।" যদি ধর্মদাস নিজের ঘরে উপস্থিত আত্মীয় স্বজনদের না দেখতেন তাহলে তিনি নিজের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে নিতান্তই স্বপ্ন মনে করতেন। কিন্তু সকলকে দেখে ধর্মদাস এখন দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা পবিত্র কবীর সাগর গ্রন্থের অধ্যায় "জ্ঞান প্রকাশ" পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭-৫৮ তে "মোহম্মদ বোধ" পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০-২১ তে দশ মুকামী রেখতা "জ্ঞান স্থিতি বোধ" অধ্যায়ের ৮৩ পৃষ্ঠাতে, "অমর মূল" অধ্যায়ের ২০২ নং পৃষ্ঠাতে আছে।

"গুরু পরিবর্তন করা কি সম্ভব?"

প্রশ্ন ৫২ :- ধর্মদাস জিজ্ঞাসা করলেন, "হে প্রভু! গুরু পরিবর্তন করা কি উচিত? আমি সাধু-সন্তদের কাছে শুনেছিলাম, গুরু পরিবর্তন করা উচিত নয়। কারণ গুরু এক হয়, জ্ঞান অনেক প্রকার হতে পারে।

উত্তর (সত্য পুরুষের) :-

জব তক গুরু মিলে নহীঁ সাচা, তব তক গুরু করো দশ পাঁচা।

কবীর ঝুঠে গুরু কে পক্ষ কো, তজত ন লাগৈ বার।

দ্বার ন পাবৈ মোক্ষ কা, রহ বার কা বার॥

ভাবার্থ :- যতক্ষণ না প্রকৃত গুরুর (সৎগুরু) সন্ধান মেলে ততক্ষণ পর্যন্ত গুরু বদলানো উচিত। তাতে যত খুশি গুরু ধারন করতে আর ছাড়তে পারেন। মিথ্যাবাদী গুরুকে অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত।

কবীর, ডুবৈ থে পর উভরে, গুরুকে জ্ঞান চমক।

বেডা দেখা জরজরা, উতর চলে ফড়ক॥

ভাবার্থ :- যে সময় আমি সদগুরুর সন্ধান পেলাম তখন তাঁর জ্ঞান প্রকাশে জানতে পারলাম আমার জ্ঞান এবং সমাধান (সাধনা) ভুল। তখন আমি এমনভাবে গুরু বদল করি, যেমন কোন পশু হঠাৎ ভয় পেয়ে দৌড়াতে শুরু করে অথবা রাত্রিতে যাত্রা করা নৌকা যাত্রীরা সকাল বেলায় যখন জানতে পারে এবং সূর্যের প্রকাশে দেখতে পায় যে তাদের নৌকাতে জল প্রবেশ করছে আর পাশেই কোন সুরক্ষিত ভালো নৌকা দাঁড়িয়ে আছে, তখন বুদ্ধিমান যাত্রীরা যারা কোন প্রকার নেশা করেনি তারা তৎক্ষণাৎ ঐ ডুবতে যাওয়া নৌকা (ছিদ্রযুক্ত নৌকাকে) ত্যাগ করে ছিদ্রবিহীন সুরক্ষিত ভালো নৌকায় উঠে পড়বে। আমি যখন কাশীতে সদ্ গুরু কবীর পরমেশ্বরের এই জ্ঞান শুনি এবং যা আপনাকে শুনিয়েছি, তখন আমি কোন জাতি ধর্ম না দেখে তৎক্ষণাৎ সদ্ গুরুর শরণে চলে যাই এবং নাম দীক্ষা নিয়ে ভক্তি শুরু করি। সদ্ গুরুদেব আমাকে দীক্ষা দেওয়ার আদেশ দিয়ে রেখেছেন। হে ধর্মদাস! বিবেক দিয়ে বিচার করুন, যদি এক বৈদ্যের চিকিৎসায় রোগী সুস্থ না হয়, তাহলে কি সে নিজের চিকিৎসার জন্য অন্য ডাক্তারের কাছে যায় না?

উত্তরে ধর্মদাস বললেন, "অবশ্যই যায়, যাওয়াও উচিত, তাকে তার জীবন রক্ষা করা উচিত।" পরমেশ্বর বললেন, "ঠিক একই ভাবে মানব জীবনও আত্মকল্যাণের জন্য প্রাপ্ত হয়, প্রতিটি জীব জন্ম-মৃত্যু রূপী রোগে আক্রান্ত। সত্যনাম এবং সারনামের ঔষধই পারে এই দীর্ঘ জন্ম-মৃত্যু রুপী রোগ থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে। এই দুই মন্ত্র কাশীতে নিবাস করা সদগুরু কবীর সাহেবের কাছেই কেবল পাওয়া যায়। পৃথিবীতে কোথাও কারো কাছে এই মন্ত্র নেই। আপনি কাশীতে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে নিন, আপনার কল্যাণ হয়ে যাবে। কারণ সদগুরু বিনা আমার ওই সতলোকে প্রাপ্তি কখনো সম্ভব নয়।"

ধর্মদাস বললেন, "আপনি তো স্বয়ং সত্য পুরুষ। এখন আর আপনি আমাকে ধোঁকা দিতে পারবেন না, আপনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। হে প্রভু! আমি তো রূপদাস গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে রেখেছি। আমি প্রথমে ওনার কাছ থেকে গুরু বদলানোর আজ্ঞা নেব, যদি উনি আজ্ঞা দেন, তবেই আমি গুরু বদলাবো।" ধর্মদাসের মূর্খতার সীমা পার হয়ে যেতে দেখে পরমেশ্বর ষষ্ঠ বারের জন্য আবার অন্তর্ধ্যান হয়ে গেলেন। ধর্মদাস আবার ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, কিন্তু কোন উপায় না দেখে গুরু রূপদাসের কাছে গেলেন, যিনি শ্রী কৃষ্ণের অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পূজারী ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব পন্থের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ধর্মদাস তার গুরুদেব রূপদাসের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং গুরু বদলানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সন্ত রুপদাস পবিত্র আত্মার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন,"পুত্র ধর্মদাস! যে জ্ঞান ঐ জিন্দা বাবা শুনিয়েছেন, সেই জ্ঞান একমাত্র ভগবানই বলতে পারেন। কিন্তু আমার বয়স তো অনেক হয়েছে, তাই আমি এই মার্গ ত্যাগ করতে পারবো না। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে তুমি ঐ মহাত্মার কাছে নাম দীক্ষা নিতে পার।

তারপর ধর্মদাস কাশী শহরে গিয়ে ওখানে জোলা কবীরের খোঁজ করতে লাগলেন। অবশেষে একটি কুঁড়েঘরে কবীর পরমেশ্বর কে কাপড় বুনতে দেখে ধর্মদাস অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এবং খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন যে, সদগুরু এবং পরমেশ্বর তো বাস্তবে ইনিই। তারপর ওনার থেকে দীক্ষা নিয়ে নিজের আত্মকল্যাণ করালেন। এর কিছুদিন পর কবীর পরমেশ্বর ধর্মদাস কে আবার দুই অক্ষরের (যার মধ্যে একটি ওঁম (ওঁ) অপরটি তৎ যা সাংকেতিক) সত্য নাম প্রদান করেন। তারপর সারনাম দিয়ে ধর্মদাসকে সতলোকবাসী করেছিলেন।

❖ কলিযুগে পরমাত্মা অন্য ভালো আত্মাদের (দৃঢ় ভক্তদের) সাথে সাক্ষাৎকার করেন, তাদের বিষয়ে নীচে আলোচনা করা হল :-

২. সন্ত মলুক দাস জীকে (অরোড়া) দেখা দিয়েছিলেন।

৩. সন্ত দাদু দাসজীকে (আমের, রাজস্থানের) দর্শন দিয়েছিলেন।

৪. সন্ত নানকদেবকে সুলতানপুর শহরের কাছে বয়ে যাওয়া বেঈ নদীর তীরে দর্শন দিয়েছিলেন। আজ যেখানে "সচ্চখন্ড সাহেব" নামে গুরুদ্বার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বানিয়ে রাখা হয়েছে।

৫. সন্ত গরীব দাসজীকে (হরিয়ানা রাজ্যের ঝজ্জর জেলার অন্তর্গত ছুড়ানী গ্রামের নিবাসী) নলা নামক মাঠে দর্শন দেন। সেই স্থানে বর্তমানে একটি স্মৃতি সৌধ বানানো আছে।

সন্ত গরীবদাস তখন মাত্র ১০ বছরের বালক ছিলেন। অন্যান্য আরো কিছু রাখালদের সাথে গরীব দাসও নিজেদের মাঠে রোজ গরু চরাতে যেতেন। একদিন জিন্দা বাবার রূপে কবীর পরমেশ্বর সতলোক (সচ্চখন্ড) থেকে নীচে নেমে আসেন। ওই সতলোক সর্ব ভুবনের উপরে অবস্থিত যেখানে পরমাত্মা থাকেন। সন্ত গরীব দাসের আত্মাকে পরমাত্মা উপরে নিজের ধাম সৎলোকে নিয়ে যান। এদিকে পৃথিবীতে ভালো গরীবদাসকে মৃত মনে করে সন্ধ্যার সময় অন্তিম সংস্কারের জন্য চিতার উপরে রেখে দেন। তৎক্ষণাৎ পরমাত্মা সন্ত গরীব দাসের আত্মাকে উপরের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে সত্যজ্ঞান দিয়ে আবার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। বালক সাথে সাথে জীবিত হয়ে যান। এই ঘটনা ১৭২৭ সালের (বিক্রমী সম্বত ১৭৮৪) ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ঘটেছিল। সন্ত গরীব দাসকে পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছিলেন। জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছিলেন। যার কারনে সন্ত গরীব দাস মহারাজ চব্বিশ হাজার বাণী বলেছিলেন যেগুলি সন্ত গোপাল দাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ঐ অমৃত বাণী সমূহকে বর্তমানে প্রিন্ট করে (ছাপিয়ে) গ্রন্থের রূপ

দেওয়া হয়েছে। আমি (সন্ত রামপাল দাস) ওই গ্রন্থের আধারে সৎসঙ্গ করে থাকি। সন্ত গরীব দাস মহারাজ নিজের অমৃত বাণীতে বলেছেন :-

গরীব, হম সুলতানী নানক তারে, দাদু কো উপদেশ দিয়া।

জাতি জুলাহা ভেদ না পায়া, কাশী মাহে কবীর হুয়া॥

গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কা এক রতি নহীঁ ভার।

সদগুরু পুরুষ কবীর হৈঁ, কূল কে সিরজনহার॥

ভাবার্থ :- সন্ত গরীবদাস মহারাজ পরমাত্মার কাছ থেকে পাওয়া দিব্য দৃষ্টি শক্তিতে ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান বলেছেন। তিনি বলেছিলেন কাশীনগরে (উত্তর প্রদেশ) যে জোলা (তাঁতি) কবীর ছিলেন, তিনি সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনহার। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের প্রবল শক্তিতে ধারণ করে রেখেছেন। অথচ ওনার উপর এর কোন ভার নেই। ঠিক যেমন বিজ্ঞানীরা উড়োজাহাজ রকেট বানিয়ে আকাশে ওড়ান এবং নিজেরাও তাতে বসে যাত্রা করেন, একইভাবে সন্ত গরীবদাস স্বচক্ষে দেখা পরমাত্মার মহিমা বর্ণনা করেছেন।

৬.সন্ত ঘীসা দাসজীকে (গ্রাম-খেখরা, জেলা-বাগপত, উত্তর প্রদেশ) পূর্ণ পরমাত্মা দর্শন দিয়েছিলেন। বইটির অধিক পৃষ্ঠা সংখ্যার প্রতি খেয়াল রাখতে হয়েছে, সেই জন্য এনাদের সম্পর্কে আর বেশি আলোচনা করা সম্ভব হল না। আরো অধিক জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট www.jagatgururampalji.org দেখুন। এখান থেকে এই সকল তথ্যের জ্ঞান বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন।

বেদ মন্ত্রের ফটোকপি (প্রমাণ সহিত)

(প্রমাণ ঋকবেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত 86 মন্ত্র ২৬-২৭)

इन्दुः पुनानो अति गाहते मृधो विश्वानि कृण्वन्त्सुपथानि यज्यवे ।
गाः कृण्वानो निर्णिजं हर्यतः कविरत्यो न क्रीळन्परि वारमर्षति ॥२६॥

पदार्थः—(**यज्यवे**) यज्ञ करने वाले यजमानों के लिये परमात्मा (**विश्वानि सुपथानि**) सब रास्तों को (**कृण्वन्**) सुगम करता हुआ (**मृधः**) उनके विघ्नों को (**अतिगाहते**) मर्द्दन करता है। और (**पुनानः**) उनको पवित्र करता हुआ और (**निर्निजं**) अपने रूप को (**गाः कृण्वानः**) सरल करता हुआ (**हर्य्यतः**) वह कान्तिमय परमात्मा (**कविः**) सर्वज्ञ (**अत्यो न**) विद्युत् के समान (**क्रीळन्**) क्रीड़ा करता हुआ (**वारं**)वरणीय पुरुष को (**पर्य्यर्षति**) प्राप्त होता है ॥२६॥

বিশ্লেষণ :- এটি ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬ এর ফটোকপি, যার অনুবাদক আর্য সমাজের আচার্য মহর্ষি দয়ানন্দের শিষ্যরা। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠান করা যজমান অর্থাৎ ভক্তদের জন্য পরমাত্মা সমস্ত রাস্তাকে সুগম করে অর্থাৎ জীবনরূপী যাত্রাপথকে দুঃখ রহিত করে, সহজ করে তোলেন। তাদের বাধা-বিপত্তিকে দূর করে অর্থাৎ সমাপ্ত করে সকল ভক্তকে পবিত্র অর্থাৎ পাপ রহিত এবং বিকার মুক্ত করেন। যেমনটি পূর্বের মন্ত্র ২৭-এ বলা হয়েছে যে পরমাত্মা দ্যুলোক অর্থাৎ সতলোকের তৃতীয় পৃষ্ঠে বিরাজমান আছেন, ওখানে পরমাত্মার শরীরের প্রকাশ

অত্যধিক বেশি। উদাহরণের জন্য বলতে পারি পরমাত্মার একটি রোমকূপের প্রকাশ কোটি-কোটি সূর্য এবং কোটি-কোটি চন্দ্রমার মিলিত প্রকাশের থেকেও অধিক। যদি ঐ পরমাত্মা তাঁর প্রকাশযুক্ত শরীর নিয়ে এই পৃথিবীতে প্রকট হয়ে যান, তাহলে আমাদের চর্মদৃষ্টি তা সহ্য করতে পারবে না। যেমন পেঁচা পাখী দিনের বেলাতে সূর্যের আলোতে কিছুই দেখতে পায় না। অনুরূপ দশা তখন সকল মানুষের হয়ে যাবে। এই জন্য ওই পরমাত্মা নিজের স্বরূপকে অর্থাৎ শরীরের প্রকাশকে কমিয়ে রেখে ঐ স্থান থেকে যেখানে পরমাত্মা নিবাস করেন, বিদ্যুৎসম দ্রুত গতিতে অর্থাৎ লীলা করার জন্য পৃথিবীতে আসেন এবং শ্রেষ্ঠ মানব দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটাও স্পষ্ট যে আপনি হলেন কবি: অর্থাৎ কবির্দেব আমরা ওনাকে কবীর সাহেব বলে থাকি।

असश्चतः शतधारा अभिश्रियो हरिं नवन्तेऽव ता उदन्युवः ।
क्षिपो मृजन्ति परि गोभिरावृतं तृतीये पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥२७॥

पदार्थः—(**उदन्युवः**) प्रेम की (**ताः**) वे (**शतधाराः**) सैकड़ों धारायें (**असश्चतः**) जो नानारूपों में (**अभिश्रियः**) स्थिति को लाभ कर रही हैं। वे (**हरिं**) परमात्मा को (**अवनवन्ते**) प्राप्त होती हैं। (**गोभिरावृतं**) प्रकाशपुञ्ज परमात्मा को (**क्षिपः**) बुद्धिवृत्तियां (**मृजन्ति**) विषय करती हैं। जो परमात्मा (**दिवस्तृतीये पृष्ठे**) द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और (**रोचने**) प्रकाशस्वरूप है, उसको बुद्धिवृत्तियां प्रकाशित करती हैं ॥२७॥

বিশ্লেষণ :- এটি ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৭ এর ফটোকপি। এখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমাত্মা দ্যুলোক অর্থাৎ অমর লোকের তৃতীয় পৃষ্ঠে অর্থাৎ তৃতীয় ভাগে বিরাজমান আছেন। সতলোক অর্থাৎ শাশ্বত স্থান তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বন-পাহাড়, ঝর্ণা, বাগ-বাগিচা (ছোট-ছোট সুন্দর ফল-ফুলের বাগান) প্রভৃতি আছে। এটি সতলোকের বাহিরের দিকের ভাগ অর্থাৎ বহির্ভাগ। (যেমন ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি তিন ভাগে বিভক্ত। দিল্লির বহির্ভাগে যেখানে চাষের জমি, খাল-বিল, বন-জঙ্গল আছে ; দ্বিতীয় ভাগে বসতি-বাজার আছে এবং তৃতীয় ভাগে সংসদ ভবন এবং কার্যালয় আছে।)

এরপর দ্যুলোকের দ্বিতীয় ভাগে জনবসতি আছে যেখানে মোক্ষপ্রাপ্ত (মুক্তি পাওয়া) হংস আত্মারা স্বপরিবারে থাকেন। (যেমন পৃথিবীতে ভক্তদেরকে ভক্ত আত্মা বলা হয় তেমনি সৎলোকে সবাইকে হংস আত্মা বলা হয়।) সৎলোকের তৃতীয় ভাগে সর্বোপরি পরমাত্মার সিংহাসন আছে। ওনার চারপাশে কেবলমাত্র নর আত্মারা থাকেন, ওখানে স্ত্রী-পুরুষের জোড়া থাকে না। যদি তারা পরিবার বসাতে চায় তাহলে শব্দ (বচন) শক্তির মাধ্যমে কেবল পুত্র সন্তান উৎপন্ন করে নিতে পারে। এইভাবে পরমাত্মা শাশ্বত স্থান সতলোককে তিন ভাগে ভাগ করে রেখেছেন। ওখানে অর্থাৎ সৎলোকে প্রত্যেক স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের কখনো বৃদ্ধাবস্থা আসে না, ওখানে কখনো মৃত্যু হয় না। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং

২৯ এর মধ্যে বলা হয়েছে যারা জরা অর্থাৎ বৃদ্ধ অবস্থা এবং মরণ অর্থাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা করে তারা তত্ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে জানেন। সতলোকে সত্যপুরুষ থাকেন, ওখানে জরা-মরণ (জন্ম-মৃত্যু) নেই। ওখানে বাচ্চারা যুবক অবস্থায় পৌঁছে চিরকালের জন্য যুবক হয়ে থাকে।

(প্রমাণ ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৮২ মন্ত্র ১-২)

असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत् ।
पुनानो वारं पर्येत्यव्ययं श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदम् ॥१॥

पदार्थः—(सोमः) जो सर्वोत्पादक प्रभु (अरुषः) प्रकाशस्वरूप (वृषा) सद्गुणों की वृष्टि करने वाला (हरिः) पापों के हरण करने वाला है, वह (राजेव) राजा के समान (दस्मः) दर्शनीय है। और वह (गाः) पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरों के चारों ओर (अभि अचिक्रदत्) शब्दायमान हो रहा है। वह (वारं) वरणीय पुरुष को जो (अव्ययं) दृढ़भक्त है उसको (पुनानः) पवित्र करता हुआ (पर्येति) प्राप्त होता है। (न) जिस प्रकार (श्येनः) विद्युत् (घृतवन्तं) स्नेहवाले (आसदं) स्थानों को (योनिं) आधार बनाकर प्राप्त होता है। इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने (असावि) इस ब्रह्माण्ड को उत्पन्न किया ॥१॥

कविर्वेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि ।
अपसेधन्दुरिता सोम मृळय घृतं वसानः परि यासि निर्णिजम् ॥२॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (वेधस्या) उपदेश करने की इच्छा से आप (माहिनं) महापुरुषों को (पर्येषि) प्राप्त होते हो। और आप (अत्यः) अत्यन्त गतिशील पदार्थ के (न) समान (अभिवाजं) हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को (अभ्यर्षसि) प्राप्त होते हैं। आप (कविः) सर्वज्ञ हैं (मृष्टः) शुद्ध स्वरूप हैं (दुरिता) हमारे पापों को (अपसेधन्) दूर करके (सोम) हे सोम ! (मृळय) आप हमको सुख दें। और (घृतं वसानः) प्रेम-भाव को उत्पन्न करते हुए (निर्निजं) पवित्रता को (परियासि) उत्पन्न करें ॥२॥

বিশ্লেষণ :- উপরে ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮২ মন্ত্র ১-২ এর ফটোকপি দেওয়া হয়েছে। এটি মহর্ষি দয়ানন্দের নির্দেশনায় তাঁরই শিষ্যদের দ্বারা অনুবাদিত এবং এটি সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভা দিল্লি থেকে প্রকাশিত।

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে :- মন্ত্র নং ১- এ বলেছে ‘সকলের উৎপত্তি কর্তা পরমাত্মা তেজোময় শরীর যুক্ত, সকলের পাপ নাশ করে সুখের বর্ষা প্রদান করেন অর্থাৎ সুখ সাগর। উনি উপরের সতলোকে সিংহাসনে বিরাজমান আছেন এবং উনি রাজার সমান দর্শনীয়।

এই একই প্রমান সূক্ষ্ম বেদেও আছে :-

অর্শ কুর্শ পর সফেদ গুমট হৈঁ, জহাঁ পরমেশ্বর কা ডেরা।
শ্বেত ছত্র সির মুকুট বিরাজে, দেখত ন উস চেহেরে নুঁ॥

এই একই প্রমান বাইবেল গ্রন্থ এবং কোরআন শরীফেও আছে এই যে, পরমাত্মা ছয় দিনে সমগ্র সৃষ্টির রচনা করে সপ্তম দিনে উপরের আকাশে তখতে অর্থাৎ

সিংহাসনে বিরাজমান হলেন। (বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থ ২/২৬-৩০ এবং কোরআন শরীফের সূরাঃ ফুরকানি ২৫ আয়াত নং ৫২-৫৯ আছে।)

ওই পরমাত্মা নিজের অমরধাম থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে শব্দ (ছন্দ) বা বাণীর মাধ্যমে জ্ঞান শোনান। তিনি বরণীয় অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে প্রাপ্ত হন, তাদের সাথে সাক্ষাৎকার করেন। যেমন ১.সন্ত ধর্মদাস জীকে (মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড়ের) ২. সন্ত মলুক দাসজীকে ৩.সন্ত দাদু দাসজীকে (রাজস্থানের জেলা আমের) ৪. সন্ত নানক দেবজীকে ৫.সন্ত গরীব দাসজীকে (হরিয়ানা রাজ্যের ঝজ্জর জেলার অন্তর্গত ছুড়ানী গ্রামে) ৬. সন্ত ঘীসা দাসজীকে (গ্রাম- খেখড়া, বাগপত,উত্তর প্রদেশ) ৭. সন্ত জম্ভেশ্বর জীকে (গ্রাম-সমরাথল, রাজস্থান) যিনি বিষ্ণোই ধর্মের প্রবর্তক। এঁনাকেও পূর্ণ পরমাত্মা দর্শন দিয়েছিলেন।

ঐ পরমাত্মা ভালো আত্মাদের সাথে সাক্ষাৎকার করেন। যাঁরা পরমাত্মার দৃঢ় ভক্ত, তাঁদের প্রতি পরমাত্মার বিশেষ আকর্ষণ থাকে। উদাহরণের জন্য বলেছেন যে, যেমন আকাশের বিদ্যুৎ ধাতব স্থানের উপর আকর্ষণ বলের প্রভাবে পড়ে। যেমন কাঁসার তৈরি ধাতুর (গ্লাস, বাটি, থালা, ঘটি বালতি প্রভৃতি) বস্তুর ওপরে বেশি বজ্রপাত হয়। তাই আগেকার দিনে বর্ষার সময় এগুলিকে শীঘ্রই খোলা আকাশের নীচে থেকে ঘরের মধ্যে রেখে দিতে বলতো। কেননা ঘরের বৃদ্ধ লোকেরা বলতেন যে বার-বার কাঁসার থালা বাসনের উপর বজ্রপাত পড়ে। সেই রূপ পরমাত্মাও নিজের প্রিয় ভক্তদের প্রতি আকর্ষিত হয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎকার করেন।

মন্ত্র নং ২ এর মধ্যেও এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পরমাত্মা তাঁর প্রিয় আত্মাদের উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছায় স্বয়ং পৃথিবীতে প্রকট হয়ে মহাপুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। উপদেশ দেওয়ার ভাবার্থ হল পরমাত্মা সদগুরু রূপে তত্ত্বজ্ঞান শুনিয়ে তাদেরকে নাম দীক্ষাও দিতেন। তাদের সদগুরুও স্বয়ং পরমাত্মাই হতেন। এটাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা অত্যন্ত গতিশীল পদার্থের মতো অর্থাৎ বিদ্যুৎসম তীব্র গতিতে এসে আমাদের ধার্মিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। আপনারা আগের প্রকরণে পড়েছিলেন, সন্ত ধর্ম দাসকে পরমাত্মা যে, কথা বলেছিলেন,” আমি ঐ স্থানে অবশ্যই যাই যেখানে ধার্মিক অনুষ্ঠান হয় কারণ আমার অনুপস্থিতিতে কাল যে কোনো উপদ্রব করে দিতে পারে। যার কারনে সাধকদের আস্থা পরমাত্মার উপর থেকে চলে যেতে পারে। আমার উপস্থিতিতে কাল এমন গড়বড় কখনো করতে সাহস পায় না। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক নং ১৫-তে বলা হয়েছে যে, সেই অবিনাশী পরমাত্মা যিনি ব্রহ্মাকেও উৎপন্ন করেছেন, তিনি সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠান গুলিতে ওনাকে ইষ্টদেব রূপে প্রতিষ্ঠিত করে আরতি স্তুতি করা উচিত।

এই ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮২ মন্ত্র ২-এর মধ্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আপনি হলেন (কবির্বেধস্য) কবির্দেব। আপনি সকলকে উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছায় এসেছেন। আপনি পবিত্র পরমাত্মা আপনি আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন অর্থাৎ পাপ নাশ করেন, হে অমর পরমাত্মা! আপনি আমাদের সুখ দিন, কেননা (দ্যুতম্ বসানঃ নির্নিজম্ পরিয়সি) আমরা হলাম আপনার সন্তান। আমাদের প্রতি

সেই বাৎসল্য (স্নেহ) প্রেমভাব উৎপন্ন করে ঐ (নির্নিজম্) সুন্দর রূপকে (পরিয়সি) উৎপন্ন করে অর্থাৎ আমাদেরকে বালক মনে করে, যেমন আগেও যখন ইচ্ছা তখন প্রকট হয়ে নিজের প্রিয় আত্মাদেরকে দর্শন দিতেন, সেই রূপ আমাদেরকেও দর্শন দিন।

(প্রমাণ ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬-২০)

स्वायुधः सोतृभिः पूयमानोऽभ्यर्ष गुह्यं चारु नाम ।

अभि वाजं सप्तिरिव श्रवस्याभि वायुमभि गा देव सोम ।।१६।।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (**गुह्यम्**) सर्वोपरि रहस्य (**चारु**) श्रेष्ठ (**नाम**) जो तुम्हारी संज्ञा है। (**अभ्यर्ष**) उसका ज्ञान करायें। आप (**सोतृभिः, पूयमानः**) उपासक लोगों से स्तूयमान हैं। (**स्वायुधः**) स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं और (**सप्तिरिव**) विद्युत् के समान (**श्रवस्याभि**) ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइये और (**वायुमभि**) हमको प्राणों की विद्या का वेत्ता बनाइये। (**देव**) हे सर्वशक्ति-सम्पन्न परमेश्वर ! हमको (**गाः**) इन्द्रियों के (**अभिगमय**) नियमन का ज्ञाता बनाइये ।।१६।।

शिशुं जज्ञानं हर्यतं मृजन्ति शुम्भन्ति वह्निं मरुतो गणेन ।

कविर्गीर्भिः काव्येना कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ।।१७।।

पदार्थः—(**शिशुम्**) "श्यति सूक्ष्मं करोति प्रलयकाले जगदिति शिशुः परमात्मा" उस परमात्मा को (**जज्ञानम्**) जो सदा प्रकट है, (**हर्यतः**) जो अत्यन्त कमनीय है, उसको उपासक लोग (**मृजन्ति**) बुद्धिविषय करते हैं और (**शुम्भन्ति**) उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं और (**मरुतः**) विद्वान् लोग (**वह्निम्**) उस गतिशील परमात्मा का (**गणेन**) गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं और (**कविः**) कवि लोग (**गीर्भिः**) वाणी द्वारा और (**काव्येन**) कवित्व से उसकी स्तुति करते हैं। (**सोमः**) सोमस्वरूप (**पवित्रम्**) पवित्र वह परमात्मा कारणावस्था में अतिसूक्ष्म प्रकृति को (**रेभन्, सन्**) गर्जता हुआ (**अत्येति**) अतिक्रमण करता है ।।१७।।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র নং ১৬-তে বলা হয়েছে যে, হে পরমাত্মন্! আপনি আপনার শ্রেষ্ঠ গুপ্ত নামের জ্ঞান প্রদান করুন। মন্ত্র ১৭-তে ওই গুপ্ত নামের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি হলেন কবি: অর্থাৎ কবির্দেব।

মন্ত্র নং ১৭ এর কেবল বাংলা অনুবাদ :- (শিশুম্ জজ্ঞানম্ হর্যন্তম্) পরমেশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান বলার উদ্দেশ্যে জেনে বুঝে শিশুরূপ ধারণ করে প্রকট হন। ঐ জ্ঞান শুনে (মরুতো গনেন) ভক্তদের একটা বড়ো অংশ পরমাত্মার শিষ্য হয়ে যায়। (মৃজন্তি শুম্যন্তি বহিন)।

এই জ্ঞান বুদ্ধিজীবী লোকেরা সহজে বুঝতে পারে, তারা তত্ত্বজ্ঞানের আধারে ওই পরমেশ্বরের ভক্তি স্তুতি করতে থাকে।

এই ভক্তি (বহিন্) অতি শীঘ্র লাভ প্রদানকারী হয়ে থাকে। ঐ পরমাত্মা নিজের তত্ত্বজ্ঞানকে (কাব্যেনা) কবিত্বের মাধ্যমে অর্থাৎ কবিদের মতো করে দোঁহা, ছন্দ, প্রবাদ-প্রবচন, চৌপাই এর মাধ্যমে (কবির্ গীর্ভিঃ) কবীর বাণী দ্বারা (পবিত্রম অতিরেভন্) শুদ্ধ জ্ঞানকে উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করে বলে থাকেন। তিনি (কবিঃ) কবিদের মতো আচরণকারী কবির্দেব। তিনি (সন্ত্) সন্ত রূপে প্রকট হওয়া (সোম) অমর পরমাত্মাই হন। (ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭)

বি: দ্র: :- এই মন্ত্রের মূল পাঠে দুইবার 'কবিঃ' শব্দ আছে, আর্য সমাজের অনুবাদ কর্তারা একটি (কবিঃ) শব্দের অর্থের অনুবাদ করেনি।

বিশ্লেষণ :- এটি ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র নং ১৮ এর ফটোকপি, যার অনুবাদ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর অনুগামীরা করেছে। এটি সর্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভা দিল্লি থেকে অনুবাদিত এবং প্রকাশিত হয়েছে। এখন এর উপর আমরা বিশ্লেষণ করবো।

ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम् ।
तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप् ।।१८।।

पदार्थः—(सोमः) सोमस्वरूप परमात्मा (सिसासन्) पालन की इच्छा करता हुआ (महिषः) जो महान् है वह परमात्मा (तृतीयं, धाम) देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्तिधाम है। उसमें (विराजम्) विराजमान जो ज्ञानयोगी है उसको (अनुराजति) प्रकाश करने वाला है और (स्तुप) स्तूयमान है। (कवीनाम्, पदवीः) जो क्रान्तदर्शियों की पदवी अर्थात् मुख्य स्थान है और (सहस्रनीथः) अनन्त प्रकार से स्तवनीय है, (ऋषिमनाः) सर्वज्ञान के साधनरूप मनवाला वह परमात्मा (यः) जो (ऋषिकृत) सब ज्ञानों का प्रदाता (स्वर्षाः) सूर्यादिकों को प्रकाशक है। वह जिज्ञासु के लिए उपासनीय है ।।१८।।

এই মন্ত্রের অনুবাদেও আর্য সমাজের আচার্যরা অনেক ভুল ত্রুটি করে রেখেছেন। আমরা সংস্কৃত ভাষাও বুঝতে পারি, তাই বিশ্লেষণ করে যথার্থ অনুবাদ এবং ভাবার্থ স্পষ্ট করছি। মন্ত্র ১৭ তে বলা হয়েছে যে ঋষি অথবা সন্ত (সাধু) রূপে প্রকট হয়ে পরমাত্মা নিজের অমৃত বাণী নিজের মুখে বলে থাকেন, আর ঐ জ্ঞানকে শুনে এবং বুঝে অনেক জনসাধারণ ওনার অনুগামী হয়ে যান। যে বাণী পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে শোনান, তা (ঋষিকৃত্) ঋষি রূপে প্রকট পরমাত্মা কর্তৃক (সহঁস্রনীয়ঃ হাজার হাজার বাণী অর্থাৎ কবীর বাণী সমূহ (ঋষিমনা) ঋষি স্বভাবের ভক্তদের জন্য (স্বর্যাঃ) অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। (কবিনাম পদবীঃ কবিত্বের মাধ্যমে দোহা, চৌপাই বাণী আকারে বলার কারণে প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে একজন অন্যতম কবি উপাধি (পদবী)ও প্রাপ্ত করে থাকেন। ঐ (সোম) অমর পরমাত্মা (সিষাসন) সকলের পালনের ইচ্ছায় প্রথম স্থিতিতে (মহিষঃ) বড় পৃথিবীতে অর্থাৎ উপরের লোকে (তৃতীয়ম্ ধাম) তৃতীয় ধাম অর্থাৎ সত্যলোকের তৃতীয় পৃষ্ঠে (অনুরাজতি) তেজপুঞ্জ শরীরে (স্তুপ) গম্বুজে অর্থাৎ সিংহাসনে (বিরাজম্) বিরাজমান আছেন অর্থাৎ বসে আছেন। এই একই প্রমান ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩ এর মধ্যেও আছে যে, পরমাত্মা সর্বলোকের উপর বিরাজমান আছেন (তিষ্ঠন্তি) বসে আছেন।

चमूषच्छ्येनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्रप्स आयुधानि बिभ्रत् ।
अपामूर्मिं सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ।।१९।

पदार्थः—(अपामूर्मिम्) प्रकृति की सूक्ष्म से सू म शक्तियों के साथ (सच-मानः) जो संगत है और (समुद्रम्) "सम्यक् द्रवन्ति भूतानि यस्मात् स समुद्रः" जिससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है। वह (तुरीयम्) चौथा (धाम) परमपद परमात्मा है। उसको (महिषः) मह्यते इति महिषः महिष इति महन्नामसु पठितम् नि० ३—१३ । महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का (विवक्ति) वर्णन करता है। वह परमात्मा (चमूसत्) जो प्रत्येक बल में स्थित है (श्येनः) सर्वोपरि प्रशंसनीय है और (शकुनः) सर्वशक्तिमान् है। (गोविन्दुः) यजमानों को लुप्त करके जो (द्रप्सः) शीघ्रगति वाला है (आयुधानि, विभ्रत्) अनन्त शक्तियों को धारण करता हुआ इस सम्पूर्ण संसार का उत्पादक है ।।१९।।

বিশ্লেষণ :- ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৯ এটিও আর্য সমাজের বিদ্বানেরা অনুবাদ করেছেন। এখানেও অনেকগুলি ভুল আছে। পুস্তকের কলেবর না বাড়িয়ে আমরা কেবল শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আলোচনা করব:-

এই মন্ত্রে চতুর্থ ধামের বর্ণনা আছে যা আপনারা সৃষ্টি রচনার প্রকরণে পড়বেন এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান জানতে পারবেন। পড়ুন এই পুস্তকের 124 নং পৃষ্ঠায়।

পরমাত্মা উপরের চারটি অজর-অমর লোক রচনা করে রেখেছেন।

১. অনামী লোক যা সকলের উপরে অবস্থিত। ২.অগম লোক ৩.অলখ লোক ৪.সত্য লোক আমরা পৃথিবী লোকে আছি, যদি এখান থেকে উপরের লোক গণনা করা হয়, তাহলে ১.সত্যলোক ২.অলখ লোক ৩.অগম লোক এবং ৪.অনামী লোকের গণনা করা হবে। ঐ চতুর্থ ধামে বিরাজমান পরমাত্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের এবং সমগ্র লোকের রচনা করেছেন। বাকি রচনাগুলি উনি সত্যলোকে বসে করেছিলেন। আর্য সমাজের অনুবাদকেরা "তুরিয়া পরমাত্মা" অর্থাৎ চতুর্থ পরমাত্মার বর্ণনা করেছেন যা বাস্তবে চতুর্থ ধাম হবে। ওখানে মূল পাঠে মন্ত্র ১৯-এর ভাবার্থ হল এই যে, তত্ত্বদর্শী সন্ত চতুর্থ ধাম এবং চতুর্থ পরমাত্মার বিবক্তি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করে।

কৃপা করে পাঠকগণ আপনারা এই পুস্তকের 124 নং পৃষ্ঠায় সৃষ্টি রচনার প্রকরণ পড়ুন, যেখান থেকে আপনারা জানতে পারবেন যে এই পুস্তকের লেখক (সন্ত রামপাল দাস) হলেন সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত যিনি তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচিত।

मर्यो न शुभ्रस्तन्वं मृजानोऽत्यो न सृत्वा सनये धनानाम् ।
वृषेव यूथा परि कोशमर्षन्कनिक्रदच्चम्वोऽरा विवेश ।।२०।।

पदार्थः—वह परमात्मा (**यूथा, वृषेव**) जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार (**कोशम्**) इस ब्रह्माण्डरूपी कोश को (**अर्षन्**) प्राप्त होकर (**कनिक्रदत्**) उच्च स्वर से गर्जता हुआ (**चम्वोः**) इस ब्रह्माण्ड रूपी विस्तृत प्रकृति-खण्ड में (**पर्याविवेश**) भली-भांति प्रविष्ट होता है और (**न**) जैसे कि (**मर्यः**) मनुष्य (**शुभ्रस्तन्वं, मृजानः**) शुभ्र शरीर को धारण करता हुआ (**अत्योन**) अत्यन्त गतिशील पदार्थों के समान (**सनये**) प्राप्ति के लिए (**सृत्वा**) गतिशील होता हुआ (**धनानाम्**) धनों के लिए कटिबद्ध होता है; इसी प्रकार प्रकृति-रूपी ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा सदैव उद्यत है ।।२०।।

বিশ্লেষণ :- এখন ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র নং ২০ এর যথার্থ জ্ঞান জানবো :-

এই মন্ত্রের অনুবাদ মহর্ষি দয়ানন্দের শিষ্যদের দ্বারা করা হয়েছে। এনাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, পরমাত্মা নিরাকার কেননা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এই কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে পরমাত্মা নিরাকার। এই জন্য অনুবাদক এই মন্ত্রের সরাসরি অনুবাদ না করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্য করে দিয়েছেন। যেমনটি মূল পাঠে লেখা আছে যে :-

মর্য ন শুভ্রঃ তন্বা মৃজানঃ অত্যঃ ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম।

বৃর্ষেব যুথা পরি কোশম অর্ষন কনিক্রদত্ চম্বোঃ আবিবেশ॥

অনুবাদ :- যেমন (মর্যঃ ন) মানুষ সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে ঠিক তেমনি পরমাত্মাও মানুষের মত (শুভ্রঃ তন্ব) সুন্দর শরীর (মৃজানঃ) ধারণ করে (অত্যয়ঃ) অত্যন্ত

গতিতে নীচে নেমে এসে (সনয়ে ধনানম্) ভক্তি ধনে ধনী অর্থাৎ পুন্য আত্মাদেরকে দর্শন দেওয়ার জন্য চলে আসেন। (যূথা বৃর্ষেব) যেমন কোনো এক সমুদায় যখন তাদের সেনাপতিকে পায়, ঠিক তেমনি সেই পরমাত্মাও সন্ত বা ঋষি রূপে প্রকট হয়ে থাকেন, তখন তার অনেক সংখ্যায় অনুগামী তৈরি হয়ে যায় এবং পরমাত্মা তাদের সকলের গুরু রূপে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ঐ পরমাত্মা (পরি কোশম্) প্রথম ব্রহ্মাণ্ডে (অর্ষন) প্রাপ্ত হয়ে অর্থাৎ এসে (কনিক্রদত্) উঁচু স্বরে সত্যজ্ঞান উচ্চারণ করতে করতে (চম্বোঃ) পৃথিবী মন্ডলে (অবিবেশ) প্রবিষ্ট হন।

ভাবার্থ :- পূর্বে যেমন বেদ মন্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা উপরের লোকে থাকেন। ওখান থেকে অতিক্রম করে নিজের রূপকে অর্থাৎ শরীরের তেজপুঞ্জকে সরল করে পৃথিবীতে আসেন। এরই প্রমাণ দিচ্ছে ঋকবেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ২০, বলা হয়েছে যে, মানুষ যেমন বস্ত্র ধারণ করে সেইরূপ পরমাত্মাও মানব শরীর ধারণ ক'রে পৃথিবীতে আসেন এবং (ধনানাম্) দৃঢ় ভক্তদের (ভালো পুণ্য আত্মাদের) সাথে সাক্ষাৎ করেন, বাণী উচ্চারণ করে তাদেরকে তত্ত্বজ্ঞান শোনান।

বিশ্লেষণ :- এটি ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬ থেকে ২০-এর ফটোকপি যার হিন্দি অনুবাদ আর্য সমাজের প্রবর্তক মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর দিশা নির্দেশে তাঁর আর্য সমাজী শিষ্যরা করেছেন। এই অনুবাদ কিছু কিছু জায়গায় ঠিক কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় ভুল আছে। প্রথমে বেশিরভাগ ঠিক অথবা কিছু কিছু ভুল জায়গা গুলি আমি শুদ্ধ করে বিশ্লেষণের মধ্যে লিখে দিয়েছি। এখন যেগুলি অধিক ভুল সেগুলিকে শুদ্ধ করে লিখছি।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬-তে বলা হয়েছে যে, হে পরমাত্মা! আপনার যে গুপ্ত বাস্তবিক (চারু) শ্রেষ্ঠ নাম আছে, তার জ্ঞান করান। প্রিয় পাঠকগণ! যেমন ভারতবর্ষের রাজাকে প্রধানমন্ত্রী বলা হয়, এটি ওনার পদবীর প্রতীক। ওনার বাস্তবিক নাম তো অন্য কিছু হয়ে থাকে। যেমন প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু, এখানে জওহরলাল হল ওনার বাস্তবিক নাম। এখানে মন্ত্র নং ১৬ তে বলা হয়েছে যে, হে পরমাত্মা! আপনার যে বাস্তবিক নাম আছে, তা (সৌতৃমীঃ) উপাসনা করার (স্ব আয়ুধঃ) স্বয়ংক্রিয় শাস্ত্রের সমান (পুয়মানঃ) অজ্ঞান রুপী নোংরাকে নাশ ক'রে পাপ নাশক সিদ্ধ হয়। আপনি আপনার ঐ সত্য মন্ত্রের জ্ঞান আমাদেরকে করান। (দেব সোম) হে অমর পরমেশ্বর! আপনার ঐ শ্বাসের মাধ্যমে জপ করলে (সপ্তিরিব=সপ্তঃ ইব) বিদ্যুতের মতো গতিতে অর্থাৎ শীঘ্রই (অভিবাজম্) ভক্তি ধনে পরিপূর্ণ করে দিয়ে (শ্রবস্যামী) ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং মোক্ষ প্রাপ্তি করান।

প্রিয় পাঠকগনের কাছে নিবেদন এই যে, এই ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬ এর অনুবাদে অনেক ভুল ছিল, যা আমি শুদ্ধ করে দিয়েছি। প্রমাণের জন্য দেখুন মূল পাঠের মধ্যে "অভিবাজম" শব্দ আছে যার অনুবাদ করা হয়নি। এর পরিবর্তে "অভিগময়" শব্দের অর্থ জোড়া হয়েছে যা মূল পাঠে নেই।

বিশ্লেষণ :- ঋকবেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র নং ১৭ এর অনুবাদেও অনেক ত্রুটি আছে, যা আর্য সমাজের শিষ্যদের দ্বারা অনুবাদিত। এখন তা শুদ্ধ করে লিখছি :-

যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ এবং ৮২-এর মন্ত্রগুলিতে প্রমাণ আছে যে, পরমাত্মা নিজের শাশ্বত স্থান থেকে যা দ্যুলোকের তৃতীয় পৃষ্ঠে বিরাজমান আছেন, সেখান থেকে অতিক্রম করে পৃথিবীতে এসে জেনে বুঝে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রকট হন। পরমাত্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে থাকা সকল প্রাণীর পালন পোষণ তিনটি স্থিতিতে করে থাকেন। ১. পরমাত্মা উপরে সত্যলোকে অর্থাৎ অবিনাশী ধামে সিংহাসনের (তখত) ওপর বসে সর্বব্রহ্মাণ্ডের সঞ্চালন করেন। ২. যখন ইচ্ছা তখন সাধু সন্তের রূপ ধারণ করে নিজের শরীরের প্রকাশকে সরল করে পূর্ণ আত্মাদের দেখা দেন। ৩. প্রত্যেক যুগে কোন এক জলাশয়ে পদ্ম ফুলের উপর নবজাতক শিশুরূপে প্রকট হন। ওখান থেকে কোন নিঃসন্তান দম্পতি ওনাকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই ঐ পরমাত্মা নিজের বাস্তবিক ভক্তির জ্ঞান যাকে তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়,তা চৌপাই দোঁহা, কবিতা এবং প্রবাদ বাক্যের রূপে শোনাতে থাকেন। যেমন ১৩৯৮ (সালে সংবত ১৪৫৫) পরমাত্মা নিজের নিজ ধাম সতলোক থেকে ভারতবর্ষের কাশী শহরের বাইরে লহরতারা নামক দীঘিতে (জলাশয়) প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের উপর শিশুরূপ ধারণ করে প্রকট হয়েছিলেন।ওখান থেকে নীরু- নিমা নামক জোলা (তাঁতি) দম্পতি ওনাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে পরমাত্মা বড়ো হতে থাকেন। কবীর বাণী বলে বলে জ্ঞান শোনাতে থাকেন। প্রমাণ ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ১ মন্ত্র ৯-এর মধ্যে আছে,যা আর্য সমাজের আচার্যদের দ্বারা অনুবাদিত। এর মধ্যেও বেশি ত্রুটি না হলেও কিছু ত্রুটি আছে।

অনুগ্রহ করে পড়ুন এই ঋকবেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ১ মন্ত্র ৯ - এর ফটোকপি :-

अभी॒ई॑ममघ्न्या॑ उ॒त श्री॒णन्ति॑ धे॒नवः॒ शिशु॑म् ।
सोम॒मिन्द्रा॑य॒ पात॑वे ॥९॥

पदार्थः—(**इमं**) उस (**सोमं**) सौम्यस्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को (**शिशुं**) कुमारावस्था में ही (**अभि**) सब प्रकार से (**अघ्न्याः**) अहिंसनीय (**धेनवः**) गौवें (**श्रीणन्ति**) तृप्त करती हैं (**इन्द्राय**) ऐश्वर्य्यं की (**पातवे**) वृद्धि के लिये । (**उत**) अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को अहिंसनीय वाणियें ऐश्वर्य्यं की प्राप्ति के लिये संस्कृत करती हैं ॥९॥

বিশ্লেষণ :– এই ফটোকপি ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ১ মন্ত্র ৯ –এর মধ্যে স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে, (সোম) অমর পরমাত্মা যখন শিশু রূপে প্রকট হন,তখন ওনার পালন পোষণের লীলা কুমারী গাভীর (অভি অঘ্ন্যা ধেনুবঃ) দ্বারা হয়ে থাকে। এরই প্রমাণ কবীর সাগরের “জ্ঞান প্রকাশ” অধ্যায়ে আছে যেখানে কবীর পরমেশ্বর কে নীরু-নীমা নিজেদের ঘরে নিয়ে যায়। তারপর শিশু রূপধারী পরমাত্মা না অন্ন, না দুধ কোন কিছুই পান করেননি। এরপর স্বামী রামানন্দ জীর উপদেশে নীরু একটি কুমারী গাই অর্থাৎ একটি বাছুর নিয়ে আসেন। তৎক্ষণাৎ সেই বাছুর দুধ দেয়। তখন ঐ কুমারী গাভীর দুধে পরমেশ্বরের পালন পোষণের লীলা হয়েছিল। কবীর সাগর

গ্রন্থ প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে লেখা হয়েছিল।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ১ মন্ত্র ৯ -এর অনুবাদে কিছু ত্রুটি আছে। যেমন (অভিঅঘ্ন্যা) এর অর্থ অসহনীয় করে দিয়েছে যা ভুল। হরিয়ানা রাজ্যের রোহতক জেলার ধনানা গ্রামে লেখকের (সন্ত রামপাল দাসের) জন্ম হয়েছে, যা বর্তমানে সোনীপত জেলার অন্তর্গত। এই অঞ্চলে যে সমস্ত গরুরা (বাছুর) গর্ভধারণ করেনি তাদের কে "বিনা ধনাই" অথবা "ধনাই" হয়নি বলা হয়। (বাংলাতে এদেরকে "ধরানো হয়নি" বলা হয়)। এটি একটি অপভ্রংশ শব্দ।একটি গরুর জন্য "অঘ্নি" শব্দের প্রয়োগ করা হয়, আর বহু বচনের জন্য "অঘ্ন্যা" শব্দের প্রয়োগ করা হয়।"অঘ্ন্যা" কথার অর্থ ধনাই হয়নি এমন গরু এবং 'অভিঘ্ন্যা' কথার অর্থ পূর্ণরূপে বিনা ধনাই (ধরানো হয়নি) অর্থাৎ কুমারী গাভী যাকে বাছুর বলা হয়।

এখন ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত তো ৯৬ মন্ত্র ১৭ এর শুদ্ধ অনুবাদ করছি:—

কেবল বাংলায়:— (শিশুম্ জজ্ঞানম্ হর্যন্তম্) পরমেশ্বর জেনে বুজে তত্ত্বজ্ঞান বলার উদ্দেশ্যে শিশুরূপে প্রকট হন। ওনার সেই জ্ঞান শুনে(মরুতো গণেন) মূলত ভক্তদের একটা বড় অংশ ঐ পরমাত্মার অনুগামী হয়ে যায়। (মৃজন্তি শুম্যন্তি বহিন্)

ঐ জ্ঞান বুদ্ধিজীবী মানুষেরা সহজে বুঝতে পারে, তারা তত্ত্বজ্ঞানের আধারে ঐ পরমেশ্বরের স্তুতি ভক্তি করতে থাকে এবং সেই ভক্তি (বহিন্) অতি শীঘ্র লাভ প্রদায়ক হয়ে থাকে। ঐ পরমাত্মা নিজের তত্ত্ব জ্ঞানকে (কাব্যেনা) কবিত্বের মাধ্যমে অর্থাৎ কবিদের মতো করে দোঁহা, ছন্দ, চৌপাই এবং প্রবাদ বাক্যের রূপে (কবির্ গীর্ভিঃ) কবির বাণী দ্বারা (পবিত্রম্ অতিরেভন্) শুদ্ধ জ্ঞানকে উঁচু স্বরে চিৎকার করে করে বলেন। তিনি (কবিঃ) কবিদের মতো আচরণ করা কবির্দেব (সন্ত্) সন্ত রূপে প্রকট (সোম) অমর পরমাত্মা হয়ে থাকেন। (ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭)

বিঃ দ্রঃ:— এই মন্ত্রের মূল পাঠে দুইবার "কবিঃ" শব্দ আছে, কিন্তু আর্য সমাজের অনুবাদ কর্তারা একটি (কবিঃ) শব্দের কোন অর্থই করেনি।

বিশ্লেষণ :— এখন ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৮ বিশ্লেষণ করা যাক। এই মন্ত্রের অনুবাদেও অনেক ত্রুটি আছে। আমরা সংস্কৃত ভাষাও বুঝতে পারি,তাই বিশ্লেষণ করে যথার্থ অনুবাদ ও ভাবার্থ করছি। মন্ত্র ১৭ তে বলা হয়েছে যে, ঋষি অথবা সন্তরুপে প্রকট হয়ে পরমাত্মা অমৃত বাণী নিজের মুখকমলে বলে শোনান এবং ঐ জ্ঞান বুঝতে পেরে সমাজের অনেক সংখ্যক মানুষ ওনার অনুগামী হয়ে যায়। (য) তত্ত্বজ্ঞানের যে বাণী পরমাত্মার শোনান তা (ঋষিকৃত্) ঋষি রূপে প্রকট হওয়া পরমাত্মা দ্বারা সৃষ্ট (সহঁস্রনীথঃ) হাজার হাজার বাণী অর্থাৎ কবীর বাণী সমগ্র (ঋষিমনা) ঋষি স্বভাবের ভক্তদের জন্য (স্বর্ষাঃ) আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। (কবিনাম পদবীঃ) কবিতার মাধ্যমে দোঁহা, চৌপাই আকারে বাণী বলার কারণে ঐ পরমাত্মা কবিদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ কবির পদবীও প্রাপ্ত করে থাকেন। সেই (সোম) অমর পরমাত্মা (সিষাসন্) সকলের পালন করার ইচ্ছায় প্রথম স্তিতিতে বড় পৃথিবীতে অর্থাৎ উপরের লোকে (তৃতীয়ম্ ধাম) তৃতীয় ধাম অর্থাৎ সত্যলোকের তৃতীয় পৃষ্ঠে (অনুরাজতি) তেজোময় শরীর যুক্ত (স্তুপ) গম্বুজে (বিরাজম্) বিরাজমান

আছেন। ওখানে বসে আছেন। এই একই প্রমান ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩ এর মধ্যেও আছে যে, পরমাত্মা সর্বলোকের উপরে উপরের লোকে বিরাজমান আছেন (তিষ্ঠন্তি) বসে আছেন।

বিশ্লেষণ:— ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৯ -এর অনুবাদও আর্য সমাজের বিদ্বানেরা করেছেন। এখানে অনেক ত্রুটি আছে। পুস্তক যাতে বড় না হয়ে যায় তার জন্য আমরা কেবল আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস আলোচনা করব।

এই মন্ত্রে চতুর্থ ধামের বর্ণনা আছে। আপনারা সৃষ্টির রচনা পড়ুন ওখানে সম্পূর্ণ তথ্য জানতে পারবেন, এই পুস্তকের 124 নং পৃষ্ঠায় পড়ুন।

পরমাত্মা উপরে চারটি অজর- অমর লোক রচনা করেছেন। ১,অনামী লোক যা সবার উপরে অবস্থিত। ২. অগম লোক ৩. অলখ লোক ৪.সত্যলোক।

আমরা পৃথিবী লোকে আছি। যদি এখান থেকে গণনা করা যায় তাহলে, সত্যলোক, অলখ লোক, অগম লোক এবং অনামি লোক। পরমাত্মা ঐ চতুর্থ ধাম অনামী লোকে বসে সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেছেন। বাকি রচনা সত্যলোকে বসে করেছিলেন। আর্য সমাজের অনুবাদকরা তুরিয়া পরমাত্মার অর্থাৎ চতুর্থ পরমাত্মার বর্ণনা করেছিলেন। তার মধ্যে মূল পাঠে মন্ত্র ১৯-এর ভাবার্থ এই যে, তত্ত্বদর্শী সন্ত সেই চতুর্থ ধাম এবং চতুর্থ পরমাত্মার (বিবক্তি) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করে থাকেন। প্রিয় পাঠকগণ আপনারা কৃপা করে এই পুস্তকের 124 নং পৃষ্ঠায় সৃষ্টির রচনা অনুচ্ছেদ পড়ুন। যা থেকে আপনারা জানতে পারবেন যে, কেবল এই লেখকই (সন্ত রামপাল দাস) সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত যিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাথে পূর্ণ পরিচিত।

বিশ্লেষণ :— ঋগ্বেদ মন্ডল ৯, সুপ্ত ৯৬ মন্ত্র ২০-এর যথার্থ অনুবাদ জানবো:—

এই মন্ত্রের অনুবাদও মহর্ষি দয়ানন্দের শিষ্যরা করেছে। এনাদের দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল এই যে, পরমাত্মা নিরাকার। কেননা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তার শিষ্যদের মধ্যে এই কথা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে যে, পরমাত্মা নিরাকার। এইজন্য অনুবাদ কর্তা এই মন্ত্রের সরাসরি অনুবাদ না করে ঘুরিয়ে - ফিরিয়ে অন্য করে দিয়েছে। যেমনটি মূল পাঠে লেখা আছে যে:—

মর্য ন শুভ্রঃ তন্বা মৃজানঃ অত্যঃ ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম্।

বৃষেব যুথা পরি কোশম অর্ষন কনিক্রদত্ চম্বো আবিবেশ॥

অনুবাদ :— (মর্যঃ) মানুষ (ন) যেমন সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে, ঠিক তেমনি পরমাত্মা (শুভ্রঃ তন্ব) সুন্দর শরীর (মৃজান্) ধারণ করে, (অত্যঃ) অত্যন্ত গতিতে (সৃত্বা) নিচে নেমে এসে (ধনানাম্) ভক্তি ধনে ধনী ব্যক্তিদের অর্থাৎ পুণ্য আত্মাদেরকে (সনয়ে) প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চলে আসেন। (যুথা বৃষেভ) যেমন, কোন এক সমুদায় যখন তাদের সেনাপতিকে কাছে পায়, ঠিক তেমনি সেই পরমাত্মাও যখন সন্ত এবং ঋষি রূপে প্রকট হয়, তখন ওনার অসংখ্য অনুগামী হয়ে যায়। আর পরমাত্মা তাদের সকলের গুরু রূপে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ঐ পরমাত্মা (পরি কোশম্) প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের (অর্ষন্) প্রাপ্ত হয়ে অর্থাৎ নেমে এসে (কনিক্রদত্) উঁচু স্বরে সত্য জ্ঞান উচ্চারণ করতে করতে (চম্বো) পৃথিবী খন্ডে (অবিবেশ) প্রবিষ্ট হন।

ভাবার্থ:– পূর্বে যেমন বেদ মন্ত্রগুলিতে বলা হয়েছিল যে, পরমাত্মা উপরের লোকে থাকেন, ওখান থেকে অতিক্রম করে নিজের রূপকে অর্থাৎ শরীরের তেজপুঞ্জকে সরল করে পৃথিবীতে আসেন। এই ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ২০ তে তারই প্রমাণ দিয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা এমনভাবে অন্য শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে চলে আসেন, যেমনভাবে মানুষ বস্ত্র ধারণ করে থাকে। এইভাবে পরমাত্মা (ধনানাম্) দৃঢ় ভক্তদের (ভালো পূর্ণ আত্মাদের) প্রাপ্ত হন। এবং তাদেরকে বাণী উচ্চারণ করে তত্ত্বজ্ঞান শোনান।

(ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৫ মন্ত্র ২)

हरिः सृजानः पथ्यामृतस्येयर्ति वाचमरितेव नावम् ।
देवो देवानां गुह्यानि नामाविष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचे ॥२॥

पदार्थः—(**हरिः**) वह पूर्वोक्त परमात्मा (**सृजानः**) साक्षात्कार को प्राप्त हुआ (**ऋतस्य, पथ्यां**) वाक्द्वारा मुक्तिमार्ग की (**इयर्ति**) प्रेरणा करता है। (**अरितेव नावम्**) जैसा कि नौका के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है। और (**देवानां देवः**) सब देवों का देव (**गुह्यानि**) गुप्त (**नामाविष्कृणोति**) संज्ञाओं को प्रकट करता है (**बर्हिषि प्रवाचे**) वाणीरूपी यज्ञ के लिये ॥२॥

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৫ মন্ত্র ২ – এর অনুবাদ মহর্ষি দয়ানন্দের শিষ্যরা করেছে, যা অনেকটা সঠিক। এর ভাবার্থ এই যে, পূর্বোক্ত পরমাত্মা অর্থাৎ যে পরমাত্মার বিষয়ে আগের মন্ত্রগুলিতে বলা হয়েছিল, তিনি (সৃজানঃ) নিজে শরীর ধারণ করে (ঋতস্য পথ্যাং) সত্য ভক্তির মার্গ অর্থাৎ যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিজের অমৃতময়ী বাক্ অর্থাৎ বাণী দ্বারা মুক্তি মার্গের প্রেরণা করে থাকেন।

সেই মন্ত্র এমন'ই ঠিক যেমন (অরিতের নাবম্) নাবিক নৌকাতে বসিয়ে নদী পার করিয়ে দেন। এইরকম ভাবে পরমাত্মা সত্য ভক্তিরূপী নৌকার দ্বারা সাধককে এই সংসার রূপী নদী থেকে পার করে দেন। তিনি (দেবানাম্ দেবাঃ) সর্ব দেবতার দেব অর্থাৎ সর্বপ্রভুদের প্রভু পরমেশ্বর (বর্হিষি প্রবাচে) বাণী রূপী জ্ঞান যজ্ঞের জন্য (গুহ্যানি) গুপ্ত (নামা আবিষ্কৃণোতি)। নামের আবিষ্কার করে থাকেন অর্থাৎ যেমন গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩-এ "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রের মধ্যে তত্ এবং সত্ এই দুটি গুপ্ত মন্ত্র আছে যা ঐ পরমেশ্বর আমাকে (সন্ত রামপাল দাসকে) বলেছেন। ঐ মন্ত্রে'ই পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) সম্ভব।

সূক্ষ্ম বেদে পরমাত্মা বলেছেন যে:–

"সোহং" শব্দ হম জগ মেঁ লাএ,সার শব্দ হম গুপ্ত ছিপাএ।

ভাবার্থ :– পরমেশ্বর স্বয়ং "সোহং" শব্দ ভক্তির জন্য বলেছেন। এই সোহং মন্ত্র কোন প্রাচীন গ্রন্থে (বেদ, গীতা, কোরআন, পুরান এবং বাইবেল) এ উল্লেখ নেই। আবারও সুক্ষ্ম বেদে বলা হয়েছে যে:–

সোহং উপর ঔর হৈ, সত্য সুকৃত এক নাম।
সব হংসো কা জহাঁ বাস হৈ, বস্তী হৈ বিন ঠাম॥

ভাবার্থ:–"সোহং" নাম তো পরমাত্মা প্রকট করে দিয়েছেন অর্থাৎ আবিষ্কার করে দিয়েছেন। কিন্তু সারশব্দকে গুপ্ত রেখেছিলেন, যা এখন আমাকে (লেখক সন্ত রামপাল দাস কে) বলেছেন। দীক্ষা নেওয়ার সময় এই মন্ত্র, সাধককে বলা হয়ে থাকে। এই মন্ত্র গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩-এ বলা "ওঁ তত্ সত্" মন্ত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

(প্রমাণ:– ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১)

अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः स्पर्धन्ते धियः सूर्ये न विशः ।
अपो वृणानः पवते कवीयन्व्रजं न पशुवर्धनाय मन्म ॥१॥

पदार्थः—(सूर्य्ये) सूर्य के विषय में (न) जैसे (विशः) रश्मियां प्रकाशित करती हैं । उसी प्रकार (धियः) मनुष्यों की बुद्धियां (स्पर्धन्ते) अपनी-अपनी उत्कट शक्ति से विषय करती हैं । (अस्मिन् अधि) जिस परमात्मा में (वाजिनीव) सर्वोपरि बलों के समान (शुभः) शुभ बल है वह परमात्मा (अपोवृणानः) कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ (पवते) सबको पवित्र करता हैं । (कवीयन्) कवियों की तरह आचरण करता हुआ (पशुवर्धनाय) सर्वद्रष्टृत्व पद के लिए (व्रजं, न) इन्द्रियों के अधिकरण मन के समान 'व्रजन्ति इन्द्रियाणि यस्मिन् तद्व्रजम्' (मन्म) जो अधिकरणरूप है वही श्रेय का धाम है ॥१॥

বিশ্লেষণ:– ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১-এর অনুবাদও আর্য সমাজের বিদ্বানেরা করে রেখেছেন।

বিশ্লেষণ :- পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা যাতে বেশি না হয়ে যায়, তার জন্য আমরা কেবল প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আলোচনা করব:- যেমনটি পূর্বে লেখা বেদ মন্ত্রগুলিতে বলা হয়েছিল যে, পরমাত্মা নিজের মুখ কমলে বাণী উচ্চারণ করে তত্ত্বজ্ঞান বলেন। প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে কবিতার মতো করে দোঁহা, ছন্দ, সাখিয়া এবং চৌপাই-এর মাধ্যমে বাণী বলার কারণে প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যেও একজন 'কবি উপাধি' লাভ করেন। ওনার নাম 'কবির্দেব' অর্থাৎ কবীর সাহেব।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১ এর মধ্যেও এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আছেন। তিনি (কবিয়ন্ ব্রজম্ ন) কবিদের মতো আচরণ করে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান।

(ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ২০ মন্ত্র ১)

प्र कविर्देववीतयेऽव्यो वारेभिरर्षति ।
साह्वान्विश्वा अभि स्पृधः ॥१॥

पदार्थः—वह परमात्मा (कविः) मेधावी है और (अव्यः) सबका रक्षक है (देववीतये) विद्वानों की तृप्ति के लिये (अर्षति) ज्ञान को देता है, (साह्वान्) सहनशील है और (विश्वाः, स्पृधः) सम्पूर्ण दुष्टों को संग्रामों में (अभि) तिरस्कृत करता है ॥१॥

বিশ্লেষণ :- ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ২০ মন্ত্র ১- এর অনুবাদও আর্য সমাজের বিদ্বানেরা করেছেন। এই অনুবাদেও 'সঠিক' কম, 'ত্রুটি' অধিক আছে। এখানে মূল পাঠে লেখা আছে যে :-

'প্র কবির্দেব বীতয়ে অব্য: বারেভি: অর্ষতি সাহান্ বিশবাঃ অভি স্পৃস্ধ্যঃ।

সরলার্থ :- (প্র) 'বেদ জ্ঞানদাতা' অপেক্ষা যে অন্য (কবির্দেব) কবির্দেব – কবীর পরমেশ্বর আছেন! তিনি বিদ্বানদের অর্থাৎ জিজ্ঞাসুদের (বীতয়ে) জ্ঞান-ধনের তৃপ্তির জন্য (বারোভিঃ) শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে (অর্ষতি) জ্ঞান দিয়ে থাকেন। তিনি (অব্যঃ) অবিনাশী, রক্ষক, (সাহ্বান) সহনশীল, (বিশ্বাঃ)তত্ত্বজ্ঞানহীন সকল দুষ্টকে (স্পৃধঃ) আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কৃপা স্পর্ধা অর্থাৎ জ্ঞান গোষ্ঠী রূপী বাক যুদ্ধে (অভি) সম্পূর্ণ রূপে তিরস্কৃত করেন এবং তাদের মুখে 'চুনকালি' দিয়ে দেন।

বি: দ্র: :- (ক) এই মন্ত্রের অনুবাদে আপনারা ফটোকপিতে দেখতে পাবেন যে, অনেক শব্দের অর্থ আর্য বিদ্বানেরা ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন= "প্র", "বারেভি:" যে কারণে বেদের যথার্থ ভাব সামনে আসেনি!

(খ) আমার অনুবাদ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সেই পরমাত্মা ভাল আত্মাদের (দৃঢ় ভক্তদের) জ্ঞান প্রদান করে থাকেন এবং ওনার নামও লেখা আছে :- 'কবির্দেব' আমরা তাকে কবীর পরমেশ্বর বলে থাকি।

(প্রমাণ ঋকবেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩)

अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि ।
सोमो देवो न सूर्यः ।।३।।

पदार्थः—(**सूर्यः, न**) सूर्य के समान जगत्प्रेरक (**अयम्**) यह परमात्मा (**सोमः, देवः**) सौम्य स्वभाव वाला और जगत्प्रकाशक है और (**विश्वानि, पुनानः**) सब लोकों को पवित्र करता हुआ (**भुवनोपरि, तिष्ठति**) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है ।।३।।

বিশ্লেষণ :- ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩ এর ফটোকপিতে আপনারা দেখতে পাবেন, এর অনুবাদ আর্য সমাজের বিদ্বানেরা করেছেন। এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, পরমাত্মা (ভুবনোপরি) সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ উপরে (তিষ্ঠতি) বিরাজমান আছেন অর্থাৎ উপরে বসে আছেন।

❖ এর যথার্থ অনুবাদ ঠিক এই প্রকার :- (অয়ং) ঐ (সোম: দেব) অমর পরমেশ্বর (সূর্যঃ) সূর্যের (ন) সমান (বিশ্বানি) সকলকে (পুনানঃ) পবিত্র করার জন্য (ভুবনোপরি) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ উপরে (তিষ্ঠতি) বসে আছেন।

ভাবার্থ :- যেমন সূর্য উপরে অবস্থান করে আর নিজের প্রকাশ এবং উষ্ণতায় সকলকে লাভ প্রদান করতে থাকে। ঠিক অনুরূপভাবে ঐ অমর পরমেশ্বর যাঁর বিষয়ে উপরের মন্ত্র গুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সব ব্রহ্মাণ্ডের উপরে বসে নিজের নিরাকার শক্তির প্রভাবে সমস্ত প্রাণীকে লাভ প্রদান করছেন এবং সমস্ত

ব্রহ্মাণ্ডের সঞ্চালন করছেন।

বিতর্ক :- মহর্ষি দয়ানন্দের অর্থাৎ আর্য সমাজীদের মত হল এই যে, পরমাত্মা কোন একটি স্থানে কোনো বিশেষ লোকের মধ্যে থাকে না।

প্রমাণ :- সত্যার্থ প্রকাশ সমুল্লাস (Chapter) নং ৭ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৮ এ (আর্য সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট ৪২৭ গলি মন্দির, নয়া বস্তি দিল্লির ৭৮তম সংস্করণ)

কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন :- ঈশ্বর সর্বব্যাপী, না কোনো দেশ-বিশেষে থাকেন?

উত্তর (মহর্ষি দয়ানন্দের) :- ঈশ্বর ব্যাপক, কারণ যিনি এক দেশে থাকেন তিনি সর্ব অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ,সর্বনিয়ন্তা সকলের শ্রষ্টা, সকলের পালনকর্তা ও প্রলয়কর্তা হতে পারেন না। যে স্থানে কর্তা নেই সেই স্থানে তার ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব। (সত্যার্থ প্রকাশের প্রকরণ সমাপ্ত)

মহর্ষি দয়ানন্দ মানতেন না যে, পরমাত্মা কোনো দেশ অর্থাৎ স্থান বিশেষে থাকেন। মহর্ষি দয়ানন্দ বেদের জ্ঞানকে সত্য বলে মানতেন।

আপনারা উপরে উল্লেখিত অনেক বেদ-মন্ত্রে স্বচক্ষে দেখেছেন যে, পরমেশ্বর উপরে এক স্থানে থাকেন। সেখান থেকে অতিক্রম করে এখানে এসে প্রকট হন। মহর্ষি দয়ানন্দ এবং আর্য সমাজীরা পরমাত্মাকে নিরাকার মনে করেন।

প্রমাণ :- সত্যার্থ প্রকাশের সমুল্লাস নং ৯ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬ সমুল্লাস ৭ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৯ এবং সমুল্লাস ১১ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫১ তে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা নিরাকার।

প্রিয় পাঠকগণ! আপনারা পূর্বে প্রদত্ত বেদ মন্ত্রগুলিতে পড়েছেন যে পরমাত্মা সাকার এবং তিনি মনুষ্য সদৃশ। তিনি উপরের লোকে থাকেন, সেখান থেকে অতিক্রম করে পৃথিবীতে এসে প্রকট হন। ভালো আত্মাদের অর্থাৎ যাঁরা দৃঢ় ভক্ত, তাদের সাথে সাক্ষাৎকার করেন। তাদেরকে তত্ত্বজ্ঞান নিজের মুখ কমলের মাধ্যমে বলে শোনান। কবিদের মত আচরণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করতে করতে পরমাত্মা নিজের আধ্যাত্মিক জ্ঞান উঁচু স্বরে উচ্চারণ করে শোনাতে থাকেন।

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এর মধ্যেও এই একই প্রমান আছে।

প্রিয় পাঠকগণ! আপনারা স্বয়ং নির্ণয় করুন, কে কতটা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিদ্বান ছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বেদ মন্ত্রের অনুবাদও মহর্ষি দয়ানন্দ এবং ওনার শিষ্য আর্য সমাজীরাই করেছেন। অথচ তা তাদের মত বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত।

নিবেদন :- বেদ মন্ত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করার উদ্দেশ্য হল এই যে, যদি আমি (লেখক) অনুবাদ করে পুস্তকে দিতাম, তাহলে অন্য ব্যক্তিরা এটা বলতেন যে, সন্ত রামপাল দাসের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান নেই। এইজন্য এর অনুবাদের উপর বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু এখন আর সেই সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন তো এই বিশ্বাস দৃঢ় হবে যে সন্ত রামপাল দাস বেদ মন্ত্রের যে অনুবাদ করেছেন, তা যথার্থ। এখন সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির জ্ঞানের বিষয়ে বলব যা স্বয়ং পরমেশ্বর নিজের দ্বারা সৃষ্টি করা জ্ঞানে বলেছেন।

সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি রচনা

সর্বপ্রথম সৎপুরুষ একা ছিলেন, অন্য কোনো রচনা তখন ছিল না। পরে তিনি নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে চারটি অবিনাশী লোকের রচনা করেন :-

১. অনামি লোক যাকে অকহ্ লোকও বলা হয়।

২. অগম লোক ৩. অলখ লোক ৪. সত্যলোক।

তারপর পরমাত্মা চারটি লোকে চারটি রূপ ধারণ করে পৃথক পৃথক চারটি উপমাত্মক নামে প্রতিটি লোকে প্রসিদ্ধ হন।

১. অনামী লোকে অনামি পুরুষ বা অকহ্ পুরুষ। ২.অগম লোকে অগম পুরুষ।

৩.অলখ লোকে অলখ পুরুষ ৪.সত্যলোকে সতপুরুষ উপমাত্মক নাম রেখেছিলেন।

তারপর চার লোকে পরমাত্মা নিজের বচন শক্তিতে এক একটি করে সিংহাসন বানান। প্রত্যেকটি সিংহাসনের উপর পরমাত্মা সম্রাটের মতো মুকুট প্রভৃতি ধারণ করে বিরাজমান হয়ে যান। তারপর, সত্যলোকে পরমেশ্বর অন্য সব কিছু রচনা করেন। এক শব্দ শক্তি দিয়ে পরমাত্মা ১৬ টি দ্বীপ এবং একটি মান সরোবরের রচনা করেন। তারপর, আবার ১৬ টি বচনে ১৬ টি পুত্রের উৎপত্তি করেন। এই ১৬ জন পুত্রের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে অচিন্ত, তেজ, সহজ দাস, জোগজিৎ, কূর্ম, ইচ্ছা, ধৈর্য এবং জ্ঞানী।

নিজের পুত্রদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই যে, সামর্থ্য বিনা কোনো কাজ সফল হয় না।

"জিসকা কাম উসীকো সাজে ঔর করে তো মূর্খ বাজে।"

সতপুরুষ নিজের পুত্র অচিন্তকে বললেন, "আমি তোমাকে কিছু শক্তি প্রদান করছি, তুমি সতলোকের অন্যান্য কিছু রচনা করো। অচিন্ত্য নিজের বচন শক্তিতে অক্ষর পুরুষের উৎপত্তি করেন। সেই মতো যুবক অক্ষর পুরুষ উৎপন্ন হলেন। তারপর সতলোকে অবস্থিত মান সরোবরে অক্ষর পুরুষ স্নান করতে চলে যান, সেখানে সেই জলে আনন্দে সাঁতার কাটতে কাটতে ঘুমিয়ে পড়েন। অক্ষর পুরুষ নিদ্রাবস্থায় জলের গভীর চলে যান। (সতলোকে অমর শরীর সেখানকার শরীর শ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়। অনেক সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও অক্ষর পুরুষ মান সরোবর থেকে ফিরে না আসার কারণে অচিন্ত আর কোন সৃষ্টি রচনা করতে পারেনি। তখন সতপুরুষ (পরম অক্ষর পুরুষ) মানস সরোবরে উপস্থিত হয়ে মান সরোবরের কিছু জল হাতের মুঠোয় নিয়ে তা দিয়ে একটি বিশালাকার ডিম বানিয়ে তার মধ্যে নিজের বচন শক্তি দিয়ে একটি আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে দেন। তারপর সেই ডিমটিকে মান সরোবরের জলে ছেড়ে দেন। জলের মধ্য দিয়ে নীচে যাওয়ার সময় ঐ ডিমের গড়-গড় শব্দে অক্ষর পুরুষের ঘুম ভেঙ্গে যায়। হঠাৎ অক্ষর পুরুষের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে অক্ষর পুরুষ ক্রোধ দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখতে লাগলেন, "কে আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে!" অক্ষর পুরুষের ক্রোধ দৃষ্টি যখন ঐ ডিমের উপর পড়লো সাথে সাথেই ডিমটি ফেটে গেল। তার মধ্য থেকে একটি

ব্যক্তি তেজোময় যুবক বেরিয়ে আসলেন। তার নাম ক্ষর পুরুষ রাখা হল। (পরে এই ক্ষর পুরুষকে কাল বলে অভিহিত করা হয়েছে) সতপুরুষ দুইজনকে বাইরে আসতে আদেশ দিলেন। তারপর পরমেশ্বর বললেন,” অক্ষর পুরুষ! তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তাই তোমাকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য এই সমস্ত ক্রিয়া করা হয়েছে। অক্ষর পুরুষ এবং ক্ষরপুরুষকে সতপুরুষ অচিন্তের সাথে অচিন্তর দ্বীপে গিয়ে থাকার আদেশ দিলেন।

কিছু সময় পর অক্ষরপুরুষ (যাকে জ্যোতি নিরঞ্জন কালও বলা হয়) মনে মনে ভাবলেন, “আমরা তিনজন তো একটা দ্বীপে থাকছি, আর বাকি আমার অন্য ভাইয়েরা এক একজন পৃথক পৃথক দ্বীপে থাকছে।” এই কথা চিন্তা করে পৃথক দ্বীপ প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যে ক্ষর পুরুষ তপস্যা শুরু করলেন। এর পূর্বে সৎপুরুষ নিজের পুত্র অচিন্তকে বললেন, তুমি সৃষ্টি রচনা করতে সক্ষম হও নি আর হবেও না॥ “আমি তোমাকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই তখন বলেছিলাম, “অন্য কিছু রচনা কর। কিন্তু অচিন্ত! তুমি তো অক্ষর পুরুষকেও ঘুম থেকে ওঠাতে পারো নি। এখন থেকে আর কখনো এমন চেষ্টা করতে যাবে না। সকল সৃষ্টি আমি নিজের বচন শক্তি দিয়ে রচনা করব।”

সৎপুরুষ সৎলোকের মধ্যে অসংখ্য লোকের রচনা করেন এবং প্রত্যেক লোকের মধ্যে নিজের বচন (শব্দ) শক্তি দিয়ে অন্যান্য আরও আত্মাদের উৎপত্তি করেন। এই সমস্ত লোক সৎপুরুষের সিংহাসনের চারিপাশে থাকতো। এদের মধ্যে কেবল নর হংসরাই (সৎলোকে মানুষকে হংস বলা হয়) থাকতেন এবং তাদেরকেও পরমেশ্বর শক্তি দিয়ে রেখেছেন, যাতে তারাও নিজের পরিবার (নর হংস) বচন শক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন করতে পারে। তারা কেবল দুইজন পুত্র উৎপন্ন করতে পারবে।

অপরদিকে ক্ষরপুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) তপস্যা করতে শুরু করে দেন। এইভাবে অক্ষর পুরুষ ৭০ যুগ পর্যন্ত তপস্যা করেন। তারপর সতপুরুষ অক্ষর পুরুষকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি জন্য এমন তপস্যা করছো?” উত্তরে ক্ষর পুরুষ বলেন, “এই স্থান আমার জন্য অনেক কম, আমার আলাদা স্থান চাই।” এ কথা শুনে পরমেশ্বর (সতপুরুষ) তার ৭০ যুগ তপস্যা করার প্রতিফলে একুশ ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে দেন যা সতলোকের বাইরের দিকের ক্ষেত্র ছিল। ঠিক যেমন ২১ টি প্লট পেয়ে গেলে যেমন হয়। এরপর জ্যোতি নিরঞ্জন (ক্ষর পুরুষ) চিন্তা করলেন যে এই ব্রহ্মাণ্ড গুলিতে কিছু নির্মাণ কার্য হওয়া দরকার। এইজন্য ক্ষর পুরুষ আবার ৭০ যুগ পর্যন্ত তপস্যা করলেন। তারপর সতপুরুষ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “এখন তুমি কি চাও?” উত্তরে ক্ষর পুরুষ বললেন, “কৃপা করে সৃষ্টি রচনার কিছু সামগ্রী দিন আমাকে প্রভু!” এ কথা শুনে সতপুরুষ ওনাকে (ক্ষর পুরুষকে) পাঁচ তত্ত্ব (জল, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ) ও তিনগুণ (রজগণ, সত্ত্বগুন ও তমোগুন) প্রদান করে বললেন, “এগুলি দিয়ে তোমার প্রয়োজনীয় নির্মাণকার্য সম্পন্ন কর।”

এরপর ক্ষরপুরুষ পুনঃরায় তৃতীয়বারের জন্য তপস্যা শুরু করেন। এইভাবে যখন ৬৪ যুগ পর্যন্ত তপস্যা হয়ে যায়, তখন সৎ পুরুষ এসে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি

আবার কেন তপস্যা করছো? তুমি আর কি কি চাও?” উত্তরে ক্ষরপুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) বলেন, “আমাকে কিছু আত্মা দিয়ে দেন। আমার ওখানে একা থাকতে ভালো লাগছে না।“এইভাবে ক্ষর পুরুষ আত্মাগুলিকে প্রাপ্ত করেন। আরো পড়ুন

আমরা কিভাবে কালের লোকে এসেছি ?

যখন ক্ষর পুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিল, তখন আমরা এই সকল আত্মারা ক্ষর পুরুষের প্রতি আকর্ষিত হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক যেমন যুবক যুবতিরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের উপর আকর্ষিত হয়ে থাকে। অথচ তাদের সাথে না আছে কোনো লেনদেন, তবুও তাদের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে, এদিকে তারা তাদের অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে নাচ গান করতে থাকে। অল্প বয়সি ছেলে মেয়েরা তাদেরকে দেখতে গিয়ে নিজেদের অর্থ নষ্ট করে ফেলে। ঠিক একই ভাবে আমরাও আমাদের পরমপিতা সতপুরুষকে ছেড়ে দিয়ে কাল পুরুষকে (ক্ষর পুরুষ) মনে প্রাণে চেয়ে ছিলাম। যে পরমেশ্বর আমাদেরকে সর্ব সুখ সুবিধা প্রদান করেছিলেন, আমরা সেই তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এই নকল অভিনয় করা কাল ব্রহ্মকে মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম এরই মধ্যে পরমাত্মা অর্থাৎ সতপুরুষ মাঝে-মাঝে এসে বহু বার আকাশবানী করে আমাদেরকে সতর্কও করেছিলেন যে, হংস আত্মাগন! তোমরা এই কালের ক্রিয়াকলাপ একদম দেখিও না, তোমরা খুশিতে থাকো। আমরা উপরে উপরে তো সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু ভিতরে ভিতরে কালকেই চাইতে থাকি। পরমেশ্বর তো অন্তর্যামী তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, এখন আর এরা এখানে থাকার যোগ্য নয়। অন্যদিকে কালপুরুষ (ক্ষর পুরুষ = জ্যোতি নিরঞ্জন) যখন দুইবার তপস্যা করে তার ফলপ্রাপ্ত করে নিয়েছিলেন তখন তিনি চিন্তা করতে থাকেন, “এখন আমার কিছু জীবাত্মার প্রয়োজন যারা আমার সাথে থাকবে। ২১ ব্রহ্মাণ্ডে একা থাকতে আমার ভালো লাগবে না।” এই জন্য ক্ষর পুরুষ জীবাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তপস্যা শুরু করলেন। এইভাবে ৬৪ যুগ পর্যন্ত তপস্যা করার পর পরমেশ্বর এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “জ্যোতি নিরঞ্জন! আবার তুমি কেন তপস্যা করছো?” ক্ষরপুরুষ বললেন, “আমাকে কিছু আত্মা প্রদান করুন, আমার একা থাকতে ওখানে আর ভালো লাগছে না।” সতপুরুষ বললেন, “তোমার তপস্যার প্রতিফলে আমি তোমাকে আরো ব্রহ্মাণ্ড দিতে পারি, কিন্তু নিজের আত্মাদের দেব না। এরা আমার শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি তারা স্বেচ্ছায় যেতে চায়, তাহলে তারা যেতে পারে।” যুবা কবীরের (সামর্থ্য কবীর পরমেশ্বরের) বচন শুনে জ্যোতি নিরঞ্জন আমাদের কাছে আসেন। এদিকে আমরা সকল হংস আত্মারা তো আগে থেকেই ওনার উপর আসক্ত ছিলাম। ওনাকে দেখে আমরা সবাই ওনার চারিপাশে ঘিরে ধরলাম। জ্যোতি নিরঞ্জন বললেন, “আমি পিতার কাছে থেকে আলাদা ২১ ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত করেছি, সেখানে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর রমণীয় স্থান বানিয়ে রেখেছি। তোমরা কি আমার সাথে ওখানে যাবে?” আমরা সমস্ত হংস আত্মারা যারা আজ ২১ ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখী হয়ে আছি, আমরা বলে উঠলাম, “আমরা তো প্রস্তুত কিন্তু যদি পিতা পরমেশ্বর আজ্ঞা দেন, তবে আমরা যেতে

পারি।” একথা শুনে ক্ষর পুরুষ (কাল) পূর্ণ ব্রহ্ম মহান কবীর (সামর্থ্য কবীর প্রভু) পরমেশ্বরের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বলেন। তখন কবিরাগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) বললেন, “যদি হংস আত্মারা আমার সামনে স্বীকৃতি দেয়, তবে আমি আজ্ঞা দেব।” তারপর ক্ষর পুরুষ এবং পরম অক্ষর পুরুষ (কবির মিতৌজা) দুজনেই আমাদের সমস্ত হংস আত্মাদের কাছে আসেন। সত কবির্দেব বললেন, “যে সমস্ত হংস আত্মারা ব্রহ্মের সাথে যেতে চাও, তারা হাত উপরে তুলে স্বীকৃতি দাও।” নিজের পিতার সামনে হাত তুলতে কারো সাহস হয়নি! কেউই স্বীকৃতি দেয়নি অনেক সময় ধরে সবাই নিশ্চুপ হয়ে রইল। তারপর একটি হংস আত্মা সাহস করে বললেন, হে পিতা! আমি ক্ষর পুরুষের সাথে যেতে চাই। তারপর ওনার দেখা-দেখি (যারা আজ কাল ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মান্ডে ফেঁসে আছি) আমরা সকল আত্মারাও স্বীকৃত দিয়ে দিই। পরমেশ্বর কবির্দেব জ্যোতি নিরঞ্জনকে বললেন, তুমি তোমার স্থানে চলে যাও। যে সমস্ত আত্মারা তোমার সাথে যেতে স্বীকৃতি দিয়েছে, আমি সেই সমস্ত হংস আত্মাদের তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তারপর জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের ২১ ব্রহ্মান্ডে চলে যায়। ঐ সময় পর্যন্ত এই ২১ ব্রহ্মান্ড সতলোকের মধ্যেই ছিল।

তারপর পূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হংস আত্মাকে এক মেয়ের রূপ দেয় কিন্তু তার স্ত্রী ইন্দ্রিয় (যোনী) রচনা করেননি এবং সমস্ত আত্মাদেরকে (যারা জ্যোতি নিরঞ্জনের (ব্রহ্মের) সাথে যাওয়ার জন্য সম্মতি দিয়েছিল) ঐ মেয়ের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সর্বপ্রথম ইচ্ছা প্রকাশ করা ঐ মেয়ের নাম পরমাত্মা অস্ট্রা (আদিমায়া/ প্রকৃতি দেবী /দুর্গা) রাখেন এবং ওকে বলে পুত্রী! আমি তোকে শব্দ শক্তি প্রদান করে দিয়েছি, যত জীব ব্রহ্ম উৎপন্ন করতে বলবে তা তুই উৎপন্ন করে দিবি। পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেব (কবীর সাহেব) নিজের পুত্র সহজ দাসকে দিয়ে প্রকৃতিকে (দূর্গাকে) ক্ষরপুরুষের কাছে পাঠিয়ে দেন। সহজ দাস জ্যোতি নিরঞ্জনকে বলেন, পরম পিতা এই বোনের শরীরে ওই সমস্ত আত্মাদের প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, যারা আপনার সাথে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এই বোনকে পিতা বচন শক্তি দিয়েছেন, আপনি যত জীব চাইবেন প্রকৃতি নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে তা উৎপন্ন করে দেবে। এই কথা বলে সহজ দাস দুর্গাকে ক্ষরপুরুষের কাছে রেখে দিয়ে নিজের দ্বীপে ফিরে আসে। যুবতী হওয়ার কারণে মেয়েটির রূপ রং ফুটে উঠেছিল। তাই ব্রহ্মের মধ্যে বিষয় বাসনা উৎপন্ন হয়ে যায় এবং প্রকৃতি দেবীর সাথে অভদ্র গতিবিধি (চাল-চলন) করতে শুরু করে দেয়। তখন দূর্গা বলেন, জ্যোতি নিরঞ্জন আমার কাছে পিতার দেওয়া শব্দ শক্তি আছে, আপনি যত প্রাণী চাইবেন তা আমি বচন শক্তি দিয়ে উৎপন্ন করে দেবো। আপনি মৈথুন পরম্পরা শুরু করবেন না। আপনিও ঐ পিতার শব্দ শক্তিতে ডিমের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছেন এবং তারপর আমিও ঐ পরম পিতার বচন শক্তিতে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি আমার বড়ো ভাই; ভাই - বোনের এই যোগ (সম্পর্ক) মহাপাপের কারণ হবে। কিন্তু জ্যোতি নিরঞ্জন প্রকৃতি দেবীর কোনো কথা (প্রার্থনা) না শুনে জোর পূর্বক নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে নখের মাধ্যমে স্ত্রী ইন্দ্রিয় (যোনী) বানিয়ে কু-কর্ম (বলাৎকার) করার চেষ্টা করে।

সেই সময় দূর্গা নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য কোনো উপায় না দেখে, নিজের সূক্ষ্ম

(দেখুন এক ব্রহ্মাণ্ডের লঘু চিত্র)

ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র

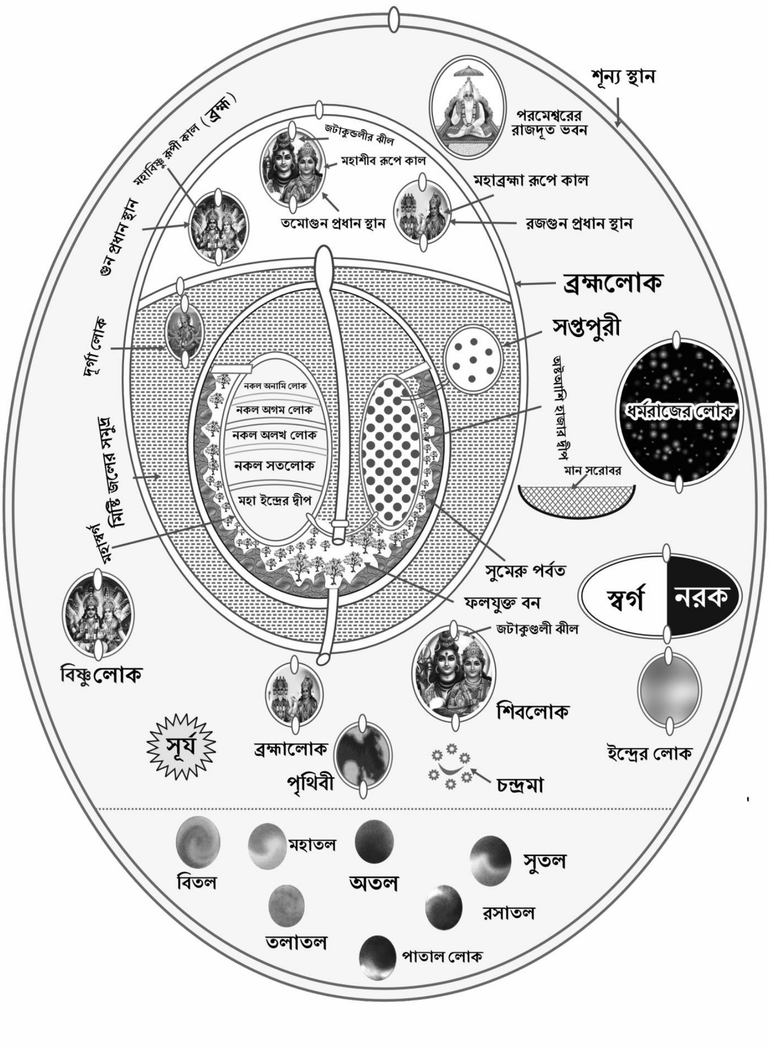

রূপ ধারণ করে জ্যোতি নিরঞ্জনের খোলা মুখের মধ্য দিয়ে পেটের মধ্যে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেবের কাছে নিজের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। তৎক্ষনাৎ কবির্দেব নিজের পুত্র যোগ সন্তায়ন অর্থাৎ জোগজীতের রূপ ধারণ করে ওখানে প্রকট হয়ে যান এবং নিজের মেয়েকে ব্রহ্মের পেট থেকে বের করেন। তারপর বলেন, জ্যোতি নিরঞ্জন! আজ থেকে তোর নাম "কাল" হবে। তোর জন্ম - মৃত্যু সর্বদা হতে থাকবে, এই জন্য তোর নাম ক্ষর পুরুষ হবে এবং তুই এক লক্ষ মানব শরীরধারী প্রাণীকে প্রতিদিন আহার করবি আর সোয়া লক্ষ উৎপন্ন করবি। এখন তোমাদের দুজনকে একুশ ব্রহ্মান্ড সহ সতলোক থেকে নিষ্কাশিত করে দিলাম। এই কথা বলার সাথে সাথে ২১ ব্রহ্মান্ড বিমানের মতো উড়ে চলে যায়। সহজ দাসের দ্বীপের পাশ দিয়ে এসে ২১ ব্রহ্মান্ড সতলোক থেকে ১৬ শঙ্খ ক্রোশ (১ ক্রোশ প্রায় ৩ কি.মি হয়) দূরে এসে স্থির হয়ে যায়।

বিশেষ বিবরণ :- এই পর্যন্ত তিন শক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. পূর্ণ ব্রহ্মকে অন্য উপমাত্মক নামেও জানা যায় যেমন, সত্পুরুষ, অকালপুরুষ, শব্দ স্বরূপী রাম, পরম অক্ষর ব্রহ্ম/পুরুষ ইত্যাদি। এই পূর্ণব্রহ্ম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বাস্তবে (আসলে) তিনি অবিনাশী। ২. পরব্রহ্মকে অক্ষর পুরুষও বলা হয়। এই পুরুষ বাস্তবে অবিনশ্বর নয়। পরব্রহ্ম সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী।

৩. ব্রহ্ম এই পুরুষকে জ্যোতি নিরঞ্জন, কাল, কৈল, ক্ষরপুরুষ, ধর্মরায় ইত্যাদি নামে জানা যায়। এই পুরুষ একুশ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। ব্রহ্মের (কাল) সৃষ্টির এক ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দেওয়া হল, এখন আমরা আরও তিন নামের সাথে পরিচিত হবো - ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার পার্থক্য :- এক ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোপরি স্থানে (সব থেকে উপরের স্থানে) স্বয়ং তিন গুপ্ত স্থান বানিয়ে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপ ধারন করে পত্নী প্রকৃতির (দূর্গা) সহযোগে তিন পুত্রের উৎপত্তি করে। এবং তাদের নামও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব রাখে। এই ব্রহ্মের পুত্র ব্রহ্মা এক ব্রহ্মাণ্ডের তিনলোকের (পৃথিবীলোক, স্বর্গলোক, পাতাললোক) রজগুণ বিভাগের মন্ত্রী (স্বামী) একে ত্রিলোকের (তিনলোকের) ব্রহ্মা বলা হয়।

ব্রহ্মালোকে যে ব্রহ্ম, ব্রহ্মা রূপে থাকে, তাকে মহাব্রহ্মা বা ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মা বলা হয়। এই ব্রহ্ম (কাল) কে সদাশিব, মহাশিব, মহাবিষ্ণু, মহাব্রহ্মাও বলা হয়।

শ্রী বিষ্ণু পুরাণে প্রমাণ :- চতুর্থ অংশ অধ্যায় ১ পৃষ্ঠা ২৩০-২৩১ এ শ্রী ব্রহ্মা বলেছেন, সেই অজন্মা সর্বময় বিধাতা পরমেশ্বরের আদি (সর্বপ্রথম) মধ্য, অন্ত স্বরূপ স্বভাব এবং সার আমি জানি না (শ্লোক ৮৩)। তিনি আমার রূপ ধারন করে সংসারের রচনা করেন, স্থিতির সময় তিনি পুরুষ রূপ এবং রুদ্র রূপে বিশ্বকে গ্রাস করেন এবং অনন্ত রূপে সম্পূর্ণ জগতকে ধারণ করেন (শ্লোক ৮৬)।

"শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের উৎপত্তি"

কাল ব্রহ্ম প্রকৃতি (দূর্গা) কে বলে, এখন আমাকে কে কি করবে? আমার যা ইচ্ছা তাই করবো। তারপরেও প্রকৃতি প্রার্থনা করে যে, একটু তো লজ্জিত হোন! প্রথমে তো, "আপনি আমার বড়ো ভাই, কারণ আপনি ঐ পূর্ণ পরমাত্মার (কবীরদেব) বচন শক্তিতে ডিম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন এবং পরে ঐ পূর্ণ প্রভুর বচন শক্তিতে আমারও সৃষ্টি হয়েছে।" দ্বিতীয়ত; "আমি আপনার পেট থেকে বের হয়েছি। তাই আমি আপনার মেয়ে আর আপনি আমার পিতা

এই পবিত্র সম্পর্ককে খারাপ করা মহাপাপ হবে! আমার কাছে পিতার দেওয়া শব্দ শক্তি আছে, যত প্রাণী আপনি চাইবেন তত প্রাণী আমি সৃষ্টি করে দেব।” জ্যোতি নিরঞ্জন দূর্গার কোন কথা না শুনে বলে, আমার যা শাস্তি পাওয়ার তা পেয়ে গিয়েছি। আমাকে সতলোক থেকে নিষ্কাষিত (বাহির) করে দিয়েছে। এখন যা খুশি তাই করবো! এই কথা বলে কালপুরুষ (ক্ষর পুরুষ) জোর করে প্রকৃতির সহিত বিবাহ করে এবং তিন পুত্রের (রজগুণ যুক্ত ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ যুক্ত বিষ্ণু, তমোগুণযুক্ত শিব শঙ্কর) উৎপন্ন করেন। যুবক হওয়া পর্যন্ত তিন পুত্রকে দূর্গার দ্বারা অজ্ঞান করে রাখেন! এবং যুবক হওয়ার পর শ্রী ব্রহ্মাকে কমল ফুলের উপর, শ্রী বিষ্ণুকে শেষ নাগের বিছানায় এবং শ্রী শিবকে কৈলাস পর্বতের উপর সজ্ঞান করে একত্রিত করেন। তারপর প্রকৃতি (দূর্গা) নিজে এই তিন দেবের বিবাহ দিয়ে এক ব্রহ্মাণ্ডের তিন লোকের (স্বর্গলোক, পৃথিবীলোক পাতাললোক) এক এক বিভাগের মন্ত্রী (প্রভু) পদে নিযুক্ত করেন। যেমন শ্রী ব্রহ্মাকে রজগুণ বিভাগের তথা বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণ বিভাগের ও শ্রী শিব শঙ্করকে তমোগুণ বিভাগের এবং স্বয়ং গুপ্ত (মহাব্রহ্মা-মহাবিষ্ণু-মহাশিব) রূপে মূখ্যমন্ত্রীর ভুমিকা পালন করেন। এক ব্রহ্মাণ্ডে এক ব্রহ্মালোকের রচনা করে তিন গুপ্ত স্থান তৈরী করেন। এক রজগুণ প্রধান স্থান সেখানে এই ব্রহ্ম (কাল পুরুষ) স্বয়ং মহাব্রহ্মা (মুখ্যমন্ত্রী) রূপে থাকেন এবং পত্নী দূর্গাকে মহাসাবিত্রী রূপে রাখেন। এই দুই জনের সংযোগে ঐ স্থানে যে পুত্রের উৎপন্ন হয়, সে রজগুণ যুক্ত হয়। তার নাম ব্রহ্মা রাখেন। দ্বিতীয় স্থান সত্ত্বগুণ যুক্ত বানিয়ে সেখানে ক্ষরপুরুষ স্বয়ং মহাবিষ্ণু রূপ ধারন করেন এবং পত্নী দূর্গাকে মহালক্ষ্মী রূপে রেখে যে পুত্রের উৎপন্ন করেন তার নাম বিষ্ণু রাখেন এবং ঐ পুত্র সত্ত্বগুণ যুক্ত হন। তৃতীয় স্থানকে কাল তমোগুণ প্রধান ক্ষেত্র তৈরী করেন। ওখানে স্বয়ং সদাশিব রূপ ধারন করে পত্নী দূর্গাকে মহাপার্বতী রূপে রাখেন। এই দুইজনের পতি পত্নীর ব্যবহারে যে পুত্রের উৎপন্ন হয়, সে তমোগুণ যুক্ত হয় এবং তাঁর নাম শিব রাখা হয়। {প্রমাণের জন্য দেখুন পবিত্র শিব মহাপুরাণ, বিদ্ধেশ্বর সংহিতা পৃষ্ঠা ২৪-২৬, এতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং মহেশ্বর থেকে অন্য (পৃথক) সদাশিবের বিবরণ আছে। রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৬ ও ৭, ৯ পৃষ্ঠা নং ১০০ থেকে ১০৫ ও ১১০ - এ অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত, শ্রীমদ্ দেবী মহাপুরাণ তৃতীয় স্কন্দ এক পৃষ্ঠা নং ১১৪ থেকে ১২৩ পর্যন্ত গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত। অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী।} এদের ধোঁকায় রাখে! অর্থাৎ সত্যকে না জানিয়ে নিজের আহারের জন্য শ্রী ব্রহ্মা দ্বারা জীবের উৎপত্তি, বিষ্ণু দ্বারা পালন বা স্থিতি (একে অন্যের প্রতি মোহ মায়ার সৃষ্টি) করে কালের জালে রেখে শ্রী শিব দ্বারা সংহার করায়। কারণ অভিশাপের জন্য কাল পুরুষকে এক লাখ মানব শরীর ধারী প্রাণীর সুক্ষ্ম শরীরের ময়লা (গন্ধ) বের করে খেতে হয়! এই জন্য একুশ ব্রহ্মাণ্ডে এক ‘তপ্ত শিলা’ আছে। কাল ভগবান এই তপ্ত শিলায় জীব আত্মাকে ভেজে গন্ধ বের করে খায়! জীব মরে না কিন্তু ভয়ংকর কষ্ট পায়। তারপর প্রাণীদের কর্মের আধারে অন্য শরীরে পাঠায়। যেমন কোন ঘরে তিনটি কক্ষ আছে। এক কক্ষে অশ্লীল চিত্র লাগানো আছে। ঐ কক্ষে যেতেই মনে মলিন বিচার চলে আসে। দ্বিতীয় কক্ষে সাধু-সন্ত-ভক্তদের চিত্র লাগানো আছে, ওখানে যেতেই মনে ভালো বিচার এবং প্রভুর প্রতি চিন্তা আসে। তৃতীয় কক্ষে দেশ ভক্ত শহীদদের চিত্র লাগানো আছে, ওখানে গেলে মনে বিদ্রেহীভাব বা জোশ ভাব উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম (কাল) নিজের চিন্তা ভাবনা (বিচার-বুদ্ধি) দিয়ে তিন গুণের তিনটি বিশেষ স্থানের রচনা করেন!

(দেখুন ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র এবং জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) ব্রহ্মের ২১ লোকের (ব্রহ্মাণ্ডের) লঘু

ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র

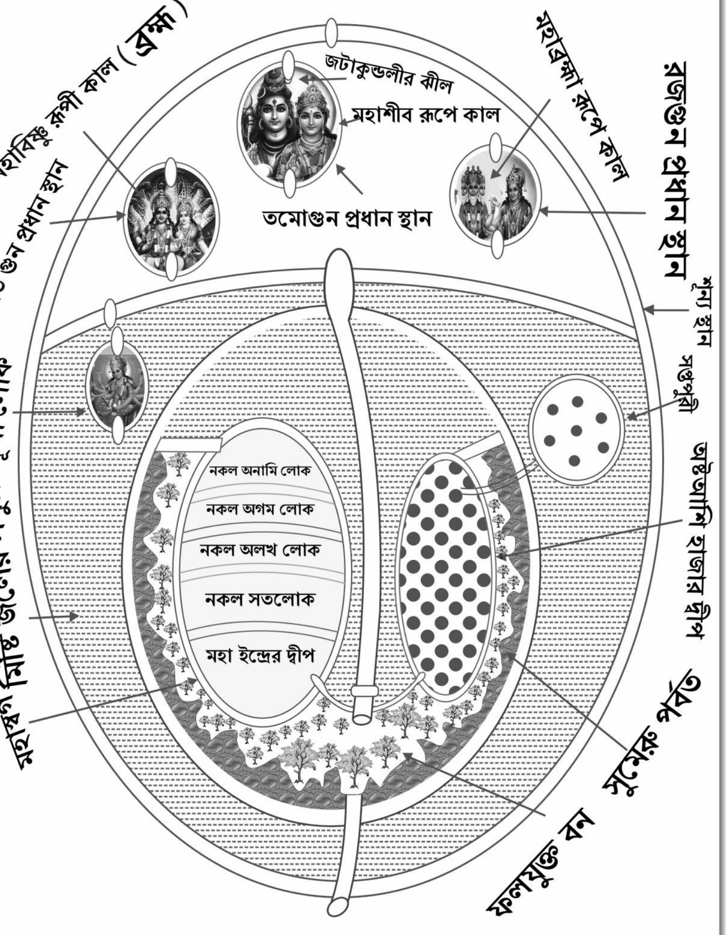

জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) ব্রহ্মের লোক (২১ ব্রহ্মাণ্ড) এর লঘুচিত্র

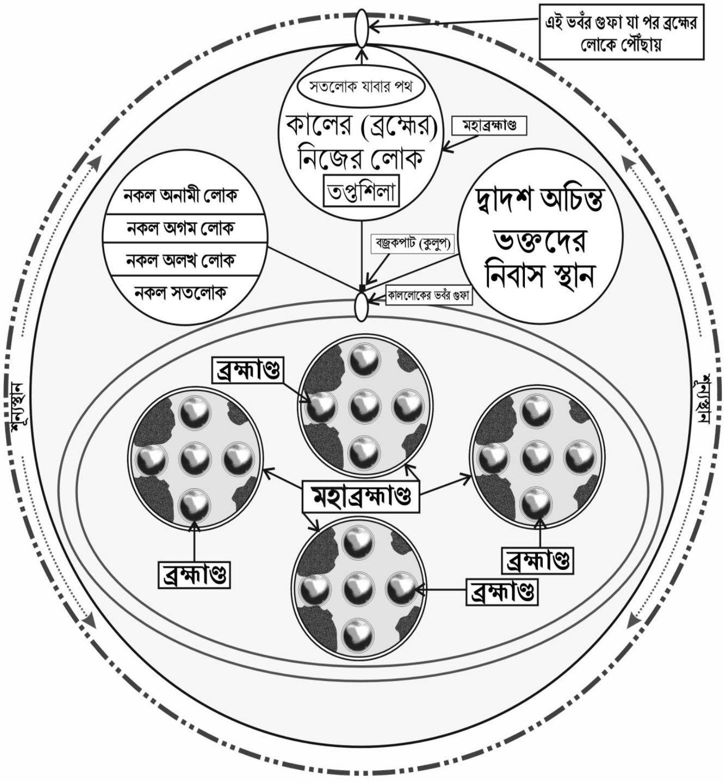

চিত্র এই পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২২ - ১২৩)

"সম্পূর্ণ সৃষ্টি রচনা"

(সুক্ষ্ম বেদ থেকে সারাংশ রূপে সৃষ্টি রচনার বর্ণনা)

প্রভু প্রেমী আত্মারা প্রথমবার নিচে বর্ণিত সৃষ্টি রচনা পড়লে মনে হবে এটা একটা দন্ত কথা (গল্প কথা), কিন্তু সর্ব পবিত্র গ্রন্থের প্রমাণকে পড়ে দাঁতের নীচে আঙুল রেখে কামড়াতে বাধ্য হবেন অর্থাৎ চিন্তা করতে বাধ্য হবেন, যে এই বাস্তবিক (সত্য) অমৃত জ্ঞান এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল? প্রার্থনা, ধৈর্যের সাথে পড়তে থাকুন এবং এই অমৃত জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখুন! আপনার একশো এক পুরুষ (পিঢ়ী) পর্যন্ত কাজে আসবে। পবিত্র আত্মারা কৃপা করে সত্যনারায়ণ অবিনাশী প্রভু/সত্পুরুষের দ্বারা সৃষ্টি রচনার বাস্তবিক জ্ঞান পড়ুন :-

১. পূর্ণ ব্রহ্ম :- এই সৃষ্টির রচনাতে সত্ পুরুষ - সতলোকের স্বামী (প্রভু) অলখ পুরুষ - অলখ লোকের স্বামী (প্রভু), অগম পুরুষ অগম লোকের স্বামী (প্রভু) এবং অনামী পুরুষ - অনামী লোকের স্বামী (প্রভু) একই 'পূর্ণ বহ্ম'। আসলে (বাস্তবে) তিনি অবিনাশী প্রভু, বিভিন্ন রূপ ধারন করে বিভিন্ন লোকে থাকেন। ঐ পরমাত্মার অন্তর্গত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড।

২. পরব্রহ্ম :- এই পুরুষ কেবল সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (প্রভু)। এই পুরুষকে অক্ষর পুরুষও বলা হয়। কিন্তু এখানকার সকল ব্রহ্মান্ড নশ্বর। এই প্রভু বাস্তবে অবিনশ্বর নয়।

৩. ব্রহ্ম :- এই প্রভু কেবল ২১ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (প্রভু)। একে ক্ষর পুরুষ, জ্যোতি নিরঞ্জন ও কাল নামে জানা যায়। এই কাল (পুরুষ) এবং এর সর্ব ব্রহ্মাণ্ড নাশবান। উপরোক্ত তিন পুরুষের (প্রভু) প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ -১৭ তে দেওয়া আছে)

৪. ব্রহ্মা :- ব্রহ্মা এই ব্রহ্মের বড় ছেলে (পুত্র) বিষ্ণু, দ্বিতীয় (মেজো) পুত্র এবং শিব তৃতীয় পুত্র। ব্রহ্মের এই তিন পুত্র এক ব্রহ্মাণ্ডের এক - এক বিভাগের (গুণের) স্বামী বা প্রভু, এরা সবাই নাশবান। বিস্তারিত বিবরণের জন্য কৃপা করে পড়ুন নিম্নে লেখা সৃষ্টি রচনা :-

{কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) সুক্ষ্ম বেদে অর্থাৎ কবীর বাণীতে নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ং নিজে বলেছেন যা নিম্নে বর্ণিত হল।} :-

সর্বপ্রথম একমাত্র স্থান অনামি (অনাময়) লোক ছিল। তাকে অকহ লোকও বলা হয়। পূর্ণ পরমাত্মা ঐ অনামি লোকে একা থাকতেন। ঐ পরমাত্মার বাস্তবিক (আসল) নাম কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর। সকল আত্মা ঐ পূর্ণ ধনীর শরীরে সমাহিত ছিল। এই কবির্দেবের উপামাত্মক নাম অনামী পুরুষ (পুরুষ অর্থাৎ প্রভু পরমাত্মা মানুষকে নিজের স্বরূপে বানিয়েছে এই জন্য মানবকেও পুরুষ বলা হয়) অনামী পুরুষের এক লোমকুপের প্রকাশ শঙ্খ সূর্যের থেকেও বেশি।

বিশেষ :- যেমন কোন দেশের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর শারীরিক নাম তো অন্য হয়

পরমেশ্বর কবীর সাহেবের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের লঘু চিত্র

অনামী লোকঃ- এই লোকে কবীর সাহেব অনামী পুরুষ রূপে আছেন। এখানে একাকি থাকেন।

অগম লোকঃ- এই লোকেও কবীর সাহেব অগম পুরুষ রূপে থাকে।

অলখ লোকঃ- এই লোকেও কবীর সাহেব অলখ পুরুষ রূপে থাকে।

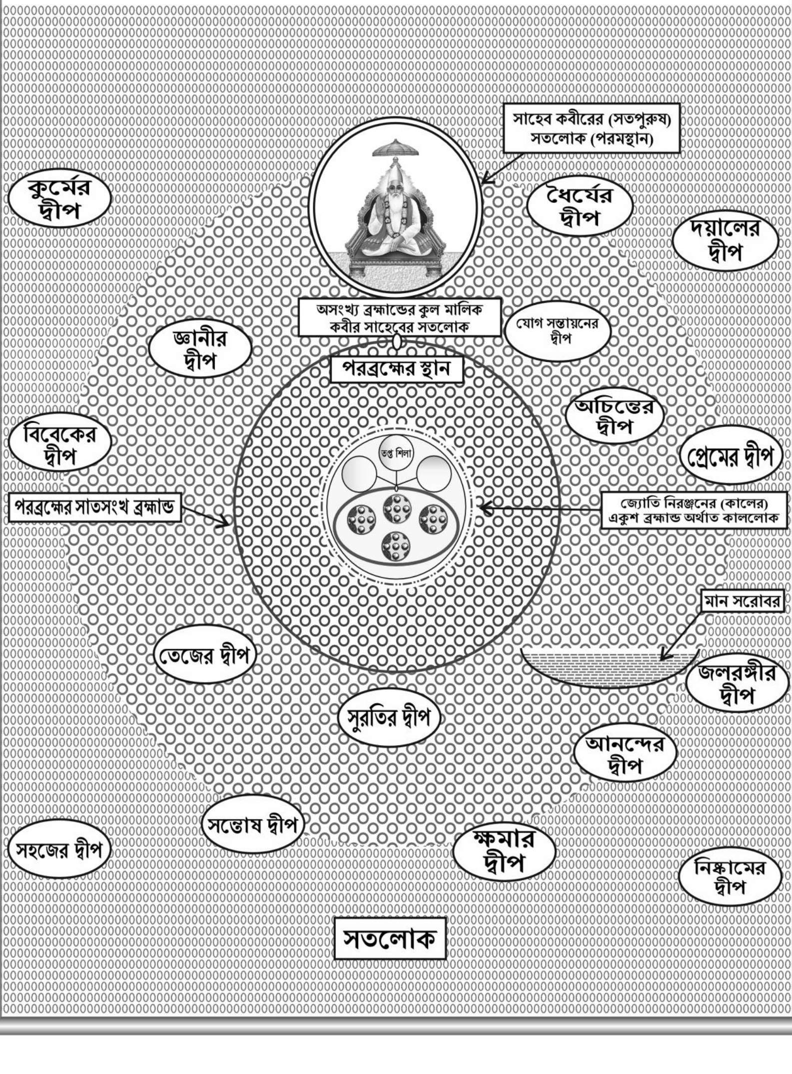

কিন্তু পদের এবং উপমাত্মক নাম প্রধান মন্ত্রী, প্রাইম মিনিস্টার ইত্যাদি হয়। অনেক সময় প্রধান মন্ত্রী নিজের কাছে কিছু বিভাগও রাখেন। সেই বিভাগের কাগজ পত্রের উপর হস্তাক্ষর করার সময় ঐ বিভাগের পদের নাম লেখেন। যেমন গৃহ মন্ত্রালয়ের নথিপত্রে স্বাক্ষর করার সময় গৃহমন্ত্রী লেখেন। ওখানে ঐ হস্তাক্ষরের শক্তি কম হয়ে যায়। সেই রূপ কবীর পরমেশ্বরের তেজ পুঞ্জের ব্যবধান বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন তেজ পুঞ্জের (পৃথক) হয়। এই 'পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব' (কবীর পরমেশ্বর) ঠিক এই ভাবে নিচের তিন লোকের রচনা শব্দ শক্তি দিয়ে করেন (অগম লোক, অলক লোক, সতলোক)। এই পূর্ণ পরমাত্মা অগম লোকে ও প্রকট হন, তিনি স্বয়ং অগম লোকেরও স্বামী। এখানে পরমাত্মার উপমাত্মক নাম অগম পুরুষ। এই অগম পুরুষের মানব সদৃশ্য শরীরে এক লোম কুপের প্রকাশ চক্র সূর্যের প্রকাশ থেকেও অধিক।

এই পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবির্দেব = কবীর পরমেশ্বর) অলখ লোকেও প্রকট হন তখন উনি অলখ লোকের স্বামী। তথা উপমাত্মক নাম অলক পুরুষ। এই পরমেশ্বরের তথা পূর্ণ প্রভুর মানব সদৃশ্য শরীর তেজোময় ও স্বয়ং প্রকাশিত। এক লোমকুপের (লোম ছিদ্র) প্রকাশ বর্ব্বুদ সূর্যের প্রকাশ থেকে ও বেশি।

এই পূর্ণ প্রভু সতলোকে ও প্রকট হন, তিনি সতলোকের ও স্বামী তথা প্রভু। এই জন্য উপমাত্মক নাম সত্পুরুষ (অবিনাশী প্রভু) অকালমূর্তি – শব্দ স্বরূপী রাম, পূর্ণ ব্রহ্ম, পরম অক্ষর ব্রহ্ম ইত্যাদি। এই প্রভুর অর্থাৎ সত্পুরুষ কবীরদেবের মানব সদৃশ্য তেজোময় শরীরের এক লোম কুপের প্রকাশ কোটি কোটি সূর্য ও চন্দ্রমার প্রকাশ থেকে ও বেশি

এই কবির্দেব (কবীর প্রভু) সত্পুরুষ রূপে সতলোকে বিরাজমান হয়ে সর্বপ্রথমে সতলোকে অন্য রচনা করেন। এক শব্দ (বচন) দিয়ে ষোল দ্বীপের সৃষ্টি (রচনা) করেন। তারপর ১৬ শব্দ দিয়ে ১৬ পুত্রের উৎপত্তি করেন। এক মান সরোবরের রচনা করেন যা অমৃতে ভরা। ষোলো পুত্রের নাম :- (১) কূর্ম, (২) জ্ঞানী, (৩) বিবেক, (৪) তেজ, (৫) সহজ, (৬) সন্তোষ, (৭) সুরতি, (৮) আনন্দ, (৯) ক্ষমা, (১০) নিষ্কাম, (১০) জলরংগী, (১২) অচিন্ত, (১৩) প্রেম, (১৪) দয়াল,(১৫) ধৈর্য, (১৬) যোগ সন্তায়ন, অর্থাৎ যোগজীত।

সত্পুরুষ কবির্দেব নিজের পুত্র অচিন্তকে সতলোকের অন্য রচনার অধিকার দেন তথা শক্তি প্রদান করেন। অচিন্ত শব্দ শক্তি দিয়ে অক্ষর পুরুষের (পরব্রহ্ম) সৃষ্টি করে বলে, আমাকে সৃষ্টি রচনায় সাহায্য করো। অক্ষরপুরুষ মানসরোবরে স্নান করতে গিয়ে আনন্দে শুয়ে পড়ে। অনেক সময় পর্যন্ত মানসরোবর থেকে বাইরে না আসার কারনে অচিন্তের প্রার্থনায় অক্ষর পুরুষকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) ঐ মানব সরোবর থেকে অমৃত জল নিয়ে একটা ডিম বানিয়ে এক আত্মাকে ডিমের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে মানসরোবরে অমৃত জলে ছেড়ে দেন। ডিমের গড় গড়াই শব্দে অক্ষর পুরুষের ঘুম ভেঙে যায়। অক্ষর পুরুষ ডিমের দিকে ক্রোধ দৃষ্টিতে তাকানোর ফলে ডিম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন তাঁর ভিতর থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন (ক্ষর পুরুষ) বের হয়,পরে এই জ্যোতি নিরঞ্জন কে কাল বলে অভিহিত করা হয়। এর আসল নাম কৈল। তখন

সতপুরুষ (কবির্দেব) আকাশবাণী করেন যে, তোমরা দুই জন মান সরোবর থেকে বাইরে এসে অচিন্তের দ্বীপে থাকো। আদেশ পেয়ে অক্ষর পুরুষ এবং ক্ষরপুরুষ (কৈল) অচিন্তের দ্বীপে থাকতে লাগেন। কবির্দেব নাবালক পুত্রের অজ্ঞানতা, তাকে এইভাবেই প্রমাণ করে দেখান, যাতে পরে মনের মধ্যে প্রভুত্বের বাসনা না জেগে ওঠে! কারণ সামর্থ্য ছাড়া কোন কাজ সফল হয় না। তারপর কবীরদেব সর্ব রচনা স্বয়ংই করেন। নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে এক রাজেশ্বরী (রাষ্ট্রীয়) শক্তি তৈরী করে (উৎপন্ন করে) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্থাপন করেন। একে পরাশক্তি বা পরানন্দনীও বলা হয়।

'পূর্ণ ব্রহ্ম' সমস্ত আত্মাকে নিজের ভিতর থেকে নিজের বচন শক্তি দিয়ে মানব শরীর সদৃশ্য সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক হংস আত্মার শরীর পরমাত্মা নিজের শরীরের মত রচনা করেছেন। প্রত্যেক হংস আত্মার শরীরের তেজ ১৬ (ষোল) সূর্যের সমান। কিন্তু পরমেশ্বরের শরীরের এক লোমকুপের প্রকাশ কোটি কোটি সূর্যের থেকেও বেশি। অনেক সময় ব্যতীত হওয়ার পর ক্ষরপুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) চিন্তা করতে লাগে, "আমরা তিন জন একই দ্বীপে থাকি বাকি অন্যরা সবাই এক-এক দ্বীপে এক জন করে থাকে। তাই আমি সাধনা করে একটি পৃথক দ্বীপ প্রাপ্ত করবো।" ক্ষর পুরুষ এই বিচার করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ৭০ যুগ পর্যন্ত তপস্যা করেন।

"আত্মারা কিভাবে কালের জালে ফেঁসেছে ?"

বিঃ দ্রঃ- যখন ক্ষর পুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিলেন, তখন আমরা এই একুশ ব্রহ্মাণ্ডে বসবাসকারী সকল আত্মারা, ক্ষর পুরুষের সাধনার প্রতি আকর্ষিত হয়ে গিয়েছিলাম! তথা হৃদয় থেকে ওনাকেই পেতে চাইতাম। ঠিক যেমন যুবক যুবতীরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রতি আকর্ষিত হয়ে থাকে। অথচ তাদের সাথে না আছে কোনো লেনদেন, তবুও তাদের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে, এদিকে তারা তাদের অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে নাচ গান করতে থাকে। অল্প বয়সি ছেলে মেয়েরা তাদেরকে দেখতে গিয়ে নিজেদের অর্থ নষ্ট করে ফেলে। ঠিক একই ভাবে আমরাও আমাদের পরমপিতা সতপুরুষকে ছেড়ে দিয়ে কাল পুরুষকে (ক্ষর পুরুষ) মনে প্রাণে চেয়ে ছিলাম। "যে পরমেশ্বর আমাদেরকে সর্ব সুখ সুবিধা প্রদান করেছিলেন, আমরা সেই পরমেশ্বরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এই নকল অভিনয় করা কাল ব্রহ্মকে মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম! এরই মধ্যে পরমাত্মা অর্থাৎ সতপুরুষ মাঝে-মাঝে এসে আকাশবানী করে আমাদেরকে সতর্কও করেছিলেন যে, "হংস আত্মাগন! তোমরা এই কালের ক্রিয়াকলাপ একদম দেখিও না! তোমরা খুশিতে থাকো।" আমরা উপরে উপরে তো সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু ভিতরে ভিতরে কালকেই চাইতে থাকি। পরমেশ্বর তো অন্তর্যামী! তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, এখন আর এরা এখানে থাকার যোগ্য নয়।

অন্যদিকে কালপুরুষ (ক্ষর পুরুষ = জ্যোতি নিরঞ্জন) যখন দুইবার তপস্যা করে তার ফলপ্রাপ্ত করে নিয়েছিলেন, তখন তিনি চিন্তা করতে থাকেন, "এখন আমার কিছু জীবাত্মার প্রয়োজন, যারা আমার সাথে থাকবে। ২১ ব্রহ্মাণ্ডে একা থাকতে আমার ভালো লাগবে না।" এই জন্য ক্ষর পুরুষ জীবাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তপস্যা শুরু করলেন। এইভাবে ৬৪ যুগ পর্যন্ত তপস্যা করার পর পরমেশ্বর

এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “জ্যোতি নিরঞ্জন! আবার তুমি কেন তপস্যা করছো?” ক্ষরপুরুষ বললেন, “আমাকে কিছু আত্মা প্রদান করুন, আমার একা থাকতে ওখানে আর ভালো লাগছে না।” সতপুরুষ বললেন, “তোমার তপস্যার প্রতিফলে আমি তোমাকে আরো ব্রহ্মাণ্ড দিতে পারি, কিন্তু কোন প্রকার জপ, তপস্যা, বা অন্য কোনে সাধনার প্রতিফলে, আমি আমার আত্মাদের তোমাকে দেব না! এরা আমার শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি তারা স্বেচ্ছায় যেতে চায়, তাহলে তারা যেতে পারে।” যুবা কবীরের (সামর্থ্য কবীর পরমেশ্বরের) বচন শুনে জ্যোতি নিরঞ্জন আমাদের কাছে আসেন। এদিকে আমরা সকল হংস আত্মারা তো আগে থেকেই ওনার উপর আসক্ত ছিলাম। ওনাকে দেখে আমরা সবাই ওনার চারিপাশে ঘিরে ধরলাম। জ্যোতি নিরঞ্জন বললেন, “আমি পিতার কাছে থেকে আলাদা ২১ ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত করেছি, সেখানে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর রমণীয় স্থান বানিয়ে রেখেছি। তোমরা কি আমার সাথে ওখানে যাবে?”

আমরা সমস্ত হংস আত্মারা যারা আজ ২১ ব্রহ্মাণ্ড দুঃখী হয়ে আছি, আমরা বলে উঠলাম, “আমরা তো প্রস্তুত কিন্তু যদি পিতা পরমেশ্বর আজ্ঞা দেন, তবে আমরা যেতে পারি।” একথা শুনে ক্ষর পুরুষ (কাল) পূর্ণ ব্রহ্ম মহান কবীর (সামর্থ্য কবীর প্রভু) পরমেশ্বরের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বলেন। তখন কবিরাগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) বললেন, “যদি হংস আত্মারা আমার সামনে স্বীকৃতি দেয়, তবে আমি আজ্ঞা দেব।” তারপর ক্ষর পুরুষ এবং পরম অক্ষর পুরুষ (কবির মিতৌজা) দুজনেই আমাদের সমস্ত হংস আত্মাদের কাছে আসেন। সত কবির্দেব বললেন, “যে সমস্ত হংস আত্মারা ব্রহ্মের সাথে যেতে চাও, তারা হাত উপরে তুলে স্বীকৃতি দাও।” নিজের পিতার সামনে হাত তুলতে কারো সাহস হয়নি কেউই স্বীকৃতি দেয়নি, অনেক সময় ধরে সবাই নিশ্চুপ হয়ে রইল।

তারপর একটি হংস আত্মা সাহস করে বললেন, হে পিতা! আমি ক্ষর পুরুষের সাথে যেতে চাই। তারপর ওনার দেখা-দেখি (যারা আজ কাল ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মান্ডে ফেঁসে আছি) আমরা সকল আত্মারাও স্বীকৃত দিয়ে দিই। পরমেশ্বর কবির্দেব জ্যোতি নিরঞ্জনকে বললেন, তুমি তোমার স্থানে চলে যাও। যে সমস্ত আত্মারা তোমার সাথে যেতে স্বীকৃতি দিয়েছে, আমি সেই সমস্ত হংস আত্মাদের তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তারপর জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের ২১ ব্রহ্মান্ডে চলে যায়। ঐ সময় পর্যন্ত এই ২১ ব্রহ্মান্ড সতলোকের মধ্যেই ছিল।

তারপর পূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হংস আত্মাকে এক মেয়ের রূপ দেয় কিন্তু তার স্ত্রী ইন্দ্রিয় (যোনী) রচনা করেননি এবং বাকি সমস্ত আত্মাদেরকে (যারা জ্যোতি নিরঞ্জনের (ব্রহ্মের) সাথে যাওয়ার জন্য সম্মতি দিয়েছিল) ঐ মেয়ের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সর্বপ্রথম ইচ্ছা প্রকাশ করা ঐ মেয়ের নাম পরমাত্মা অস্ট্রা (আদিমায়া/ প্রকৃতি দেবী /দুর্গা) রাখেন তথা সতপুরুষ বললেন পুত্রী! আমি তোকে শব্দ শক্তি প্রদান করে দিয়েছি, যত জীব ব্রহ্ম উৎপন্ন করতে বলবে তা তুই উৎপন্ন করে দিবি। পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেব (কবীর সাহেব) নিজের পুত্র সহজ দাসকে দিয়ে প্রকৃতিকে (দূর্গাকে) ক্ষরপুরুষের কাছে পাঠিয়ে দেন। সহজ

দাস জ্যোতি নিরঞ্জনকে বলেন, পরম পিতা এই বোনের শরীরে ঐ সমস্ত আত্মাদের প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, যারা আপনার সাথে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এই বোনকে পিতা বচন শক্তি দিয়েছেন, আপনি যত জীব চাইবেন প্রকৃতি নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে তা উৎপন্ন করে দেবে। এই কথা বলে সহজ দাস দুর্গাকে ক্ষরপুরুষের কাছে রেখে দিয়ে নিজের দ্বীপে ফিরে আসে।

যুবতী হওয়ার কারণে মেয়েটির রূপ রং ফুটে উঠেছিল। তাই ব্রহ্মের মধ্যে বিষয় বাসনা উৎপন্ন হয়ে যায় এবং প্রকৃতি দেবীর সাথে অভদ্র গতিবিধি (চাল-চলন) করতে শুরু করে দেয়। তখন দূর্গা বলেন, জ্যোতি নিরঞ্জন আমার কাছে পিতার দেওয়া শব্দ শক্তি আছে, আপনি যত প্রাণী চাইবেন তা আমি বচন শক্তি দিয়ে উৎপন্ন করে দেবো। আপনি মৈথুন পরম্পরা শুরু করবেন না। আপনিও ঐ পিতার শব্দ শক্তিতে ডিমের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছেন এবং তারপর আমিও ঐ পরম পিতার বচন শক্তিতে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি আমার বড়ো ভাই; ভাই - বোনের এই যোগ (সম্পর্ক) মহাপাপের কারণ হবে। কিন্তু জ্যোতি নিরঞ্জন প্রকৃতি দেবীর কোনো কথা (প্রার্থনা) না শুনে জোর পূর্বক নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে নখের মাধ্যমে স্ত্রী ইন্দ্রিয় (যোনী) বানিয়ে কু-কর্ম (বলাৎকার) করার চেষ্টা করে।

সেই সময় দূর্গা নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য কোনো উপায় না দেখে নিজের সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে জ্যোতি নিরঞ্জনের খোলা মুখের মধ্য দিয়ে পেটে মধ্যে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেবের কাছে নিজের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। তৎক্ষনাৎ কবির্দেব নিজের পুত্র যোগ সন্তায়ন অর্থাৎ জোগজীতের রূপ ধারণ করে ওখানে প্রকট হয়ে যান এবং নিজের মেয়েকে ব্রহ্মের পেট থেকে বের করেন। তারপর বলেন, জ্যোতি নিরঞ্জন! আজ থেকে তোর নাম “কাল” হবে। তোর জন্ম - মৃত্যু সর্বদা হতে থাকবে, এই জন্য তোর নাম ক্ষর পুরুষ ও হবে এবং তুই এক লক্ষ মানব শরীরধারী প্রাণীকে প্রতিদিন আহার করবি আর সোয়া লক্ষ উৎপন্ন করবি। এখন তোমাদের দুজনকে একুশ ব্রহ্মান্ড সহ সতলোক থেকে নিষ্কাশিত করে দিলাম। এই কথা বলার সাথে সাথে ২১ ব্রহ্মান্ড বিমানের মতো উড়ে চলে যায়। সহজ দাসের দ্বীপের পাশ দিয়ে এসে ২১ ব্রহ্মান্ড সতলোক থেকে ১৬ শঙ্খ ক্রোশ (১ ক্রোশ প্রায় ৩ কি.মি হয়) দূরে এসে স্থির হয়ে যায়।

বিশেষ বিবরণ :- এই পর্যন্ত তিন শক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. পূর্ণ ব্রহ্মকে অন্য উপমাত্মক নামেও জানা যায় যেমন, সত্পুরুষ, অকালপুরুষ, শব্দ স্বরূপী রাম, পরম অক্ষর ব্রহ্ম/পুরুষ ইত্যাদি। এই পূর্ণব্রহ্ম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বাস্তবে (আসলে) তিনি অবিনাশী। ২. পরব্রহ্মকে অক্ষর পুরুষও বলা হয়। এই পুরুষ বাস্তবে অবিনশ্বর নয়। পরব্রহ্ম সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বা প্রভু।

৩. ব্রহ্ম যাকে জ্যোতি নিরঞ্জন, কাল, কৈল, ক্ষরপুরুষ, ধর্মরায় ইত্যাদি নামে জানা যায়। এই পুরুষ একুশ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। ব্রহ্মের (কাল) সৃষ্টির এক ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দেওয়া হল, এখন আমরা আরও তিন নামের সাথে পরিচিত হবো - ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র

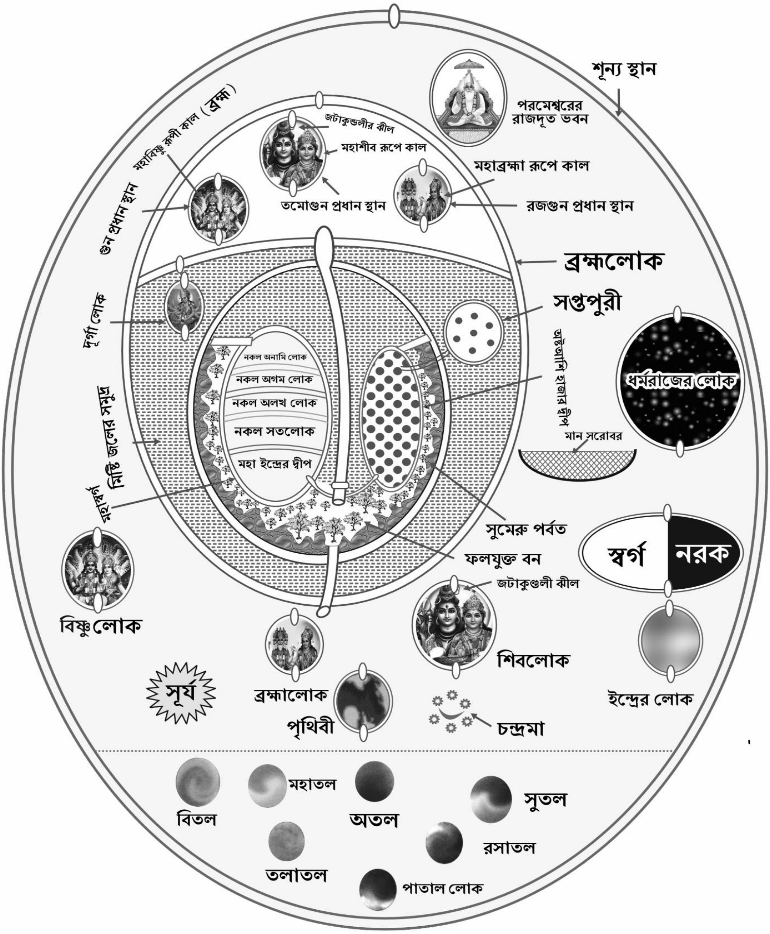

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার পার্থক্য :- এক ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোপরি স্থানে (সব থেকে উপরের স্থানে) ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) তিন গুপ্ত স্থান বানিয়ে, স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের রূপ ধারন করে স্ত্রী প্রকৃতির (দূর্গা) সাথে পতি-পত্নী সহযোগে তিন পুত্রের উৎপত্তি করেন, এবং তাদের নামও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব রাখে। এই ব্রহ্মের পুত্র ব্রহ্মা এক ব্রহ্মাণ্ডের তিনলোকের (পৃথিবীলোক, স্বর্গলোক, পাতাললোক) রজগুণ বিভাগের মন্ত্রী (স্বামী) একে ত্রিলোকের (তিনলোকের) ব্রহ্মা বলা হয়। ব্রহ্মালোকে যে ব্রহ্ম, ব্রহ্মা রূপে থাকে তাকে মহাব্রহ্মা বা ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মা বলা হয়। এই ব্রহ্ম (কাল) কে সদাশিব, মহাশিব, মহাবিষ্ণু, মহাব্রহ্মাও বলা হয়।

শ্রী বিষ্ণু পুরাণে প্রমাণ :- চতুর্থ অংশ অধ্যায় ১ পৃষ্ঠা ২৩০-২৩১ এ শ্রী ব্রহ্মা বলেছেন, সেই অজন্মা সর্বময় বিধাতা পরমেশ্বরের আদি (সর্বপ্রথম) মধ্য, অন্ত স্বরূপ স্বভাব এবং সার আমি জানি না (শ্লোক ৮৩)। তিনি আমার রূপ ধারন করে সংসারের রচনা করেন, স্থিতির সময় তিনি পুরুষ রূপ এবং রুদ্র রূপে বিশ্বকে গ্রাস করেন এবং অনন্ত রূপে সম্পূর্ণ জগতকে ধারণ করেন (শ্লোক ৮৬)।

"শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের উৎপত্তি"

কাল ব্রহ্ম প্রকৃতি (দূর্গা) কে বলে, এখন আমাকে কে কি করবে? আমার যা ইচ্ছা তাই করবো। তারপরেও প্রকৃতি প্রার্থনা করে যে, একটু তো লজ্জিত হোন। প্রথমে তো আপনি আমার বড়ো ভাই, কারণ আপনি ওই পূর্ণ পরমাত্মার (কবীরদেব) বচন শক্তিতে ডিম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন এবং পরে ওই পূর্ণ প্রভুর বচন শক্তিতে আমারও সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত আমি আপনার পেট থেকে বের হয়েছি। তাই আমি আপনার মেয়ে আর আপনি আমার পিতা এই পবিত্র সম্পর্ককে খারাপ করা মহাপাপ হবে। আমার কাছে পিতার দেওয়া শব্দ শক্তি আছে, যত প্রাণী আপনি চাইবেন তত প্রাণী আমি সৃষ্টি করে দেব। জ্যোতি নিরঞ্জন দূর্গার কোন কথা না শুনে বলে, আমার যা শাস্তি পাওয়ার পেয়ে গিয়েছে। আমাকে সতলোক থেকে নিষ্কাষিত (বাহির) করে দিয়েছে। এখন যা খুশি তাই করবো। এই কথা বলে কালপুরুষ (ক্ষর পুরুষ) জোর করে প্রকৃতির সহিত বিবাহ করে এবং তিন পুত্রের (রজগুণ যুক্ত ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ যুক্ত বিষ্ণু, তমোগুণযুক্ত শিব শঙ্কর) উৎপন্ন করেন। যুবক হওয়া পর্যন্ত তিন পুত্রকে দূর্গার দ্বারা অজ্ঞান করে রাখেন, এবং যুবক হওয়ার পর শ্রী ব্রহ্মাকে কমল ফুলের উপর, শ্রী বিষ্ণুকে শেষ নাগের বিছানায় এবং শ্রী শিবকে কৈলাস পর্বতের উপর সজ্ঞান করে একত্রিত করেন। তারপর প্রকৃতি (দূর্গা) নিজে এই তিন দেবের বিবাহ দিয়ে এক ব্রহ্মাণ্ডের তিন লোকের (স্বর্গলোক, পৃথিবীলোক পাতাললোক) এক এক বিভাগের মন্ত্রী (প্রভু) পদে নিযুক্ত করেন। যেমন শ্রী ব্রহ্মাকে রজগুণ বিভাগের তথা বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণ বিভাগের ও শ্রী শিব শঙ্করকে তমোগুণ বিভাগের এবং স্বয়ং গুপ্ত (মহাব্রহ্মা-মহাবিষ্ণু-মহাশিব) রূপে মূখ্যমন্ত্রীর ভুমিকা পালন করেন। এক ব্রহ্মাণ্ডে এক ব্রহ্মলোকের রচনা করে তিন গুপ্ত স্থান তৈরী করেন। এক রজগুণ প্রধান স্থান সেখানে এই ব্রহ্ম (কাল পুরুষ) স্বয়ং মহাব্রহ্মা (মুখ্যমন্ত্রী) রূপে থাকেন এবং পত্নী দূর্গাকে মহাসাবিত্রী রূপে রাখেন। এই দুই জনের সংযোগে ঐ স্থানে যে পুত্রের উৎপন্ন হয়, সে রজগুণ যুক্ত হয়। দ্বিতীয় স্থান সত্ত্বগুণ

যুক্ত বানিয়ে সেখানে ক্ষরপুরুষ স্বয়ং মহাবিষ্ণু রূপ ধারন করেন এবং পত্নী দূর্গাকে মহালক্ষ্মী রূপে রেখে যে পুত্রের উৎপন্ন করেন তার নাম বিষ্ণু রাখেন এবং ওই পুত্র সত্ত্বগুণ যুক্ত হন। তৃতীয় স্থানকে কাল তমোগুণ প্রধান ক্ষেত্র তৈরী করেন। ওখানে স্বয়ং সদাশিব রূপ ধারন করে পত্নী দূর্গাকে মহাপার্বতী রূপে রাখেন। এই দুইজনের পতি পত্নীর ব্যবহারে যে পুত্রের উৎপন্ন হয়, সে তমোগুণ যুক্ত হয় এবং তাঁর নাম শিব রাখা হয়। {প্রমাণের জন্য দেখুন পবিত্র শিব মহাপুরাণ, বিদ্ধেশ্বর সংহিতা পৃষ্ঠা ২৪-২৬, এতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং মহেশ্বর থেকে অন্য (পৃথক) সদাশিবের বিবরণ আছে। রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৬ ও ৭, ৯ পৃষ্ঠা নং ১০০ থেকে ১০৫ ও ১১০ - এ অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত, শ্রীমদ্ দেবী মহাপুরাণ তৃতীয় স্কন্দ এক পৃষ্ঠা নং ১১৪ থেকে ১২৩ পর্যন্ত গীতা প্রেশ গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত। অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী।} এদের ধোঁকায় রাখে, অর্থাৎ সত্যকে না জানিয়ে নিজের আহারের জন্য শ্রী ব্রহ্মা দ্বারা জীবের উৎপত্তি, বিষ্ণু দ্বারা পালন বা স্থিতি (একে অন্যের প্রতি মোহ মায়ার সৃষ্টি) করে কালের জালে রেখে শ্রী শিব দ্বারা সংহার করায়। কারণ অভিশাপের জন্য কাল পুরুষকে এক লাখ মানব শরীর ধারী প্রাণীর সুক্ষ্ম শরীরের ময়লা (গন্ধ) বের করে খেতে হয়, এই জন্য একুশ ব্রহ্মাণ্ডে এক তপ্ত শিলা আছে। কাল ভগবান এই তপ্ত শিলায় জীব আত্মাকে ভেজে গন্ধ বের করে খায়। জীব মরে না কিন্তু ভয়ংকর কষ্ট পায়। তারপর প্রাণীদের কর্মের আধারে অন্য শরীরে পাঠায়। যেমন কোন ঘরে তিনটি কক্ষ আছে। এক কক্ষে অশ্লীল চিত্র লাগানো আছে। ওই কক্ষে যেতেই মনে মলিন বিচার চলে আসে। দ্বিতীয় কক্ষে সাধু-সন্ত-ভক্তদের চিত্র লাগানো আছে, ওখানে যেতেই মনে ভালো বিচার এবং প্রভুর প্রতি চিন্তা আসে। তৃতীয় কক্ষে দেশ ভক্ত শহীদদের চিত্র লাগানো আছে, ওখানে গেলে মনে বিদ্রোহীভাব বা জোশ ভাব উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম (কাল) নিজের চিন্তা ভাবনা (বিচার-বুদ্ধি) দিয়ে তিন গুণের তিনটি বিশেষ স্থানের রচনা করেন।

"তিন গুণ কি? প্রমান সহিত"

"তিন গুণ রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব। এই তিন গুণ ব্রহ্ম (কাল) তথা প্রকৃতি (দূর্গা) থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তিন জনই নশ্বর"

প্রমাণ:- গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রী শিব মহাপুরাণ যার সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার পৃষ্ঠা ২৪ থেকে ২৬ বিধ্যেশ্বর সংহিতা পৃষ্ঠা ১১০ অধ্যায় ৯ রুদ্র সংহিতা" ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব এই তিন দেবতাদের মধ্যে গুণ আছে। কিন্তু সদা শিব (ব্রহ্ম-কাল) কে গুণাতীত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ :- গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীমদ দেবী ভাগবত্ পুরাণ যার সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী, তৃতীয় স্কন্দ, অধ্যায় ৫ পৃষ্ঠা ১২৩ :- ভগবান বিষ্ণু দূর্গার স্তুতি করে বলছেন - আমি (বিষ্ণু) ব্রহ্মা এবং শঙ্কর তোমার কৃপায় বিদ্যমান আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে। আমরা নিত্য (অবিনাশী) নই। তুমিই নিত্য (অবিনাশী) জগৎ জননী, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী।

ভগবান শঙ্কর বললেন, যদি ভগবান ব্রহ্মা ও ভগবান বিষ্ণু তোমার থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার পরে উৎপন্ন হওয়া আমি তমোগুণী লীলা করা শঙ্কর কি তোমার সন্তান নই? অর্থাৎ তুমিই আমাকে উৎপন্ন করেছো। এই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি-সংহারে তোমার গুণ সর্বত্র বিদ্যমান। এই তিন গুণে উৎপন্ন আমারা, ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শংকর সর্বদা নিয়মানুসারে কর্মে তৎপর থাকি।

❖ উপরোক্ত এই বিবরণ একমাত্র হিন্দীতে অনুবাদিত শ্রীদেবী মহাপুরাণে বিদ্যমান আছে। এখানে কিছু তথ্য লুকানো হয়েছে। সেই জন্য আপনারা প্রমাণ দেখুন শ্রীমদদেবী ভাগবত মহাপুরাণ সভাষটিকম্ সমহাত্যম্, খেমরাজ শ্রী কৃষ্ণদাস প্রকাশিত মুম্বাই, এতে সংস্কৃত সহ হিন্দী অনুবাদ আছে। তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক ৪২:-

ব্রহ্মা - অহম্ ঈশ্বরঃ ফিল তে প্রভাবাস্তবে বয়ম্ জনি যুতা ন যদা তু নিত্যাঃ কে অন্যে সুরাঃ শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা ॥ (৪২) ॥

হিন্দী থেকে বাংলা অনুবাদ :- হে মাতা! ব্রহ্মা, আমি এবং শিব তোমার প্রভাবে (শক্তিতে বা দয়ায়) জন্ম নিয়েছি। আমরা নিত্য না। অর্থাৎ আমরা অবিনাশী না। তাহলে অন্য দেবী দেবতা ইন্দ্রাদি কিভাবে নিত্য (অবিনাশী) হতে পারে? তুমিই অবিনাশী প্রকৃতি তথা সনাতনী দেবী।

পৃষ্ঠা ১১ - ১২, অধ্যায় ৫, শ্লোক ৮ :-

যদি দয়াদ্রমনা ন সদাঁংবিকে কথমহং বিহিতঃ চ

তমোগুণঃ কমলজশ্চ রজোগুণ সম্ভব সুবিহিতঃ কিমু সত্বগুণোঁ হরিঃ। (৮)

অনুবাদ:- ভগবান শঙ্কর বলেন, হে মাতা! যদি আমার উপর দয়া যুক্ত হও তা হলে আমাকে তমোগুণে কেন বানিয়েছেন? কমল থেকে (পদ্ম) উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজগুণে কি জন্য বানিয়েছেন? এবং বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণে কেন বানিয়েছেন? অর্থাৎ জীবের জন্ম মৃত্যু রূপী দুষ্কর্মে আমাদের কেন লাগিয়েছেন ?

শ্লোক-১২ :- রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা তব গতিং ন হি বিহ বিদম্ শিবে (১২)

বাংলায় :- নিজের পতি পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে সদা (সর্বদা) ভোগ বিলাস করতে থাকো। তোমার গতি (ভেদ) কেউ জানে না।

নিষ্কর্ষ:- উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হয় যে, রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ শিব এই তিন জনই নশ্বর। দূর্গার স্বামী ব্রহ্ম (কাল) দূর্গার সাথে সদাভোগ বিলাস করতে থাকে। এটা প্রমাণিত হল যে, দূর্গা এবং ব্রহ্ম ও (কাল) সাকার।

"ব্রহ্ম (কাল) এর অব্যক্ত থাকার প্রতিজ্ঞা"

(সূক্ষ্ম বেদ দ্বারা শেষ সৃষ্টি রচনা ...)

তিন পুত্রের উৎপত্তির পর ব্রহ্ম, পত্নী দূর্গা (প্রকৃতি) কে বলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, ভবিষ্যতে কাউকে আমি আমার বাস্তবিক রূপে দর্শন দেব না। তার জন্য আমাকে সবাই অব্যক্ত মনে করবে। তুমি আমার ভেদ কাউকে বলবে না। আমি গুপ্ত থাকব। দূর্গা জিজ্ঞাসা করে, আপনি আপনার পুত্রদেরও দর্শন দেবেন না ? ব্রহ্ম

বলেন, আমি নিজের পুত্রদের এবং অন্য কাউকে কোন সাধনার ফলে দর্শন দেব না। এ আমার অটল সিদ্ধান্ত (নিয়ম)। তখন দূর্গা বলেন এটা আপনার উত্তম নিয়ম নয়, নিজের সন্তানদের থেকেও লুকিয়ে থাকবেন! তখন কাল বলেন, দূর্গা এ আমার অসহায়তা (বিবশতা)! এক লাখ মানব শরীরধারী প্রাণীর আহার (খাবার) করার অভিশাপ লেগে আছে! যদি আমার পুত্ররা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ) জানতে পারে, তা হলে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কার্য করবে না! এই জন্য আমার এই অনুত্তম নিয়ম সদা (সর্বদা) থাকবে। এই তিনজনকে একটু বড় হলে অজ্ঞান করে রাখবে। আমার বিষয়ে বলবে না। অন্যথায় তোমাকেও দণ্ড (সাজা) ভোগ করতে হবে। এই ভয়ে দূর্গা কখনো সত্য ঘটনা (বাস্তবিকতাকে) বলেন না।

প্রমাণ :- এই জন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪ এ বলেছে, এই বুদ্ধিহীন জন সমুদয় আমার অনুত্তম নিয়মের বিষয়ে অপরিচিত। আমি কখনো কারো সামনে প্রকট হই না। আমি আমার নিজের যোগ মায়ায় লুকিয়ে থাকি। এই জন্য আমার অব্যাক্ততাকে মানুষ রূপে আসা কৃষ্ণ মনে করে। কিন্তু আমি শ্রী কৃষ্ণ নই!

(অবুদ্ধয়ঃ) বুদ্ধিহীন জন সমুদয় (মম) আমার (অনুত্তমম্) অনুত্তম অর্থাৎ ঘাটিয়া (অব্যয়ম্) অবিনাশী (পরম্ ভাবম্) বিশেষ ভাবকে (অজানন্ত:) না জেনে (মাম্ অব্যক্তম্) আমার অব্যক্ততাকে (ব্যক্তিম্) মানুষ রূপে (আপন্নম), আসা (মন্যন্তে) মানে অর্থাৎ আমি কৃষ্ণ না। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪)।

গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭ এবং ৪৮-এ বলেছে, এটা আমার আসল (বাস্তবিক) কাল রূপ। এই রূপের দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি - না - বেদে বর্ণিত বিধিতে, না - কোন জপে, না- কোন তপে অর্খাৎ কোন ভাবে সম্ভব নয় বা কোন ক্রিয়ায় হবে না।

যখন তিন ছেলে যুবক হয়ে যায়, তখন মাতা ভবানী (প্রকৃতি অষ্টাঙ্গী) বলেন, তোমরা সাগর মন্থন করো। প্রথমবার সাগর মন্থন করলে (জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের শ্বাস দ্বারা চার বেদ উৎপন্ন করেন এবং গুপ্ত বাণী দ্বারা আদেশ দেন। সাগরে নিবাস করো) চার বেদ বের হয়, বেদ নিয়ে তিন ছেলে মায়ের কাছে আসেন। মাতা ব্রহ্মাকে বলে এই চার বেদকে তুমি নিজের কাছে রেখে অধ্যায়ন করো।

নোট:- আসলে পূর্ণব্রহ্ম, ব্রহ্মকে অর্থাৎ কালকে পাঁচ বেদ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চার বেদ প্রকট করেন এবং পঞ্চম বেদকে লুকিয়ে রাখেন। পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং প্রকট হয়ে কবির্গির্ভীঃ অর্থাৎ কর্বিবাণী দ্বারা প্রবাদ বাক্য বা (স্থানীয় লোক বাক্য) দোঁহার মাধ্যমে ওই পঞ্চম বেদের জ্ঞান প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয়বার সাগর মন্থন করলে তিন কন্যা (মেয়ে) পায়। মাতা তিন কন্যাকে তিন জন কে ভাগ করে দেন। প্রকৃতি (দুর্গা) নিজে অন্য তিন রূপ (সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও পার্বতী) ধারণ করে সমুদ্রের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। সাগর মন্থনের সময় বাইরে আসেন। ঐ তিন কন্যা প্রকৃতির তিন রূপ, ভগবান ব্রহ্মাকে সাবিত্রী, ভগবান বিষ্ণুকে লক্ষ্মী এবং ভগবান শঙ্করকে পার্বতী দেবীকে পত্নী রূপে দেয়। তিন দেবতা ভোগ বিলাস করে সুর ও অসুরের জন্ম দেন।

{যখন তৃতীয় বার সাগর মন্থন করে তখন চৌদ্দ (১৪) রত্ন ব্রহ্মাকে, অমৃত বিষ্ণু

ও দেবতাদেরকে, আর মদ (শরাব) অসুরদের দেয়। পরমার্থে শিব বিষকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন। এ অনেক পরের কথা} যখন ব্রহ্মা বেদ পড়তে লাগলো, তখন জানতে পারে সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনহার (সৃষ্টিকর্তা) সর্ব কূলের মালিক (প্রভু) অন্য এক পুরুষ। তখন ব্রহ্মা - বিষ্ণু ও শঙ্কর কে বলেন বেদে লেখা আছে সৃজনহার অন্য কোন প্রভু, কিন্তু বেদ বলছে সে ভেদ আমিও জানি না। তার জন্য সংকেত আছে কোন তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে জিজ্ঞাসা করো। তখন ব্রহ্মা মায়ের (মাতা) কাছে এসে সর্ব বৃত্তান্ত (ঘটনা) বলেন। মাতা বলে আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই। আমিই কর্তা (প্রধান), আমিই সর্ব শক্তিমান। তখন ব্রহ্মা বলে বেদ ঈশ্বর কৃত, ইহা মিথ্যা হতে পারে না।

তখন দূর্গা বলেন, তোর পিতা তোকে দর্শন দেবে না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। ব্রহ্মা বলেন মাতা আপনার উপর আমার বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। আমি ঐ পুরুষের (প্রভুর) খোঁজ করেই ছাড়ব। দূর্গা বলেন যদি তোকে দর্শন না দেয় তাহলে তুই কি করবি? ব্রহ্মা বলেন, পিতার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে আমার মুখ দেখাব না। অন্যদিকে জ্যোতি নিরঞ্জন শপথ (দিব্যি, কশম) নিয়েছেন যে, আমি অব্যক্ত থাকব, কাউকেও দর্শন দেব না। অর্থাৎ ২১ ব্রহ্মাণ্ডে আমি আমার বাস্তবিক (আসল) কাল রূপে কাউকে দর্শন দেব না।

গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক নং - ২৪

অব্যক্তম্, ব্যক্তিম্, আপন্নম্, মন্যন্তে, মাম্ অবুদ্ধয়ঃ।

পরম্ ভাবম্, অজানন্তঃ, মম্, অব্যয়ম্, অনুত্তমম্ ॥২৪॥

অনুবাদ:- (অবুদ্ধয়ঃ) বুদ্ধিহীন মানুষ (মম্) আমার (অনুতমম্) অশ্রেষ্ঠ (যা ভালো নয়, খারাপ, ঘাটিয়া ইত্যাদি) (অব্যয়ম) অটল (পরম) পরম (ভাবম্) ভাবকে (অজনন্তঃ) না জেনে (অব্যক্তম্) অদৃশ্যমান (মাম্) আমাকে অর্থাৎ কালকে (ব্যক্তিম্) নর আকারে আসা কৃষ্ণ অবতার (মন্যন্তে) মনে করে।

গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক নং ২৫

ন, অহম্, প্রকাশঃ, সর্বস্য, যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মুঢ়ঃ অয়ম্, ন, অভিজানাতি, লোকঃ, মাম্, অজম্, অব্যয়ম্ ॥২৫॥

অনুবাদ:- (অহম্) আমি (যোগ মায়া সমাবৃতঃ) যোগমায়ায় লুকিয়ে থাকি (সর্বস্য) সবাইকে (প্রকাশঃ) প্রত্যক্ষ (ন) হই না অর্থাৎ অদৃশ্য বা অব্যক্ত থাকি এই জন্য (অজম্) জন্ম না নেওয়া (অব্যযম্) অবিনাশী অটল ভাবকে (অয়ম্) এই (মুঢ়) অজ্ঞানী (লোকঃ) জনসমুদায়ের সংসার (মাম্) আমাকে (ন) না (অভিজানাতি) জেনে অর্থাৎ আমাকে কৃষ্ণ অবতার রূপে আসা মনে করে। কারণ ব্রহ্ম নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে বিভিন্ন রূপ ধারন করেন। তিনি দূর্গার স্বামী, এই জন্য এই মন্ত্রে বলছেন,আমি শ্রী কৃষ্ণদের মত দূর্গার পেটে জন্ম গ্রহণ করি না।

"ব্রহ্মা'র নিজের পিতা (কাল) ব্রহ্মকে প্রাপ্তির চেষ্টা"

দূর্গা ব্রহ্মাকে (শ্রী ব্রহ্মাকে) বলেন অলখ নিরঞ্জন তোমার পিতা। কিন্তু তিনি তোমাকে দর্শন দেবেন না। ব্রহ্মা বলেন, আমি দর্শন (দেখা) করেই আসব। মাতা

জিজ্ঞাসা করেন, যদি দর্শন না হয় তাহলে তুমি কি করবে? ব্রহ্মা বলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি পিতার দর্শন না হয়, তাহলে আপনার সামনে আসব না। এই বলে শ্রী ব্রহ্মা ব্যাকুল (ভাবাবেগ) হয়ে উত্তর দিকে চলে যান, সেখানে ঘোর অন্ধকার ছিল। ওখানে ব্রহ্মা চার যুগ পর্যন্ত ধ্যান করে কিন্তু কোন কিছু প্রাপ্তি হয় না। কাল আকাশবাণী করে দূর্গা সৃষ্টি রচনা কেন হচ্ছে না? শ্রী ভবানী বলে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মা জেদ করে আপনার খোঁজে গিয়েছে। ব্রহ্ম (কাল) বলেন, ওকে ফিরিয়ে আনো। আমি ওকে দর্শন দেব না। ব্রহ্মা ছাড়া জীব উৎপত্তির কার্য অসম্ভব। তখন দূর্গা (প্রকৃতি) নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে গায়ত্রী নামের এক মেয়েকে উৎপন্ন করে ব্রহ্মাকে ফিরিয়ে আনতে বলেন। গায়ত্রী ব্রহ্মার কাছে যাযন, কিন্তু ব্রহ্মা সমাধিতে (মগ্ন) ছিলেন, তাই তিনি জানেন না যে, তার কাছে কেউ এসেছে। তখন আদি কুমারী (প্রকৃতি), গায়ত্রীকে ধ্যানের মাধ্যমে বলে ওর চরণ স্পর্শ কর। গায়ত্রী চরন স্পর্শ করলে ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়। ব্রহ্মা ক্রোধিত হয়ে বলেন, তুই কোন পাপীনী আমার ধ্যান ভঙ্গ করেছিস? আমি তোকে অভিশাপ দেব। গায়ত্রী বলেন, আমার কোন দোষ নেই। আগে আমার কথা শোনো তারপর অভিশাপ দিও। তোমাকে মাতা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন। কারণ তোমাকে ছাড়া জীব উৎপন্ন হবে না। ব্রহ্মা বলেন, আমি কিভাবে যাব এখনো পিতার দর্শন পাইনি। এখন গেলে আমার উপহাস হবে। যদি তুমি মাতার সামনে বলতে পার যে, ব্রহ্মা পিতার (জ্যোতি নিরঞ্জন) দর্শন পেয়েছেন, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে যাব। তখন গায়েত্রী বলেন, যদি আপনি আমার সঙ্গে সম্ভোগ ক্রিয়া (সেক্স) করেন, তাহলে আমি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারি। ব্রহ্মা মনে মনে ভাবতে লাগে যে, তিনি তাঁর পিতার তো দর্শন পাননি! তাই, মাতা দূর্গার সামনে যেতে তাঁর লজ্জা লাগছে! অন্য কোন উপায় না দেখে গায়ত্রীর সহিত রতি ক্রিয়া করে।

তখন গায়ত্রী বলেন, আরও এক সাক্ষী তৈরি করলে কেমন হয়? ব্রহ্মা বলেন ভালো কথা। গায়েত্রী শব্দ শক্তি দিয়ে এক মেয়ের (পুহপবতি) জন্ম দেন, তাকে বলেন, তুমি সাক্ষী দেবে যে, ব্রহ্মা পিতার দর্শন পেয়েছে। তখন পুহ্পবতি বলেন, আমি কি জন্য মিথ্যা সাক্ষী দেব? তবে হ্যাঁ, যদি ব্রহ্মা আমার সাথে রতি ক্রিয়া করে তাহলে মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারি। গায়ত্রী ব্রহ্মাকে বুঝিয়ে বলেন এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তখন ব্রহ্মা পুহপবতির সাথে রতিক্রিয়া করে এবং তিন জন এক সঙ্গে আদি মায়ার (প্রকৃতি) কাছে যায়। দুই দেবী উপরোক্ত শর্ত এইজন্য রেখেছিল, যদি মাতার সামনে আমাদের মিথ্যা সাক্ষীর কথা বলে দেয়, তাহলে মাতা আমাদের অভিশাপ দেবে। এই জন্য ব্রহ্মাকেও দোষী বানায়।

(এই জন্য মহারাজ গরীবদাস বলেছেন, 'দাস গরীব য়হ চুক ধুরোম্ - ধুর')

"মাতার (দুর্গা) দ্বারা ব্রহ্মাকে অভিশাপ"

মাতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার পিতার দর্শন হয়েছে? ব্রহ্মা বলে, হ্যাঁ মাতা! পিতার দর্শন হয়েছে। দূর্গা বলেন সাক্ষীকে (প্রমাণ দেখাও) ? তখন ব্রহ্মা বলেন, এই দুই জনের সামনে (সাক্ষাতে) দেখা হয়েছে। দেবী দুই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জানো? ব্রহ্মা তার পিতার দর্শণ পেয়েছে? তখন দু'জনেই বলেন হ্যাঁ আমরা নিজের চোখে দেখেছি। ভবানী প্রকৃতির সন্দেহ হয়। আমাকে বলেছে দর্শন দেব না কিন্তু এরা

বলছে দর্শন হয়েছে! তখন দেবী অষ্টাঙ্গী ধ্যানের মাধ্যমে কাল/জ্যোতি নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করেন কি ব্যাপার?

জ্যোতি নিরঞ্জন বলেন, এই তিনজনই মিথ্যা কথা বলছে। তখন মাতা বলেন তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। আকাশবাণী হয়েছে তোমাদের দর্শন হয়নি। এই কথা শুনে ব্রহ্মা বলে হে মাতা আমি প্রতিজ্ঞা করে পিতার খোঁজে গিয়েছিলাম কিন্তু পিতার (ব্রহ্ম) দর্শন হয় নি। আপনার সামনে আসতে লজ্জা হচ্ছিল, এই জন্য আমরা মিথ্যা কথা বলেছি। তখন মাতা (দূর্গা) বলেন, আমি তোমাদের অভিশাপ দেব!

ব্রহ্মাকে অভিশাপ :- জগতে তোর পূজা হবে না। পরবর্তীতে তোর বংশ পাখণ্ডী হবে। মিথ্যা কথা বলে জগৎকে ঠকাবে। উপরে ধর্ম কর্ম করে দেখাবে কিন্তু ভিতরে ছল কপট করবে। কথা (পাঠ) পুরাণের শোনাবে কিন্তু স্বয়ং (নিজের) জ্ঞান হবে না, অর্থাৎ সদ্ গ্রন্থের আসল জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞান থাকবে। ধন প্রাপ্তি ও অহংকারের (মান সম্মান) জন্য গুরু সেজে শিষ্যদের লোকবেদ (শাস্ত্র বিরুদ্ধ শোনা কথা) শোনাবে। দেবী দেবতাদের পূজা করবে এবং করাবে, এক জন অন্য জনের নিন্দা করে কষ্টের – উপর কষ্ট উঠাবে। যে ওদের শিষ্য হবে তাদের পরমার্থের জ্ঞান বলবে না। দক্ষিণার জন্য জগতকে ভ্রমিত করবে। নিজেকে সব থেকে বড়ো আর অন্যকে নীচ মনে করবে। এই কথা মায়ের মুখে শুনে ব্রহ্মা মুর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। অনেক সময় পরে জ্ঞান ফিরে আসে।

গায়ত্রীকে অভিশাপ দেয় :- তোর স্বামী (পতি) ষাঁড় হবে। তুই মৃত্যুলোকে গাভী রূপে জন্ম নিবি।

পুহপবতিকে অভিশাপ দেয় : - তোর জায়গা নোংরায় হবে। তোর ফুলকে কেউ পূজায় লাগাবে না। এই মিথ্যা সাক্ষীর জন্য তোকে নরক ভোগ করতে হবে। তোর নাম কেওড়া কেতকী হবে। (হরিয়ানায় কুসেন্ধী বলে) এই ফুলের গাছ নোংরা জায়গায় হয়।

তিন জনকে অভিশাপ দেওয়ার পরে মাতা ভবানী খুব আপসোস করেন। জীব চিন্তা ভাবনা না করে মনের (কালের) প্রভাবে খারাপ কাজ করে ফেলে কিন্তু আত্মার (সত্ পুরুষের অংশ) প্রভাবে যখন জ্ঞান হয় তখন আপসোস করে। যেমন, মাতা- পিতা নিজের ছেলে মেয়েদের ছোট একটা (সামান্য) ভুলের কারণে শাসন করে (ক্রোধিত হয়) কিন্তু পরে খুব আপসোস (মনখারাপ) করেন। {এই প্রক্রিয়া মনের (কাল নিরঞ্জন) প্রভাবে সর্ব জীবে ক্রিয়াবান।} কিন্তু এখানে এক বিশেষ নিয়ম নিরঞ্জন কাল ব্রহ্ম তৈরী করে রেখেছে। যদি কোন জীব কোন দুর্বল জীবকে দুঃখী করে তাহলে তাকে তার প্রতিফল দিতে হবে। যখন আদি ভবানী (প্রকৃতি অষ্টাঙ্গী) ব্রহ্মা, গায়ত্রী ও পুহপবতিকে অভিশাপ দেয় তখন অলখ - নিরঞ্জন (ব্রহ্ম - কাল) বলেন হে ভবানী! (প্রকৃতি-অষ্টাঙ্গী) তুমি ওদের অভিশাপ দিয়ে ভুল করেছ। এখন আমি তোমাকে অভিশাপ দেব দ্বাপর যুগে তোমারও পাঁচ পতি হবে। (দ্রৌপদীই আদি মায়ার অবতার হয়) এই আকাশবাণী শুনে আদি মায়া বলেন, হে জ্যোতি নিরঞ্জন! (কাল) আমি এখন তোমার অধীনে যা ইচ্ছা তাই করো।

{সৃষ্টি রচনায় দুর্গার নাম বার - বার লেখার উদ্দেশ্য যে, শ্রী গীতা এবং বেদ বা পুরানের প্রমান দেখার সময় আমাদের সন্দেহ উৎপন্ন হবে না। যেমন গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩ - ৫ এ কাল ব্রহ্ম বলেছেন প্রকৃতি তো সমস্ত জীবকে গর্ভে ধারন করা মাতা আর আমি প্রকৃতির গর্ভে বীজ স্থাপন করা সমস্ত জীবের পিতা। শ্লোক ৫ এ বলেছেন প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন তিন গুন জীব আত্মাকে কর্মের বাঁধনে বেঁধে রাখে। এইজন্য এখানে দুর্গাকে প্রকৃতি বলা হয়েছে, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে তিন গুন বলা হয়।

পিতাকে (কাল-ব্রহ্ম) প্রাপ্তির জন্য বিষ্ণুর প্রস্থান এবং মাতা দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্তি।

দেবী প্রকৃতি বিষ্ণুকে বলেন পুত্র তুমিও তোমার পিতার খোঁজ করে দেখ। বিষ্ণু পিতা ব্রহ্মের (কালের) খোঁজ করতে করতে পাতাল লোকে চলে যায় যেখানে শেষ নাগ ছিল। বিষ্ণুকে নিজের সীমানায় প্রবেশ করতে দেখে ক্রোধিত হয়ে বিষ ভরা ফুংকারা (ফু) মারে। বিষে ভরা ফুংকারের প্রভাবে বিষ্ণুর শরীরের রঙ শ্যামলা হয়ে যায়। স্প্রে-পেন্টের মত হয়ে যায়। শ্রী বিষ্ণু চিন্তা করে, শেষ নাগকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) বিষ্ণুর মনোভাব দেখে চিন্তা করেন এখন বিষ্ণুকে শান্ত করান দরকার। তখন আকাশবাণী করেন, বিষ্ণু এখন তুমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে সত্য কথা বল। শেষ নাগ তোমাকে যে কষ্ট দিয়েছে তাঁর প্রতিশোধ তুমি দ্বাপর যুগে নেবে। দ্বাপর যুগে তুমি (বিষ্ণু) কৃষ্ণ অবতার ধারন করবে, আর শেষ নাগ কালীদহতে কালিন্দ্রী নামক নাগের অবতার ধারণ করবে।

উঁচ হোই কে নীচ সতাবৈ, তাকর ওএল (বদলা) মোহী সো পাবৈ

জো জীব দেই পীর পুনী কাহু, হম পুনি ওএল দিবাবে তাহুঁ॥

তখন বিষ্ণু মায়ের কাছে এসে সত্য কথা বলেন, হে মা ! পিতাজী আমাকে দর্শন দেয়নি। এই কথায় মাতা (প্রকৃতি) প্রসন্ন হয়ে বলে পুত্র তুমি সত্যবাদী। আমি নিজের শক্তি দিয়ে তোমাকে তোমার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়ে তোমার মনের সন্দেহ দূর করবো।

কবীর, দেখ পুত্র তোহি পিতা ভিটাউঁ, তৌরে মন কা ধোঁখা মিটাউ।

মন স্বরূপ কর্তা কহ জানো, মন তে দুজা ঔর ন মানো ।

স্বর্গ পাতাল দৌর মন কেরা, মন অস্থীর মন অহৈ অনেরা।

নিরকার মন হী কো কহিয়ে, মন কী আস নিশ দিন রহিয়ে।

দেখ হুঁ পলটি সুন্য মহ জ্যোতি। জহাঁ পর ঝিলমিল ঝালর হোতি॥

এইভাবে মাতা (অষ্টাঙ্গী, প্রকৃতি) বিষ্ণুকে বলেন, মনই জগতের কর্তা মনই জ্যোতি নিরঞ্জন। ধ্যানে যে এক হাজার জ্যোতি দেখা যায় তাই জ্যোতি নিরঞ্জন এর আসল রূপ। যে শঙ্খ ঘন্টা ইত্যাদির বাজনা শোনা যায় তা মহাস্বর্গে জ্যোতি নিরঞ্জনেরই। মাতা (অষ্টাঙ্গী, প্রকৃতি) বলেন, হে পুত্র তুমি সর্ব দেবতার মাথার চুড়া (সরতাজ)। তোমার প্রত্যেক আশা (কামনা) বা কর্ম আমি পূর্ণ করবো। তোমার পূজা সমস্ত জগতে হবে। তুমি আমাকে সত্য কথা বলেছ। কালের একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের বিশেষ অভ্যাস নিজের ব্যর্থ মহিমা বানায়। যেমন শ্রী দূর্গা শ্রী বিষ্ণুকে বলেছেন তোর

পূজা জগতে হবে। আমি তোকে তোর পিতার দর্শন করিয়ে দিয়েছি। দূর্গা কেবলমাত্র প্রকাশ দেখিয়ে বিষ্ণুকে ভ্রমিত করেছে। শ্রী বিষ্ণু ও প্রভুর এই স্থিতি নিজের ভক্তদের বোঝাতে লাগে যে পরমাত্মার কেবল মাত্র প্রকাশ দেখা যায়, পরমাত্মা নিরাকার। তারপর আদি ভবানী রুদ্রের (মহেশ) কাছে গিয়ে বলে, মহেশ তুমিও তোমার পিতার খোঁজ করে দেখ। তোমার দুই ভাই তোমার পিতার দর্শন পায়নি। ওদের যা দেওয়ার তা দিয়ে দিয়েছি। এখন তুমি ও চেয়ে নাও তোমার কি দরকার। মহেশ বলে, হে জননী! আমার বড় ভাইরা পিতার দর্শন করতে পারেনি। তাই আমি বৃথা চেষ্টা করতে চাই না। কৃপা করে আমাকে এমন আর্শীবাদ দেন যে, আমি অমর (মৃত্যুঞ্জয়) হয়ে যাই। মাতা বলেন, এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ এক উপায় (যুক্তি) বলে দিতে পারি। যাতে তোমার আয়ু সব থেকে বেশি লম্বা হবে। বিধি যোগ সমাধি (এই জন্য শ্রী মহাদেব বেশির ভাগ সময় সমাধীতে থাকে)। পরে মাতা (অষ্টাঙ্গী দূর্গা) তিন পুত্রকে তিন বিভাগ ভাগ করে দেয়।

ভগবান ব্রহ্মাকে কাল লোকে এক লক্ষ চুরাশি প্রকারের শরীর (চোলা) তৈরির জন্য রজগুণ প্রভাবিত করে সন্তান উৎপত্তির জন্য প্রেরণা (বিবশ) করে, জীব উৎপত্তির বিভাগ প্রদান করে। ভগবান বিষ্ণুকে সকল প্রাণীর পালন পোষন (কর্ম অনুসার) করা ও মোহ - মমতা উৎপন্ন করে ভারসাম্য বানিয়ে রাখার বিভাগ দেন।

ভগবান শঙ্কর (মহাদেব) কে সংহার করার বিভাগ প্রদান করেন। কারণ এদের পিতা নিরঞ্জনকে প্রতিদিন এক লাখ মানব শরীরধারী জীব আত্মাকে খেতে হয়। এখানে মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু তথা শংকর থেকে কিভাবে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার সম্ভব হয়। এই তিন জন নিজের নিজের লোকে থাকে। যেমন আজ কাল সঞ্চার প্রণালীকে চালানোর জন্য উপগ্রহকে আকাশে পাঠানো হয়, আর নীচে পৃথিবীর উপর ওই সঞ্চার প্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয়। ঠিক এইভাবে তিন দেব যেখানেই থাকেন না কেন তাদের শরীর থেকে বের হওয়া সুক্ষ্ম গুণের তরঙ্গ ত্রিলোকের প্রত্যেক প্রাণীর উপর প্রভাব বানিয়ে রাখে। উপরোক্ত বিবরণ ব্রহ্মের এক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির রচনা। ক্ষর পুরুষের (কালের) এই রূপ ২১ (একুশ) টি ব্রহ্মাণ্ড আছে।

কিন্তু ক্ষরপুরুষ (কাল) স্বয়ং অব্যক্ত থাকে অর্থাৎ আসল (বাস্তবিক) শরীরে কারো সামনে আসে না। এই কালকে প্রাপ্ত (পাওয়ার) করার জন্য তিন দেব (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) বেদে বর্ণিত নিয়ম অনুসার ঘোর সাধনা করে তবুও তাঁরা ব্রহ্মের (কাল) দর্শন পাননি। পরে ঋষিগন বেদকে পড়ে। বেদে লেখা আছে (অধ্যায় ১ মন্ত্র ১৫)'অগ্নেঃ তনুর অসি, পবিত্র যজুর্বেদের অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১ এ লেখা আছে "অগ্নেঃ তনুর অসি বিষ্ণুবে ত্বা সোমস্য তনুর অসি"। এই মন্ত্রে দুই বার বেদ সাক্ষী দিচ্ছে যে সর্ব ব্যাপক, সর্ব পালন কর্তা সত্পুরুষ স্বশরীর (শরীর আছে)। পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ৮- এ বলেছে যে (কবির মনিষী) পরমেশ্বরকে সর্ব প্রাণী চায় তিনি কবির দেব অর্থাৎ কবীর। তার শরীর নাড়ি (অস্নাবিরম) যুক্ত নয়। (শুক্রম) বীর্য থেকে তৈরি পাঁচ তত্ত্বের ভৌতিক (অকায়ম) কায়ার নয়। তিনি সকলের মালিক সর্বোপরি সত্যলোকে বিরাজমান। ঐ পরমেশ্বরের তেজ পুঞ্জের (স্বজ্যোতি) স্বয়ং প্রকাশিত শরীর যা শব্দ স্বরূপ অর্থাৎ অবিনাশী। ঐ কবীরদেবই (কবীর পরমেশ্বর) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা

করেছেন বা সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনহার, তিনি (স্বয়ম্ভূঃ) স্বয়ং প্রকট হন, আসলে তিনি (শ্বাশত) অবিনাশী পরমাত্মা। (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে প্রমাণ)

ভাবার্থ যে পূর্ণ ব্রহ্মের শরীরের নাম কবীর (কবির দেব) ঐ পরমেশ্বরের শরীর নূর তত্ত্ব দিয়ে তৈরী। পরমাত্মার শরীর অতি সুক্ষ্ম। এক মাত্র ঐ সাধকই দেখতে পারেন যাঁর দিব্য দৃষ্টি খুলেছে। ঠিক তেমন জীবেরও সুক্ষ্ম শরীর আছে যার উপর পাঁচ তত্ত্বের খোল (কভার) অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্ব দিয়ে বানানো শরীর, এই শরীর মাতা পিতার সংযোগে (শুক্রম্) বীর্য থেকে তৈরি হয়। শরীর ত্যাগের পর জীবের সুক্ষ্ম শরীর সাথে থাকে। ঐ শরীর সেই সাধক দেখতে পারে যার দিব্য দৃষ্টি খুলেছে। পরমাত্মা ও জীবের মধ্যে স্থিতি সেইরূপ মনে কর। বেদে ওম্ নামের স্মরণ করার প্রমাণ আছে, যা এক মাত্র ব্রহ্ম সাধনার। এই উদ্দেশ্যে ওঁম জপকে পূর্ণ ব্রহ্মের জপ মনে করে ঋষিগণ হাজার বৎসর হঠযোগ (সমাধি লাগিয়ে) করে প্রভু প্রাপ্তির চেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রভু দর্শন পান না। কিছু সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। এই সিদ্ধি রূপী খেলনা নিয়ে খেলা করে ঋষিগণ জন্ম- মৃত্যুর চক্রে থেকে গিয়েছে। তাঁরা নিজের অনুভবকে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছে যে, পরমাত্মা নিরাকার। ব্রহ্ম (কাল) প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমি আমার বাস্তবিক রূপে কাউকে দর্শন দেব না। এই জগত আমাকে অব্যক্ত রূপে জানবে। (অব্যক্তের ভাবার্থ আকার আছে কিন্তু ব্যক্তিগত রূপে বা স্থুল রূপে দর্শন দেয় না। যেমন আকাশে মেঘ হলে দিনের সময় সূর্য্য অদৃশ্য হয়ে যায় দৃশ্যমান হয় না। কিন্তু মেঘের ওপারে যেমন ছিল তেমনই আছে। এই অবস্থাকে বা ভাবকে অব্যক্ত বলা হয়)। প্রমাণের জন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪ - ২৫ অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৮ ও ৩২ দেখুন।

পবিত্র গীতা বলা ব্রহ্ম (কাল) শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রেতবত প্রবেশ করে বলেছেন, হে অর্জুন আমি বড় কাল (সব থেকে বড় কাল) সবাইকে খেতে এসেছি। (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২) এটা আমার আসল (বাস্তবিক) রূপ। তুই ছাড়া অন্য কেউ আমার এই রূপ কে আগে দেখেনি পরেও কেউ দেখতে পারবে না। অর্থাৎ বেদে বর্ণিত যজ্ঞ জপ - তপ তথা ওম্ নাম ইত্যাদির বিধিতে এই আসল রূপের দর্শন হবে না। (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৮) আমি কৃষ্ণ না এই মূর্খ জনসমুদয় কৃষ্ণ রূপে আমার অব্যক্ত তাকে মানুষ রূপ মানে। কারণ আমার এই খারাপ (অনুত্তম) নিয়মের সাথে সবাই অপরিচিত। আমি আমার আসল (বাস্তবিক) কাল রূপে কারো সামনে আসি না। নিজের যোগমায়ায় লুকিয়ে থাকি (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোকে নং ২৪-২৫)

বিচার করুন :- নিজের লুকিয়ে থাকার নিয়মকে স্বয়ং অশ্রেষ্ঠ (অনুত্তম) কেন বলছেন? যদি পিতা নিজের সন্তানকে দর্শন না দেয়, তাহলে কোন ত্রুটি বা ভুল আছে যার কারণে লুকিয়ে থেকে সুবিধা প্রদান করেন। কাল (ব্রহ্ম) কে অভিশাপের জন্য একলাখ মানব শরীর ধারী প্রাণীকে আহার (খাবার) করতে হয় এবং ২৫ শতাংশ প্রতিদিন বেশি উৎপন্ন করতে হয়। তাদের বন্দোবস্ত করার জন্য তথা কর্ম ফল ভোগের জন্য চুরাশি লাখ যোনী সৃষ্টি করেছে। যদি সকলের সামনে স্ত্রী বা পুত্র মাতা পিতাকে মেরে খায় তাহলে ব্রহ্মের প্রতি সকলের ঘৃণা হয়ে যাবে। যদি পূর্ণ পরমাত্মা কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) স্বয়ং আসেন বা নিজের কোন বার্তা বাহক (দূত) কে পাঠান, তাহলে সর্ব প্রাণী সত্যভক্তি করে কালের জাল থেকে বেরিয়ে যাবে।

ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র

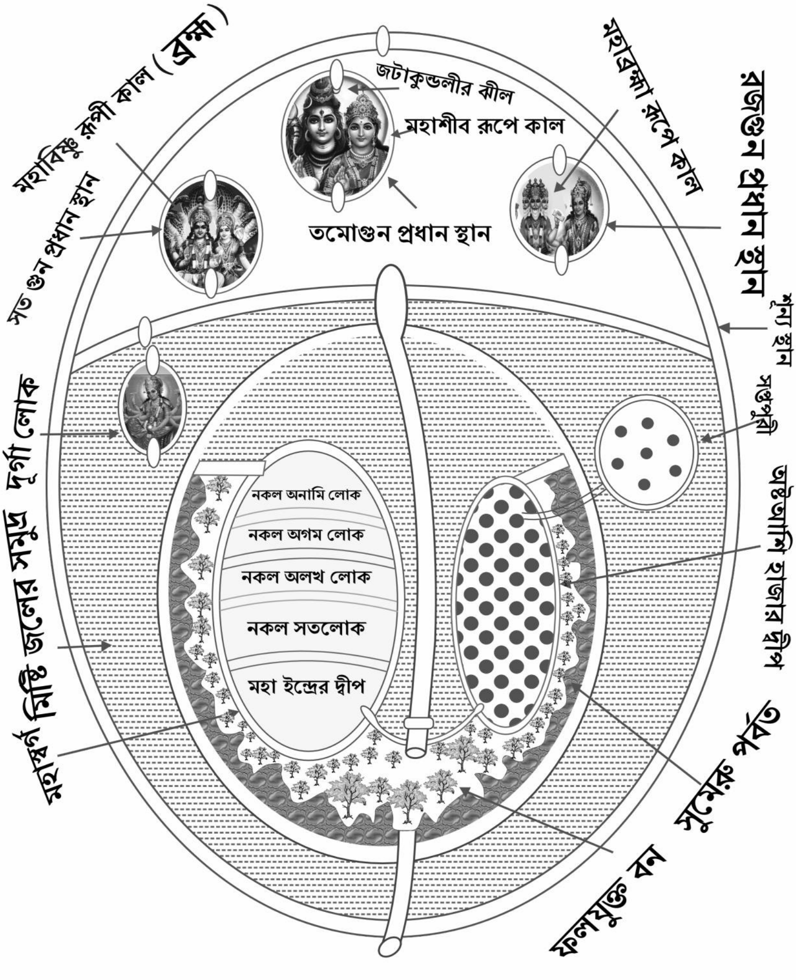

জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) ব্রহ্মের লোক (২১ ব্রহ্মাণ্ড) এর লঘুচিত্র

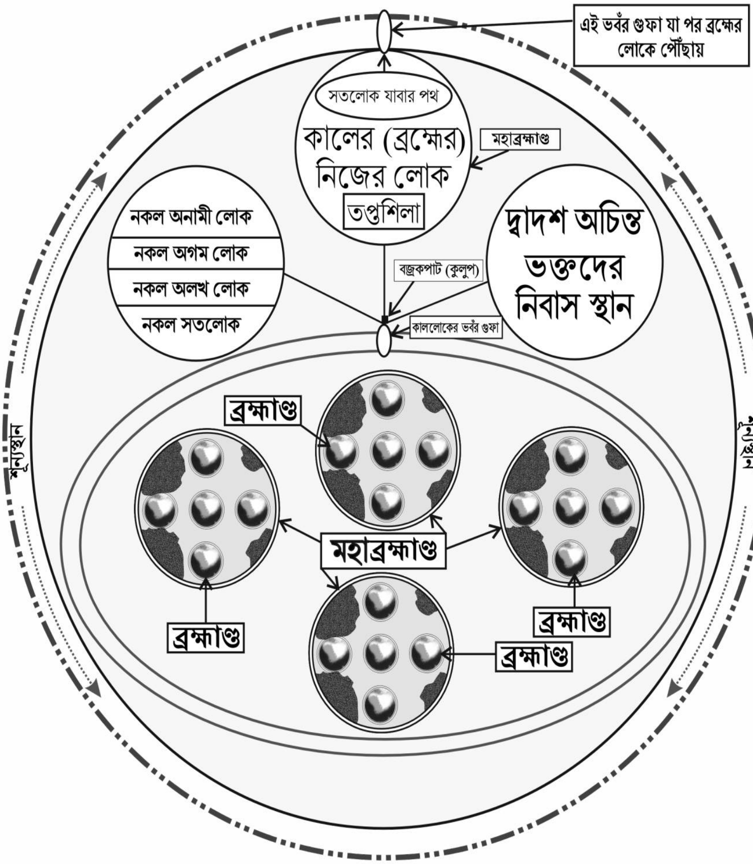

এই জন্য সবাইকে ধোঁকা (ছলনা) দিয়ে রাখে। পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮, ২৪, ২৫-এ নিজের সাধনায় হওয়া মুক্তি (গতি) কে অতি (অনুত্তমাম্) অশ্রেষ্ঠ বলেছে। নিজের বিধান (নিয়ম) কেও (অনুত্তম) অশ্রেষ্ঠ বলেছে।

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মলোকে এক মহাস্বর্গ তৈরী করে রেখেছে। প্রাণীকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য মহাস্বর্গের এক স্থানে প্রকৃতি দেবীর দ্বারা (দূর্গা-আদিমায়া) নকল সতলোক - নকল অলখলোক - নকল অগমলোক - এবং নকল অনামী লোকের রচনা বা সৃষ্টি করে রেখেছেন। কবীর সাহেবের এক শব্দ - (কথা) ‘কর নৈনো দীদার মহল মে প্যারা হে’ বাণীতে।

কায়া ভেদ কিয়া নিরবারা, য়হ সব রচনা পিণ্ড মব্ধারা হৈ।

মায়া অবিগত জাল পসারা, সো কারীগর ভারা হৈ।

আদি মায়া কিন্হী চতুরাই, ঝূঠী বাজী পিণ্ড দিখাঈ।

অবিগত রচনা রচী অন্ড মাহি বাকা প্রতিবিম্ব ডারা হৈ।

এক ব্রহ্মাণ্ডের অন্য লোকেরও রচনা আছে। যেমন শ্রী ব্রহ্মার লোক, শ্রী বিষ্ণুর লোক, শ্রী শিবের লোক। সেখানে বসে তিন প্রভু নীচের তিন লোকের (স্বর্গলোক অর্থাৎ ইন্দ্রের লোক পৃথিবী লোক ও পাতাল লোক) এক - এক বিভাগের মালিক হয়ে (বা প্রভু হয়ে) পিতা কালের খাওয়ার জন্য প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কার্য দেখে বা নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিন প্রভুরও জন্ম-মৃত্যু হয়। তখন কাল এদেরও মেরে খায়। এই ব্রহ্মাণ্ডকে অন্ড (ডিম)ও বলে কারণ ব্রহ্মাণ্ডের আকার ডিমের মত বানানো তাই একে পিণ্ডও বলে কারণ শরীরে (পিণ্ড) এক ব্রহ্মাণ্ডের রচনার বিভিন্ন লোকের দৃশ্য শরীর কমলে দেখা যায় যেমন টি.ভি তে দেখা যায়। এখানে এক মান সরোবর ও ধর্মরায় (ন্যায়াধিশ) এর লোকও আছে। এবং এক গুপ্ত স্থানে পূর্ণ পরমাত্মা অন্য রূপ ধারন করে থাকেন, যেমন প্রত্যেক দেশের ‘রাজদূত ভবন’ থাকে। ওখানে কেউ যেতে পারে না। ওখানে সেই আত্মারা থাকে, যাদের সত্যলোকে যাওয়ার সময় পূর্ণ হয় নি। যখন ভক্তি যুগ আসে তখন পরমেশ্বর কবীর নিজের প্রতিনিধি পূর্ণ সন্ত সত্‌গুরু কে পাঠান এবং ঐ পূণ্য আত্মাদের পৃথিবীতে মানব শরীর প্রাপ্ত করান। তখন তারা অতি শীঘ্র ভক্তিতে লেগে যায়,অর্থাৎ সত্‌গুরু থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত করে পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত করে। ঐ স্থানে থাকা হংস আত্মাদের নিজের ভক্তি কামাই নষ্ট হয় না। পরমাত্মার ভাণ্ডার থেকে সর্ব সুবিধা নিশুল্ক উপলদ্ধ হয়। ব্রহ্মার (কাল) উপাসনা করা ব্যক্তিদের ভক্তি কামাই স্বর্গ - মহাস্বর্গে সমাপ্ত হয়ে যায়। কারণ এই কাল লোকের (ব্রহ্ম লোক) এবং পরব্রহ্মের লোকে প্রাণীদের নিজের কর্ম ফলই প্রাপ্ত হয়।

ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) নিজের ২০-টি (কুড়ি) ব্রহ্মাণ্ডকে চার মহাব্রহ্মাণ্ডে বিভাজিত করে রেখেছেন। এক মহাব্রহ্মাণ্ডে পাঁচ ব্রহ্মাণ্ডের সমূহ বানিয়ে রেখেছেন, তার চারিদিকে ডিমের মতো গোলাকার পরিধিতে আটকানো এবং চার মহাব্রহ্মাণ্ডকেও অনুরূপ ভাবে গোলাকার পরিধিতে আবদ্ধ করে রেখেছেন। একুশতম ব্রহ্মাণ্ডের রচনা এক মহাব্রহ্মান্ডের মত জায়গা নিয়ে করেছে। একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রবেশ পথে তিন রাস্তা তৈরি করে রেখেছেন। বাম দিকে নকল সতলোক, নকল অলখ লোক, নকল

অগম লোক, নকল অনামী লোকের রচনা, প্রাণীকে বিভ্রান্ত করার জন্য আদি মায়ার দ্বারা তৈরী করে রেখেছেন। ডান দিকে সর্ব শ্রেষ্ঠ ১২ জন ব্রহ্ম সাধক (ভক্ত) কে রিজার্ভ রাখে এবং প্রত্যেক যুগে তাদের নিজের দূত রূপে পৃথিবীতে পাঠান।

তাঁরা শাস্ত্রবিধি রহিত সাধনা বা জ্ঞান বলে স্বয়ং ভক্তিহীন হয়ে যায় এবং শিষ্যদেরও কালের জালে ফাঁসিয়ে রাখে। পরে ঐ ভক্ত এবং গুরু দুই জনই নরকে যায়। কাল সামনের রাস্তায় একটি তালা লাগিয়ে রেখেছে। যে রাস্তা কালের (ব্রহ্ম) নিজ লোকে যায়। ওখানে ব্রহ্ম (কাল) নিজের আসল (বাস্তবিক) কাল রূপে থাকে। ঐ স্থানে এক বিশাল পাথরের চাটু আকারের রুটি ভাজা লোহার গোল প্লেটের মত সর্বদা গরম থাকে। ওখানে কাল প্রতিদিন এক লাখ মানব শরীরধারী প্রাণীর সুক্ষ্ম শরীরকে ভেজে গন্ধ বের করে খায়। ঐ সময় সর্ব প্রাণী খুব যন্ত্রণা পায় তথা হাহাকার করতে থাকে। কিছু সময় পরে অজ্ঞান হয়ে যায়, জীব মরে না। পরে ধর্মরায়ের লোকে গিয়ে কর্মের আধারে অন্য যোনিতে জন্ম নেয়, এই ভাবে জন্ম - মৃত্যুর চক্র চলতে থাকে।

উপরোক্ত সামনে লাগানো তালা ব্রহ্ম (কাল) নিজের আহারের জন্য (আহার করা প্রাণীর জন্য) কিছুক্ষণ খোলা রাখেন। পূর্ণ পরমাত্মার সত্যনামে ও সারনামে এই তালা স্বয়ং খুলে যায়। কালের এই জালের বর্ণনা পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর সাহেব) স্বয়ং নিজের ভক্ত ধর্মদাসকে বলেছেন।

"পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্থাপনা।"

কবীর পরমেশ্বর (কবীর্দেব) পূর্বে বলেছেন যে, পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) নিজের কর্মে অবহেলা করে মান সরোবরে শুয়ে পড়ে। যখন পরমেশ্বর (আমি অর্থাৎ কবীর সাহেব) শব্দ শক্তি দিয়ে একটি ডিম তৈরী করে মান সরোবরে ছেড়ে দেন। তখন অক্ষর পুরুষ ঐ ডিমের দিকে ক্রোধিত দৃষ্টিতে দেখেন। এই দুই অপরাধের কারণে অক্ষর পুরুষকে সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড সহিত সতলোক থেকে নিষ্কাশিত করে দেন। দ্বিতীয় কারণ অক্ষর পুরুষ, (পরব্রহ্ম) সাথী ব্রহ্মের (ক্ষরপুরুষ) বিদায়ে ব্যকুল হয়ে পরম পিতা কবির্দেবের (কবীর সাহেব) কথা ভুলে ক্ষর পুরুষের কথা মনে করতে লাগে এবং চিন্তা করেন যে, ক্ষর পুরুষ খুব আনন্দে আছে, সে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছে, আমি পিছনে রয়ে গেলাম আর যে সমস্ত আত্মারা পর ব্রহ্মের সাথে সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম -মৃত্যুর কর্মদণ্ড ভোগ করছে, তারাও কালের (ক্ষরপুরুষ) সাথে আসা আত্মাদের বিদায়ের কথা মনে করে ব্যকুল হয়ে ওঠে এবং পূর্ণ পরমাত্মা সুখদায়ী কবীর দেবের কথা ভুলে যায়। পরমেশ্বর কবীরদেব বারবার বোঝানোর পরেও তাদের আস্থা কম হয় না। পরব্রহ্ম চিন্তা করে যদি আমিও ক্ষরব্রহ্মের মত পৃথক স্থান প্রাপ্ত করি তাহলে ভালো হবে, এই চিন্তা করে রাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছাতে সারনামের জপ শুরু করে দেয়। যে সমস্ত আত্মারা পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে আছে তারা চিন্তা করে, যে সমস্ত আত্মারা ব্রহ্ম (ক্ষর) পুরুষের সঙ্গে গিয়েছে তারা খুব আনন্দ করছে। আমরা পিছনে থেকে গেলাম। পরব্রহ্মও চিন্তা করতে থাকে যে, ক্ষর পুরুষ পৃথক দ্বীপ প্রাপ্ত করে খুব আনন্দ – ফুর্তি করছে। এই কথা চিন্তা করে পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) হঠযোগ করেনা কেবল রাজ্য প্রাপ্তির জন্য বিশেষ ভাবে সহজ ধ্যান যোগ (মনেপ্রাণে) করতে থাকে। পৃথক স্থান প্রাপ্ত করার

জন্য পাগলের মত বিচরণ করতে থাকে। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয়। অন্য কিছু আত্মারা যারা পূর্বে কালব্রহ্মের সঙ্গে যাওয়া আত্মাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিল তারা পরব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পূর্ণ প্রভু জিজ্ঞাসা করার পর পৃথক (আলাদা) স্থান ও কিছু আত্মার জন্য প্রার্থনা করে। তখন কবীরদেব বলেন, যদি কোন আত্মা তোমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় (নিজ ইচ্ছায়) যেতে চায়, তাহলে তাকে পাঠিয়ে দেব।

পূর্ণ প্রভু জিজ্ঞাসা করেন কোন কোন হংস আত্মা পরব্রহ্মের সঙ্গে যেতে চাও। তাঁরা সম্মতি ব্যক্ত করো। অনেক সময় পরে এক হংস আত্মা -সম্মতি ব্যক্ত করে, এবং দেখাদেখি বাকি সর্ব আত্মারা সম্মতি ব্যক্ত করে। সর্ব প্রথম সম্মতি দেওয়া হংস আত্মাকে স্ত্রী রূপ দিয়ে তাঁর নাম ঈশ্বরীয় মায়া (প্রকৃতি-সুরতি) রাখেন এবং অন্য আত্মাদের ঐ ঈশ্বরীয় মায়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে অচিন্তের দ্বারা অক্ষর পুরুষের (পরব্রহ্ম) কাছে পাঠিয়ে দেন। (আত্মারা পতিব্রতা পদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সাজা পায়) কয়েক যুগ পর্যন্ত দুই জন সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডে থাকে কিন্তু পরব্রহ্ম দুর্ব্যবহার করে না। ঈশ্বরী মায়ার ইচ্ছায় নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা নখ দিয়ে স্ত্রী ইন্দ্রীয় (যোনি) তৈরী করে বিবাহ করে। ঈশ্বরী দেবীর সম্মতিতে (ইচ্ছায়) সন্তান উৎপন্ন করে। এই জন্য পরব্রহ্মের লোকে (সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডে) প্রাণীদের তপ্ত শিলার কষ্ট সহ্য করতে হয় না। ওখানের পশু পাখিরাও ব্রহ্মলোকের দেবতাদের থেকেও ভালো চরিত্রের হয়, তাঁদের আয়ু অনেক লম্বা (বেশি), কিন্তু জন্ম -মৃত্যু কর্মের আধারে হয় অর্থাৎ পরিশ্রম করে উদর পূর্তি করতে হয়। ওখানেও স্বর্গ ও নরক বানানো আছে। পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) কে সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইচ্ছা রূপী ভক্তি ধ্যান অর্থাৎ সহজ সমাধি বিধিতে করা ভক্তি ধনের প্রতিফলে প্রদান করে এবং সতলোক থেকে পৃথক স্থানে গোলাকার পরিধিতে আবদ্ধ করে সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড সহিত অক্ষর ব্রহ্মা ও ঈশ্বরীয় মায়াকে নিষ্কাসিত (বাইরে বের) করে দেয়।

❖ পূর্ণ ব্রহ্মের (সতপুরুষ) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যা সত্যলোকে অবস্থিত এবং ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ড ও পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড এই সকল ব্রহ্মান্ডের প্রভু (মালিক) অর্থাৎ মালিক পরমেশ্বর কবীরদেব, তিনি সবকিছুর (সর্বকুলের) রচনহার।

শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিব চার ভূজা (হাত) এবং ১৬ কলা যুক্ত। প্রকৃতি দেবী (দূর্গা) আট ভূজা (হাত) এবং ৬৪ কলা, ব্রহ্ম (ক্ষরপুরুষ) এক হাজার ভূজা অর্থাৎ হাজার কলা এবং একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। পরব্রহ্ম (অক্ষরপুরুষ) দশ হাজার ভূজা এবং দশ হাজার কলা যুক্ত এবং সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। পূর্ণব্রহ্ম (পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ সত্ পুরুষ) - এর অসংখ্য হাত (ভূজা) এবং অসংখ্য কলা এবং ক্ষর ব্রহ্মের ২১ ব্রহ্মান্ড ও পর ব্রহ্মের ৭ শঙ্খ ব্রহ্মান্ড এবং অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু প্রত্যেক প্রভু নিজের সর্ব হাত লুকিয়ে কেবল দুই হাত রাখতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা তখন সর্ব ভূজা প্রকট করতে পারেন। পূর্ণ পরমাত্মা পরম অক্ষর ব্রহ্ম প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে পৃথক স্থান তৈরী করে অন্যরূপে গুপ্তভাবে থাকেন। মনে করো, কোন ক্যামেরা ঘরের বাইরে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ঘরের ভিতরে টি.ভি (টেলিভিশন) রাখা আছে। টি.ভি-তে বাইরের সব দৃশ্য দেখা যায়। অন্য টি.ভি বাইরে রেখে ভিতরে ক্যামেরা লাগালে শুধু ভিতরে বসা প্রবন্ধকের চিত্র দেখা যাবে। এতে সমস্ত কর্মচারীরা সাবধান থাকবে।

এইভাবে পূর্ণ পরমাত্মা নিজের সতলোকে বসে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেও সত্গুরু কবির্দের বিদ্যমান থাকেন। যেমন সূর্য দূরে থাকলেও তার প্রভাব সর্বত্র থাকে।

"পবিত্র অথর্ব বেদে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

কাণ্ড নং ৪, অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ১ :-

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।

সঃ বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম - জ - জ্ঞানম্ - প্রথমম - পুরস্তাত্ - বিসিমতঃ - সুরুচঃ - বেনঃ -আবঃ - সঃ বুধ্ন্যাঃ- উপমা -অস্য - বিষ্ঠাঃ -সতঃ-চ - যোনিম্-অসতঃ - চ -বি বঃ।

অনুবাদ:- (প্রথমম্) প্রাচীন অর্থাৎ সনাতন (ব্রহ্ম) পরমাত্মা (জ) প্রকট হয়ে (জ্ঞানম্) নিজের যুক্তি-বিদ্যাতে (পুরস্তাত্) শীর্ষে অর্থাৎ সতলোক ইত্যাদিকে (সুরুচঃ) নিজের ইচ্ছায় বড় প্রেমে (আদরের সাথে) স্ব-প্রকাশিত (বিসিমতঃ) সীমা রহিত (সীমাহীন) অর্থাৎ বিশাল সীমা যুক্ত লোককে ওই (বেনঃ) তাঁতী তানে অর্থাৎ কাপড়ের মত বুনে (আবঃ) সুরক্ষিত করে (চ) তথা (সঃ) এই পূর্ণ ব্রহ্মই সর্ব রচনার কর্তা। (অস্য) এই জন্য ওই (বুধন্যাঃ) মূল মালিক (যোনিম্) মূল স্থান সত্যলোকের রচনা করে (অস্য) ওই (উপমা) সদৃশ্য অর্থাৎ প্রায় একই রকম (সতঃ) অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মের লোককে অল্প স্থায়ী (চ) এবং (অসতঃ) ক্ষর পুরুষের অস্থায়ী লোক ইত্যাদি (বিঃবঃ) বাসস্থান ভিন্ন ভাবে (বিষ্ঠাঃ) স্থাপিত করে।

ভাবার্থ : - পবিত্র বেদের জ্ঞান বলা ব্রহ্ম (কাল) বলছেন যে সনাতন পরমেশ্বর স্বয়ং অনাময় (অনামী) লোক থেকে সত্যলোকে প্রকট হয়ে নিজের বিচার-বুদ্ধিতে বা নিজের ইচ্ছায় কাপড়ের মত বুনে সৃষ্টি (রচনা) করে উপরের সতলোক ইত্যাদিকে সীমা রহিত (সীমাহীন) স্বপ্রকাশিত অজর-অমর অর্থাৎ অবিনশ্বর করেছে এবং নিচের পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মের ২১ (একুশ) ব্রহ্মাণ্ডের ছোট ছোট রচনাও ওই পরমাত্মা অস্থায়ী রূপে করেছেন।

অথর্ববেদ:-কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ২:-

ইয়ং পিত্র্যা রাষ্ট্রেত্বগ্রে প্রথমায় জনুষে ভুবনেষ্ঠাঃ।

তস্মা এতং সুরুচং হারমত্মং ধর্ম শ্রীনন্তু প্রথমায় ধাস্যবে॥ ২॥

ইয়ম -পিত্র্যা-রাষ্ট্রি,- এতু - অগ্রে - প্রথমায়-জনুষে - ভুবনেষ্ঠাঃ।

তস্মা-এতম্ -সুরুচম্- হবারমহ্মম্ -ধর্মম্ -শ্রীনন্তু - প্রথমায় - ধাস্যবে

অনুবাদ:- (ইয়ম্) এই (পিত্যা) জগত পিতা পরমেশ্বর (এতু) এই (অগ্রে) সর্বত্তোম্ (প্রথমায়) প্রথম মায়া পরানন্দীনি (রাষ্ট্রি) রাজেশ্বরী শক্তি অর্থাৎ পরাশক্তি, যাকে সকলের আকর্ষণ শক্তিও বলা হয়। এই আকর্ষন শক্তিকে (জনুষে) উৎপন্ন করে (ভুবনেষ্ঠাঃ) বিভিন্ন লোক স্থাপনা করে (তস্মা) এই পরমেশ্বর (সরুচম্) বড়ো প্রেমের সাথে নিজের ইচ্ছায় (এতম্) একে (প্রথমায়) প্রথম উৎপত্তি করে, শক্তি অর্থাৎ পরা শক্তির দ্বারা (হারমত্মম্) একে অন্যের বিয়োগকে আটকায় অর্থাৎ

আকর্ষণ শক্তির (শ্রীনন্তু) গুরুত্ব আকর্ষণকে পরমাত্মা আদেশ দেয় সর্বদা থাক (সদা থাক) যা কখনো সমাপ্ত না হওয়া (ধর্মম্) স্বভাবকে (ধস্যাবে) ধারণ করে তানে অর্থাৎ কাপড়ের মত বুনে রেখেছে।

ভাবার্থ :- জগত পিতা পরমেশ্বর নিজের শব্দশক্তি দিয়ে রাষ্ট্র অর্থাৎ সর্বপ্রথম মায়া রাজেশ্বরীকে উৎপন্ন করে এবং ওই পরাশক্তির দ্বারা একে অন্যের আকর্ষণ শক্তিতে আবদ্ধ করে, যা কখনো সমাপ্ত না হওয়া গুণে যুক্ত। তারপর উপরোক্ত সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে স্থাপিত করে।

অথর্ববেদ :- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৩:-

প্র য়ো যজ্ঞে বিদ্বানস্য বন্ধুবিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি।

ব্রহ্ম ব্রহ্মন উজ্জভার মধ্যাত্রীচৈরুচ্চৈঃ স্বধা অভি প্রতস্থৌ ॥৩॥

প্রায়ঃ-যজ্ঞে-বিদ্বানস্য-বন্ধুঃ-বিশ্বা-দেবানাম্-জনিমা-বিবক্তি।

ব্রহ্ম-ব্রহ্মনঃ উজ্জভার মধ্যাত্ নিচৈ-উচ্চৈঃস্বধা অভিঃ প্রতস্থৌ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- (প্র) সর্ব প্রথম (দেবানাম্) দেবতাদের ও ব্রহ্মাণ্ডের (যজ্ঞে) উৎপত্তির জ্ঞান কে (বিদ্বানস্য) জিজ্ঞাসু ভক্তকে (য়ঃ) যে (বন্ধুঃ) বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা তাঁর নিজের সেবককে (জনিমা) নিজের দ্বারা সৃজন করাকে (বিবক্তি) স্বয়ংই ঠিক ঠিক বিস্তার পূর্বক বলেন। যে (ব্রহ্মনঃ) পূর্ণ পরমাত্মা (মধ্যাত্) নিজের মধ্যে থেকে অর্থাৎ শব্দ শক্তি দিয়ে (ব্রহ্মঃ) ব্রহ্ম-ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ কালকে (উজ্জভার) উৎপন্ন করে (বিশ্বা) সমস্ত সংসারকে অর্থাৎ সর্ব লোকের (উচ্চৈঃ) উপর সত্যলোক ইত্যাদি (নিচৈঃ) নীচে পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মের সর্বব্রহ্মাণ্ড (স্বধা) নিজের ধারন করা (অভিঃ) আকর্ষণশক্তি দিয়ে (প্রতস্থৌ) দুটো কেইভালো ভাবে স্থির করে।

ভাবার্থ :- পূর্ণ পরমাত্মা নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান তথা সর্ব আত্মাদের উৎপত্তির জ্ঞান নিজের দাসকে স্বয়ংই সঠিক ভাবে বলেন। যে পূর্ণ পরমাত্মা নিজের মধ্যে অর্থাৎ নিজের শরীর থেকে নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষ, কাল) উৎপত্তি করেন, এবং সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপর সতলোক, অলখ লোক, অগমলোক, অনামী লোক ইত্যাদি এবং নিচে পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মার ২১ ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের ধারণ করা আকর্ষণ শক্তি দিয়ে আবদ্ধ করে রাখেন। যেমন পূর্ণ পরমাত্মা কবীর পরমেশ্বর (কর্বিদেব) নিজের সেবক অর্থাৎ সখা (সাথী) শ্রী ধর্মদাসকে, আদরনীয় গরিব দাস আরো অনেককে নিজের দ্বারা রচনার সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ংই বলেন। উপরোক্ত বেদ মন্ত্রও এই কথার সমর্থন করেছে।

অথর্ববেদ :- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৪

সঃ হি দিবঃ সঃ পৃথিব্যা ঋতস্থা মহী ক্ষেমন্ রোদসী অস্কভায়ত্।

মহান মহী অস্কভায়দ বি জাতো ধ্যা সদ্ম পার্থিব চ রজঃ॥ ৪॥

সঃ হি-দিবঃ-স- পৃথিব্যা - ঋতস্থা - মহী-ক্ষেমম্-রোদসী-অকস্ভায়ত - মহান মহী-অস্কভায়দ-বিজাত:- ধাম-সদম্ - পার্থিবম্-চ-রজঃ।

অনুবাদ : - (সঃ) ওই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা (হি) নিঃসন্দেহে (দিবঃ) চার দিব্য লোক যেমন সতলোক, অলখ লোক, অগম লোক ও অনামী অর্থাৎ অকহ লোক অর্থাৎ দিব্য গুণ যুক্ত লোককে (ঋতস্থা) সত্য অর্থাৎ অজর অমর রূপে স্থির করে (স) তার সমান (পৃথিব্যা) নিচের পৃথিবীর সমস্ত লোক যেমন পরব্রহ্মের ৭ শঙ্খ ব্রহ্মান্ড এবং কাল ব্রহ্মের ২১ ব্রহ্মান্ডকে (মহী) পৃথিবী তত্ত্ব দিয়ে (ক্ষেমম্) সুরক্ষার সহিত (অস্কভয়াত্) স্থির করে (রোদসি) আকাশ তত্ত্ব ও পৃথিবী তত্ত্বের উপর নিচের ব্রহ্মান্ডকে {যেমন আকাশের গুন শব্দ,পূর্ণ পরমাত্মা উপরের লোক শব্দ শক্তির (বচনে) তেজ পুঞ্জের বানিয়েছেন। তথা নীচের পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষ) সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম/ক্ষর পুরুষের একুশ ব্রহ্মাণ্ডকে পৃথিবী তত্ত্ব দিয়ে অস্থায়ী রূপে বানিয়েছে। } (মহান) পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা (পার্থিবম্) পৃথিবীর মত (বি) ভিন্ন-ভিন্ন (ধাম) লোক) আরও (সদম্) আবাস স্থান (মহী) পৃথিবী তত্ত্বে (রজঃ) প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ছোট ছোট লোকেও (জাতঃ) রচনা করে (অস্কভায়ত) স্থির করেছেন।

ভাবার্থ :- উপরের চার লোককে সত্যলোক, অলখ লোক, অগম লোক ও অনামী লোককে অজর অমর স্থায়ী অর্থাৎ অবিনশ্বর বানিয়েছেন এবং নিচের ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম -এর লোককে অস্থায়ী রচনা করেছেন এবং অন্য ছোট-ছোট লোকও ওই পরমেশ্বরই রচনা (সৃষ্টি) করে স্থির করেছেন।

অথর্ববেদ :- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৫

সঃ বুধ্ন্যাদাষ্ট্র জনুষোঅভ্যগ্রং বৃহস্পতিদেবতা তস্য সম্রাট্।

অহর্ঘচ্ছুক্রং এবং জ্যোতিষো জনিষ্টাথ ধুমন্তো বি বসন্তু বিপ্রাঃ ॥ ৫ ॥

সঃ—বুধ্ন্যাত্ -আষ্ট-জনুষেঃ-অভি -অগ্রম্ -বৃহস্পতিঃ- দেবতা - তস্য -সম্রাট-অহঃ- যত্ - শুক্রম -জ্যোতিষ - জনিষ্ট -তথ - ধমন্তঃ-বি- বসন্ত-বিপ্রাঃ।

অনুবাদ :- (সঃ) ওই (বুধ্ন্যাত্) মূল মালিকের প্রথম স্থানে (অভি-অগ্রম্) সর্ব প্রথম (আষ্ট্র) অষ্টাঙ্গী মায়া-দূর্গা অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী (জনুষেঃ) উৎপন্ন হয় কারণ নিচের পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোকের প্রথম স্থান সতলোক, একে তৃতীয় ধামও বলা হয় (তস্য) এই দূর্গার ও মালিক (সম্রাট) রাজাধিরাজ (বৃহস্পতিঃ) সব থেকে বড় পতি ও জগত গুরু (দেবতা) পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন। (যত্) এখান থেকে (অহঃ) সকলের বিয়োগ হয়েছে। (অথ) এর পরে (জ্যোতিষঃ) জ্যোতি রূপ নিরঞ্জন অর্থাৎ কালের (শুক্রম্) বীর্য অর্থাৎ বীজ শক্তিতে (জনিষ্ট) দুর্গার পেটে (উদরে) উৎপন্ন হয়ে (বিপ্রঃ) ভক্ত আত্মা (বি) পৃথক (ধ্যুমন্তঃ) মনুষ্যলোক তথা স্বর্গলোকে জ্যোতি নিরঞ্জনের আদেশে দুর্গা বলে (বসন্তু) নিবাস করো, অর্থাৎ তারা বসবাস করতে লাগে।

ভাবার্থ:- পূর্ণ পরমাত্মা উপরের চার লোকের নীচের দিক থেকে সর্ব প্রথম অর্থাৎ সত্যলোকে আষ্ট্রা অর্থাৎ অষ্টাঙ্গীর (প্রকৃতিদেবী/দূর্গা) উৎপত্তি করেন। ওই রাজা ধীরাজ পূর্ণ পরমেশ্বর (সত পুরুষ) যার থেকে সকলের বিয়োগ হয়েছে। আবার সমস্ত প্রানী জ্যোতি নিরঞ্জনের (কাল) বীজ (বীর্য) থেকে দূর্গার গর্ভে উৎপন্ন হয়ে পৃথিবী লোকে ও স্বর্গ লোকে নিবাস করতে লাগে।

অথর্ববেদ :- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৬

নুনং তদস্য কাব্যো হিনোতি মহো দেবস্য পূর্বস্য ধাম।

এষ যজ্ঞে বহুভিঃ সাকমিত্থা পূর্বে অর্ধে বিষিতে সসন নু ॥৬॥

নুনম্-তত্-অস্য-কাব্য:- মহঃ - দেবস্য - পূর্ব্যস্য- ধাম - হিনোতি – পুর্বে

বিষিতে - এষ - যজ্ঞে - বহুভিঃ -সাকম্ -ইত্থা -অর্ধ-সসন্ -নু।

অনুবাদ :- (নুনম্) নিঃসন্দেহে (তত্) ওই পূর্ণ পরমেশ্বর অর্থাৎ তত্ ব্রহ্মই (অস্য) এই (কাব্যঃ) ভক্ত আত্মাদের যে পূর্ণ পরমেশ্বরের বিধিৎ ভক্তি করে তাকে (মহঃ) সর্বশক্তিমান (দেবশ্য) পরমেশ্বরই (পূর্ব্যস্য) পূর্ব (ধাম) লোকে অর্থাৎ সত্যলোকে (হিনোতি) নিয়ে যান। (পূর্বে) পূর্বের (বিষিতে) বিশেষ চাওয়া (মনে প্রাণে চাওয়া) (এষ) এই পরমেশ্বরকে (যজ্ঞে) সৃষ্টি উৎপত্তির জ্ঞানকে জেনে (বহুভিঃ) খুব আনন্দের (সাকম্) সাথে (অর্ধে) আধা (সসন) শোয়া (ইতা) বিধ্বিবত্ এই প্রকার (নু) ভালো আত্মকে স্তুতি করায়।

ভাবার্থ :- ওই পূর্ণ পরমেশ্বর সত্য সাধনা করা সাধককে, প্রথম স্থানে (সতলোকে) নিয়ে যান। যেখান থেকে চলে এসেছে, ওখানে ওই বাস্তবিক সুখদায়ী প্রভুকে প্রাপ্ত করে খুশিতে আত্মা বিভোর হয়ে আনন্দে (মস্তি) স্তুতি করে। হে পরমাত্মা! অসংখ্য জন্মের পথ ভুলে যাওয়া আত্মা আসল (বাস্তবিক) ঠিকানা পেয়ে গিয়েছে। এর প্রমাণ পবিত্র ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬ তে - ও আছে।

শ্রদ্ধেয় গরীব দাসকে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) স্বয়ং সৎ ভক্তি প্রদান করে সত্যলোকে নিয়ে যান। তখন নিজের অমৃতবাণীতে আদরনীয় গরীব দাসজী মহারাজ নিজের চোখে দেখে বলেছেন :-

গবীর, অজব নগর মেঁ লে গয়ে, হমকুঁ সত্গুরু আন।

ঝিলকে বিম্ব অগাধ গতি। সুতে চাঁদর তান॥

অথর্ববেদ :- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৭

যোঅথর্বাণ পিত্তরং দেববন্ধুং বৃহস্পতিং নমসাব চ গচ্ছাত্।

ত্বং বিশ্বেতাং জনিতা যথাসঃ কবিদেবো ন দভায়ত্ স্বাধবান্ ॥ ৭ ॥

যঃ অথর্বানম - পিত্তরম - দেববন্ধুম্ - বৃহস্পতিম্ - নমসা-অব-চ

-গচ্ছাত্ - ত্বম্ - বিশ্বেষাম্- জনিতা-যথা-সঃ-কবির্দেবঃ-ন-দভায়ত্-স্বধাবান্।

অনুবাদ:-(যঃ) যে (অথর্বানম্) স্থির অর্থাৎ অবিনাশী (পিত্তরম্) জগত পিতা (দেব বন্ধুম্) ভক্তের বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ আত্মার আধার (বৃহস্পতিম্) জগত গুরু (চ) তথা (নমসা) বিনম্র পূজারী অর্থাৎ বিধি নিয়মে থেকে যে সাধনা করে সাধককে সুরক্ষার সাথে (গচ্ছত্) সতলোক যাওয়া অর্থাৎ সতলোক নিয়ে যাওয়া (বিশ্বেষাম্) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে (জনিতা) রচনা করা জগদম্বা অর্থাৎ মায়ের গুণে ও যুক্ত (ন দভায়ত্) কালের মতন ধোকা না দেওয়া (স্বধাবান্) স্বভাবের অর্থাৎ গুনে যুক্ত (যথা) যেমন কার তেমন অর্থাৎ সেইরূপ (সঃ) তিনিই (ত্বম্) নিজে (কবির্দেবঃ/ কবীরদেবঃ) কবীরদেব অর্থাৎ ভাষার পার্থক্যে কবীর পরমেশ্বরও বলা হয়।

ভাবার্থ :- এই মন্ত্রে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ওই পরমেশ্বরের নাম কবীরদেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর, তিনি সমস্ত কিছু রচনা করেছেন।

যে পরমেশ্বর অচল (এখানে অচল অর্থ স্থায়ী) অর্থাৎ অবিনাশী (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তে-ও প্রমাণ আছে) জগৎগুরু, আত্মার আধার, যে পূর্ণ মুক্তি পেয়ে সত্যলোকে চলে যায়, তাদের সতলোকে নিয়ে যাওয়া, সর্বব্রহ্মাণ্ডের রচনা কর্তা, কালের (ব্রহ্ম) মতো ধোকা না দেওয়া, সেই পরমেশ্বর স্বয়ং কবীরদেব অর্থাৎ কবীর প্রভু। এই পরমেশ্বরকে সর্ব ব্রহ্মাণ্ড ও প্রাণীকে নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে উৎপন্ন করার জন্য (জনিতা) মাতাও বলা হয় তথা (পিত্তরম্) পিতা তথা (বন্ধু) সখা বা ভাই (দেব) ইত্যাদি ও বলা হয় আসলে এই পরমেশ্বরই পূর্ণ পরমাত্মা। এই জন্য এই কবীরদেবের স্তুতি করা হয়েছে।

ত্বমের মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব,

ত্বমেব বিদ্যা চ দ্রবিনং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব মম্ দেব দেব।

এই পরমেশ্বরের মহিমার প্রমাণ পবিত্র ঋগ্বেদ মণ্ডল নং ১ সুক্ত নং ২৪-এ বিস্তারিত ভাবে লেখা আছে।

মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্।

স ভূমিং বিশ্বতোং বৃত্বাত্যতিষ্ঠদশড়গুলম্ ॥ ১ ॥

সহস্রশির্যা – পুরুষ – সহস্রাক্ষঃ – সহস্রপাত – স – ভুমিম্ – বিশ্বতঃ – বৃত্বাঅত্যাতিষ্ঠত্ – দশংগুলম্।

অনুবাদ:-(পুরুষ) বিরাট রূপ কাল ভগবান অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ (সহস্রশির্ষা) হাজার মাথা (শির) (সহস্রাক্ষঃ) হাজার চোখ (সহস্রপাত) হাজার পা (স) এই কাল (ভূমিম্) পৃথিবীর মত একুশ ব্রহ্মাণ্ডকে (বিশ্বতঃ) সর্বদিক থেকে (দশংগুলম্) দশ আঙ্গুল দিয়ে অর্থাৎ পূর্ণ রূপে কন্ট্রোল করে (বৃত্বা) গোলাকার পরিধিতে বেঁধে প্রবিষ্ট করে (অত্যাতিষ্ঠত্) এর থেকে বড় পরিধিযুক্ত নিজের লোকে সকলের থেকে পৃথক একুশতম ব্রহ্মাণ্ডে থাকেন।

ভাবার্থ :- এই মন্ত্রে বিরাট (কাল/ব্রহ্ম) পুরুষের বর্ণনা আছে। (গীতা অধ্যায় ১০-১১ তেও এই কাল ব্রহ্মের এইরূপ বর্ণনা আছে। অধ্যায় ১১ মন্ত্র নং ৪৬ - এ অর্জুন বলছে হে সহস্রবাহু অর্থাৎ হাজার হাত যুক্ত আপনি আপনার চতুর্ভুজ রূপে দর্শন দেন।) হাজার হাত, হাজার চোখ, হাজার কানের বিরাট রূপ কাল প্রভু নিজের অধীনে সর্ব প্রাণীকে পূর্ণ রূপে বশ (অধীন) করে অর্থাৎ ২০ ব্রহ্মাণ্ডকে গোলাকার পরিধিতে আবদ্ধ করে স্বয়ং উপরের (পৃথক) একুশ ব্রহ্মাণ্ডে বসে থাকেন।

"পবিত্র ঋগ্বেদে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

ঋগ্বেদে মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ২

পুরুষ এবেদং সর্ব যদ্ভুতং যচ্চ ভাব্যম্।

উতামৃতত্বস্যেশানো যদত্রেনাতিরোহতি ॥২॥

পুরুষ - এব- ইদম্ - সর্বম্ - যত্ভুতম্ -যত -চ- ভাব্যম – উত - অমৃতত্বস্য- ইশানঃ-যত্- অন্নেন - অতিরোহতি।

অনুবাদ :- (এব) এই রূপ কিছু ঠিক (পুরুষ) ভগবান। এই অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম, (চ) আর (ইদম্) এই (যত)যে (ভাব্যম্) ভবিষ্যতে (ভূতম্) উৎপন্ন হবে (সর্ব) সব (যত্) প্রযত্ন দিয়ে (সে) অর্থাৎ পরিশ্রম দ্বারা (অন্নেন) অন্ন থেকে (অতিরোহতি) বিকশিত হয়। এই অক্ষর পুরুষও (উত) সন্দেহ যুক্ত (অমৃতত্বস্য) মোক্ষের (ইশানঃ) স্বামী অর্থাৎ ভগবান অক্ষর পুরুষও কিছু ঠিক (সাথী) কিন্তু পূর্ণ মোক্ষদায়ক নয়।

ভাবার্থ :- এই মন্ত্রে পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষ) বিবরণ আছে। তিনি কিছু (সামান্য) ভগবানের মত লক্ষণ (গুণ) যুক্ত। কিন্তু এই ভগবানের ভক্তিতেও পূর্ণ মোক্ষ হয় না, এই জন্য একে সন্দেহ যুক্ত মুক্তিদাতা বলা হয়েছে। এই ভগবান কিছু প্রভু গুণ যুক্ত এই জন্য বলা হয়, এই প্রভু কালের মত তপ্ত শিলায় প্রাণীদের ভেজে খায় না। কিন্তু এই পরব্রহ্মের লোকেও প্রাণীকে পরিশ্রম করে কর্মের আধারে ফল প্রাপ্ত করতে হয়। অন্ন থেকেই সর্ব প্রাণীর শরীর বিকশিত হয়। জন্ম তথা মৃত্যুর সময় কালের লোক থেকে বেশি সময় হলেও উৎপত্তি প্রলয় এবং চুরাশি লাখ যোনির যন্ত্রণা বজায় থাকে।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৩:-

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াঁশ্চ পুরুষঃ।

পাদোঅস্য বিশ্বা ভূতানী ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩॥

তাবান-অস্য - মহিমা -অতঃ-জ্যাযান্-চ-পুরুষঃ- পাদঃ-অস্য-বিশ্বা-ভূতানি -ত্রি – পাদ্ -অস্য -অমৃতম্ -দিবি।

অনুবাদ :- (অস্য) এই অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মের তো (এতাবান্) এতটাই (মহিমা) প্রভুত্ব আছে। (চ) তথা (পুরুষ)ঃ) এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর (অতঃ) এর থেকেও (জ্যায়ান্) বড়। (বিশ্বা) সমস্ত (ভূতানি) ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ তথা এদের লোক ও সত্যলোক তথা এই সব লোকে যত প্রাণী আছে (অস্য) এই পূর্ণ পরমাত্মা পরম অক্ষর পুরুষের (পাদঃ) এক পা অর্থাৎ এক অংশ মাত্র। (অস্য) এই পরমেশ্বরের (ত্রি) তিন (দিবি) দিব্য লোক, যেমন- সতলোক-অলখ লোক-অগম লোক (অমৃতম্) অবিনাশী (পাদ্) অন্য পা মনে কর। অর্থাৎ সর্ব ব্রহ্মাণ্ডে উৎপন্ন সব কিছু সত্পুরুষ পূর্ণ পরমাত্মার অংশ বা অঙ্গ।

ভাবার্থ- উপরের মন্ত্র ২ এ বর্ণিত অক্ষর পুরুষের (পরব্রহ্ম) এতটাই মহিমা, কিন্তু পূর্ণ পুরুষ কবীরদেব এর থেকে অনেক বড় অর্থাৎ সর্ব শক্তিমান অর্থাৎ সর্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁর অংশ মাত্র। এই মন্ত্রে তিন লোকের বর্ণনা এই জন্য করা হয়েছে যে চতুর্থ অনামী (অনাময়) লোক অন্য রচনার পূর্বে (পূর্বের থেকে) ছিল। তিন প্রভুর (ক্ষর পুরুষ - অক্ষর পুরুষ তথা এই দুই জন থেকে অন্য পরম অক্ষর পুরুষ) বিবরণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক সংখ্যা ১৬-১৭ তে - ও আছে।

তার প্রমাণে গরীবদাস সাহেব বলেছেন যে:-

গরীব, যাকে অর্ধ রূম পর সকল পসারা। এইসা পূর্ণব্রহ্ম হামারা ॥

গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মণ্ড কা, এক রতি নহী ভার।

সত্গুরু পুরুষ কবীর হে, কুলকে সৃজন হার॥

এর প্রমাণে আদরনীয় দাদু সাহেব বলছেন :-

জিন মোকু নিজ নাম দিয়া, সোই সত্গুরু হমার।

দাদু দুসরা কোই নহী, কবীর সৃজনহার॥

এর প্রমাণ শ্রদ্ধেয় নানক সাহেব ও দিয়েছেন:-

য়ক অর্জ গুফতম্ পেশ তো দর কুন করতার।

হক্কা কবীর করীম তু, বে এব পরবরদিগার॥

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব, পৃষ্ঠা নং : ৭২১, মহলা ১ রাগ তিলংগ)

কুন করতারের অর্থ - সবকিছু সৃষ্টির মালিক (রচনহার) অর্থাৎ শব্দ শক্তি দিয়ে রচনা করা শব্দ স্বরূপী প্রভু, হক্কা কবীরের অর্থ সত্ কবীর করীমের অর্থ দয়ালু, পর্বরদিগার এর অর্থ পরমাত্মা।)

ঋগ্বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৪

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈতপুরুষঃ পাদোৎস্যেহাভবতপুনঃ।

ততো বিশ্ব ডব্যক্রামত্সাশনানশনে অভি ॥৪॥

ত্রি-পাদ-উর্ধ্বঃ-উদৈত্-পুরুষঃ-পাদ -অস্য-ইহ -অভবত্-পুনঃ

ততঃ-বিশ্বড-ব্যক্রামত্ - সঃ-অশানানশনে-অভি

অনুবাদ :- (পুরুষঃ) এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মা (উর্ধ্বঃ) উপরের (ত্রি) তিন লোক যেমন সত্যলোক-অলখলোক-অগমলোক রূপী (পাদ্) পা অর্থাৎ উপরের স্থানে (উদৈত্) প্রকট হন অর্থাৎ বিরাজমান আছেন। (অস্য) এই পরমেশ্বর পূর্ণ ব্রহ্মের (পাদঃ) এক পা অর্থাৎ এক অংশ জগত রূপে (পুনর্) পুনরায় তিনি (ইহ) এখানে (অভবত্) ও প্রকট হন (ততঃ) এই জন্য (সঃ) এই অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা (অশনান শনে) আহার (খাওয়া) করা কাল অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ ও আহার না করা পরব্রহ্ম অর্থাৎ অক্ষর পুরুষেরও (অভি) উপর (বিশ্বড়) সর্বত্র (ব্যক্রামত্) ব্যাপ্ত আছেন। অর্থাৎ তার প্রভুত্ব সর্ব ব্রহ্মাণ্ড ও সর্ব প্রভুর উপর, তাই তিনি সর্ব কূলের মালিক। তিনি নিজের শক্তি সর্বত্র বিস্তার করে রেখেছেন।

ভাবার্থ :– ওই সর্ব সৃষ্টির রচনহার প্রভু নিজের রচনার উপরের তিন স্থানে (সতলোক, অলখলোক, অগমলোক) তিন পুরুষ রূপে স্বয়ং প্রকট হন। অর্থাৎ স্বয়ংই বিরাজমান আছেন। এখানে অনামী লোকের বর্ণনা এই জন্য করেন নি, কারন অনামী লোকে কোন রচনা নেই তথা অকহ (অনাময়) লোক সৃষ্টি রচনার পূর্ব থেকে ছিল। আবার বলেছে ওই পরমাত্মার সতলোক থেকে বিচ্যুত হয়ে নিচের ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের লোকের উৎপত্তি হয়েছে। এই পূর্ণ পরমাত্মা আহার করা কাল

ব্রহ্ম (কারণ ব্রহ্ম/কাল অভিশাপের জন্য এক লাখ মানব শরীর ধারী প্রাণীকে খায়) এবং আহার না করা পরব্রহ্ম অক্ষর পুরুষেরও (পরব্রহ্ম প্রাণীদের খায় না কিন্তু জন্ম -মৃত্যুর কর্মদণ্ড ভোগ করতে হয়) উপর সর্বত্র ব্যপ্ত আছেন। অর্থাৎ এই পূর্ণ পরমাত্মার প্রভুত্ব সবার উপর বিদ্যমান। কবীর পরমেশ্বরই সমস্ত কুলের মালিক। তিনি নিজের শক্তিকে সর্বত্র বিস্তার করে রেখেছেন। সূর্য যেমন তার আলো ছড়িয়ে দিয়ে সবাইকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি পূর্ণ পরমাত্মা নিজের শক্তির ক্ষমতাকে সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবহার করেন। যেমন মোবাইল ফোনের টাওয়ার এক জায়গায় হলেও নিজের শক্তি অর্থাৎ মোবাইল ফোনের রেঞ্জের ক্ষমতা চারিদিকে বিস্তার থাকে। সেইরূপ পূর্ণ প্রভু তার নিজের নিরাকার শক্তি সর্বত্র ব্যাপ্ত রাখেন। পূর্ণ পরমাত্মা এক স্থানে বসে সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এর প্রমাণ শ্রদ্ধেয় গরীব দাস মহারাজ নিজের বাণীতে দিয়েছেন। (অমৃত বাণী রাগ কল্যাণ)

তীন চরণ চিন্তামনী সাহেব, শেষ বদন পর ছায় ।

মাতা, পিতা, কুল ন বন্ধু, না কিহ্নে জননী জায়ে ॥

ঋগ্বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৫

তস্মাদ্বিরাটজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।

স জাতো অত্যারিচ্যত পশ্চাদভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥

তস্মাত্ - বিরাট্ - অজায়ত - বিরাজঃ- অধি -পুরুষঃ

স-জাতঃ-অত্যারিচ্যত- পশ্চাত্ - ভূমিম্ - তথঃ-পুরঃ।

অনুবাদ :- (তস্মাত্) তারপরে ওই পরমেশ্বর সত্পুরুষের শব্দ শক্তিতে (বিরাট) বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মকে যাকে কালপুরুষ বলা হয় তাঁর (অজায়েৎ) উৎপত্তি হয়। (পশ্চাৎ) তারপরে (বিরাজঃ) বিরাট পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের থেকেও (অধি) বড় (পুরুষঃ) পরমেশ্বর (ভূমি) পৃথিবী অর্থাৎ পরবহ্মের লোককে (অত্যারিচ্যত) ভালোভাবে রচনা করে (অথঃ) পুনরায় (পুরঃ) অন্য ছোট ছোট লোককে (স) ওই পূর্ণ পরমেশ্বরই (জাতঃ) সৃষ্টি করে স্থাপিত করেন।

ভাবার্থ :- উপরোক্ত মন্ত্র ৪-এ বর্ণিত তিনলোক (অগমলোক, অলখলোক তথা সতলোক) - এর রচনার পরে ওই সর্বশক্তিমান পূর্ণ পরমাত্মা জ্যোতি নিরঞ্জনকে (ব্রহ্ম) উৎপত্তি করেন। পূর্ণব্রহ্ম কবীরদেব (কবীর প্রভু) থেকে বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্ম (কাল) এর উৎপত্তি হয়। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৩ মন্ত্র ১৫ তে আছে যে, অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ অবিনাশী প্রভু থেকে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়েছে। এই প্রমাণ - অথর্ববেদ কাণ্ড নং ৪ অনুবাক ১ সুক্ত ৩ -এ বলেছে, যে পূর্ণ ব্রহ্মের থেকে ব্রহ্ম -এর উৎপত্তি হয়েছে। সেই পূর্ণব্রহ্মই (ভূমিম্) ছোট বড় ভূমি ও সর্ব লোকের রচনা করেন। পূর্ণ ব্রহ্ম এই বিরাট ভগবান অর্থাৎ ব্রহ্মের থেকেও বড় অর্থাৎ এদেরও মালিক।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৫

সপ্তাস্যাসপরিধ্যস্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।

দেবা য়ধ্যজ্ঞং তন্বাণা অবধ্নপুরুষং পশুম্ ॥ ১৫॥

সপ্ত-অস্য-আসন্-পরিধয়ঃ-ত্রিসপ্ত-সমিধঃ-কৃতাঃ-

দেবা-যত্-যজ্ঞম্-তন্ত্রানাঃ-অবধ্নন্-পুরুষম-পশুম্।

অনুবাদ :- (সপ্ত) সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তো পরব্রহ্মের এবং (ত্রিসপ্ত) একুশ ব্রহ্মান্ড কাল ব্রহ্মের (সমিধঃ) কর্ম দণ্ডের দুঃখ রূপী আগুনে দুঃখী (কৃতাঃ) করা (পরিধিয়ঃ) গোলাকার পরিধিতে ঘেরা সীমানায় (আসন্) বিদ্যমান। (যত্) যে (পুরুষম্) পূর্ণ পরমাত্মার (যজ্ঞম্) বিধিত্ ধার্মিক কর্ম অর্থাৎ পূজা করে (পশুম) বলির পশুর মত কালের জালে কর্ম বন্ধনে বাঁধা (দেবা) ভক্ত আত্মাকে (তন্বনাঃ) কালের দ্বারা রচনা করা অর্থাৎ পাপ কর্ম বন্ধনের জাল থেকে যে (অবধ্নন্) বন্ধন রহিত করে অর্থাৎ তাকে বন্দীছোড় বলা হয়।

ভাবার্থ :- সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্মের এবং একুশ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের যা গোলাকার সীমায় আবদ্ধ, পাপ কর্মের আগুনে জ্বলা প্রাণীকে বাস্তবিক পূজা বিধি বলে ঠিক (সহী) উপাসনা করান। বলি দেওয়া পশুর মত জন্ম - মৃত্যুতে বদ্ধ কালের (ব্রহ্ম) খাওয়ার জন্য তপ্ত শিলায় কষ্টে পীড়িত ভক্ত আত্মাকে কালের কর্ম বন্ধনের বিস্তারিত জালকে ছিঁড়ে বন্ধন রহিত করেন, অর্থাৎ বন্দি থেকে মুক্ত করা বন্দি ছোড়। এর প্রমাণ পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ৩২-এ - ও আছে যে, কবিরংঘারিসি (কবির) কবির পরমেশ্বর (অংঘ) পাপের (অরি) শত্রু (অসি) আছেন, অর্থাৎ পাপ বিনাশক কবীর দেব। ব্রম্ভারিসি (ব্রম্ভারি) বন্ধনের শত্রু অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বরই বন্দিছোড় (বন্দি থেকে যে মুক্ত করে)

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজ্ঞন্ত দেবাস্তানি ধর্মানি প্রথমান্যাসন্

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত য়ত্র পূর্বে সন্ধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬॥

যজ্ঞেন - যজ্ঞম্ - অ-যজন্ত - দেবাঃ-তানি - ধর্মানি -প্রথমানি - আসন্ - তে - হ-নাকম্- মহিমানঃ -সচন্ত - যত্র -পুর্বে -সান্ধ্যাঃ -সন্তি দেবাঃ।

অনুবাদ :- যে (দেবাঃ) নির্বিকার দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা (অযজ্ঞম্) অসম্পূর্ণ (অধুরী) ভুল ধার্মিক পূজার স্থানে (যজ্ঞেন) সত্য ভক্তির ধার্মিক কর্মের আধারে (অয়জন্ত) পূজা করে (তানি) সে (ধর্মানি) ধার্মিক শক্তি সম্পন্ন (প্রথমানি) মূখ্য অর্থাৎ উত্তম (আসন্) আছে। (তেহ) সেই আসল (মহিমানঃ) মহান ভক্তি শক্তি যুক্ত হয়ে (সাধ্যাঃ) সফল ভক্তজন (নাকম্) পূর্ণ সুখদায়ক পরমেশ্বরকে (সচন্ত) ভক্তি নির্মিতের কারণ অর্থাৎ সভক্তির কামাইয়ে (ফলে) প্রাপ্ত হয়। সে ওখানে চলে যায়। (যত্রঃ) যেখানে (পূর্বে) প্রথম সৃষ্টির (দেবাঃ) পাপরহিত দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা (সন্তি) আছে।

ভাবার্থ - যে নির্বিকার (যে মাছ, মাংস, শরাব, তামাক ইত্যাদি সেবন করা ত্যাগ করে দিয়েছে এবং অন্য খারাপ জিনিস থেকে দূরে থাকে) দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মা শাস্ত্র বিধি রহিত পূজাকে ত্যাগ করে, শাস্ত্রানুকুল সাধনা করে সে ভক্তির কামাইয়ে ধনী হয়ে কালের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সত্য ভক্তির কামাইয়ের ফলে ওই সর্ব সুখদায়ী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে। অর্থাৎ সতলোকে চলে যায় যেখানে প্রথম

সৃষ্টির দেব স্বরূপ অর্থাৎ, পাপ রহিত হংস আত্মা আছে।

যেমন, কিছু আত্মারা কাল (ব্রহ্ম) জালে ফেঁসে এখানে এসেছে, এবং কিছু পরব্রহ্মের সাথে সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডে গিয়েছে। তবুও অসংখ্য আত্মা যাদের বিশ্বাস পূর্ণ পরমাত্মার প্রতি অটল যারা পতিব্রতা পদ থেকে বিচ্যুত না হয়ে সেখানে থেকে গিয়েছে। সেই জন্য এই বর্ণনা পবিত্র বেদেও সত্য বলছে। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক সংখ্যা ৮ ও ১০ - এ বর্ণিত আছে। যে সাধক পূর্ণ পরমাত্মার সৎ সাধনা শাস্ত্রবিধি অনুসার করে সে ভক্তির প্রতিফলে ওই পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে। অর্থাৎ পরমাত্মার কাছে চলে যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে তিন প্রভু আছে,ব্রহ্ম - পরব্রহ্ম - পূর্ণব্রহ্ম। এদের (১) ব্রহ্ম -ইশ -ক্ষর পুরুষ, (২) পরব্রহ্ম -অক্ষর পুরুষ / অক্ষর ব্রহ্ম ঈশ্বর তথা (৩) পূর্ণ ব্রহ্ম - পরম অক্ষর ব্রহ্ম - পরমেশ্বর-সত্ পুরুষ ইত্যাদি উপমাত্মক শব্দতে জানা যায়।

এর প্রমাণ ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ থেকে ২০ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে যে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) শিশুরূপ ধারন করে প্রকট হয়ে নিজের নির্মল জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান (কবিগীর্ভিঃ) কবীর বাণী দ্বারা নিজের ভক্তদের মুখে বলে বর্ণনা করেন। এই কবীরদেবের ধাম (কবীর পরমেশ্বর) ব্রহ্মের (ক্ষরপুরুষ) ধাম তথা পরব্রহ্মের (অক্ষরপুরুষ) ধামের থেকে আলাদা (ভিন্ন) এটা পূর্ণ ব্রহ্মের (পরম অক্ষর পুরুষ) তৃতীয় ঋতধাম (সতলোক)। ওখানে তিনি নর আকারে বিরাজমান আছেন এবং সতলোক থেকে চতুর্থ অনামীলোক ওখানেও ওই কর্বিদেব (কবীর পরমেশ্বর) অনামী পুরুষ রূপে মানুষ সাদৃশ্য আকারে বিরাজমান আছেন।

“পবিত্র শ্রীমদ দেবী মহাপুরণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ”

“ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাতা-পিতা”

(দূর্গা এবং ব্রহ্মের যোগ থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম)

পবিত্র শ্রীমদ্‌দেবী মহা পুরানের তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ১-৩ (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত, অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার ও চিমনলাল গোস্বামী, পৃষ্ঠা নং ১১৪)।

পৃষ্ঠা নং ১১৪ থেকে ১১৮ পর্যন্ত বিবরণ আছে যে, ভবানী অনেক আচার্যদের সম্পূর্ণ মনস্কামনা পূর্ণ করে এইরূপ বলা হয়। তাকে প্রকৃতিও বলা হয়। তথা ব্রহ্মের সাথে তাঁর অভেদ সম্বন্ধ আছে, {যেমন পত্নিকে অর্ধাঙ্গিনীও বলা হয়। অর্থাৎ দূর্গা ব্রহ্মের (কাল) পত্নি।} এক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রচনার বিষয়ে রাজা শ্রী পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসার পর শ্রী ব্যাসদেব বলেন, আমি শ্রী নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। “হে দেবর্ষি! এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা কিভাবে হয়েছে?” আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী নারদ বলেন, আমি আমার পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। হে পিতাজী এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা আপনি করেছেন না শ্রী বিষ্ণু করেছে না শ্রী শিব করেছে? দয়া করে সত্য - সত্য বলার কৃপা করুন। তখন আমার পূজ্য পিতা ব্রহ্মা বলেন, পুত্র নারদ আমি নিজেকে কমল ফুলের উপর বসা পেয়েছিলাম। আমি জানিনা এই অগাধ

(সীমাহীন জল) জলে আমি কিভাবে উৎপন্ন হয়েছি। আমি এক হাজার বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর অন্বেষণ (খোঁজ) করতে থাকি। কোথাও জলের কিনারা পায়নি। তারপর আকাশবাণী হয়, তপ করো। এক হাজার বৎসর পর্যন্ত তপ করি। তারপর সৃষ্টি করার আকাশবাণী হয়। ততক্ষণে মধু আর কৈটভ নামের দুই রাক্ষস আসে। তাদের ভয়ে আমি কমলের দন্ড ধরে নিচে নামি। সেখানে শ্রী বিষ্ণু শেষ শয্যার উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। তাঁর থেকে এক স্ত্রী বের হয় (প্রেতের মত প্রবিষ্ট দূর্গা) তিনি বিভিন্ন অলংকার সজ্জিত হয়ে আকাশে দেখা দেন। তখন ভগবান বিষ্ণুর চেতনা (হুঁশ) আসে। ওখানে আমি আর বিষ্ণু দুইজন ছিলাম। এতক্ষণে ভগবান শঙ্করও এসে যায়। দেবী আমাদের বিমানে বসিয়ে ব্রহ্মালোকে নিয়ে যান। ওখানে এক ব্রহ্মা এক বিষ্ণু ও এক শিবকে দেখি এবং আর এক দেবীকে দেখি। শ্রী দেবীকে দেখে শ্রী বিষ্ণু বিবেকপূর্বক নিম্নের বর্ণনা করে, (ব্রহ্ম কাল ভগবান বিষ্ণুকে চেতনা প্রদান করে, শ্রী বিষ্ণুর নিজের বাল্যকালের স্মৃতি মনে পরে তখন বাল্যকালের কাহিনী শুনায়)।

পৃষ্ঠা নং ১১৯ -১২০ তে ভগবান বিষ্ণু শ্রী ব্রহ্মা ও শ্রী শিবকে বলেন, ইনি আমাদের তিন জনের মাতা ও জগত জননী প্রকৃতি দেবী। আমি এই দেবীকে তখন দেখেছিলাম যখন আমি ছোট বালক ছিলাম। এই মাতা আমাকে তখন দোলনায় দোল দিচ্ছিলেন।

তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং ১২৩-এ শ্রী বিষ্ণু, শ্রী দূর্গার স্তুতি করে বলছেন-তুমি শুদ্ধ স্বরূপা, এই সর্ব সংসার তোমার থেকে উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমি (বিষ্ণু) ব্রহ্মা আর শংঙ্কর আমরা সকলে তোমার কৃপাতেই বিদ্যামান। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) আর তিরোভাব (মৃত্যু) হয়। অর্থাৎ আমরা তিন দেবই নাশবান একমাত্র তুমিই নিত্য (অবিনাশী) জগত জননী প্রকৃতি দেবী।

ভগবান শঙ্কর বলেন হে দেবী! যদি মহাভাগ বিষ্ণু তোমার থেকে উৎপন্ন হয় তাহলে তার পর উৎপন্ন হওয়া ব্রহ্মা ও তোমারই পুত্র। আর তমোগুনী লীলা করা শঙ্কর কি তোমার পুত্র নয়? অর্থাৎ আমাকেও তুমি উৎপন্ন করেছ।

বিচার করুণ – উপরোক্ত বিবরণ থেকে (সিদ্ধ) প্রমাণিত হয় যে শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিব নাশবান অর্থাৎ অবিনশ্বর নয়। মৃত্যুঞ্জয় (অজর অমর) সর্বেশ্বর নয়, এই তিন দেব দূর্গার (প্রকৃতি) পুত্র কাল ব্রহ্ম (কাল-সদাশিব) এদের পিতা।

তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা ১২৫-এ শ্রী ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করেন, হে মাতা! বেদে যে ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। সে আপনি না অন্য কোন প্রভু? তার উত্তরে দূর্গা বলে আমি ও ব্রহ্ম একই। আর এই স্কন্দে অধ্যায় ৬ পৃষ্ঠা ১২৯-এ বলেছে এখন আমার কার্য সিদ্ধি করার জন্য বিমানে বসে তোমরা শীঘ্র যাও। কোন কঠিন কাজ উপস্থিত হলে আমাকে স্মরণ করিও আমি সামনে প্রকট হয়ে যাব। দেবতাগণ আমার (দূর্গার) ও ব্রহ্মের ধ্যান সর্বদা করতে থাকবে। আমাদের দুই জনের স্মরণ করতে থাকলে তোমাদের কার্য সিদ্ধির জন্য তিল মাত্র সন্দেহ থাকবে না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় প্রমাণ হয় যে, দূর্গা (প্রকৃতি) এবং ব্রহ্ম (কাল) এই তিন দেবতার মাতা - পিতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নাশবান ও পূর্ণ শক্তি যুক্ত নয়। এই তিন দেবের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, শ্রী শিবের) বিবাহও মাতা দূর্গা দেন (প্রকৃতি দেবী) পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯-এ তৃতীয় স্কন্দে।

গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক ১২

যে চ, এব সাত্বিকাঃ ভাবাঃ রাজসাঃ, তামসাঃ চ, যে,

মতঃ এব, ইতি তান্, বিদ্ধি, ন, তু অহম্, তেষু, তে, ময়ি॥

অনুবাদ :- (চ) আর (এব) ও (যে) যে (সাত্বিকাঃ) সতগুণ বিষ্ণু থেকে স্থিতি (ভাবাঃ) ভাবা হয় আর (যে) যে (রাজসাঃ) রজ গুন ব্রহ্মা থেকে উৎপত্তি (চ) তথা (তামসাঃ) তমোগুণ শিব থেকে সংহার হয় (তান্) ওই সব (মতঃএব) আমার দ্বারা সুনিয়োজিত নিয়ম অনুসারেই হয় (ইতি) এমন (বিদ্ধি) জান (তু) কিন্তু বাস্তবে (তেষু) ইহাতে (আহম্) আমি আর (তে) সে (ময়ি) আমার মধ্যে (ন) নেই।

"পবিত্র শিব মহাপুরাণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

(কাল ব্রহ্ম ও দূর্গা থেকে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের উৎপত্তি)

পবিত্র শ্রী শিব পুরাণ গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত। অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার। অধ্যায় ৬ রুদ্র সংহিতা পৃষ্ঠা নং ১০০ তে বলেছে যে, মূর্তি রহিত পরব্রহ্ম, তাঁর মূর্তি ভগবান সদাশিব। সদা শিবের শরীর থেকে এক শক্তি বের হয়, ওই শক্তিকে অম্বিকা, প্রকৃতি (দুর্গা) ত্রিদেব জননী (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবকে উৎপন্ন করা মাতা) বলা হয়। তার ৮ (ভুজা) হাত আছে। ওই কাল ব্রহ্মকে সদা শিব, শিব, শম্ভু আর মহেশ্বরও বলা হয়। (পৃষ্ঠা নং ১০১) সে নিজের সমস্ত শরীরে, ভস্ম মাখিয়ে রাখে। ওই কাল রূপী ব্রহ্ম এক শিবলোক নামক ক্ষেত্রের নির্মাণ করেন। সেখানে পতি পত্নির ব্যবহার করে এক পুত্রের উৎপন্ন করেন। তার নাম বিষ্ণু রাখে। (শিব পুরাণ পৃষ্ঠা নং ১০২)

আবার রুদ্র সংহিতা অধ্যায় নং ৭ পৃষ্ঠা নং ১০৩ – এ ব্রহ্মাজী বলেছেন যে, আমার উৎপত্তি শ্রী ভগবান সদাশিব (ব্রহ্ম/কাল) ও প্রকৃতির (দুর্গা) সংযোগে অর্থাৎ পতি - পত্নীর ব্যবহারে হয়েছিল, পরে আমাকে অজ্ঞান করে রাখে।

রুদ্র সংহিতা অধ্যায় নং ৯ পৃষ্ঠা নং ১১০ এ বলা হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতায় গুণ আছে। কিন্তু শিবকে (কাল-ব্রহ্ম) গুণাতীত বলা হয়েছে।

এই সকল প্রমাণে সিদ্ধ হয় যে, সদা শিব (কাল-ব্রহ্ম) ও প্রকৃতির (দূর্গা) থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়। এই তিন ভগবানের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিব) মা- দূর্গা দেবী তথা পিতা শ্রী জ্যোতি নিরাঞ্জন (ব্রহ্ম)। এই তিন প্রভু তিন গুণযুক্ত রজগুণ- ব্রহ্মা, সত্বগুণ – বিষ্ণু, তমোগুণ – শিব।

"পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবদ গীতায় সৃষ্টি রচনার প্রমাণ "

পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩ থেকে ৫ পর্যন্ত ব্রহ্ম (কাল) বলেছে প্রকৃতি (দুর্গা) আমার স্ত্রী (পত্নী)। আমি ব্রহ্ম (কাল) দূর্গার পতি। আমাদের দুই জনের সংযোগে সর্ব প্রাণী (সহিত) ও তিন গুনের (রজগুণ – ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ – বিষ্ণু – তমোগুণ শিব) উৎপত্তি হয়। আমি (ব্রহ্ম) সকল (সর্ব) প্রাণীর পিতা ও প্রকৃতি (দুর্গা) তাদের মাতা। আমি প্রকৃতির উদরে বীজ স্থাপন করি, ইহাতে সমস্ত প্রানীর উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি (দুর্গা) থেকে উৎপন্ন তিন গুন (রজগুন – ব্রহ্মা, সত্বগুণ – বিষ্ণু ও তমোগুণ – শিব) জীবকে কর্মের আধারে শরীরে বেঁধে রাখে। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ তথা ১৬,১৭, তে আছে।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ১

উর্দ্ধমূলম, অধঃশাখম্, অশ্বত্থম্, প্রহুঃ অব্যয়ম্

ছন্দাসি, যস্য, পর্ণানি, যঃ তম্ বেদ, সঃ বেদবিত্॥

অনুবাদ:- (উর্দ্ধমূলম) উপরে পূর্ণ পরমাত্মা আদি পুরুষ পরমেশ্বর রূপী শিকড় (অধঃশাখম্) নীচে তিন গুণ অর্থাৎ রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব রূপী শাখা যুক্ত (অব্যয়ম্) অবিনাশী (অশ্বত্থম্) বিস্তারিত অশ্বত্থের বৃক্ষ আছে। (যস্য) যার (ছন্দাসি) যেমন বেদে ছন্দ (ভাগ) আছে–এমন সংসার রূপী বৃক্ষের ছোট - ছোট ভাগের ডাল ও (পর্ণানি) পাতা (প্রাহুঃ) বর্নিত আছে (বলা হয়) (তম্) ওই সংসার রূপী বৃক্ষকে (যঃ) যে (বেদ) বিস্তারিত ভাবে জানে (সঃ) সেই (বেদবিত্) পূর্ণ জ্ঞানী অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ২

অধঃ চ, উর্ধ্বম্, প্রসৃতা: তস্য, শাখা: গুণ প্রবৃদ্ধাঃ

বিষয়প্রবালা: অধঃ চ মুলানি, অনুসন্ততানি, কর্মনুবন্ধীনি, মনুষ্যলোকে॥

অনুবাদ :- (তস্য) ওই বৃক্ষের (অধঃ) নীচে (চ) আর (উধ্বর্ম) উপরে (গুণপ্রবৃদ্ধাঃ) তিন গুণের-ব্রহ্মা-রজগুণ, বিষ্ণু-সত্বগুণ-শিব-তমোগুণ রূপী (প্রসৃতা) বিস্তারিত (বিষয়প্রবালাঃ) বিকার-কাম-ক্রোধ, মোহ, লোভ, অহংকার রূপী মোটা (শাখাঃ) ডাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব (কর্মনুবন্ধীনি) জীবকে কর্মের বাঁধনে বাঁধার (মুলানি) মূল শিকড় অর্থাৎ মূখ্য কারণ (চ) তথা (মনুষ্যলোকে) মানব লোকে অর্থাৎ পৃথিবী লোকের (অধঃ) নীচে নরক ও (উধর্বম) উপরে স্বর্গ লোক ইত্যাদি চুরাশি লাখ যোনিতে (অনুসন্ততানি) ব্যবস্থিত করে।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ৩

ন, রুপম্, অস্য, ইহ, তথা, উপলভ্যতে, ন, অন্তঃ, ন, চ,

আদিঃ ন, চ সম্প্রতিষ্ঠা, অশ্বত্থম্, এনম, সুবিরুঢ়মূলম, অসংগশাস্ত্রেণ, দৃঢ়ন, ছিত্বা॥

অনুবাদ:- (অস্য) এই রচনার (ন) না (আদিঃ) শুরু (চ) তথা (ন) না (অন্তঃ) অন্ত (শেষ) (ন) না (তথা) ওই রূপ (রূপম্) স্বরূপ (উপলভ্যাতে) পাওয়া যায় (চ) তথা (ইহ) এখানে বিচারকালে অর্থাৎ আমার দ্বারা দেওয়া গীতা জ্ঞানে পূর্ণ ভাবে জানা আমারও (ন) নেই। (সম্প্রতিষ্ঠা) কারন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রচনার বিষয়ে আমি ভালোভাবে জানি না। (এনম্) এই (সুবিরুঢ়মূলম্) ভাল ভাবে স্থায়ী স্থিতি যুক্ত (অশ্বত্থম) মজবুত স্বরূপ যুক্ত সংসার রূপী বৃক্ষের জ্ঞানকে (অসংডগশাস্ত্রেন) পূর্ণ জ্ঞান রূপী (দৃঢ়ন) দৃঢ় সূক্ষ্ম বেদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা (ছিত্বা) কেটে অর্থাৎ নিরঞ্জনের ভক্তিকে ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণ ভঙ্গুর মেনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্ম তথা পরব্রহ্ম থেকেও আগে পূর্ণ ব্রহ্মের খোঁজ করা দরকার।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ৪

ততঃ পদম্ তৎ পরিমার্গিতব্যাম্, যস্মিন্, গতাঃ ন, নিবর্তন্তি, ভূয়ঃ

তম্, এব, চ, আদ্যম্, পুরুষম্, প্রপদ্যে, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা, পুরাণী॥

অনুবাদ :- যখন তত্ত্বদর্শী সন্ত খোঁজ পাওয়া যাবে (ততঃ) তারপরে (তৎ) ওই পরমাত্মার (পদম) পরমপদ বা স্থান অর্থাৎ সতলোকের (পরিমার্গিতব্যম্) ভালভাবে খোঁজ করা দরকার (যস্মিন্) যেখানে (গতাঃ) যাওয়ার পর সাধক আর (ভূয়ঃ) এই সংসারে (ন, নিবর্তান্তি) ফিরে আসে না। (চ) আর (যতঃ) যে পরমাত্মা পরম অক্ষর ব্রহ্ম থেকে (পুরাণী) আদি (প্রবৃতিঃ) রচনার - সৃষ্টি (প্রসৃতা) উৎপন্ন হয়েছে (তম্) অজ্ঞাত (অধ্যম) আদি যম অর্থাৎ আমি কাল নিরঞ্জন (পুরুষম্) পূর্ণ পরমাত্মার (এব) ই (প্রপদ্যে) শরণে আছি তথা তাঁরই পূজা করি।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬

দ্বৌ, ইমৌ, পুরুষৌ, লোকে ক্ষর, চ অক্ষরঃ এব, চ,

ক্ষর: সর্বানি, ভুতানি, কুটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্চতে॥

অনুবাদ :- (লোকে) এই সংসারে (দ্বৌ) দুই প্রকারের (পুরুষ) ভগবান আছে এক (ক্ষর) নাশবান (চ) আর এক (অক্ষরঃ) অবিনাশী (পুরুষঃ) ভগবান (এব) এই রূপ (ইমৌ) এই দুই প্রভুর লোকে (সর্বানী) সম্পূর্ণ (ভূতানি) প্রাণীর শরীর (ক্ষর) নাশবান (চ) আর (কুটস্থ) জীব আত্মাকে (অক্ষরঃ) অবিনাশী (উচ্চতে) বলা হয়।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ১৭

উত্তমঃ পুরুষঃ, তু, অন্যঃ পরমাত্মা, ইতি, উদাহৃতঃ।

যঃ লোকত্রয়ম্ আবিশ্য, বিভর্তি, অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ॥

অনুবাদ :- (উত্তমঃ) উত্তম (পুরুষঃ) প্রভু (তু) তো (অন্যঃ) উপরোক্ত দুই প্রভু 'ক্ষর পুরুষ তথা অক্ষর পুরুষ' থেকেও অন্য (ইতি) তাকে বাস্তবে (পরমাত্ম) পরমাত্মা (উদাহৃতঃ) বলা হয় (যঃ) তিনি (লোকত্রয়ম্) তিন লোকে (আবিশ্য) প্রবেশ করে (বিভর্তি) সকলের ধারন পোষণ করেন। তিনিই (অব্যয়ঃ) অবিনাশী (ঈশ্বরঃ) ঈশ্বর (প্রভুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সামর্থ্য প্রভু)।

ভাবার্থ :- গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু বলেছেন যে, এই সংসারকে উল্টানো বৃক্ষের মত মনে করো। উপরে শিকড় (মূল) তো পূর্ণ পরমাত্মা। নিচে ডাল আদি অন্য ভাগ। এই সংসার রূপী বৃক্ষের প্রত্যেক ভাগের (ভিন্ন-ভিন্ন) পৃথক-পৃথক বিবরণ যে সন্ত জানে সে তত্ত্বদর্শী সন্ত যাঁর বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪-এ বলেছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ২-৩ এ এতটাই বলেছে যে তিন গুণ রূপী শাখা আছে। এই বিচার কালে অর্থাৎ গীতাতে আমি তোকে (গীতা জ্ঞানদাতা) সম্পূর্ণ ভাবে বলতে বা জানাতে পারব না কারণ এই সংসারের রচনার আদি অন্তের জ্ঞান আমার জানা নেই। সেই জন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪-এ বলেছে কোন তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে থেকে ওই পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান জান। গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক ১-এ ওই তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি ওই সংসার রূপী বৃক্ষের প্রত্যেক ভাগের জ্ঞান করাবেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোকে ৪-এ বলেছে ওই তত্ত্বদর্শীর সাক্ষাতের পর ওই পরম পদ পরমেশ্বরের খোঁজ করা দরকার অর্থাৎ ওই তত্ত্বদর্শী সন্তের কথা অনুসার সাধনা করা দরকার যাতে পূর্ণ মোক্ষ (অনাদি মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তে স্পষ্ট করে বলেছে যে

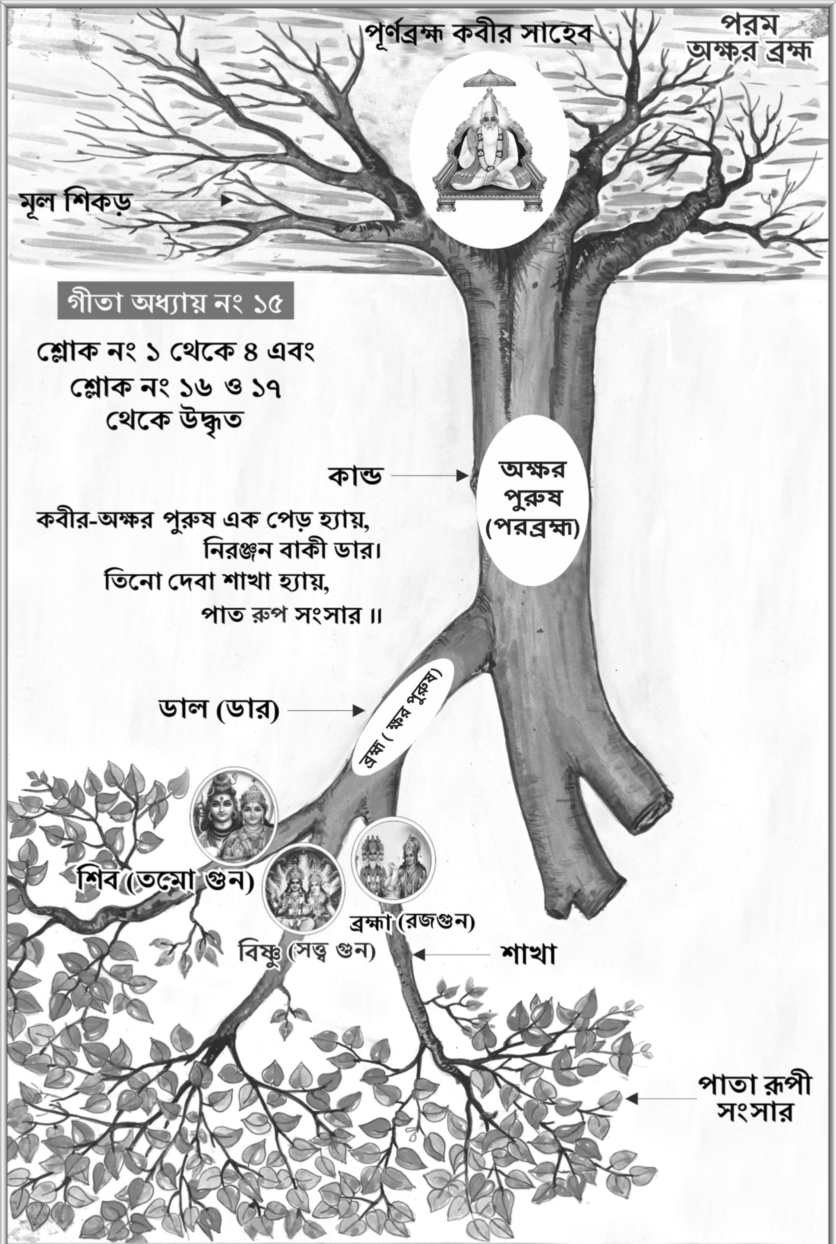

এই সংসার হল, উল্টো বৃক্ষের মত যেমন – উপরে মূল (শিকড়)
নীচে শাখা (ডাল বা পাতা) রূপী বৃক্ষের চিত্র

এই সংসারে তিন প্রভু আছে, এক ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ (পর ব্রহ্ম) তৃতীয় পরম অক্ষর পুরুষ (পূর্ণব্রহ্ম) ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ বাস্তবে অবিনাশী নয়। অবিনাশী পরমাত্মা তো এই দুই জন থেকে অন্য। তিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ ও পোষণ করেন।

উপরোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ তথা ১৬ -১৭ তে এটা প্রমাণিত হয় যে, উল্টো ঝোলানো সংসার রূপী বৃক্ষের মূল অর্থাৎ শিকড় তো পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম। সেখান থেকে সমস্ত বৃক্ষের পালন পোষণ হয়। বৃক্ষের যে অংশ পৃথিবীর (মাটির উপর) বাইরে থাকে তাকে (তানা) কাণ্ড বলা হয়। একে অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) বলা হয়। ওই কাণ্ডের উপর থেকে যে মোটা ডাল বের হয় তাঁর এক ডাল ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষরপুরুষ । ওই ডাল থেকে অন্য তিন শাখা (ডাল) কে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব মনে করো এবং শাখার (ডালের) পরে পাতা রূপে সাংসারিক প্রাণীদের মনে করো। উপরোক্ত গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক ১৬ -১৭ তে স্পষ্ট করে দিয়েছে, ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) এবং অক্ষর পুরুষের (পরব্রহ্ম) দুই লোকে যত প্রাণী আছে তাদের স্থুল শরীর নশ্বর এবং জীবাত্মা অবিনশ্বর। অর্থাৎ উপরোক্ত দুই প্রভু ও তাদের অন্তর্গত সর্ব প্রাণী নশ্বর। অক্ষর পুরুষকে অবিনশ্বর বললেও বাস্তবে (আসলে) অবিনশ্বর নয়। অবিনশ্বর তো পূর্ণ পরমাত্মা এই দুই ভগবান থেকে আলাদা। তিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের পালন পোষণ করেন। উপরোক্ত বিবরণে তিন প্রভুর পৃথক পৃথক বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

"পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কুরাণ শরীফে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কোরআন শরীফের প্রমাণ:- কোরআন শরিফে পবিত্র বাইবেলেরও জ্ঞান আছে। এই জন্য এই দুই পবিত্র সদ্গ্রন্থ মিলে মিশে প্রমাণিত করেছে কে এবং কেমন সৃষ্টির রচনহার এবং তার বাস্তবিক নাম কি।

পবিত্র বাইবেলের (উৎপত্তি গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং২ এ, অ. ১ : ২০ - ২ঃ ৫ এ)

ষষ্ঠ দিন:- প্রাণী আর মানুষ ঃ

অন্য প্রাণীদের সৃষ্টি করেন (২৬), পরমেশ্বর বলেন। আমি মানুষকে নিজের স্বরূপে নিজের সমতুল্য বানিয়েছি। যে সর্ব প্রাণীদের অধীনে রাখবে ২৭, তখন পরমেশ্বর মানুষকে নিজের মত (স্বরূপে) উৎপন্ন করেন। নর আর নারী রূপে মানুষকে সৃষ্টি করেন।

২৯, প্রভু মানুষের খাওয়ার জন্য বীজযুক্ত ছোট-ছোট গাছ ও গাছের ফল প্রদান করেন। (মাছ, মাংস ইত্যাদি খেতে বলে নি)

সপ্তম দিন:- বিশ্রামের দিনঃ

পরমেশ্বর ষষ্ঠ দিনে সর্ব সৃষ্টির উৎপন্ন করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন।

পবিত্র বাইবেলে প্রমাণ করে দিয়েছে যে পরমাত্মা মানব সাদৃশ্য (শরীর যুক্ত)। তিনি ছয় দিনে সর্ব সৃষ্টি রচনা করে সপ্তম দিন বিশ্রাম করেন।

পবিত্র কোরআন শরিফ (সুরত ফুকার্নি ২৫, আয়ত নং ৫২, ৫৮, ৫৯)

আয়ত ৫২ :- ফলা তুতিঅল্, কাফিরণ ও জহিদহুম বিহী জিহাদন কবীরা (কবীরন)॥৫২॥

এর ভাবার্থ এই যে, হজরত মুহম্মদের খুদা (প্রভু) বলছেন যে, হে পৈগম্বর! তুমি কাফিরদের (যে এক প্রভুর ভক্তি ত্যাগ করে অন্য দেবী- দেবতাদের মূর্তি পুজা করে) কথা শুনবে না, কারণ ওই লোকেরা কবীরকে পূর্ণ পরমাত্মা মানে না। তুমি আমার দ্বারা দেওয়া এই কোরআন জ্ঞানের আধারে অটল থাকবে যে, কবীরই পূর্ণ প্রভু। তথা কবীর আল্লার (ভগবানের) জন্য সংঘর্ষ করবে, (ঝগড়া করবে না) অর্থাৎ কোরআনের জ্ঞানে অটল থাকবে ঝগড়া করবে না।

আয়ত ৫৮ :- ব্ তবক্কাল্ অলল্,-হরিল্লজী লা যমুতু ওয় সব্বিহ্ বিহম্দিহী ওয় কফা বিহী বিজুনুবি অইবাদিহী খবীরা (কবীরা) ॥ ৫৮॥

ভাবার্থ :- হজরত মহম্মদ যাকে প্রভু মানে সেই আল্লাহ (প্রভু) অন্য কোন প্রভুর দিকে ঈশারা করে বলেছেন, হে পৈগম্বর ! ওই কবীর পরমাত্মার উপর বিশ্বাস রাখো, যে জিন্দা মহাত্মা রূপে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল। তিনি কখনো মরেন না। অর্থাৎ বাস্তবে (আসলে) তিনি'ই অবিনাশী। প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্র মহিমার (পাকী) গুনগাণ করে যাও, ওই কবীর আল্লা (কবীরদেব) পূজার যোগ্য। তিনি উপাসকের সর্ব পাপের বিনাশক।

আয়ত ৫৯ :- অল্লজী খলকসসমাবাতি বলঅর্জ ব্ -মা বৈনহুমা ফী সিওতি অথ্যমিন্ সুম্মস্তবা অললঅর্শি অরহমানু ফসতল বিহী খবীরন্ (কবীরন্) ॥ ৫৯॥

ভাবার্থঃ- হজরত মহম্মদের কোরআন শরিফ বলা প্রভু (আল্লা) বলছেন, এই কবীর প্রভু, সেই প্রভু, যিনি মাটি থেকে আকাশের মধ্যে যা কিছু বিদ্যামান আছে সেই সব কিছুর রচনা ছয় দিনে করে, সপ্তম দিনে উপরের সতলোকে সিংহাসনের উপরে বিরাজমান হন। তাঁর বিষয়ে কোন তত্ত্বদর্শী (বাখবর) সন্তকে জিজ্ঞাসা করো। ওই পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি কিভাবে হবে তা আমি জানি না। তাঁর বিষয়ে কোন তত্ত্বদর্শী (বাখবর) সন্তকে জিজ্ঞাসা করো।

উপরোক্ত দুই পবিত্র ধর্মের (ইসাই ও মুসলমান) পবিত্র শাস্ত্র মিলে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সর্ব সৃষ্টির রচনহার, সর্ব পাপ বিনাশক, সর্ব শক্তিমান, অবিনাশী পরমাত্মার মানব সদৃশ্য শরীরে আছে। তিনি সতলোকে থাকেন। তাঁর নাম কবীর তাকে আল্লাহু অকবিরুও বলা হয়। শ্রদ্ধেয় ধর্মদাস, পুজ্য কবীর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন–হে সর্ব শক্তিমান! আজ পর্যন্ত এই তত্ত্বজ্ঞান আমাকে কেউ বলেনি। বেদ বিশেষজ্ঞরাও বলেননি। এই থেকে প্রমাণিত হয় চার পবিত্র বেদ এবং চার পবিত্র পুস্তক (কোরআন শরিফ, ইত্যাদি) মিথ্যা। পূর্ণ পরমাত্মা বলেছেন :–

কবীর, বেদ কতেব ঝুঠে নহীঁ ভাঈ, ঝুঠে হৈঁ যো সমঝে নাহিঁ।

ভাবার্থ :- চার পবিত্র বেদ (ঋগ্বেদ- অথর্ববেদ-যজুর্বেদ-সামবেদ) ও পবিত্র গ্রন্থ কখনো (কোরআন শরিফ,জবুর-তৌরাত-ইঞ্জিল) মিথ্যা নয়, কিন্তু যে বুঝতে পারেনি সে জ্ঞানহীন অবুঝ।

"পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের (কবির দেব) অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ।"

বিশেষ :- নিম্নের অমৃতবাণী সন ১৪০৩ থেকে {যখন পূজ্য কবির্দেবের (কবির পরমেশ্বর) লীলাময় শরীরের বয়স পাঁচ বৎসর হয়েছিল} ১৫১৮ পর্যন্ত {কবীর পরমেশ্বর মগহর নামক স্থান থেকে সশরীরে সতলোক গমন করেন} প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর তাঁর নিজের সেবক ধর্মদাস সাহেবকে বলেন। ধনী ধর্মদাস সাহেব সেই বাণী লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু ওই সময়ের পবিত্র হিন্দু ও পবিত্র মুসলমানদের অবুঝ (নিম হাকিম) ধর্ম গুরুরা বলতেন, ধানক (তাঁতি) কবীর মিথ্যাবাদী। কোন সদ্‌গ্রন্থে শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের মাতা পিতার নাম নেই। এই তিন প্রভু অবিনশ্বর এদের জন্ম-মৃত্যু হয় না। পবিত্র বেদ বা পবিত্র কোরান শরিফে কবীর পরমেশ্বরের কোন প্রমাণ নেই। পরমাত্মা নর-আকৃতি লেখা আছে, আমরা প্রতিদিন পড়ি। সহজ সরল আত্মারা ওই বিচক্ষণদের (চতুর গুরুদের) উপর বিশ্বাস করে যে, সত্যিই তো কবীর তাঁতী অশিক্ষিত এবং গুরুদেব শিক্ষিত, এটা তো সত্য। কিন্তু আজ প্রকাশ্যে আসছে, আমাদের সকল পবিত্র ধর্ম ও পবিত্র সদ্‌গ্রন্থ সাক্ষী। এতে প্রমাণিত হয় পূর্ণ পরমেশ্বর, সর্ব সৃষ্টির রচনহার, সর্বকুলের কর্তা এবং সর্বজ্ঞ কবীরদেব। (কবীর পরমেশ্বর) তিনি কাশীর (বেনারস) লহরতারা দীঘিতে কমল ফুলের (পদ্ম ফুল) উপর প্রকট হয়ে ১২০ বৎসর পর্যন্ত বাস্তবিক তেজময় শরীরে উপর মানব সদৃশ্য অল্প তেজ যুক্ত শরীর নিয়ে সৃষ্টির জ্ঞান সঠিক ভাবে বর্ণনা করে সশরীরে সতলোকে চলে যান।

কৃপা করে পাঠকগন! পড়ুন কবীর সাহেব দ্বারা উচ্চারিত অমৃত বাণী :-

ধর্মদাস য়হ জগ বৌরানা। কোই ন জানে পদ নিরবানা ॥ ১ ॥
য়হী কারণ মৈঁ কথা পসারা। জগসে কহিয়ো রাম নিয়ারা ॥
য়হী জ্ঞান জগ জীব সুনাও। সব জীবোঁ কা ভরম নশাও ॥ ২ ॥
ভরম গয়ে জগ বেদ পুরাণা। আদি রাম কা ভেদ ন জানা ॥ ৩ ॥
রাম রাম সব জগত বখানে। আদি রাম কোঈ বিরলা জানে ॥ ৪ ॥
জ্ঞানী সুনে সো হিরদৈ লগাঈ। মূর্খ সুনে সো গম্য না পাই ॥ ৫ ॥
অব মৈঁ তুমসে কহুঁ চিতাঈ। ত্রিদেবন কী উৎপত্তি ভাঈ ॥৬ ॥
কুছ সংক্ষেপ কহুঁ গৌহরাঈ। সব সংশয় তুম্হরে মিট জাঈ ॥ ৭ ॥
মাঁ অষ্টাঙ্গী পিতা নিরঞ্জন। বে জম দারুন বংশন অঞ্জন ॥ ৮ ॥
পহিলে কীন্হ নিরঞ্জন রাঈ। পিছে সে মায়া উপজাঈ ॥ ৯ ॥
মায়া রূপ দেখ অতি শোভা। দেব নিরঞ্জন তন মন লোভা ॥ ১০ ॥
কামদেব ধর্মরায় সতায়ে। দেবী কো তুরতহী ধর খায়ে ॥১১ ॥
পেট সে দেবী করী পুকারা। সাহব মেরা করো উবারা ॥ ১২ ॥
টের সুনি তব হম তহাঁ আয়ে। অষ্টাঙ্গী কো বন্দ ছুড়ায়ে ॥ ১৩ ॥

সতলোক মে কিন্হা দুরাচারি, কাল নিরঞ্জন দিন্হা নিকারি॥ ১৪॥
মায়া সমেত দিয়া ভগাই, যোলহ সঙ্খ কোস দুরী পর আঈ॥ ১৫॥
অষ্টাঙ্গী ঔর কাল অব দোঈ, মন্দ কর্ম সে গয়ে বিগোঈ॥ ১৬॥
ধর্মরায় কো হিকমত কীন্হা। নখ রেখা সে ভগকর লীন্হা॥১৭॥
ধর্মরায় কিন্হা ভোগ বিলাসা। মায়া কো রহী তব আসা॥ ১৮॥
তিন পুত্র অষ্টাঙ্গী জায়ে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম ধরায়ে॥ ১৯॥
তীন দেব বিস্তার চলায়ে। ইনমে য়হ জগ ধোকা খায়ে॥ ২০॥
পুরুষ গম্য কৈসে কো পাবৈ। কাল নিরঞ্জন জগ ভরমাবৈ॥২১॥
তীন লোক আপনে সুত দীন্হা। সুন্ন নিরঞ্জন বাসা লিন্হা ॥ ২২॥
অলখ নিরঞ্জন সুন্ন ঠিকানা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভেদ ন জানা॥ ২৩॥
তীন দেব সো উনকো ধাবেঁ। নিরঞ্জন কা বে পার না পাবেঁ॥ ২৪॥
অলখ নিরঞ্জন বড়া বটপারা। তীন লোক জিব কীন্হা অহারা॥২৫॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নহী বঁচায়ে। সকল খায় পুন ধুর উড়ায়ে॥ ২৬॥
তিনকে সুত হৈঁ তিনো দেবা। আধঁর জীব করত হৈঁ সেবা॥ ২৭॥
অকাল পুরুষ কাহু নহীঁ চীন্হাঁ। কাল পায় সবহি গহ লীন্হাঁ॥২৮॥
ব্রহ্ম কাল সকল জগ জানে। আদি ব্রহ্ম কো না পহিচানে॥ ২৯॥
তিনোঁ দেব ঔর ঔতারা। তা কো ভজে সকল সংসারা॥ ৩০॥
তিনোঁ গুণকা য়হ বিস্তারা। ধর্মদাস মৈঁ কহোঁ পুকারা॥ ৩১॥
গুণ তিনো কি ভক্তি মেঁ, ভুল পরো সংসার।॥৩২॥
কহৈ কবীর নিজ নাম বিন, কৈসে উতরৈঁ পার॥৩৩॥

উপরোক্ত অমৃত বাণীতে কবীর পরমেশ্বর নিজ সেবক শ্রী ধর্মদাস সাহেবকে বলেছেন! হে ধর্মদাস এই সকল সংসার তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিচলিত। কেউ পূর্ণ মোক্ষ মার্গ এবং পূর্ণ সৃষ্টি রচনার জ্ঞান জানে না। এই জন্য আমি তোমাকে আমার দ্বারা সৃষ্টির কথা শোনাচ্ছি। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাড়াতাড়ি (তুরন্ত) বুঝে যাবে। কিন্তু সর্ব প্রমাণ দেখেও যারা মানবে না তাঁরা কালের প্রভাবে প্রভাবিত। সে ভক্তি করার যোগ্য নয়। এখন আমি বলছি তিন ভগবানের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? এদের মাতা অষ্টাঙ্গী (দূর্গা) এবং পিতা জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম, কাল)। প্রথমে ডিমের থেকে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়। পরে দূর্গার উৎপত্তি হয়। দূর্গার রূপে আকৃষ্ট (আসক্ত) হয়ে কাল (ব্রহ্ম) ভুল করে ছেড় - ছাড় (অসভ্য আচরন) করে তখন দুর্গা (প্রকৃতি) কালের পেটে শরণ নেয়।

আমি ওখানে গিয়ে (যেখানে কাল জ্যোতি নিরঞ্জন ছিল) ভবানী (দূর্গাকে) কে ব্রহ্মের (কাল) পেট থেকে বের করে একুশ ব্রহ্মাণ্ড সহ ১৬ শঙ্খ কোস দূরে পাঠিয়ে দিই। জ্যোতি নিরঞ্জন (ধর্মরায়) প্রকৃতি দেবীর সাথে ভোগ বিলাস করে। এই দুই জনের

সংযোগে ত্রিগুণের (শ্রী ব্রহ্মা রজগুন, শ্রী বিষ্ণু সত্ত্ব গুন, শ্রী শিব তমোগুন) উৎপত্তি হয়। এই তিন গুণের সাধনা করে সকল প্রাণী কালের জালে ফেঁসে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আসল (বাস্তবিক) মন্ত্র পাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মোক্ষ কি ভাবে হবে?

বিশেষ:- প্রিয় পাঠক বিচার করুণ, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু শ্রী শিবের স্থিতি অবিনাশী বলেছিল। সর্ব হিন্দু সমাজ আজ পর্যন্ত তিন দেবকে অজর অমর, বা জন্ম - মৃত্যু রহিত মনে করে আসলে এই তিন জনই নশ্বর। এদের পিতা কাল রূপী ব্রহ্ম ও মাতা দূর্গা (প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী)। আপনারা পূর্বে যে প্রমাণ পড়েছেন সেই জ্ঞান আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যমান। কিন্তু হিন্দু সমাজের কলিযুগের গুরু, ঋষি সন্তদের এই সত্য জ্ঞান নেই। যে অধ্যাপক পাঠ্যক্রমের সিলেবাসের সাথে পরিচিত নয় সেই অধ্যাপক ঠিক নয়। বিদ্যার্থীদের ভবিষ্যতের শত্রু। সেইরূপ যে গুরু এখনও পর্যন্ত জানেন না ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের মাতা পিতা কে? সেই গুরু, ঋষি, সন্ত জ্ঞান হীন। এই অজ্ঞানীরা সর্ব ভক্ত সমাজকে শাস্ত্রবিধি বিরুদ্ধ জ্ঞান লোক বেদের আধারে বা (দন্ত কথা বা শোনা কথার আধারে দিয়ে) অজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভক্তি সাধনা করিয়ে সহজ-সরল ভক্তদের মানব জন্ম নষ্ট (খারাপ) করছে। কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪-তে প্রমাণ আছে যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিজ ইচ্ছায় পূজা করলে তাতে কোন লাভ হয় না। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেব ৫ বৎসরের লীলাময় শরীরে সন্ ১৪০৩ থেকেই সর্ব শাস্ত্রের জ্ঞান নিজের অমৃতবাণীতে (কবির বাণীতে) বলা আরম্ভ করেন। কিন্তু ওই অজ্ঞানী গুরুরা সেই জ্ঞানকে ভক্ত সমাজ পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি। যা বর্তমানে স্পষ্ট হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মাই তত্ত্বদর্শী সন্ত রূপে কাশীতে কবীর রূপে এসেছিলেন।

"আদরনীয় গরীবদাস সাহেবের অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

আদি রমৈঁণী (সদ গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং ৬৯০ থেকে ৬৯২ পর্যন্ত)

আদি রমৈঁণী অদলী সারা। জা দিন হোতে ধুন্ধুঁকারা ॥ ১ ॥
সত্পুরুষ কিন্হা প্রকাশা। হম হোতে তখত্ কবীর খবাসা ॥২॥
মন মোহিনী সিরজী মায়া। সত্পুরুষ এক খ্যাল বনায়া॥ ৩ ॥
ধর্মরায় সিরজে দরবাণী। চৌষঠ জুগতপ সেবা ঠাঁনী ॥ ৪ ॥
পুরুষ পৃথিবী জাকুঁ দীন্হী। রাজ করো দেবা আধীনী ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ড ইকীস রাজ তুম্হ দীন্হা, মন কী ইচ্ছা সব জুগ লীন্হা ॥ ৬ ॥
মায়া মূল রূপ এক ছাজা। মোহি লীয়ে জিনহুঁ ধর্মরাজা ॥ ৭ ॥
ধর্ম কা মন চঞ্চল চিত ধারয়া। মন মায়া কা রূপ বিচারা ॥ ৮ ॥
চঞ্চল চেরী চপল চিরাগা। য়া কে পরসে সরবস জাগা ॥ ৯ ॥
ধর্মরায় কিয়া মন কা ভাগী। বিষয় বাসনা সঙ্গ সে জাগী ॥ ১০॥
আদি পুরুষ অদলি অনরাগী। ধর্মরায় দিয়া দিল সেঁ ত্যাগী ॥ ১১ ॥
পুরুষ লোক সেঁ দিয়া ঢহাহী। অগম দ্বীপ চলি আয়ে ভাঈ ॥ ১২॥

সহজ দাস জিস দীপ রহন্তা। কারণ কৌঁন কৌঁন কুল পন্থা ॥ ১৩॥
ধর্মরায় বোলে দরবানী। সুনো সহজ দাস ব্রহ্মজ্ঞানী ॥ ১৪॥
চৌসঠ জুগ হম সেবা কীন্হী পুরুষ পৃথিবী হম কুঁ দীন্হী ॥ ১৫॥
চঞ্চল রূপ ভয়া মন বৌরা। মনমোহিনী ঠগিয়া ভৌরা ॥ ১৬॥
সত্‌পুরুষ কে না মন ভায়ে। পুরুষ লোক সে হম চলি আয়ে ॥ ১৭॥
আগর দীপ সুনত বড়ভাগী। সহজ দাস মেটো মন পাগী ॥ ১৮॥
বোলে সহজদাস দিল দানী। হম তো চাকর সত্‌ সহদানী ॥ ১৯॥
সত্‌ পুরুষ সে অরজ গুজারুঁ। জব তুমহারা বিবাণ উতারু ॥২০ ॥
সহজ দাস কো কীয়া পীয়ানা। সত্যলোক লীয়া প্রবানা। ॥ ২১॥
সতপুরুষ সাহিব সরবংগী। অবিগত অদলী অচল অভঙ্গী ॥ ২২॥
ধর্মরায় তুম্হরা দরবানী। অগর দ্বীপ চলি গয়ে প্রাণী ॥ ২৩॥
কৌন হুকম করী অরজ অবাজা। কহাঁ পঠাবৌ উস ধর্মরাজা ॥২৪॥
ভই অবাজ অদলি এক সাচা। বিষয় লোক জা তীন্যুঁ বাচা ॥ ২৫॥
সহজ বিমাঁন চলে অধিকাঈ। ছিন মেঁ অগর দ্বীপ চলি আঈ ॥ ২৬॥
হামতো অরজ করী অনরাগী। তুম্হ বিষয় লোক জাবো বড়ভাগী ॥ ২৭ ॥
ধর্মরায় কে চলে বিমানা। মানসরোবর আসে প্রানা ॥ ২৮ ॥
মানসরোবর রহন ন পায়ে। দরৈ কবীরা থাঁনা লায়ে ॥২৯॥
বংকনাল কি বিষমী বাটী। তহাঁ কবীরা রোকী ঘাটী ॥৩০॥
ইন পাঁচো মিলি জগত বন্ধানা। লখ চৌরাশী জীব সঁতানা ॥ ৩১॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মায়া। ধর্মরায় কা রাজ পঠায়া ॥ ৩২ ॥
যৌহ খোকা পুর ঝুঠী বাজী। ভিসতি বৈকুণ্ঠ দগাসী সাজী ॥৩৩।
কৃতিম জীব ভুলাঁনেঁ ভাই। নিজ ঘর কী তো খবরি ন পাঈ ॥ ৩৪ ॥
সবা লাখ উপজে নিত হন্সা, এক লাখ বিনশে নিত অন্সা ॥ ৩৫ ॥
উপতি খপতি প্রলয় ফেরী। হর্ষ শোক জৌরা জম জেরী ॥৩৬ ॥
পাচোঁ তত্ব হৈ প্রলয় মাঁহী। সত্বগুণ রজগুণ তমগুণ ঝাঁই ॥ ৩৭ ॥
আঠোঁ অঙ্গ মিলি হৈ মায়া। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সকল ভরমায়া॥৩৮ ॥
যা মেঁ সুরতি শব্দ কি ডোরী। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড লগী হৈ খোরী॥৩৯॥
শ্বাসা পারস মন গহ রাখো ॥ খোল্হি কপাট অমীরস চাখো॥ ৪০॥
শুনাউঁ হংস শব্দ সুন দাসা। অগম দ্বীপ হৈ অগ হৈ বাসা ॥ ৪১ ॥
ভবসাগর জম দণ্ড জমানা। ধর্মরায় কা হৈ তলবাঁনা ॥ ৪২ ॥
পাচোঁ উপর পদ কি নগরী। বাট বিহঙ্গম বংকী ডগরী॥ ৪৩॥

হমরা ধর্মরায় সোঁ দাবা। ভবসাগর মেঁ জীব ভরমাবা ॥ ৪৪ ॥
হম তো কহৈ অগম কি বাণী। জহা অবিগত অদলী আপ বিনানী ॥ ৪৫ ॥
বন্দী ছোড় হমারা নামম। অজর অমর হৈ অস্থীর ঠামম্ ॥ ৪৬ ॥
জুগন জুগন হম কহতে আয়ে। জম জৌঁরা সেঁ হন্স ছুটায়ো ॥ ৪৭ ॥
জো কোই মানে শব্দ হমারা। ভবসাগর নহীঁ ভরমেঁ ধারা ॥ ৪৮ ॥
যা মেঁ সুরতি শব্দ কা লেখা। তন অন্দর মন কীন্হী দেখা ॥ ৪৯ ॥
দাস গরীব অগম কী বাণী। খোজা হংসা শব্দ সহদানী ॥ ৫০ ॥

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ :- আদরণীয় গরীবদাস সাহেব বলছেন যে প্রথম এখানে অন্ধকার ছিল এবং পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেব সত্যলোকে সিংহাসনের উপর বিরাজমান ছিলেন। আমরা ওখানের চাকর ছিলাম। প্রথমে পরমাত্মা জ্যোতি নিরঞ্জনকে উৎপন্ন করেন। পরে তার তপের প্রতিফলে একুশ ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করেন তার পরে মায়া (প্রকৃতি) উৎপত্তি করেন। যুবতী দুর্গার রূপে মুগ্ধ (মোহিত) হয়ে জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) দুর্গার ইজ্জত নেওয়ার চেষ্টা করে। ব্রহ্ম তার শাস্তি পায়। ব্রহ্ম (জ্যোতিনিরঞ্জন) কে সত্যলোক থেকে বের করে অভিশাপ দেন যে, এক লাখ মানব শরীরধারী, প্রাণী প্রতিদিন আহার করবে এবং সওয়া লাখ উৎপন্ন করবে। এখানে সর্ব প্রাণী জন্ম মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করছে। যদি কেউ পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক আসল শব্দ (সত্য নাম) জপ মন্ত্র আমার থেকে প্রাপ্ত করে, তাহলে তাকে কালের (বন্দী) কারাগার থেকে মুক্ত করে দেব। আমার নাম বন্দীছোড়। গরীব দাস নিজের গুরু তথা প্রভু কবীর পরমাত্মার আধারে বলেছেন, সচ্চে (সত্য) মন্ত্র অর্থাৎ সতনাম ও সার শব্দ প্রাপ্ত করুণ। পূর্ণ মোক্ষ হয়ে যাবে। তা না হলে নকল নাম দাতা সন্ত মহন্তের মিষ্টি কথায় ফেঁসে শাস্ত্র বিধি রহিত সাধনা করে কাল জালে থেকে যাবে। এবং কষ্টের উপর কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।

গরীবদাসজী মহারাজের বাণী -

মায়া আদি নিরঞ্জন ভাঈ, অপনে জায়ে আপৈ খাঈ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চেলা, ওঁম সোহম কা হৈ খেলা। ৩৭ ॥
সিখর সুন্ন মেঁ ধর্ম অন্যায়ী, জিন শক্তি ডায়েন মহল পঠাঈ ॥
লাখ গ্রাসৈ নিত উঠ দুতী, মায়া আদি তখত্ কী কুতী ॥ ৩৮ ॥
সওয়া লাখ ঘড়িয়ে নিত ভাণ্ডে, হন্সা উত্পতি পলয় ডাণ্ডে।
এ তিনোঁ চেলা বট পারী, সিরজে পুরুষা সিরজী নারী ॥ ৩৯ ॥
খোকাপুর মেঁ জীব ভুলায়ে, স্বপনা নরক বৈকুন্ঠ বানায়ে।
যো হরহট কা কুয়া লোই, য়া লগ বন্ধ্যা হৈ সব কোঈ ॥ ৪০ ॥
কিড়ী কুঞ্জর আউর অবতারা, হরহট ডোরি বন্ধে কঈ বারা।
অরব অলীল ইন্দ্র হুয়ে হৈঁ ভাই, হরহট ডোরি বন্ধে সব আঈ। ৪১ ॥
শেষ মহেশ গণেশ্বর তাঈ, হরহট ডোরি বন্ধে সব আঈ।

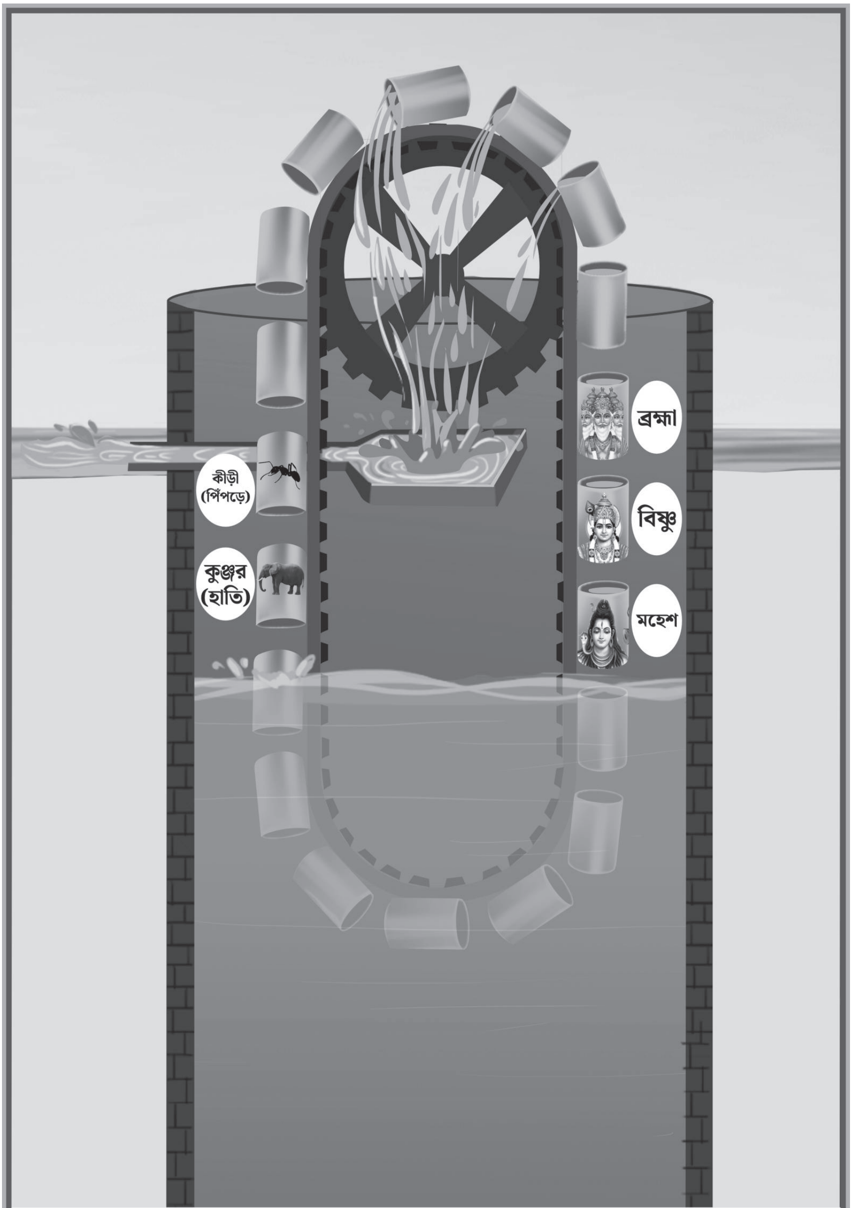

য়োহ হরহট কা কুঁয়া লোই, যা গল বন্ধা হে সব কই ।
কীড়ী কুঞ্জর ওর অবতারা, হরহট ডোরী বন্ধে কই বারা ।।

কাল লোকে জন্ম-মৃত্যু রূপী চক্র (হরহট)

শুক্রাদিক ব্রহ্মাদিক দেবা, হরহট ডোরি বন্ধে সব খেবা॥

কোটিক কর্তা ফিরতা দেখ্যা, হরহট ডোরি কহু সুন লেখা ॥ ৪২॥

চতুর্ভুজী ভগবান কহাবৈ, হরহট ডোরি বন্ধে সব আবৈ॥

য়ো হৈ খোখাপুর কা কুয়া, যা মেঁ পড়া সো নিশ্চয় মুবা। ৪৩ ॥

জ্যোতি নিরঞ্জনের (কালবলীর) বশ (অধীন) হয়ে এই তিন দেবতা (রজগুণ ব্রহ্মা সত্ত্বগুণ - বিষ্ণু, তমোগুণ - শিব) নিজের মহিমা দেখিয়ে জীবকে স্বর্গ নরকের ভব সাগরে (চুরশি লাখ যোনিতে) ঘুরাতে থাকে জ্যোতি নিরঞ্জন মায়ার দ্বারা নাগিনীর মত জীবকে জন্ম দেয় আর পরে মেরে খায়। নাগিনী যে ভাবে নিজের শরীর দিয়ে ডিমের চারিদিকে কুণ্ডলী বানিয়ে রাখে। পরে ওই ডিমের উপর নিজেই ফনা মারে, যার ফলে ডিম ফেটে যায় এবং সেখান থেকে বাচ্চা বেরিয়ে পরে। তাদেরকে নাগিনী খেয়ে ফেলে। ফণা মারার সময় একাধিক ডিম ভেঙে যায় কারণ নাগিনী এক সাথে অনেক ডিম দেয়।

যদি কোন বাচ্চা কুণ্ডলীর (সর্পিনীর দুমের ঘেরা) বাইরে চলে যায়, তাহলে সে বাচ্চা বেঁচে যায়। তা-না হলে কুণ্ডলিতেও (নাগিনী) ছাড়ে না, যত বাচ্চা ওই কুণ্ডলীর ভিতরে থাকে সকলকে খেয়ে ফেলে। যে সাধক ব্রহ্ম (কাল ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন দেবী দূর্গা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য দেবতার দের ভক্তিতে সীমিত আছে, তারা কালব্রহ্ম রূপী নাগিনীর কুণ্ডলীতে অর্থাৎ জন্ম মরণের চক্রতে কাল লোকে থেকে যায়, যাদের কে কাল জ্যোতি নিরঞ্জন খায়।

'মায়া কালী নাগিনী আপনে জায়ে খাত। কুণ্ডলী মে ছোড়ে নহীঁ সৌ বাতোঁ কী বাত' ॥

এই রূপ কালের জাল। গুরু থেকে নাম নিয়ে নিরঞ্জন পর্যন্ত ভক্তি করলে নিরঞ্জনের কুণ্ডলীর (২১ ব্রহ্মাণ্ড) বাইরে আসতে পারবে না। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, আদিমায়া শেরাওয়ালীও নিরঞ্জনের কুণ্ডলীর মধ্যে রয়েছে। এ বেচারা অবতার ধারণ করে আসে আর জন্ম - মৃত্যুর চক্র কাটতে থাকে। এই জন্য বিচার করুন, সোহং জপ যা ধ্রুব ও প্রহল্লাদ ও শুকদেব ঋষি জপে ছিল তারাও পার হতে পারেনি। কারণ শ্রী বিষ্ণু পুরাণের প্রথম অংশ অধ্যায় ১২ শ্লোক ৯৩ পৃষ্ঠা ৫১-তে লেখা আছে যে ধ্রুব কেবল এক কল্প কাল অর্থাৎ এক হাজার চতুর্যুগ পর্যন্ত মুক্ত। এই জন্য তিনি কাল লোকেই আছেন। (ওঁম নমঃ ভাগবতে বাসুদেবায়) মন্ত্র জপ করা ভক্তরা কৃষ্ণ পর্যন্ত ভক্তি করে, তারাও চুরাশী লক্ষ যোনির চক্র থেকে বাঁচতে পারবে না। পরম পূজ্য কবীর সাহেব ও গরীব দাস সাহেবের অমৃত বাণীতে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

অনন্ত কোটি অবতার হৈ, মায়া কে গোবিন্দ। কর্তা হো হো অবতরে, বহুর পড়ে জম ফন্দ॥

সত্পুরুষ কবীর সাহেবের ভক্তিতেই জীবের পূর্ণ মুক্তি হবে। জীব যতক্ষণ সতলোকে ফিরে যাবে না ততক্ষণ এই রূপ কর্ম করতে হবে আর দান ধর্মের পূন্য ফল স্বর্গ রূপী হোটেলে খরচ করে পূনরায় কর্মের আধারে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে থাকবে। মায়া দূর্গা থেকে উৎপন্ন হয়ে কোটি কোটি গোবিন্দ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) মৃত্যুকে প্রাপ্ত করেছে। ভগবানের অবতার হয়ে এসেছিলেন আর কর্মের বন্ধনে বদ্ধ হয়ে কর্মের আধারে লক্ষ চুরাশিতে চলে গিয়েছেন। যেমন দেবর্ষি নারদের অভিশাপ বিষ্ণুকে লেগেছিল। তিনি শ্রী রামচন্দ্র রূপে অযোধ্যায় আসেন।

শ্রীরাম রূপে বালিকে বধ করেন। ওই কর্মদণ্ড ভোগের জন্য কৃষ্ণের অবতার হয়। বালির আত্মা শিকারী হয়ে জন্ম নেয় এবং নিজের প্রতিশোধ নেয়। শ্রী কৃষ্ণের পায়ে বিষাক্ত তীর মেরে বধ করে। মহারাজ গরীব দাস নিজ বাণীতে বলেছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মায়া ঔর ধর্মরায় কহিয়ে।
ইন পাচোঁ মিল পরপঞ্চ বনায়া, বাণী হমরী লহিয়ে॥
ইন পাঁচো মিল জীব অটকায়ে, জুগন-জুগন হম আন ছুটায়ে।
বন্দী ছোড় হমারা নামম, অজর অমর হৈ অস্থির ঠামম॥
পীর পেগম্বর কুতুব ঔলিয়া, সুর নর মুনিজন জ্ঞানী।
য়েতা কো তো রাহ ন পায়া, জমকে বন্ধে প্রাণী॥
ধর্মরায় কী ধূমা-ধামী, জম পর জংগ চালাউঁ।
জোরা কো তো জান ন দুঙ্গা, বান্ধ অদল ঘর ল্যাউঁ॥
কাল অকাল দোহু কো মোসুং মহাকাল সির মুণ্ডু ॥
মৈঁ তো তখত হুজুরী হুকুমী, চোর খোঁজ কুঁ ঢুণ্ঢু ॥
মূলা মায়া মগ মেঁ বৈঠী, হংসা চুন-চুন খাঈ।
জ্যোতি স্বরূপী ভয়া নিরঞ্জন, মৈঁ হী কর্তা ভাঈ॥
সহঁস অঠাশী দীপ মুণীশ্বর, বন্ধে মুলা ডোরী।
এত্যাঁ মেঁ জম কা তলবানা, চলিয়ে পুরুষ কীশোরী॥
মুলা কা তো মাথা দাঙ্গু, সত কী মোহর করুঙ্গা।
পুরুষ দীপ কুঁ হন্স চলাউঁ, দরা ন রোকন দুংগা॥
হাম তো বন্দী ছোড় কহাবাঁ, ধর্মরায় হৈ চকবৈ।
সতলোক কী সকল সুনাবাঁ, বাণী হমরী অখবৈ॥
নৌ লখ পট্টন উপর খেলুঁ, সহদরে কুঁ রোকুঁ।
দ্বাদশ কোটি কটক সব কার্টু, হন্স পঠাউঁ মোখুঁ ॥
চৌদহ ভূবন গমন হৈ মেরা, জল থল মেঁ সরবংগী।
খালিক খলক খলক মেঁ খালিক, অবিগত অচল অভংগী॥
অগর অলীল চক্র হৈঁ মেরা, জিত সে হম চল আয়ে।
পাচোঁ পর প্রবাণা মেরা, বন্ধি ছুটাবন ধায়ে॥
জহাঁ ওঁকার নিরঞ্জন নাঁহী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু দেব নহীঁ জাহীঁ।
জহাঁ করতা নহীঁ কাল ভগবানা, কায়া মায়া পিণ্ড ন প্রাণা।
পাঁচ তত্ত্ব তিনোঁ গুণ নাহীঁ, জোরা কাল দীপ নহীঁ জাহীঁ।
অমর করুঁ সতলোক পাঠাঁউ, তাতে বন্দী ছোড় কহাউঁ॥

কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) - এর মহিমায় আদরনীয় গরীব দাস সাহেব বলেছেন আমার প্রভু কবির (কবির্দেব) বন্দী ছোড় আছেন। বন্দীছোড় এর ভাবার্থ - কালের কারাগার থেকে ছাড়ানো। কাল ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব প্রাণী পাপের

বন্ধনে বাঁধা আছে। পূর্ণ পরমাত্মা (কবির্দেব) কবীর সাহেব ওই পাপকে নাশ করে মুক্ত করে দেন। ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কেউ-ই পাপ নাশ করতে পারে না। যেমন কর্ম তেমনই ফল দেয়। এই জন্য যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ৩২ এ লেখা আছে। ‘কবিরংঘারিরসি’= (কবীর) কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)(অজ্ঘ অরি) পাপের শত্রু, ‘বম্ভারিরসি’ = (বম্ভারিঃ) বন্ধনের (অরি) শত্রু অর্থাৎ বন্ধনের শত্রু অর্থাৎ বন্দিছোড়।

এই পাঁচ জনের (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মায়া-আর ধর্মরায়) উপরে সত্ পুরুষ পরমাত্মা (কবির্দেব)। তিনি অবিনশ্বর সত্ লোকের মালিক। পর ব্রহ্ম-ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, আদি মায়া এরা নাশবান। মহাপ্রলয়ে এই দেবতাগন তথা এদের সর্বলোক সমাপ্ত হয়ে যাবে। এদের আয়ু সাধারণ জীব থেকে অনেক হাজার গুণ লম্বা। কিন্তু যে সময় নির্ধারিত আছে তা একদিন অবশ্যই পূর্ণ হবে। শ্রদ্ধেয় গরীব দাস মহারাজ বলেছেন:-

শিব ব্রহ্মা কা রাজ, ইন্দ্র গিনতী কহাঁ। চার মুক্তি বৌকুণ্ঠ সমঝ যেতা লহ্মা॥

সংখ জুগন কী জুনী, উম্র বড় ধারিয়া। জা জননী কুর্বান, সু কাগজ পারিয়া॥

যেতী উম্র বুলন্দ মরৈগা অন্ত রে। সদগুরু লগে ন কান, ন ভৈটে সন্ত রে॥

শঙ্খ যুগ লম্বা আয়ু হলেও এক দিন না এক দিন মরতে হবে। যদি সত্পুরুষ পরমাত্মা (কবীরদেব) কবীর সাহেবের প্রতিনিধি পূর্ণ সন্ত (গুরু) যে তিন নামের মন্ত্র (যাতে এক ওঁম্ + তৎ + সৎ সংকেতিক) দেন তথা ওই সন্ত যদি নাম দান করার আদেশ দেন তাহলে তাঁর থেকে উপদেশ নিয়ে নামের কামাই করে আমরা সতলোকের অধিকারী হংস হতে পারি। সত্য সাধনা ছাড়া বহু লম্বা আয়ু কোন কাজে আসবে না কারন জ্যোতি নিরাঞ্জনের লোকে দুঃখই দুঃখ।

কবীর, জীবনা তো থোড়া হী ভলা, জৈ সত্ সুমিরন হোয়।

লাখ বর্ষ কা জীবনা, লেখৈ ধরৈ না কোয়॥

যদি সত্যসাধনা করা হয় তাহলে অল্প আয়ুই ভাল যদি সত্য সাধনা সৎপুরুষের না হয় কাল ব্রহ্মের বা দেব দেবীদের পূজা করে অথবা প্রণায়াম ইত্যাদি করে দীর্ঘায়ু যুক্ত ব্যক্তির কোন লেখা (Account) মোক্ষ মার্গে থাকবে না। এতো বেশি আয়ু (শঙ্করের মতো) পাওয়া গেলেও একদিন মৃত্যু অবশ্যই হবে। ভুল ভক্তিতে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকেই যাবে। এই রকম আয়ুর লাভ কি?

কবীর সাহেব নিজেই (পূর্ণ ব্রহ্মের) নিজের পরিচয় দিয়েছেন, উপরের অসংখ্য হাতযুক্ত পরমাত্মা সত্পুরুষ, তিনি সত্যলোকে (সচ্চ খণ্ড, সতধাম) থাকেন এবং তার অন্তর্গত সর্বলোক (যেমন - ব্রহ্ম বা কালের ২১ ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তির (দূর্গা) লোক ও পর ব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড ও অনান্য সর্ব ব্রহ্মাণ্ড)। সত্যনাম ও সারনামের জপ পূর্ণ গুরু থেকে প্রাপ্ত করে সাধনা করলে ওই সতলোকে যাওয়া যাবে। সচ্চখণ্ডে (সতলোক) যে আত্মারা চলে যায় তাদের পুণরায় জন্ম হয় না।

সত্ পুরুষ (পূর্ণব্রহ্ম) কবীর সাহেব (কবির্দেব) অন্য লোকেও ভিন্ন - ভিন্ন নামে বিরাজমান আছেন। যেমন, অলখ লোকে অলখ পুরুষ, অগম লোকে অগমপুরুষ ও অকহলোকে অনামী পুরুষ রূপে বিরাজমান। এই - সব পরমাত্মার উপমাত্মক নাম। কিন্তু ওই পূর্ণ পুরুষ - এর আসল (বাস্তবিক নাম) নাম কবির্দের (ভাষা ভিন্ন কবীর সাহেব)

“আদরনীয় নানক সাহেবের অমৃতবাণীতে সৃষ্টি রচনার সংকেত”

শ্রী নানক সাহেবের অমৃতবাণী, মহলা ১, রাগ বিলাবলু, অংশ ১ (গু, গ্র, পৃ: ৮৩৯)

আপে সচু কীআ কর জোড়ি। অংডজ ফোড়ি জোডি বিছোড়॥

ধরতী আকাশ কীয়ে বৈসণ কউ থাউ। রাতি দিনতু কীয়ে ভউ-ভাউ॥

জিন কীয়ে করি বেখনহারা। (৩)

ত্রিতীয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেসা। দেবী দেব উপায়ে বেসা॥ (৪)

পড়ন পানী আগনী বিসরাউ। তাহী নিরঞ্জন সাচো নাউ॥

তিসু মহি মনুয়া রহিয়া লিও লাই। প্রণবতি নানকু কালু ন খাঈ॥ (১০)

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ – সত্য পরমাত্মা (সতপুরুষ) স্বয়ং নিজের হতে সর্ব সৃষ্টির রচনা করেছেন। তিনি ডিম বানিয়ে পরে ভাঙেন তাঁর থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন বের হয়। ওই পূর্ণ পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীর থাকার জন্য পৃথিবী, আকাশ, পবন, প্রাণী, পাঁচতত্ত্ব রচনা করেন। নিজের দ্বারা সৃষ্টির সাক্ষী তিনি নিজে দেন। অন্য কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারে না। ডিম থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন বের হওয়ার পরে, তিন দেব, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের উৎপত্তি হয় এবং অন্য দেবী দেবতাদের উৎপত্তি হয় এবং অগণিত জীবের উৎপত্তি হয়। তাঁরপরে শুরু হয় অন্য দেবী দেবতাদের জীবন চরিত্র। এর পরে মুনি ঋষিদের অনুভবের ছয় শাস্ত্র ও আঠারো পুরান তৈরি হয়। পূর্ণ পরমাত্মার সত্যনামের (সতনাম) সাধনা অনন্য মনে করলে এবং গুরু মর্যাদায় থেকে করলে তাদের কালে খায় না, এটা নানক দেবের বাণীতে বিদ্যমান।

রাগ মারু (অংশ) অমৃতবাণী মহলা ১ (গু.গ্র.পৃ. ১০৩৭)

সুনহু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেসু উপায়ে। সুনে বরতে যুগ সবায়ে॥

ইসু পদ বিচারে সো জনু পুরা। তিস মিলিয়ে ভরমু চুকাইদা।

সাম বেদু, রুগু জুজরু অথরবণু। ব্রহ্মমে মুখ মাই হৈ ত্রেগুণ॥

তা কী কীমত কহি ন সকৈ। কো তিউ বোলে জিউ বুলাইদা॥

উপরোক্ত অমৃতবাণীর সারাংশ - যে সন্ত পূর্ণ সৃষ্টির রচনা শোনাবেন এবং বলবেন , ডিম দুই ভাগ হয়ে কে বেরিয়েছে ? পরে কে ব্রহ্ম লোকের শুন্যে অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপত্তি করেছেন এবং সেই পরমাত্মা কে? যিনি ব্রহ্মের (কাল) মুখ দিয়ে চার বেদের (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ) এর উচ্চারণ করিয়েছেন। পূর্ণ পরমাত্মা যেমন চায় তেমনই প্রত্যেক প্রাণীর মুখ দিয়ে বলাতে পারেন। এই সকল জ্ঞানকে জানা সন্তের কাছে যাও, যিনি সর্ব শঙ্কার (সন্দেহের) পূর্ণ সমাধান করে দেবেন, কারন তিনি পূর্ণ সন্ত অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত।

শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ৯২৯, অমৃত বাণীতে শ্রী নানক সাহেবের রাগ রামকলী মহলা ১. দক্ষণী ঔওঁকার

ঔওঁকারি ব্রহ্ম উতপতি। ঔওঁকারু কীয়া জিনি চিত। ঔওঁকারি সৈল জুগ ভয়ে। ঔওঁকারি বেদ নিরময়। ঔওঁকারি সবদি উধরে। ঔওঁকারি গুরুমুখি তরে। ওনম অখর সনহু বীচারু। ওনম অখরু ত্রিভবন সারু।

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে শ্রী নানক সাহেব বলছেন যে, ওঁ - কার অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে। কয়েক যুগ আনন্দ - ফূর্তি করার পর ওঁ কার (ব্রহ্ম) বেদের উৎপত্তি করে যা পরে ব্রহ্মার প্রাপ্তি হয়। তিন লোকে ভক্তি

করার একমাত্র বিধান ওঁ কার জপ। এই ওঁম শব্দ পূর্ণ সন্ত থেকে উপদেশ নিয়ে অর্থাৎ গুরু ধারন করে জপ করলে উদ্ধার হয়।

বিশেষ - শ্রী নানক সাহেব তিন মন্ত্র (ওঁম - তত্ - সত) - এর বিবরণ রহস্যময় ভাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। তা একমাত্র পূর্ণ সন্তই বুঝতে পারেন এবং তিনি তিন মন্ত্রের জপও উপদেশিকে বোঝান। (পৃ: ১০৩৮)

উত্তম সতিগুরু পুরুষ নিরালে, সবদি রতে হরি রস মাতবালে।

রিধি, বুধি, সিধি, গিয়ান গুরু তে পাইয়ে, পুরে ভাগ মিলাঈদা ॥১৫॥

সতিগুরু তে পায় বিচারা, সুন সমাধি সতে ঘরবারা।

নানক নিরমল নাদু সবদ ধুনি, সচু রামৈঁ নামি সমাইদা ॥ (১৭)

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ :- যে বাস্তবিক জ্ঞান দেওয়া সদগুরু তো অন্যই হন, তিনি একমাত্র নাম জপ করান, অন্য কোন হঠযোগ সাধনার কথা বলেন না। যদি আপনাদের ধন-দৌলত, পদ, বুদ্ধি বা ভক্তি শক্তি দরকার হয়, তাহলে তা ভক্তি মার্গের দ্বারা পূর্ণ সন্তই প্রদান করাবেন। এমন পূর্ণ সন্ত বড় ভাগ্য থাকলে পাওয়া যায়। ওই পূর্ণ সন্তই বিস্তারিত বর্ণনা করবেন এই যে, "পরমেশ্বরই উপরের শূন্যে (আকাশে) আমাদের আসল বাড়ি (সতলোক) বানিয়ে রেখেছেন। ওখানে একমাত্র সারনামের ধুন (শব্দ-আওয়াজ) চলতে থাকে। ওই আনন্দময় অবিনাশী পরমেশ্বরকে সারশব্দ দ্বারা প্রাপ্ত করে অর্থাৎ বাস্তবিক (আসল) আনন্দময় স্থান প্রাপ্ত করে আমরা বসবাস করতে পারি।" অন্য নাম অথবা অজ্ঞানী গুরু দ্বারা এটা সম্ভব নয়।

আংশিক অমৃতবাণী মহলা পহলা (শ্রী গু.গ্র.পৃ: ৩৫৯-৩৬০)

শিব নগরী মহি আসনি বৈসউ কলপ ত্যাগী বাদম্। (১)

সিঙ্গী সবদ সদা ধুনি সোহৈ অহিনিসি পুরৈ নাদম্। (২)

হরি কীরতি রহ রাসি হমারী গুরু মুখ পন্থ অতীতম্ (৩)

সগলী জ্যোতি হমারী সংমিয়া নানা বরণ অনেকম্।

কহ নানক সুনি ভরথরী জোগী পারব্রহ্ম লিব একম্। (৪)

উপরোক্ত বাণীর ভাবার্থ :- শ্রী নানক সাহেব বলেছেন, হে ভরথরী যোগী আপনার সাধনা ভগবান শিব পর্যন্ত। তাই আপনি শিব নগরীতে (শিব লোকে) স্থান পেয়েছেন। শরীরে যে সিঙ্গী শব্দ ইত্যাদি শোনা যায় তা ওই শরীর কমলে টেলিভিশনের মত প্রত্যেক দেব লোকের দৃশ্য ওখানে দেখা বা শোনা যায়।

আমি এক পরমাত্মায় অর্থাৎ সব থেকে উপরে যে পরমাত্মা আছে, অনন্য মনে সেই পরমাত্মায় ধ্যান লাগাই।

আমি লোক দেখানো (ভস্ম লাগানো, হাতে লাঠি বা তিলক লাগানো ইত্যাদি সাজ) সিঙ্গার করি না। আমি সব প্রানীকে এক পরমাত্মার সন্তান মনে করি। সব কিছু ওই শক্তিতে চলমান, আমার মুদ্রা তো সত্যনামের জপ, যা সত্গুরু থেকে প্রাপ্ত করতে হয়। ক্ষমা করা আমার বেশ ভুষা। আমি পূর্ন পরমাত্মার উপাসক। এটা পূর্ন সত্ গুরুর দেওয়া ভক্তি মার্গ।

অমৃতবানী রাগ আসা মহলা ১ (গুরুগ্রন্থ-পৃ ৪২০)

॥ আসা মহলা ১ ॥ জিনী নামু বিসারিয়া দুজে ভরমি ভুলাই। মুলু ছোড়ি ডালি লগে

কিয়া পাবহি ছাঈ॥১ ॥ সাহিবু মেরা এ-কুহৈ অবরু নহীভাই। কৃপাতে সুখু পাইয়া সাচে পরথাই ॥ ৩॥ গুরু কি সেবা সো করে জিসু আপি করায়। নানক সিরু দে ছুটি ঐ দরগহ পতি পায়॥ ৪ ॥

উপরোক্ত বাণীর ভাবার্থ :- শ্রী নানক সাহেব বলেছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মার আসল নাম ভুলে অন্য ভগবানের নামের জপে ভ্রমিত হয়ে অর্থাৎ মূলকে ছেড়ে (পূর্ন পরমাত্মা কবিদেব) ডালে জল দিচ্ছে (তিনগুন রজগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু, তমোগুন শিব)। এই সাধনায় কোন সুখ হবে না অর্থাৎ গাছ শুকিয়ে যাবে।গাছের ছায়ায় বসতেও পারবে না। কারন শাস্ত্র বিধি রহিত সাধনা করাই ব্যর্থ এতে কোন লাভ হবে না। প্রমান:- পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩,২৪ এ বর্নিত আছে। ওই পূর্ণ পরমাত্মা কে প্রাপ্তি করার জন্য শাস্ত্র বিধি রহিত মনমর্জী আচরন বন্ধ করে সত্য নামের জপ করতে হবে। তাহলে পূর্ণ মোক্ষ সম্ভব, তা- না হলে নরকে যেতে হবে।

শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৮৪৩, ৮৪৪

॥ বিলাবলু মহলা॥১॥ মৈঁ মন চাহু ঘনা সাচি বিগাসী রাম। মোহি প্রেম পিরে প্রভু অবিনাশী রাম॥ অবিগতো হরি নাথু নাথহ তিসৈ ভবৈ সো থীয়ে। কিরপালু সদা দয়ালু দাতা জীয়া আন্দরি তুং জিয়ে। মৈ আধারু তেরা তু খসমু মেরা মৈ তানু তকীয়া তেরও। সাচি সুচা সদা নানক গুরু সবিদ ঝগরু নিবেরও॥৪॥২॥

উপরোক্ত অমৃত বাণিতে শ্রী নানক সাহেব বলেছেন, অবিনাশী পর্ণ পরমাত্মা নাথেরও নাথ (দেবতাদের ও দেবতা সর্ব প্রভু শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিব, ব্রহ্ম ও পর ব্রহ্ম এদেরও নাথ) অর্থাৎ আমি সত্য নামকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি। হে পরমাত্মা ! আপনি সমস্ত প্রানীর জীবনের আধার। আমি আপনার শ্রী চরনে আশ্রিত, আপনি আমার মালিক। সত্ গুরু রূপে এসে সত্ ভক্তির নির্ণায়ক জ্ঞান দিয়ে, সমস্ত ঝগড়ার সমাধান করে দিয়েছেন বা সমস্ত সন্দেহের সমাধান করে দিয়েছেন।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৭২১, রাগ তিলক মহলা ১)

য়ক অর্জ গুফতম পেশ তো দর কুন করতার।

হক্কা কবীর ক্রীম তু বেএব পরবরদিগার

নানক বুগোয়দ জন তুরা তেরে চাকরাঁ পাখাক॥

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে স্পষ্ট করে দিয়েছে, (হক্কা কবীর) আপনি সত্ কবীর (কুন করতার) শব্দ শক্তি দিয়ে রচনা করা শব্দ স্বরূপী প্রভু অর্থাৎ সৃষ্টির রচনহার। আপনিই (বে এব) নির্বিকার (পরবরদিগার)পালন কর্তা দয়ালু প্রভু, আমি আপনার দাসেরও দাস।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ২৪ রাগ সিরী মহলা ১)

তেরা এক নাম তারে সংসার, ম্যায় য়হা আস য়েহো আধার।

নানক নীচ কহৈ বিচার, ধানক রূপ রহা করতার॥

উপরোক্ত অমৃত বাণীতে প্রমাণ দিচ্ছে যে কাশীতে যে তাঁতী আছে, তিনিই (করতার) সর্ব কুলের মালিক ও সৃজন হার। অতি আধীন হয়ে শ্রী নানক সাহেব বলেছেন, আমি সত্য কথা বলছি ওই ধানক অর্থাৎ তাঁতি কবীরই পূর্ন ব্রহ্ম (সত্ পুরুষ)।

বিশেষ:- উপরোক্ত সংকেতিক জ্ঞানে আমরা জানতে পেরেছি কি ভাবে সৃষ্টির

রচনা হয়েছে? এখন পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি করা দরকার। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা পূর্ন সন্ত থেকে নাম উপদেশ নিয়ে সদভক্তি করবো।

"অন্যান্য সাধু সন্ত দ্বারা সৃষ্টি রচনার দন্ত (প্রচলিত) কথা"

অন্য সন্ত দ্বারা সৃষ্টির যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা কেমন? কৃপা করে নিম্নে পড়ুন অন্য পন্থের মতবাদ :- সৃষ্টির রচনার বিষয়ে রাধার স্বামী পন্থের ও ধন ধন সত্ গুরু পন্থের বিচার।

'পবিত্র পুস্তক জীবন চরিত্র, পরম সন্ত বাবা জয়মল সিংহ মহারাজ' পৃষ্ঠা নং ১০২-১০৩ থেকে সৃষ্টি রচনা:- (সাবন কৃপাল পাব্লিকেশন, দিল্লী) :-

সর্ব প্রথম সত্ পুরুষ নিরাকার ছিলেন, পরে (ইজাহার) আকারে আসেন। উপরের তিন নির্মল মন্ডল (সতলোক, অলখ লোক, অগম লোক) সৃষ্টি করে প্রকাশ ও নাদ - ধুনী সৃষ্টি করেন।

পবিত্র পুস্তক সার বচন (নসর), প্রকাশক :– রাধাস্বামী সত্সঙ্গ সভা, দয়াল বাগ আগরা, সৃষ্টি রচনা পৃষ্ঠা ৮।

সর্ব প্রথম ধুঁ - ধূ কার ছিল। তাতে পুরুষ শূন্য সমাহিত ছিল। তখন কোন রচনা ছিল না। পরে যখন ইচ্ছা হয় তখন শব্দ প্রকট হয়। এই শব্দ থেকে সমস্ত ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি হয়। প্রথমে সত্ লোক, পরে সত্ পুরুষের কলা থেকে তিন লোক এবং অনান্য সমস্ত কিছুর বিস্তার হয়।

এই জ্ঞান এমন যে, এক সময় একটি ছেলে চাকরীর জন্য ইন্টারভিউ দিতে যায় তাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি মহাভারত পড়েছেন, ছেলেটি উত্তর দেয় মহাভারত তো আমার মুঠের মধ্যে আছে। অফিসার ছেলেটিকে প্রশ্ন করে, পাঁচ পান্ডবের নাম বল? ছেলে টি উত্তর দেয়, এক ভীম ছিল, এক তার বড় ভাই, একজন ছোট ছিল, এক জন আরও ছিল, আর এক জনের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। উপরোক্ত সৃষ্টি রচনার জ্ঞানও সেইরূপ।

সত্পুরুষ ও সতলোকের মহিমার পাঁচনাম (ওম্ কার -জ্যোতিনিরঞ্জন- ররংকার- সোহং- সত্ নাম) ও তিন নাম (অকাল মূর্তি - সত্ পুরুষ - শব্দ স্বরূপী রাম) দেওয়া সন্ত দ্বারা রচিত পুস্তকের কিছু নিষ্কর্ষ :-

সন্ত প্রকাশ ভাগ ৩ পৃষ্ঠা ৭৬ এ লেখা আছে যে, "সচ্চখন্ড বা সত্নাম চতুর্থ লোক", ওখানে সত্ নামকে স্থান বলা হয়েছে। ওই পবিত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৭৯ তে লেখা আছে "এক রাম দশরথের পুত্র, দ্বিতীয় রাম মন, তৃতীয় রাম ব্রহ্ম, চতুর্থ রাম সতনাম-ই আসল রাম"। পবিত্র গ্রন্থ সন্ত মত প্রকাশ প্রথম ভাগ পৃষ্ঠা ১৭ তে লেখা আছে, ওই সতলোককে সতনাম বলা হয়। পবিত্র গ্রন্থ সার বচন বার্তিক পৃষ্ঠা ৩ এ লেখা আছে যে, "এখন বোঝা দরকার রাধা স্বামী পদ সব থেকে উচ্চ পদ বা ঘর যাকে সন্তগন সত্ লোক, সচ্চখন্ড, সারশব্দ, সতশব্দ ,সতনাম ও সত্ পুরুষ বলে বর্ণনা করেছে"। পবিত্র সার বচন গ্রন্থ আগরা থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা নং ৪ ও ৩ - এ, এই রকমই বর্ণনা আছে। পবিত্র গ্রন্থ সচ্চখন্ডের সড়ক (রাস্তা) পৃষ্ঠা ২২৬-এ লেখা আছে সাচ্চা খন্ড বা সতলোক সন্তের দেশ। একে সতনাম, সত্ শব্দ, সার শব্দ বলা হয়।

বিশেষ :- উপরোক্ত ব্যাখ্যা এমন যে, কোন ব্যক্তি যে জীবনে কখনো শহর দেখেনি, মোটর গাড়ী চালানো বা পেট্রোল দেখেনি, ড্রাইভার কাকে বলে তাও জানে

না। ওই ব্যক্তি তাঁর অন্য সাথীদের বলে, আমি শহরে যাই, মোটর গাড়ীতে বসে আনন্দ করি। তখন সাথীরা জিজ্ঞাসা করে, মোটর গাড়ী দেখতে কেমন, পেট্রোল, ড্রাইভার ও শহর কেমন? ওই নাদান গুরু উত্তর দেয়, শহর বলো বা মোটর গাড়ী একই কথা, মোটর গাড়ীকেই শহর বলা হয়, পেট্রোলকেও গাড়ী বলা হয়, ড্রাইভার গাড়ীকেও বলা হয়, সড়কও গাড়িকেই বলা হয়।

আসুন বিবেচনা করি- সতপুরুষ তো হলেন পূর্ণ পরমাত্মা, সতনাম হল সেই দুই মন্ত্রের নাম, যার মধ্যে একটি ওঁম + তৎ সাংকেতিক রয়েছে এবং এরপর সারনাম সাধককে পূর্ণ গুরু দ্বারা প্রদান করা হয়। এই সতনাম এবং সারনাম দুটোই সমিরন অর্থাৎ জপ করার নাম। সতলোক সেই স্থান , যেখানে সতপুরুষ থাকেন। পুণ্যাত্মাগণ স্বয়ং নির্ণয় করুন সত্য এবং অসত্যের বিষয়ে।

শাস্ত্রে পরমাত্মার প্রমাণ

প্রশ্ন:- আমাদের সংসারে শাস্ত্র এবং সাধু সন্তরা পরমাত্মার বিষয়ে কি বলেছেন?

উত্তর:- বিশ্বের প্রধান প্রধান শাস্ত্রে এবং সদগ্রন্থের মধ্যে পরমাত্মার বিষয় খুব ভালোভাবে পরিভাষিত করা হয়েছে। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক বিশ্বের প্রধান প্রধান শাস্ত্র সমূহ বা সদগ্রন্থ সমূহ কি কি আছে?

বেদ:- বেদ দুই প্রকার:- ১.সূক্ষ্ম বেদ ২. সাধারণ বেদ।

১. সূক্ষবেদ:- এটি সেই জ্ঞান যা পরমাত্মা স্বয়ং পৃথিবীতে প্রকট হয়ে নিজের মুখ কমলে উচ্চারণ করে বলে থাকেন, এটি সম্পূর্ণ জ্ঞান যুক্ত শাস্ত্র।

প্রমাণ:- ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র নং ২৬-২৭, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮২ মন্ত্র নং ১-৩,ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র নং ১, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৫ মন্ত্র নং ২, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ২০ মন্ত্র নং ১, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র নং ১৬-২০, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৫৪ মন্ত্র নং ৩, যজুর্বেদ অধ্যায় ৯ মন্ত্র নং ১ এবং ৩২, যজুর্বেদ অধ্যায় ২৯ মন্ত্র নং ২৫, অথর্ববেদ কান্ড ৪ অনুবাক ১ মন্ত্র ৭, সামবেদ মন্ত্র সংখ্যা ৮২২

অন্যান্য প্রমাণ:- শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ মন্ত্র ৩২ এর মধ্যেও আছে, ওখানে বলা হয়েছে যে, সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্ম অর্থাৎ সত্য পুরুষ নিজের মুখ কমলের মাধ্যমে বাণী বলে তত্ত্বজ্ঞান বিস্তারিতভাবে বলে থাকেন। কারণ:- পরমাত্মা সৃষ্টির রচনার একেবারে শুরুতে সম্পূর্ণ জ্ঞান ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জন অর্থাৎ কালপুরুষ) হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ছিলেন। (Fax করে দিয়ে ছিলেন) পরমাত্মার দ্বারা নির্ধারিত সময়ে ওই জ্ঞান স্বয়ং কাল পুরুষের নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সমুদ্রের মধ্যে প্রকট হয়ে যায়। কিন্তু কালপুরুষ চালাকি করে এর মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের বিষয়গুলি লুকিয়ে ফেলে। অবশিষ্ট অসম্পূর্ণ জ্ঞান এই সংসারে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ওই জ্ঞানকে চার ভাগে চারটি পৃথক পৃথক বেদ রূপে প্রকাশ করা হয় যা আজ আমাদের সামনে উপস্থিত।

২. সাধারণ বেদ :- এটি সেই আংশিক (অসম্পূর্ণ) জ্ঞান যা ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন অর্থাৎ কাল) তাঁর নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন। এই জ্ঞান অসম্পূর্ণ জ্ঞান। এর মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বার করে নেওয়া হয়েছিল। যা ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল জেনে বুঝে করেছিল এর কারণ ছিল এই যে, "কালপুরুষ" সব সময় ভয়ে থাকে, যাতে কেউ পূর্ণ পরমাত্মার বিষয়ে জ্ঞান না পেয়ে যায়। যদি সংসারের

সকল প্রাণীদের এই পূর্ণ পরমাত্মার বিষয়ে জ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে সবাই এই কালের লোককে ত্যাগ করে পূর্ণ পরমাত্মার লোকে (সত্যলোক = শাশ্বত স্থান) চলে যাবে, যেখানে যাওয়ার পর চিরকালের জন্য জন্ম - মৃত্যুর কষ্ট সমাপ্ত হয় হয়ে যায়। এই জন্য ব্রহ্ম (কাল পুরুষ) পূর্ণ পরমাত্মার পরম পদের বিষয়ে কোনো জ্ঞান বলেনি এমনকি তা নষ্ট করে দিয়েছিল। সেই জ্ঞানের পূর্তি করার জন্য পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং সশরীরে প্রকট হয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান বলে থাকেন এবং নিজেকে প্রাপ্ত করার বাস্তবিক মন্ত্রও তিনি বলে থাকেন, যা কাল ভগবান সমাপ্ত করে দিয়ে অবশিষ্ট অসম্পূর্ণ জ্ঞান সংসারে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই জ্ঞানকে ঋষি জনেরা "বেদ" বলে থাকেন। ঋষি ব্যাসদেব এই "বেদ" লিখেছিলেন এবং একে চার ভাগে বিভক্ত করে দেন।

১. ঋগ্বেদ ২.যজুর্বেদ ৩.সামবেদ ৪.অথর্ববেদ এই চার বেদ বর্তমানে প্রচলিত।

এই চার বেদ এর সারাংশকে কাল পুরুষ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, রূপে শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে স্বয়ং মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধেরপূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন। সেটিও পরবর্তীকালে মহর্ষি ব্যাসদেব তালপাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন যা আজ আমাদের কাছে উপলব্ধ।

সদগ্রন্থের মধ্যে বাইবেলের নামও অন্যতম। বাইবেল :- এটি তিন পুস্তকের মিলিত সংগ্রহ।

১. তৌরেত ২. জবুর ৩. ইঞ্জিল।

বাইবেলের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টির উৎপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে লেখা আছে যে, পরমাত্মা সর্বপ্রথম সৃষ্টি রচনা করেছেন। পরমাত্মা ছয় দিনের মধ্যে পৃথিবী, সূর্য, দিন-রাত, পশু-পাখি, নর-নারী এই সবকিছু রচনা করে সপ্তম দিনে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়ে যান সৃষ্টি রচনার প্রথম অধ্যায়ে ২৬, ২৭-২৮ নং শ্লোকের মধ্যে এটিও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে,পরমাত্মা মানুষকে তাঁর নিজের স্বরূপের মতো উৎপন্ন করেছেন। এই কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মাও মানুষের মত নরাকার।

"বাইবেলে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ"

বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থে লেখা আছে যে, (শ্লোক ২৭-২৮) পরমেশ্বর মানুষকে খাওয়ার জন্য বীজ উৎপাদক উদ্ভিদ (ধান, গম, ছোলা ,বাজরা প্রভৃতি) এবং ফল উৎপাদক বৃক্ষ দিয়ে বলেছেন এগুলি তোমাদের ভোজন। পশু-পাখিদের খাওয়ার জন্যও ঘাস, পাতা যুক্ত ঝোপঝাড় দিয়েছেন এরপর পরমাত্মা তো বিশ্রামের জন্য নিজ ধাম সতলোকে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়ে গিয়েছিলেন, এরপর বাইবেলের মধ্যে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা কাল ভগবান এবং তার পুত্রদের নিজেদের জ্ঞান। যদি বাইবেল গ্রন্থের মধ্যে পরবর্তীকালে মাংস খাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা পূর্ণ পরমাত্মার আদেশ নয়। ওই আদেশ কোন অসম্পূর্ণ প্রভুর আদেশ। পূর্ণ পরমাত্মার (Complete God) আদেশের বিপরীতে চলা অর্থাৎ আদেশ উলঙ্ঘন করলে পাপের ভাগী হতে হয়।

❖ **কোরান শরিফ (মজীদ)** :- বাইবেল গ্রন্থের পরেই শ্রদ্ধার সাথে কোরআন শরিফের নাম নেওয়া হয়ে থাকে। কোরান শরীফের জ্ঞান দাতাও তিনি, যিনি বাইবেল গ্রন্থের জ্ঞান দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি চার বেদ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার

জ্ঞানও দিয়েছেন এই জন্য তিনি বাইবেল ও কোরআন শরীফের মধ্যে চার বেদ ও শ্রীমদম্ভগবদ্ গীতা জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি ঘটায়নি।

❖ **উপনিষদ** :- মোট ১১- টি উপনিষদকে মান্য করা হয়। এই উপনিষদের জ্ঞান সাধারণত কোন ঋষির মতামত বা অনুভব হয়ে থাকে। যদি তাদের ওই অনুভব বা মতামত বেদ বা গীতা জ্ঞানের সাথে না মেলে তাহলে তা ব্যর্থ এবং তা আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। এই জন্য উপনিষদ গুলিকে ছেড়ে আমাদের বেদ এবং গীতার জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত কারণ উপনিষদ গুলি বেশির ভাগ জ্ঞান-ই বেদ এবং গীতা জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান। একইভাবে বাইবেল এবং কোরআন শরিফের জ্ঞানকেও মনে করুন, যদি তা বেদ এবং গীতা জ্ঞানের সাথে না মেলে তাহলে সেগুলিও গ্রহণযোগ্য নয়।

❖ **পুরান** :- বর্তমান মানব সমাজে সর্বমোট ১৮- টি পুরাণের মান্যতা আছে। যদিও এই পুরান গুলির জ্ঞান সমূহকে একই বোধ বলে বিবেচনা করা হয়। এই জ্ঞান সর্বপ্রথম ব্রহ্মা তার নিজের পুত্রদের (দক্ষ প্রভৃতি ঋষিদের) মধ্যে দিয়েছিলেন। রাজা দক্ষ, শ্রী মনু এবং পরাসর প্রভৃতি ঋষিগণ এই জ্ঞান প্রচার করার সময় নিজেদের অনুভব অর্থাৎ মতামত মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবে ১৮ টি ভাগে পুরানের জ্ঞান মান্য করা হয়। এই ১৮ টি পুরাণের জ্ঞানের যে অংশ বেদ এবং গীতা জ্ঞানের সাথে মিল খায় না, তা ত্যাগ করা উচিত। তাই অন্যান্য যে কোন পুস্তকের জ্ঞান যদি বেদ ও গীতা জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান যুক্ত হয়, তাহলে তা ত্যাগ করা উচিত।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে গীতা জ্ঞানদাতা অর্জুনকে বলেছেন যে, হে অর্জুন! তুই সর্বভাবে ওই পরমেশ্বরের (গীতা জ্ঞানদাতা থেকে যিনি ভিন্ন) ,শরণে চলে যা। ওই পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি এবং সনাতন পরম ধাম (সতলোক) প্রাপ্ত করবি। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩২-এ বলেছেন, যে জ্ঞান (সূক্ষ্ম জ্ঞান) স্বয়ং পরমাত্মা নিজ মুখ কমলে বলে শোনান, সেই জ্ঞানকে সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের বাণী বলা হয়। ওই জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে, যার মধ্যে পরমাত্মা পূর্ণ মুক্তি মার্গের জ্ঞান দিয়েছেন। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এর মধ্যে বলা হয়েছে যে ওই তত্ত্ব জ্ঞান তুই তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে বোঝ। তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত তোকে তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ দেবেন।গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১ এ যে তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, যে সন্ত সংসার রূপী বৃক্ষের সর্ব বিভাগের বিষয়ে জানেন, তিনি বেদবিত অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য জানা তত্ত্বদর্শী সন্ত। সূক্ষ্মবেদ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের বাণীতে বলা হয়েছে যে:-

কবীর, অক্ষর পুরুষ এক পেড় হৈ ক্ষর পুরুষ বাকি ডার।
তীনোঁ দেবা শাখা হৈঁ, পাত রূপ সংসার॥

এই সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের বাণীকে তত্ত্ব জ্ঞানও বলা হয়। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ এ বলা হয়েছে যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির পরে পরমেশ্বরের ওই পরম পদের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধক পুনঃরায় আর কখনো এই সংসারে ফিরে আসে না অর্থাৎ তার পূর্ণ মুক্তি হয়ে যায়। ওই পরমাত্মাই এই সংসার রূপী বৃক্ষের রচনা করেছেন, কেবল ওনারই ভক্তি করো। গীতা জ্ঞান দাতা নিজের সাধনা অপেক্ষা, ওই পরমাত্মার ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ মান্যতা দিয়েছেন। ওই ভক্তিতেই পরমেশ্বরের ওই পরমপদ প্রাপ্তি হয়, যা প্রাপ্ত করার পর জীবের জন্ম-মৃত্যু রূপী

জীবন চক্র চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়।

❖ **শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহেব :-** এই গ্রন্থকে শিখদের ধর্মগ্রন্থ মানা হয়। বাস্তবে এটি বিভিন্ন মহাপুরুষদের অমৃতবাণীর সংগ্রহ। যার মধ্যে শ্রী নানক দেবের বাণী অর্থাৎ মহলা-পহলার বাণী যা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সূক্ষ্মবেদের সাথে মিল খায়। কারণ শ্রী নানক দেবকে পূর্ণ পরমাত্মা দর্শন দিয়েছিলেন। যে সময় শ্রী নানক দেব সাহেব সুলতানপুর শহরে এক নবাবের মুদিখানায় কর্মচারী ছিলেন। সুলতানপুর শহর থেকে প্রায় আধা কি.মি. দূরে বেঈ নদী বয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিনের মতো শ্রী নানক দেব ওই নদীতে স্নান করতে যেতেন। একদিন পরমাত্মা স্বয়ং জিন্দা বাবার বেশ ভুষা ধারণ করে বেঈ নদীতে প্রকট হয়েছিলেন, সেখানে শ্রী নানক দেবের সাথে পরমাত্মার জ্ঞান চর্চা হয়েছিল। তারপর শ্রী নানক দেব ওই নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুব দেয়, কিন্তু বাইরে আর ফিরে আসে না। ওখানে উপস্থিত লোকেরা মনে করেন যে, শ্রী নানকদেব নদীতে ডুবে গিয়েছেন। শহরের লোকজনেরা ওই নদীতে জাল ফেলে ভালোভাবে ওনার খোঁজ করেন কিন্তু কোথাও ওনার সন্ধান পায়নি, কারণ শ্রী নানক দেব তো জিন্দা বাবা রুপে প্রকট হওয়া পূর্ণ পরমাত্মার সাথে স্বচ্চখন্ডে (সতলোকে) চলে গিয়েছিলেন। তিনদিন পর শ্রী নানকদেব পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসেন এবং ওই বেঈ নদীর ওই নির্দিষ্ট তীরে দাঁড়িয়ে যায়, যেখান থেকে অন্তর্ধ্যান হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রী নানক দেবকে জীবিত অবস্থায় দেখে সুলতানপুর বাসীদের খুশির কোনো ঠিকানা ছিল না। শ্রী নানক দেবের বোন নানকীরও সুলতানপুর শহরে বিবাহ হয়েছিল। নিজের বোনের বাড়িতেই নানকদেব থাকতেন। নিজের ভাইয়ের মৃত্যু শোকে দুঃখী বোন নানকী ভাইকে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এবং পরক্ষণে তা খুশিতে বদলে যায়। শ্রী নানক দেব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার পান সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান পান, প্রকৃত নাম (সতনাম) পান। ভাইবালে বালী "জন্মসাখী গুরু নানক দেব" জী পুস্তকের মধ্যে এবং প্রাণ সংগলী হিন্দি লিপির মধ্যে আছে, যার সম্পাদক সন্ত সম্পূর্ণ সিং। এই দুই পুস্তকের মধ্যে প্রমাণ আছে যে, শ্রী গুরু নানক দেব স্বয়ং মর্দানাকে বলেছিলেন যে, আমাকে পরমাত্মা জিন্দা বাবার রুপে বেঈ নদীর তীরে দর্শন দিয়েছিলেন, যখন আমি স্নান করার জন্য গিয়েছিলাম। আমি তিন দিন ধরে ওনার সাথে থেকে ছিলাম, ওই জিন্দা বাবা আমার সদগুরু। তিনি সর্ব সৃষ্টির রচনাহার। এইজন্য কেবল তিনি 'বাবা' বলার অধিকারী, অন্য কাউকে 'বাবা' বলা উচিত নয়, ওনার নাম কবীর।

কায়েম দায়কা কুদরতী সব পীরন সির পীর আলম্ বড়া কবীর॥

এই জন্য শ্রী নানক দেবের বাণী (মহলা ১) সূক্ষ বেদের সাথে মিল খায়, তাই এটি সঠিক। অন্য সাধু-সন্তদের বাণী এতটা সঠিক নয়। কারণ এটাই যে শ্রী নানকদেব স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার পেয়েছিলেন।

প্রমাণ:- শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহেবের ২৪ নম্বর পৃষ্ঠাতে লেখা বাণী:-

এক সুআন দুঈ সুআনী নাল ভলকে ভোঁকহী সদা বিয়াল,

কুড় ছুরা মুঠা মুরদার ধানক রুপ রহা করতার।

তেরা এক নাম তারে সংসার মৈঁ ঐহো আশ ঐহে আধার,

ধানক রুপ রহা করতার। ফাহী সুরত মলুকী বেশ, এহ ঠগবাড়া ঠগী দেশ।

খরা সিআনাঁ বহুতা ভার, ধানক রুপ রহা করতার॥

শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহিবের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৩১ এ নিম্ন বানী আছে :-

নীচ জাতি পরদেশী মেরা, ক্ষণ আবৈ ক্ষণ জাবৈ।

জাকি সংগত নানক রহন্দা, ক্যকর মুন্ডা পাবৈ॥

পৃষ্ঠা ৭২১ তে নিম্নে লেখা আছে :-

য়ক অর্জ গুফতম পেশ তোরদ কুন করতার।

হক্কা কবীর করীম তূ , বেএব পরবর দিগরা॥

উপরোক্ত এই অমৃতবাণী গুলি শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহিবে উল্লেখ আছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শ্রী নানকদেবকে পূর্ণ পরমাত্মা দর্শন দিয়েছিলেন। তিনি “কবীর করতার” ছিলেন, যিনি কাশী নগরে ধানক (তাঁতি) রুপে লীলা করতে এসেছিলেন।

সন্ত গরীব দাসজীকে (গ্রাম ছুড়ানী, জেলা ঝজ্জর, হরিয়ানা) এইভাবে ‘জিন্দা বাবা’ রুপে কবীর পরমাত্মা দর্শন দিয়েছিলেন, একইভাবে ওনাকেও স্বচ্চখণ্ডে (সতলোকে) নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আবার ওনাকে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সন্ত গরীব দাস জী বলেছেন যে:-

গরীব, হম সুল্তানী নানক তারে, দাদূ কূঁ উপদেশ দিয়া।
জাতি জুলহা ভেদ নহীঁ পায়া, কাশী মাহেঁ কবীর হুয়া॥
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কা, এক রতি নহীঁ ভার।
সতগুরু পুরুষ কবীর হৈ, কুলকে সিরজন হার॥

সন্ত দাদূ দাস মহারাজকেও পূর্ণ পরমাত্মা ‘জিন্দা বাবা’ রুপে দর্শন দিয়েছিলেন, তখন সন্ত দাদূ দাস মাত্র ৭ বছর বয়সী ছিলেন, সেই সময় গ্রামের বাইরে ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন। পূর্ণ পরমাত্মা ওনাকে জিন্দাবাবা রূপে দর্শন দিয়ে সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দাদূ দাস তিনদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন, তারপর যখন জ্ঞান ফিরলো তখন পরমাত্মা কবীর সাহেবের মহিমা বানী আকারে বলতে লাগলেন।

জিন মোকূঁ নিজ নাম (বাস্তবিক নাম) দিয়া,সোই সতগুরু হমার।

দাদূ দূসরা কোঈ নহীঁ, কবীর সিরজনহার॥

দাদূ নাম কবীর কী, জৈ কোঈ লেবে ঔট।

উনকো কবহু লাগে নহীঁ, কাল বজ্র কী চোট॥

সন্ত গরীব দাস জী বলেছেন:-

দাদূ কূঁ সতগুরু মিলে, দেঈ পান কী পীখ।

বুঢ়া বাবা জিসে কহৈ, য়হ দাদূ কী নহীঁ সীখ॥

পহলী চোট দাদূ কো, মিলে পুরুষ কবীর।

টক্কর মারী জদ মিলে ফির সান্তর কে তীর॥

❖ বান্ধবগড় নিবাসী, সন্ত ধর্মদাসকে দর্শন দিয়েছিলেন :-

যে সময় ধর্মদাস তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে মথুরাতে পৌঁছলেন। তখন ওনাকে ঐ জিন্দা পরমাত্মা, জিন্দা মহাত্মার রূপে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

ধর্মদাসকেও পরমাত্মা সত্যলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিন দিন রাত্রি পর্যন্ত ধর্মদাসও শ্রী নানকদেবের মতো'ই পরমাত্মার সাথে আকাশ মণ্ডলে (সত্যলোকে) ছিলেন। ধর্মদাসের শরীর অচৈতন্য থাকে। তৃতীয় দিন অজ্ঞাত অবস্থা থেকে ফিরে বলেন, আমি সত্যলোকে পরমাত্মার সাথে গিয়েছিলাম। ওই পরমাত্মা কাশী শহরে লীলা করতে এসেছেন, ওনার সাথে সাক্ষাত করবো। ধর্মদাস বারাণসীতে (কাশী) যান। ওখানে তাঁতী রুপে পরমাত্মাকে কর্ম করতে দেখে আশ্চর্য হয়ে, চরণে পড়ে যান এবং যথার্থ ভক্তিবিধি প্রাপ্ত করে নিজের আত্মকল্যাণ করান। বিস্তারিত তথ্য এই পুস্তকের পৃষ্ঠা নং 52 তে পড়ুন। (কে কে পেয়েছিলেন পরমাত্মাকে?)

❖ হজরত মুহম্মদকেও পরমাত্মা মক্কায় (কাবা) জিন্দা মহাত্মা রূপে সাক্ষাৎকার করেন এবং ওনাকে নিজের লোকে নিয়ে যান, যা এক ব্রহ্মাণ্ডের রাজদূত ভবন রূপে নির্মিত, পরমাত্মা হজরত মুহাম্মদকে বোঝান এবং নিজের জ্ঞান শোনান। কিন্তু হজরত মুহম্মদ পরমাত্মার জ্ঞানকে অস্বীকার করেন আর সত্যলোকে না থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই জন্য হজরত মুহম্মদকে সশরীরে সেখান থেকে ফিরিয়ে দেন। ওই সময় হজরত মুহম্মদের কয়েক হাজার মুসলমান অনুগামী হয়ে গিয়েছিল, ওনার মহিমা সংসারে পূর্ণোদ্যমে ছড়িয়ে পড়ছিল আর কুরআনের জ্ঞানকে সর্বোত্তম মেনে চলছিল।

সন্ত গরীব দাসজী বলেন যে, কবীর পরমেশ্বর মুহম্মদ সাহেবকে উপরের লোকে নিয়ে যান, কিন্তু সেখানে তিনি থাকেননি। গরীব দাস জী বলেন যে, কবীর পরমেশ্বর জী নিজের বাণীতে বলেছেন :-

হম মুহম্মদ কো বহাঁ লে গয়ো, ইচ্ছা রুপী বহাঁ নহী রহয়ো।
উল্ট মুহম্মদ মহল পঠায়া, গুঝ বিরজ এক কলমা ল্যায়া।
রোজা,বঙ্গ নিমাজ দয়ী রে, বিস্মল কী নহীঁ বাত কহী রে।
মারী গঊ শব্দ কে তীরম্, এস্যে হোতে মুহম্মদ পীরম্।
শব্দে ফের জিবাঈ, জীব রাখ্যা মান্স নহী ভখ্যা, এস্যে পীর মুহম্মদ ভাঈ।
মারী গঊ লে শব্দ তলবার, জীবত হুঈ নহীঁ আল্লাহ সে করী পুকার।
তব হমোঁ (মুঝকো) মুহম্মদ নে য়াদ কিয়া রে। শব্দ স্বরুপ হম বেগ গয়া রে।
মুঈ গঊ হমনে তুরন্ত জিবাঈ। তব মুহম্মদ কৈ নিশ্চয় আঈ॥
তুম কবীর অল্লহ দর্বেশা। মোমিন মুহম্মদ কা গয়া অন্দেশা॥
কহা মুহম্মদ সুন জিন্দা সাহেব। তুম আল্লাহ কবীর ঔর সব নায়ব॥

এরই প্রমাণ “কুরান শরিফ” এর সুরত ফুরকানি ২৫ আয়াত নং ৫২-৫৯ এর মধ্যেও আছে। কুরআন শরিফের জ্ঞানদাতা হজরত মুহম্মদ সহ মুসলমান ধর্মের সমস্ত মুসলমানরা খুদা (আল্লাহ) মনে করেন, এবং ওনাকেই পূর্ণ পরমাত্মা মনে করেন। এই ৫২-৫৯ নম্বর আয়াতের মধ্যে কুরআন শরিফের জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, হে পয়গম্বর! হজরত মুহম্মদ! আমি তোকে কুরআনের আয়াতের মধ্যে যে জ্ঞান দিয়েছি তুই তার উপর দৃঢ় হয়ে থাক, কবীরকে আল্লাহ বলে যে কাফেররা মানে না বা বিশ্বাস করে না, তুই তাদের কথায় না গিয়ে তাদের সাথে সংঘর্ষ করবি

কিন্তু ঝগড়া করবি না। হে পয়গম্বর! ইনি কবীর নামক পরমাত্মা, যিনি কাউকে পুত্র,পুত্রবধূ, শ্বশুর, শাশুড়ি ও নাতি বানিয়েছেন, তুমি ওই জিন্দা বাবার উপর ভরসা রাখো। (যে তোকে কাবাতে দর্শন দিয়েছিল) তিনিই বাস্তবে অবিনাশী পরমাত্মা, তিনি নিজের বান্দাদের (ভক্তদের) গুনাহ্ (পাপ) ক্ষমা করে দেন, তিনিই কবীর আল্লাহ্।এই কবীর আল্লাহের বর্ণনা বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থের মাধ্যমেও উল্লেখ আছে যে, ওই পরমাত্মা ছয় দিনের মধ্যে আকাশ এবং ভূমির মধ্যে যা কিছু আছে অর্থাৎ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র এই সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে সিংহাসনের ওপর বিরাজমান হয়েছেন। ওনার খবর কোনো বাখবরের অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো।

হজরত মুহম্মদ মাংস খেতেন না

সন্ত গরীব দাস জী মহারাজ (গ্রাম ছুড়ানি, জেলা ঝজ্জর, হরিয়ানা) নিজের অমৃত বাণীতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, হজরত মুহম্মদ এবং তার ১ লক্ষ ৮০ হাজার অনুগামীরা মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তারা কখনো মাংস খায়নি এবং তারা কখনো গরু বিসমিল্লাহ (হত্যা) করেনি।

গরীব, নবী মুহম্মদ নমস্কার হৈ, রাম রসূল কহায়া।

এক লাখ অস্সী কূঁ সৌগন্ধ, জিন নহীঁ করদ চলায়া॥

অর্স- কুর্স পর আল্লাহ তখ্ত হৈ, খালিখ বিন নহীঁ খালী।

বৈ পৈগম্বর পাক পুরুষ থে,সাহেব কে অবদালী

ভাবার্থ :- গরীব দাস জী বলেছেন যে, নবী মুহম্মদকে, আমি প্রণাম করছি। তিনি তো পরমাত্মার রসূল(দূত)ছিলেন। ওনার একলাখ আশি হাজার মুসলমান অনুগামী ছিলেন। আমি (গরীব দাস) শপথ নিয়ে বলছি, ওনারা (এক লাখ আশি হাজার অনুগামীরা) এবং হজরত মুহম্মদ নিজেও কখনো কোনো জীবের উপর ছুরি (করদ) চালাননি অর্থাৎ কখনো জীব হিংসা করে মাংস ভক্ষণ করেননি।

পরমাত্মা আকাশের অন্তিম পৃষ্টে (সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপরের স্থানে) বিরাজমান আছেন,কিন্তু কখনো ওনার দৃষ্টি থেকে কোনো জীব লুকিয়ে নেই,তিনি সমস্ত জীবকে দেখেন। ওই পয়গম্বর (হজরত মুহম্মদ এবং অন্যান্যরা) পবিত্র আত্মা ছিলেন। তারা পরমাত্মার কৃপা পাত্র ছিলেন।

সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজের বিচার

এই কথার সাক্ষী সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজও (বিষ্ণোই ধর্মের প্রবর্তক) দিয়েছেন। শব্দ সংখ্যা ১২ তে:-

মহমদ- মহমদ ন কর কাজী, মহমদ কা তো বিষম বিচারু।

মহমদ হাত করদ ন হোতি, লোহে ঘরী ন সারু।

মহমদ সাথ পয়গম্বর সীধা, এক লাখ অশ্বী হজারু।

মহমদ মরদ হলালী হোতা, তুম হী ভএ মুরদারুঁ।

ভাবার্থ :- সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজ বলেছেন যে :- হে কাজী! আপনারা ওই পবিত্র আত্মা মুহম্মদের নাম নিয়ে গরু অথবা অন্যান্য জীবকে হত্যা করেন,আপনারা ওই মহাপুরুষের বদনাম করেন, হজরত মুহম্মদের বিচার অনেক কঠিন ছিল। আপনারা

ওনার বলা মার্গ থেকে হারিয়ে গেছেন। হজরত মুহম্মদের হাতে কখনো করদ (জীব হত্যা করার ছুরি) ছিল না, যা লোহার একটি পাতের উপর হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে ধারালো অস্ত্র তৈরি করা হয়। হজরত মুহম্মদের সাথে তার এক লাখ আশী হাজার মুসলমান অনুগামী ছিলেন। তিনি সরল সাদা-সিধে অর্থাৎ নেক পয়গম্বর ছিলেন। হজরত মুহম্মদ তো বীরপুরুষের মতো হালাল করা উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। আর আপনারা তো জীব হিংসাকারী (মুরদারু)। আপনারাও ওই মহাপুরুষের মতো নিজের জীবন নিষ্পাপ করুন। জীব হিংসা কখনো করো না। পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মা রূপে সমরাথল নামক স্থানে সন্ত জম্ভেশ্বরকে দর্শন দিয়েছিলেন:-

যেমনটি বেদ শাস্ত্রে প্রমাণ আছে যে, পরমাত্মা সতলোকে থাকেন, এবং ওখান থেকে বিদ্যুৎ সম গতিতে তিনি পৃথিবীতে প্রকট হয়ে ভালো আত্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের আধ্যাত্মিক যথার্থ জ্ঞান দেন। তিনি কবিদের মতো আচরণ করতে করতে পৃথিবীতে বিচরণ করেন। যার কারণে তিনি প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে অন্যতম কবি হন। একারণে তিনি কবি উপাধিও প্রাপ্ত করেন। পরমাত্মা ভক্তির সুপ্ত মন্ত্রের আবিষ্কার করেন যা বেদ অন্যান্য পুস্তকের কোথাও নেই। কৃপা করে এই মন্ত্র গুলির অনুবাদ দেখুন এই পুস্তকের 100 নং পৃষ্ঠাতে।

প্রমাণ :- ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ২০ মন্ত্র ১ , ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬-২৭,ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৮২ মন্ত্র ১ ও ২, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৫ মন্ত্র ২, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬-২০।

যেমনটি পূর্বে লিখে দিয়েছি যে, হজরত মুহম্মদ সহ অন্যান্য আরো কিছু মহাত্মাদেরকে পূর্ণ পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মা রুপে দর্শন দিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে পূর্ণ পরমাত্মা সমরাথল নামক স্থানে মহাত্মা জম্ভেশ্বর মহারাজকে জিন্দা বাবা রুপে দর্শন দিয়েছিলেন।

প্রমাণ :- শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজের বাণী, শব্দ সংখ্যা= ৫০ এর কিছু অংশ

দিল - দিল আপ খুদায় বন্দ জাগ্যো, সব দিল জাগ্যো সোঈ।
জো জিন্দো হজ কাবৈ জাগ্যো, থল সির জাগ্যো সোঈ॥
নাম বিষ্ণু কৈ মুসকল ঘাতৈ, তে কাফর সৈতানী।
হিন্দু হোয় কা তীর্থ ন্হাবৈ, পিন্ড ভরাবৈ, তেপন রহা ইবাঁনী।
তুরক হোয় হজ কাঁবো ধোকে, ভূলা মুসলমানী।
কে কে পুরুষ অরব জাগৈলা, থল জাগ্যো নিজ বাণী।

ভাবার্থ :- শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজ বলেছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মা রুপে হজরত মুহম্মদকে কাবাতে (মক্কায়) দর্শন দিয়েছিলেন, যে সময় হজরত মুহম্মদ হজ করতে মক্কায় গিয়েছিলেন এবং ওনাকে জাগ্রত করেছিলেন এই যে, মন্দির - মক্কা প্রভৃতি তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করতে থাকলে কখনো পরমাত্মা প্রাপ্তি হয় না। পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য মন্ত্র জপ করা প্রয়োজন। শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজ আবারও বলেছেন যে, ওই পরমাত্মাই থল সির (সমরাথল) নামক স্থানে (রাজস্থান প্রদেশে) এসে আমাকে জাগিয়েছেন! না জানি আর কত ব্যক্তি জেগে উঠবে, এইভাবে আমার সমরাথল স্থান প্রসিদ্ধ হয়েছে। এগুলি আমার নিজের বাণী অর্থাৎ বিশেষ বচন। আমি নিজের

অনুভবের খাস (আমার) যথার্থ বাণী বলে-বলে সমরাথলের ব্যক্তিদের মধ্যে পরমাত্মার ভক্তির জন্য জাগরণ এনেছি, কিন্তু সত্যকে স্বীকার না করে মুসলমানেরা এখনও পর্যন্ত কাবাতে হজ করতে যায়, তারা ভ্রমিত হয়ে আছে। তারা ওখানে গিয়ে পাষাণ (পাথর) কে সিজদা করে, যা সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ। একই ভাবে হিন্দুরাও বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করে, ভূত পূজা করে, পিন্ড দান করে, এগুলি সব ব্যর্থ সাধনা।

সন্ত শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজ ২৯ টি নিয়ম বানিয়ে একটি স্বচ্ছ সাধক সমাজ নির্মাণ করেছিলেন। যারা এই ২৯ টি (বিশ নয় = ২৯) নিয়ম পালন করতেন এবং শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজের বলা মন্ত্র জপ করতেন, তাদেরকে বিষ্ণোই (২৯ টি নিয়ম পালনকারী) বলা হয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে "বিষ্ণোই" সম্প্রদায় নেই বললেই চলে। কারণ সময় অনুসারে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে। সেই অনুসারে মানুষের ব্যবহার, আচার - বিচার সব কিছুই বদলে যায়। এর প্রধান কারণ সাধু - সন্তের অভাব। শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজের স্বর্গ ধামে যাওয়ার পর ওনার মতো সিদ্ধি - শক্তি এবং ভক্তি যুক্ত মহাপুরুষ কেউ ছিলেন না, যার কারণে নিয়ম মর্যাদা পালন ঠিক মতো হচ্ছিল না। বর্তমানে "বিষ্ণোই" ধর্মের অনুগামীরা কেবল তীর্থ ভ্রমণ করাকে অধিক মহত্ব দেয় এবং এই সমস্ত তীর্থ ধামে গিয়ে সেখানে হোম যজ্ঞ প্রভৃতি করে নিজেকে ধন্য মনে করে। তীর্থ সাধারণত সেই সমস্ত স্থানগুলিকে বলা হয়, যেখানে কোনো সাধু - সন্তরা নিজের জীবনকালে সাধনা করেছিলেন এবং সেখানে কিছু চমৎকার দেখিয়েছিলেন। এছাড়া জন্ম স্থান এবং নির্বাণ স্থানকেও তীর্থ স্থান বা স্মরণীয় স্থান বলা হয়ে থাকে। কোনো স্থান ধাম এগুলি অবশ্যই স্মরণীয়, এগুলির প্রয়োজনও অনিবার্য। কারণ যার ঘটনাবলী নিয়ে স্থানটি প্রসিদ্ধ, তার কর্মকাণ্ড মনে রাখার জন্য এবং তাকে সত্যতার প্রতীক হিসেবে মনে রাখার জন্য এই সব স্মরণীয় স্থান গুলি তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভক্তি সাধনা ছাড়া মানব জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। তাই পূর্ণ গুরুর খোঁজ করে তার বলা মর্গে চলে জীবন সুফল করুন। কারণ সমস্ত মহাপুরুষেরাই গুরু ধারণ করেছিলেন এবং গুরুও যেন বক্ত গুরু হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ যে গুরু নিজের মুখ কমলে ভক্তি বিধি বলেন। কিছু সময় পর প্রত্যেক ধর্মের ভক্তিবিধি বদলে দেওয়া হয়, যা ক্ষতিকারক। উদাহরণের জন্য :-

সন্ত শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজের ১২০ টি শব্দ (অমৃতবাণী) আছে, যা ওনার নিজ মুখ কমলে উচ্চারণ করা বাণী। বর্তমানে ওনার প্রত্যেক শব্দের (বাণীর) শুরুতে 'ওঁ' অক্ষর যুক্ত করা হয়েছে যা ভুল এবং সন্ত মহারাজের অপমান। যদি 'ওঁম' শব্দ ছাড়া অমৃত বাণী গুলি সার্থক না হত, তাহলে তা জম্বেশ্বর মহারাজ স্বয়ং যুক্ত করতেন। যেমন কোন কোম্পানির তৈরি মোটর সাইকেলের পিষ্টন, যা পূর্ণ রূপে সঠিক হয়। যদি কোনো ব্যাক্তি ওই পিস্টনের মাথায় একটি নাট বোল্ট লাগিয়ে নিজের চতুরতা দেখায়, তাহলে তা কতটা ঠিক? (কোনো কোম্পানীর প্রোডাক্ট বিক্রি করা দণ্ডনীয় অপরাধ সুতরাং এটা করা অনুচিত।) ঠিক একইভাবে সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজের বাণীর সাথে 'ওঁম' যুক্ত করে পড়লে তা লাভের পরিবর্তে ক্ষতিকারক হয়ে থাকে।

❖ ঠিক এইভাবে একটি গায়েত্রী মন্ত্র বানিয়ে নিয়ে হিন্দু ধর্মের ব্যক্তিরা শ্রদ্ধার সাথে জপ করতে থাকে। মন্ত্রটি ঠিক এইভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে = "ওঁম ভূর্ভব স্বঃ তত্সবিতুর্ বরেণিয়ম্ ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়ো ন প্রচোদয়াত্" বাস্তবে

এটি যজুর্বেদ অধ্যায় ৩৬ এর মন্ত্র নং ৩, এর পূর্বে 'ওঁম' অক্ষর নেই। বেদের বাণী ভগবানের দ্বারা প্রদেয়, এর পূর্বে 'ওঁম' অক্ষর যুক্ত করা মানে ভগবানের অপমান করা। পিস্টনের উপরে নাট বোল্ট লাগানোর মত ব্যার্থ ক্রিয়া।

সন্ত শ্রী জম্বেশ্বর মহারাজের শব্দ সংখ্যা= ৬৯ এ বলেছেন যে, বেদ এবং পুরাণের মধ্যে সেই যথার্থ ভক্তি মার্গ নেই। এগুলোকে ঠিকভাবে না বুঝে মানুষজন ভুতের পূজা শুরু করে দিয়েছে। ওই অপরমপার পরমাত্মার তারা কেন জপ (স্মরণ) করে না! যিনি এই সংসার রূপী বৃক্ষের মূল (শিকড়)। মূলের পূজা না করে, ডাল অথবা পাতার পূজা করা ব্যর্থ। এই সাধনায় যম বা কালের হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। (যম = জন্ম, কাল= মৃত্যু) অর্থাৎ কখনো জন্ম-মৃত্যু সমাপ্ত হবে না।

❖ কোন এক ভদ্র পুরুষ তংত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে এবং সেই ব্যক্তি তার জীবনের বিধি জেনে যায়। তাই সে জীবিত অবস্থায় লাভবান হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পরেও তার কোনো ক্ষতি হয় না। তিনি পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) প্রাপ্ত করে নেয়।

শব্দ নং ৭২ এর কিছু বানী:-

বেদ কুরাণ কুমায়া জালুঁ ভূলা জীব কূজীব কূজানী।
কেবল জ্ঞানী থল সির আয়ো পরগট খেল পসারী।
কোড় তেতীসাঁ পোহ রচাবণ হারী, জ্যুঁ ছক আঈসারী।

শব্দ নং ৭২ এর মধ্যে শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজ বলেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান বলার জন্য পরমাত্মা সন্ত রূপে সমরাথলে এসেছিলেন। তিনি পূর্ণ জ্ঞানী এবং সমস্ত সৃষ্টির রচনা কার। তার দেওয়া তত্ত্বজ্ঞানে আমার পূর্ণ তৃপ্তি হয়েছে, তিনি পূর্ণ গুরু।

শব্দ সংখ্যা ৬৯ এর কিছু বানী:-

সো অপরম্পার কাঁয় ন জঁপো, তত খিন লহো ইমাণো।
ভল মূল সীঁচো রে প্রানী, জ্যুঁ তরবর মেলত ডালু।
জইয়া মূল ন সীচ্চো তো জামন- মরন বিগোবো।
অঁহনিশ কবনী থীর ন রহিবা ন বচ্যোঁ জম কালুঁ।

কোঈ কোঈ ভল মূল সিঁচীলো,ভল তঁত বুঝীলো জা জীবন।
কী বিধি জাণী, জীবতড়া কছু লাহো হোসী মূবা ন আবত হাঁনী।

শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজের গুরু কে ছিলেন?

শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজকে পূর্ণ পরমাত্মা সকলের রচয়িতা জিন্দা মহাত্মার রুপে দর্শন দিয়েছিলেন। ওনাকেই তিনি নিজের গুরু করেছিলেন, তিনি সন্ত শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজের গুরু ছিলেন:-

প্রমাণ:- শব্দ নং ৯০ এর অন্তিম বাণী:-

জাঁ জাঁ পবন আসণ, পাণী আসণী, চাঁদ আসণ।
সূর (সূর্য) আসণ গুরু আসণ সঁমরা থলে।

কহৈ সতগুরু ভুল মত জাইয়ো পড়োলা অভৈ দোজখে।

শব্দ নং ৯১ এর কিছু বানী :-

ছন্দে- মন্দে বালক বুদ্ধে,কূড়ে কপটে ধাধ ন সিদ্ধে।
মেরে গুরু জো দীহ্নী শিক্ষা সর্ব আলিঙ্গন ফোরী দীক্ষা।

সত -সত ভাখত গুরু রায়োঁ জরা মরন ভো ভাগুঁ।

শব্দ নং ৯২ এর কিছু বাণী:-

পড় বেদ কুরাণ কুমায়া জালোঁ দন্ত কথা জুগ ছায়া।
সিদ্ধ সাধক কো এক মতো, জিন জীবত মুক্ত দৃঢ়ায়ো।

জুগাং -জুগাং কা জোগী আয়ো, সতগুরু সিদ্ধ বতাঔ।
সহজ স্নানী কেবল জ্ঞানী ব্রহ্ম জ্ঞানী সুকৃত অহল্যো ন জাই।

উপরোক্ত অমৃত বানী গুলির ভাবার্থ :- শব্দ নং ৯০ এর বাণী গুলিতে সন্ত শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজ নিজে বলেছেন যে, যেমন বাতাসের আসন (স্থান =শিবির=আশ্রম) আছে, বায়ু কিছু কি.মি. উপর পর্যন্ত আছে, তাদেরও স্থান আছে। যদিও তারা নিজের স্থানে (আসন) এদিক - ওদিক প্রবাহিত হতে থাকে। এই প্রকার জল = জলেরও স্থান আছে, চাঁদ এবং সূর্যেরও স্থান আছে। তেমনি সদগুরু প্রাপ্তির পর আমি সমরাথলে নিজের আসন (স্থান) স্থাপিত করি। গুরুজী আমাকে বলেছেন যে, পরমাত্মাকে ভুলে যেওনা অন্যথায় দোজখ অর্থাৎ নরকে পচবে। এই জন্য সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজ মানব জাতিকে সতর্ক করে বলেছেন যে, গুরু ধারণ করো আর পরমাত্মার ভক্তি করো।

পুষ্টিকরণ :- যেভাবে সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজকে পূর্ণ পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মা রূপে দর্শন দিয়েছিলেন অনুরূপভাবে হরিয়ানা প্রদেশের ঝজ্জর জেলার অন্তর্গত ছুড়ানী গ্রামের নিবাসী সন্ত গরীব দাস মহারাজকেও দর্শন দিয়েছিলেন। সন্ত গরীব দাসও নিজের অমৃত বাণীতে বলেছেন যে :-

গরীব, ঐসা সতগুরু হম মিল্যা, হৈ জিন্দা জগদীশ।
সুন্ন বিদেশী মিল গয়া, ছত্র মুকুট হৈ শীশ॥
গরীব, জিন্দা জোগী জগত গুরু, মালিক মুরসিদ পীর।
দোহুঁ দীন ঝগড়া মঁডয়া, পায়া নহীঁ শরীর॥
গুরু জ্ঞান অমান অডোল অবোল হৈ, সতগুরু শব্দ সেরী পিছানী।
দাস গরীব কবীর সতগুরু মিল্যা, আন অস্থান রোপ্যা ছুড়ানী॥

এইভাবে সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজ তার শব্দ সংখ্যা ৯১ এর মধ্যে যে অমৃত বাণী লিখেছেন, সেখানে বলেছেন যে, আমার গুরুর যে জ্ঞান তা কূড়ে = মিথ্যা, কপটে = কপটতাযুক্ত এবং বালক বুদ্ধি অর্থাৎ অসম্পূর্ণ জ্ঞান অথবা শিথিল জ্ঞান অথবা ঋদ্ধি-সিদ্ধির জন্য নয়। এই জ্ঞান তো পূর্ণ মোক্ষ মার্গের জ্ঞান, আমার গুরুদেব আমাকে সমস্ত সত্য জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলি দীক্ষা রূপে আমি সবাইকে বলেছি, যার ফলে “জরা” বৃদ্ধা অবস্থায় হওয়া কষ্ট এবং মরণ (মৃত্যু) ভয় সমাপ্ত হয়ে যায়।

পুষ্টিকরণ :- শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২৯ এর মধ্যেও একই প্রমাণ আছে বলা হয়েছে, যে সাধক তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ করে নেয়, সে জরা-মরণের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রচেষ্টা করতে থাকে, কারণ সে তত্ত্ব ব্রহ্মে সাথে পরিচিত হয়ে যায় এবং সর্ব কর্ম থেকে পরিচিত হয়ে যায়।

শব্দ নং ৯২ এর অমৃত বাণীর ভাবার্থ:- সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজ বলেছেন, বেদ এবং কুরআন সঠিকভাবে না বুঝে এরা নিজেদের শোনা কথা (দন্তকথা) মানব সমাজকে শোনাতে থাকে, সাধক ও সিদ্ধ পুরুষের একটাই মত হয়। তারা জীবিত

থেকেও মৃত মনে করে সংসারে থাকে, তারা সংসারকে অসার মনে করে। প্রত্যেক যুগে পরমাত্মা স্বয়ং প্রকট হয়ে যথার্থ ভক্তি জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি স্বয়ং সদগুরু হন। তিনি পূর্ণ সিদ্ধ অর্থাৎ সর্বশক্তিমান হয়ে থাকেন। সেই সদগুরু বা সন্ত রূপে প্রকট হওয়া পরমাত্মাই কেবল জ্ঞানী অর্থাৎ উনি একাই সত্য জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। ওই সদগুরু দেবের কাছে থেকে যারা দীক্ষা নেয়, তারা ব্রহ্ম জ্ঞানী অর্থাৎ তাদের সত্যসাধনার অহল্যো অর্থাৎ ভক্তি কখনো ব্যর্থ যায় না। তারা পূর্ণ মুক্তি (মোক্ষ) পেয়ে যায়।

বিশ্লেষণ:- বিষ্ণোই ধর্মের অনুবাদ কর্তা শব্দ নং ৫০ অমৃতবাণীর ভাবার্থ কিভাবে করেছে দেখুন:-

দিল দিল আপ খুদাবঁদ জাগ্যো, সব দিল জাগ্যো সোঈ।
জো জিন্দা হজ কাবে জাগ্যো, থলসির জাগ্যো সোঈ॥

এই ভাবে ভুল ভাবার্থ করে দিয়েছে যে, "হজরত মুহাম্মদকে যে পরমাত্মা কাবাতে দর্শন দিয়েছিলেন, তিনি শ্রী সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজ ছিলেন এবং উনি সমরাথলে এসেছিলেন"। যদি এমন অর্থ হত, তাহলে সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজের জন্ম তো পবিত্র পিপাসর গ্রামে হয়েছিল, উনি তো অনেক আগেই ওখানে চলে এসেছিলেন এবং অনেক পরে সমরাথলে গিয়েছিলেন, তারপর লালাসরে ওনার নির্বাণ হয়। এই অমৃতবাণীর বাস্তবিক অর্থ আমি পূর্বে লিখে দিয়েছি, সেটাই সঠিক। তারপরেও যে সমস্ত মহান আত্মাদেরকে পরমাত্মা দর্শন দেন, তারা সবাই পূর্ণ সন্ত হন। কিন্তু নির্ধারিত সময় ছাড়া এবং অধিকারী সন্ত ছাড়া পরমাত্মা সতভক্তির আদেশ দেন না। সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজ স্বয়ং যে মন্ত্র জপ করতেন, তা বিষ্ণোই ধর্মের আরতি সংখ্যা ৮ এর প্রথম পংক্তিতে লেখা আছে। আরতি সংখ্যা ৮:-

"ওঁম্ শব্দ সোহংগ ধ্যাবে। প্রভু শব্দ সোহংগ ধ্যাবে"

কিন্তু এই মন্ত্রের জপ কিভাবে করতে হবে, তা সদগুরু ছাড়া আর কেউ জানে না। শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজ স্বয়ং ওই মন্ত্র জপ করতেন, অথচ অন্যদের বলতেন "বিষ্ণু-বিষ্ণু ভণ (জপ) রে প্রাণী" অর্থাৎ বিষ্ণু - বিষ্ণু জপ করতে থাকো। কারণ ছিল এটাই যে, যতদিন না শিষ্য অধিকারী (যোগ্য) হয়, ততদিন এই মন্ত্রের জপ করতে দেওয়া হয় না। এছাড়া আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, পরমাত্মা যে সমস্ত সন্ত মহাত্মাদেরকে দর্শন দিয়ে এই জ্ঞান বা মন্ত্র দিয়েছিলেন, তাদের সবাইকে এই মন্ত্র গুপ্ত রাখতে বলেছিলেন, যতদিন না কলিযুগের ৫৫০৫ বছর অতিবাহিত না হয়। ১৯৯৭ সালে কলিযুগ ৫৫০৫ বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এখন থেকে এই মন্ত্র পরমাত্মার আদেশে দেওয়া হবে। একমাত্র পূর্ণ সন্তের (গুরুর) কাছ থেকে এই মন্ত্র প্রাপ্ত করতে হবে, কারণ অধিকারী গুরু ছাড়া দীক্ষা নিলে এই মন্ত্রের কোনো লাভ হবে না। একই রকম ভাবে শ্রী নানক দেবও স্বয়ং এই মন্ত্রের জপ করতেন, যা বিষ্ণোই ধর্মের আরতি সংখ্যা ৮ এর প্রথম পঙক্তিতে আছে, অথচ অন্যান্য শিখদেরকে বলতেন, বাহে-গুরু বাহে-গুরু জপ করো। কারণ ছিল এটাই যে, এই মন্ত্র কলিযুগের ৫৫০৫ বছর পর্যন্ত গুপ্ত রাখার আদেশ ছিল। এখন থেকে এই মন্ত্র-জপ ঘরে ঘরে হতে থাকবে, এই দুই অক্ষরের মন্ত্রকে সতনামও বলা হয়।

এই দুই অক্ষরের নাম সন্ত ঘীসা দাসকে (গ্রাম-খেখড়া, জেলা-বাগপথ, উত্তর প্রদেশ) পূর্ণ পরমাত্মা জিন্দা রূপ ধারণ করে এসে দর্শন দিয়েছিলেন। সন্ত ঘীসা দাস

নিজের বাণীতে বলেছেন:-

ঔহংগ সোহংগ জপলে ভাই। রাম নাম কী য়হী কামাঈ॥

হরিয়ানা প্রদেশের ঝজ্জর জেলার অন্তর্গত ছুড়ানী গ্রামে সন্ত গরীব দাসজী মহারাজকে পূর্ণ পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মার রূপে জঙ্গলে দর্শন দিয়েছিলেন ওনাকেও এই মন্ত্র জপ করার জন্য দিয়েছিলেন। এবিষয়ে সন্ত গরীব দাস জী মহারাজ নিজের অমৃত বাণীতে লিখেছেন:-

"রাম নাম জপ করে স্থির হোঙ্গ, ওঁ সোহং মন্ত্র দোঈ"

অথচ সন্ত গরীব দাসও অন্য কউকে এই মন্ত্র জপ করতে দেয়নি। শুধুমাত্র একজন সন্তকে দিয়ে তাকে শক্ত আদেশ দেন যে, তুমিও কেবল নিজের একজন বিশ্বাসযোগ্য শিষ্যকেই দেবে, অন্য কাউকে নয়। এইভাবে উনিও নিজের একজন বিশ্বাসযোগ্য শিষ্যকে দেন। এই পরম্পরা অনুসারে এই গুপ্ত মন্ত্র আমার পূজ্য গুরুদেব সন্ত রামদেবানন্দ জী মহারাজের কাছে আসে। তারপর উনি ওই মন্ত্র আমাকে দেন এবং আমাকে ১৯৯৪ সালে নাম দীক্ষা দেওয়ার আদেশ দেন। ১৯৯৭ সালে পরমাত্মা স্বয়ং আমাকে (সন্ত রামপাল দাসকে) দর্শন দেয় এবং এই নাম ও সারনাম দেওয়ার আজ্ঞা দেন। বর্তমান সময়ে মোক্ষ (মুক্তি) প্রাপ্তির সর্বোত্তম সময়। প্রশ্ন ছিল সদগ্রন্থের মধ্যে পরমাত্মার বিষয়ে কি বলেছে?

উত্তর:- এখনো পর্যন্ত সদগ্রন্থের এবং পরমাত্মাকে পাওয়া মহাপুরুষদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

"পরমাত্মা সাকার এবং নরাকার যুক্ত" ...

এই সার কথাটি সমস্ত সদগ্রন্থে এবং পরমাত্মা পাওয়া সাধু-সন্তদের সিদ্ধান্ত।

যে সমস্ত সন্ত-মহাত্মাকে পরমাত্মা দর্শন দিয়ে জ্ঞান দিয়েছিলেন, তারা কোনো বিশেষ ধর্মের স্থাপনা করেনি। তারা ধার্মিক চেতনাকে উপরে তুলেছেন এবং যথার্থ ভক্তির প্রচার-প্রসারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, ওনাদের মতাদর্শ একটি ধর্ম অর্থাৎ সমুদায়ের রূপ নিয়ে নেয়। যেমনটি শিখ ধর্মের ক্ষেত্রে হয়, বিশ্নোই ধর্মও এভাবে তৈরি হয়ে যায়। যদিও এনারা পূর্বে সকলেই হিন্দু ধর্মকে মানতেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের মধ্যে সত্য সাধনা ধীরে ধীরে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই এই সমস্ত মহাত্মারা পরমাত্মা থেকে প্রাপ্ত যথার্থ জ্ঞানের আধারে ভক্তি এবং ধার্মিকতাকে জনতাদের মধ্য ছড়াতে থাকে, যার ফলে অনুগামীদের বিভিন্ন লাভ হতে শুরু হয়। এইভাবে তারা এই মার্গে আসতে শুরু করে। এখনো পর্যন্ত এই ধর্ম প্রায় কয়েকশো বছর পার হয়ে গিয়েছে। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক দেব এবং বিশ্নোই ধর্মের সংস্থাপক শ্রী সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজ সমকালীন ছিলেন। বর্তমানে এই দুই ধর্মের মধ্যে সেই ভক্তি-মর্যাদা আর নেই। তাই এগুলির পুনরুত্থান আমার (সন্ত রামপাল দাসের) মাধ্যমে এখন হচ্ছে, সেই যথার্থ ভক্তি এবং যথার্থ মর্যাদা পালন করানো হচ্ছে যা উপরোক্ত মহাপুরুষগণ পালন করিয়েছিলেন। উপরোক্ত মহাত্মাদের সাথেও ওই সময়ে অনেক ব্যক্তিরা বিরোধ করেছিল ওনাদেরকে অনেক খারাপ কথা বলেছিল কিন্তু সাধু-সন্তরা সব সময় নিজের উদ্দেশ্যে অবিচল থাকে, কেননা তারা মানব কল্যাণের জন্যই জন্ম নেয়। বর্তমানে আমার (সন্ত রামপাল দাসের) সাথেও ঠিক এমন অত্যাচার, অন্যায় হচ্ছে, বিভিন্নভাবে বদনাম করা হচ্ছে, কিন্তু সত্যকে কখনো সমাপ্ত করা যায় না। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তুফান কেউ আটকাতে পারবে না। এখন এই সত্য জ্ঞানের বিস্ফোরণ হয়ে গেছে।

"বিষ্ণোই ধর্মের ভক্তি"

প্রশ্ন :- বিষ্ণোই ধর্মের লোকেরা কিসের ভক্তি করে? এই ধর্মের প্রবর্তক কোন মহাপুরুষ ছিলেন?

উত্তর :- বিষ্ণোই ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজ। ভারতবর্ষের রাজস্থান রাজ্যে পীপাসর গ্রামে ওনার জন্ম হয়, ওনার ভক্তি স্থল ছিল রাজস্থানের সমরাথল গ্রামে এবং নির্বাণ স্থল ছিল রাজস্থানের লালাসর গ্রাম, যাকে মুকামও বলা হয়।(মুকামকথারঅর্থ স্থান।)

বিষ্ণোই ধর্মের ভক্তি:- শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজকে শ্রী বিষ্ণুর (সত্ত্বগুণ বিষ্ণু) অবতার মনে করা হয়। এ বিষয়ে স্বয়ং জম্ভেশ্বর মহারাজ নিজের অমৃত বাণীতে বলেছেন।

প্রমাণ :- শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজের শব্দ বাণী থেকে শব্দ সংখ্যা- ৯৪, ৫৪, ৬৭, ১১৬ বিষ্ণোই ধর্মের মধ্যে শ্রী বিষ্ণুর তথা শ্রীকৃষ্ণের (যিনি সত্ত্বগুণী বিষ্ণুর অবতার ছিলেন) ভক্তি করার জন্য শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজ নিজের মুখ কমলে আদেশ দিয়েছিলেন। বিষ্ণোই ধর্মের ভক্তিতে সর্বোচ্চ লাভ ছিল স্বর্গ প্রাপ্তি (বৈকুণ্ঠ বাস), এটিও অমৃত বাণীর মধ্যে প্রমাণিত আছে।

প্রমাণ :- শব্দের বাণী সংখ্যা:-১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৫,৩১, ৩৩, ৩৪,৬৪,৬৭,৭৮, ৯৭, ৯৮, ১০২, ১১৯ ১২০

শ্রী বিষ্ণু কে এই সংসারের মূ ল (শিকড়) অর্থাৎ পালনকর্তা বলেছেন।

"সদগুরুর কাছ থেকে নামদীক্ষা নিয়ে ভক্তি করুন" :-

বাণীতে শব্দ সংখ্যা = ৩০

শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজের আদেশ ছিল এই যে, গুরুর কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করলে তবেই লাভ প্রাপ্ত হবে। সর্বপ্রথম যাচাই (পরখ) করে গুরু নির্বাচন করতে হবে। গুরু বিনা দান করা উচিত নয়, একমাত্র গুরুদেব হলেন দান করার জন্য সুপাত্র, কুপাত্রকে কখনো দান দেওয়া উচিত নয়।

প্রমাণ:- শব্দের বাণী সংখ্যা:- ১, ২৩, ২৬, ২৯, ৩০, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৫, ৫৬,৭৭, ৮৫, ৮৬, ৯০, ৯১, ১০১, ১০৭, ১০৮, ১২০

কুপাত্রকে দান দেওয়া ব্যর্থ:- বিশেষ বিবরণ = শব্দের বাণী সংখ্যা ৫৬ এর মধ্যে আছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, কুপাত্রকে দেওয়া দান এমন মনে করো যেমন, অন্ধকার রাত্রে চোর চুরি করে নিয়ে যায় আর সুপাত্রকে দেওয়া দান এমন মনে করো, যেমন কোনো উর্বর জমিতে বীজ বপন করা হয়েছে। বিষ্ণোই ধর্মের মধ্যে তীর্থে ভ্রমণ করা, তীর্থধামে স্নান করা, পিন্ডদান প্রভৃতি পূজা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রমাণ :- শব্দের বাণী সংখ্যা = ৫০

❖ শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজকে পূর্ণ পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মা রূপ ধারণ করে সমরাথল নামক স্থানে এসে দর্শন দিয়েছিলেন। প্রমাণ:- শব্দের বাণী সংখ্যা - ৫০, ৭২, ৯০

❖ বেদ শাস্ত্রের মধ্যে পূর্ণ মুক্তির মার্গ নেই :- প্রমাণ - ৫৯, ৯২

❖ ভক্তি বিনা রাজপাঠ এবং সমস্ত মহিমা ব্যর্থ :- প্রমাণ :- বাণী সংখ্যা - ৬০

❖ শ্রী রামচন্দ্র কিছু ভুল করেছিলেন :- প্রমাণ - শব্দের বাণী সংখ্যা ৬২

❖ গুরুকে ছেড়ে শিষ্যের সম্মান (মহিমা) করা অপরাধ :-

প্রমাণ :- শব্দের বাণী সংখ্যা - ৭১

কবীর পরমেশ্বর বলেছেন যে :-

গুরু কো তজৈ ভজৈ জো আনা (অন্য)। তা পাশুয়া কো ফোকট জ্ঞানা॥

❖ বিষ্ণোই ধর্মে স্বর্গ ধাম (বৈকুন্ঠ) কে উত্তম (শ্রেষ্ঠ) লোক মানা হয়:-প্রমাণ:- শব্দের বাণী সংখ্যা = ৭৩, ১১৯, ৯৪

"হরিয়ানাতে হরি আসবে"

শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজের শব্দের বাণী সংখ্যা = ১০২ এ লেখা আছে:-

বিষ্ণু-বিষ্ণু ভণ অজর জরী জৈ, ধর্ম হুবৈ পাপাঁ ছুটিজৈ।
হরি পর হরি কো নাম জপীজৈ, হিরয়ালো হরি আন হরূঁ, হরি ন্যারায়ণ দেব নরূঁ।
আশা সাস নিরাস ভইলো, পাইলো মোক্ষ দবার খিণূ॥

ভাবার্থ:- এখানে বলা হয়েছে যে, "হিরয়ালো হরি আণ হরূঁ" এখানে "হরিয়ালো" শব্দের অর্থ হরিয়ানা। ওই সময় ভারতবর্ষে হরিয়ানা প্রদেশ ছিল না। এইজন্য "হরিয়ালো" লিখে দেওয়া হয়েছিল। এই পঙতির অর্থ হলো এই যে - "হরি অর্থাৎ পরমাত্মা হরিয়ালো অর্থাৎ হরিয়ানা প্রদেশে আসবে"। পরমাত্মা যাকে নারায়ণ বলা হয়, তিনি নর অর্থাৎ সাধারণ মানুষের রূপ ধারণ করে আসবে। এমনিতে নারায়ণ শব্দের অর্থ জলে প্রকট হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়, তিনি কেবল কবীর পরমেশ্বরই ছিলেন। এই জন্য পরমাত্মাকে নারায়ণ বলা হয়েছে। ওনার দ্বারা বলা জ্ঞানের আধারে নিরাশ ভক্তদের মনে আশার আলো জাগাবে এবং মুক্তি (মোক্ষের) প্রাপ্ত হবে। এর ভাবার্থ এই যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করার প্রতিফলে সাধক ভক্তি করা সত্ত্বেও সর্বপ্রকার লাভ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে এই জন্য পরমাত্মা হরিয়ানাতে আসবে এবং ওনার দ্বারা বলা শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি সাধনা করে সাধকরা মোক্ষ (মুক্তি) প্রাপ্ত করবে এবং নিরাশায় ডুবে থাকা ভক্তদের মনে আশা জাগবে যে, এখন এখানেও সুখ মিলবে এবং পরলোকেও সুখ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি অবশ্যই হবে। বাণী:- হরি পর হরি কো নাম উপীজৈ।

এই বাণীটিকে এই ভাবে পড়ুন :- হল পল হরি কে নাম জপীজৈ।

"শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজেরও কোন গুরু ছিলেন" (যা পূর্বে লিখে দেওয়া হয়েছে।)

প্রমাণ :- শব্দের বাণী সংখ্যা:- ৯০, ৯১, ৯২

শব্দ সং. ৯০ গুরু সম্বন্ধিত বাণী,গুরু আসন সমরাথলে।

কহৈ সতগুরু ভূল মত জাইয়োঁ পড়োলা অমৈ দোজখে।

শব্দ সং. ৯১ থেকে কিছু অংশ:-

মেরে গুরু জো দীহ্নী শিক্ষা, সর্ব আলিডগংন ফেরী দীক্ষা।
সত সত ভাখত গুরু রায়োঁ জরা মরণ ভয় ভাগু॥

প্রমাণের জন্য পুস্তক "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" - এর সাথে সম্মন্ধিত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার কিছু অধ্যায় এবং শ্লোক যেগুলির হিন্দি অনুবাদ "শ্রী জয়দয়াল গোয়েন্দা" দ্বারা করা হয়েছে এবং ভারতের প্রসিদ্ধ প্রেস "গীতা প্রেস গোরক্ষপুর" (উত্তর প্রদেশ) থেকে প্রকাশিত।

(শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা অধ্যায় ১ এর কোনো শ্লোকই গীতা জ্ঞান দাতার নিজস্ব বলা নয়। তাই এগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।)

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় শ্লোকের ফটোকপি

কথম্, ভীষ্মম্, অহম্, সংখ্যে, দ্রোণম্, চ, মধুসূদন,
ইষুভিঃ, প্রতি, যোৎস্যামি, পূজার্হৌ, অরিসূদন॥ ৪॥

তখন অর্জুন বললেন, –

মধুসূদন	=	হে মধুসূদন!	ইষুভিঃ	=	বাণ দিয়ে
অহম্	=	আমি	যোৎস্যামি	=	যুদ্ধ করব?
সংখ্যে	=	রণভূমিতে	(যতঃ)	=	কেননা
ভীষ্মম্	=	পিতামহ ভীষ্ম	অরিসূদন	=	হে অরিসূদন! শত্রুদমনকারী
চ	=	এবং			
দ্রোণম্	=	দ্রোণাচার্যের	(তৌ)	=	ঐ দুজন (ই)
প্রতি	=	প্রতি (সঙ্গে)	পূজার্হৌ	=	পূজনীয়।
কথম্	=	কী করে			

গুরূন্, অহত্বা, হি, মহানুভাবান্, শ্রেয়ঃ, ভোক্তুম্,
ভৈক্ষ্যম, অপি, ইহ, লোকে, হত্বা, অর্থকামান্, তু, গুরূন্,
ইহ, এব, ভুঞ্জীয়, ভোগান, রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫॥

সেইজন্য এই –

মহানুভাবান্	=	মহানুভব	গুরূন্	=	গুরুজনদের
গুরূন্	=	গুরুজনদিগকে	হত্বা	=	হত্যা করে
অহত্বা	=	হত্যা না করে	(অপি)	=	ও
ইহ	=	এই	ইহ	=	এই লোকে
লোকে	=	লোকে	রুধিরপ্রদিগ্ধান্	=	রুধিরমিশ্রিত
ভৈক্ষ্যম্	=	ভিক্ষালব্ধ অন্ন	অর্থকামান্	=	অর্থ ও কামরূপ
অপি	=	ও	ভোগান্	=	ভোগ (সমূহ)
ভোক্তুম্	=	গ্রহণ করা	এব	=	ই
শ্রেয়ঃ	=	কল্যাণকারক (বিবেচনা করি)	তু	=	তো
			ভুঞ্জীয়	=	ভোগ করব।
হি	=	কেননা			

ন, চ, এতৎ, বিদ্মঃ, কতরম্, নঃ, গরীয়ঃ, যদ্বা, জয়েম,
যদি, বা, নঃ, জয়েয়ুঃ যান্, এব, হত্বা, ন, জিজীবিষামঃ,
তে, অবস্থিতাঃ, প্রমুখে, ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬॥

এবং আমরা –

এতৎ	=	এটি	যৎ, বা	=	অথবা (এটিও জানিনা যে)
চ	=	ও			
ন, বিদ্মঃ	=	জানি না (যে)	জয়েম	=	আমরা জয়ী হবো
নঃ	=	আমাদের	যদি, বা	=	কিংবা
কতরম্	=	কী (করা)	নঃ	=	আমাদেরকে
গরীয়ঃ	=	উচিত	জয়েয়ুঃ	=	ওরা জয় করবে,

	(এবং)	তে	= সে
যান্	= যাদের	এব	= ই
হত্বা	= বধ করে (আমরা)	ধার্তরাষ্ট্রাঃ	= ধৃতরাষ্ট্র–পুত্রেরা
ন, জিজীবিষামঃ	= বেঁচে থাকতেও চাই না	প্রমুখে	= (আমার) সম্মুখে
		অবস্থিতাঃ	= অবস্থান করছে।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ, পৃচ্ছামি, ত্বাম্, ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ,
যৎ, শ্রেয়ঃ, স্যাৎ, নিশ্চিতম্, ব্রূহি, তৎ, মে, শিষ্যঃ, তে,
অহম্, শাধি, মাম্, ত্বাম্, প্রপন্নম্, ॥ ৭॥

অতএব –

কার্পণ্যদোষো–	কাতরতা রূপ	তৎ	= তা
পহত স্বভাবঃ	= দোষে উপহত স্বভাব (এবং) ধর্ম বিষয়ে মোহিত	মে	= আমাকে
		ব্রূহি	= বলো; (কেননা)
		অহম্	= আমি
ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ	= চিত্ত (আমি)	তে	= তোমার
ত্বাম্	= তোমাকে	শিষ্যঃ	= শিষ্য (তাই)
পৃচ্ছামি	= প্রশ্ন করছি	ত্বাম্	= তোমার
যৎ	= যা (আমার পক্ষে)	প্রপন্নম্	= শরণাগত
নিশ্চিতম্	= নিশ্চিত	মাম্	= আমাকে (উচিত)
শ্রেয়ঃ	= কল্যাণকারী	শাধি	= শিক্ষা দাও।
স্যাৎ	= হবে		

ন, তু, এব, অহম্, জাতু, ন, আসম্, ন, ত্বম্, ন, ইমে, জনাধিপাঃ,
ন, চ, এব, ন, ভবিষ্যামঃ, সর্বে, বয়ম্, অতঃ, পরম্॥ ১২॥

কেননা আত্মা নিত্য, এই জন্য শোক করা অনুচিত। বাস্তবিক পক্ষে–

ন	= না	জনাধিপাঃ	= রাজারা
তু	= তো	ন (আসন্)	= ছিলেন না।
(এবম্)	= এইরূপ	চ	= আর
এব	= ই (হয়) (যে)	ন (এবম্)	= এও নয়
অহম্	= আমি	এব	= যে
জাতু	= কোনও কালে	অতঃ	= এর
ন, আসম্	= ছিলাম না (অথবা)	পরম্	= পরে
ত্বম্	= তুমি	বয়ম্	= আমরা
ন (আসীঃ)	= ছিলে না (অথবা)	সর্বে	= সকলে
ইমে	= এই	ন, ভবিষ্যামঃ	= থাকব না।

অবিনাশি, তু, তৎ, বিদ্ধি, যেন, সর্বম্, ইদম, ততম্, বিনাশম্,
অব্যয়স্য, অস্য, ন, কশ্চিৎ, কর্তুম্, অর্হতি॥ ১৭॥

এই ন্যায়ানুসারে–

অবিনাশি	=	নাশ রহিত			(কেননা)
তু	=	তো	অস্য	=	এই
তৎ	=	তাকে	অব্যয়স্য	=	অবিনাশীর
বিদ্ধি	=	জানো,	বিনাশম্	=	বিনাশ
যেন	=	যার দ্বারা	কর্তুম	=	করতে
ইদম্	=	এই	কশ্চিৎ	=	কেউই
সর্বম্	=	সম্পূর্ণ (জগৎ)	ন, অর্হতি	=	সমর্থ হয় না।
ততম্	=	ব্যাপ্ত রয়েছে			

বাসাংসি, জীর্ণানি, যথা, বিহায়, নবানি, গৃহ্নাতি,
নরঃ, অপরাণি, তথা, শরীরাণি, বিহায়,
জীর্ণানি, অন্যানি, সংযাতি, নবানি, দেহী ॥ ২২॥

এবং যদি তুমি বলো যে 'আমি শরীর বিয়োগের জন্য শোক করছি' তবে এটাও উচিত নয়, কেননা –

যথা	=	যেরূপ	তথা	=	সেইরূপ
নরঃ	=	মানুষ	দেহী	=	জীবাত্মা
জীর্ণানি	=	পুরনো	জীর্ণানি	=	পুরাতন
বাসাংসি	=	বস্ত্রগুলি	শরীরাণি	=	শরীরগুলি
বিহায়	=	ত্যাগ করে	বিহায়	=	ত্যাগ করে
অপরাণি	=	অন্য	অন্যানি	=	অন্য
নবানি	=	নূতন (বস্ত্র)	নবানি	=	নূতন (শরীর)
গৃহ্নাতি	=	গ্রহণ করে,	সংযাতি	=	প্রাপ্ত হয়।

জাতস্য, হি, ধ্রুবঃ, মৃত্যুঃ, ধ্রুবম্, জন্ম, মৃতস্য, চ, তস্মাৎ,
অপরিহার্যে, অর্থে, ন, ত্বম, শোচিতুম্, অর্হসি ॥ ২৭॥

হি	=	কেননা (এরূপ হলে তো)	জন্ম	=	জন্ম (হওয়া সিদ্ধ হয়)
জাতস্য	=	জাত ব্যক্তির	তস্মাৎ	=	সেইজন্য
মৃত্যুঃ	=	মৃত্যু	ত্বম্	=	তুমি (এই)
ধ্রুবঃ	=	নিশ্চিত	অপিরহার্যে	=	অপরিহার্য
চ	=	এবং	অর্থে	=	বিষয়ে
মৃতস্য	=	মৃতের	শোচিতুম্	=	শোক করতে
ধ্রুবম্	=	নিশ্চিত	ন, অর্হসি	=	পারো না।

হতঃ, বা, প্রাপ্স্যসি, স্বর্গম্, জিত্বা, বা, ভোক্ষ্যসে, মহীম্,
তস্মাৎ, উত্তিষ্ঠ, কৌন্তেয়, যুদ্ধায়, কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭॥

এই সব কারণে যুদ্ধ করাই তোমার পক্ষে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ, কেন না যুদ্ধে –

হতঃ	=	নিহত হলে	প্রাপ্স্যসি	=	প্রাপ্ত হবে
বা	=	হয় (তুমি)	বা	=	অথবা
স্বর্গম্	=	স্বর্গ	জিত্বা	=	জয় করে

মহীম্ = পৃথিবীকে
ভোক্ষ্যসে = ভোগ করবে।
তস্মাৎ = সেইজন্য
কৌন্তেয় = হে অর্জুন!
যুদ্ধায় = যুদ্ধের জন্য
কৃতনিশ্চয়ঃ = দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে
উত্তিষ্ঠ = ওঠে পড়।

সুখদুঃখে, সমে, কৃত্বা, লাভালাভৌ, জয়াজয়ৌ, ততঃ,
যুদ্ধায়, যুজ্যস্ব, ন, এবম্, পাপম্, অবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

যদি তোমার স্বর্গ অথবা রাজ্যের ইচ্ছা না থাকে তবুও –

জয়াজয়ৌ = জয়পরাজয়
লাভালাভৌ = লাভহানি, (এবং)
সুখদুঃখে = সুখদুঃখকে
সমে = সমান
কৃত্বা = জ্ঞান করে
ততঃ = তদনন্তর
যুদ্ধায় = যুদ্ধের জন্য
যুজ্যস্ব = প্রস্তুত হও,
এবম্ = এই ভাবে (যুদ্ধ করলে তুমি)
পাপম্ = পাপ
ন, অবাপ্স্যসি = প্রাপ্ত হবে না।

যাবান্, অর্থঃ, উদপানে, সর্বতঃ, সংপ্লুতোদকে,
তাবান্, সর্বেষু, বেদেষু, ব্রাহ্মণস্য, বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

কেন না –

সর্বতঃ = (মানুষের) সকল দিক থেকে
সংপ্লুতোদকে = পরিপূর্ণ জলাশয়
(প্রাপ্তে সতি) = প্রাপ্ত হলে
উদপানে = ছোট জলাশয়ে
যাবান্ = যতটা
অর্থঃ = প্রয়োজন
(অস্তি) = থাকে,
বিজানতঃ = উত্তমরূপে ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট
ব্রাহ্মণস্য = ব্রাহ্মণের (ও)
সর্বেষু = সব
বেদেষু = বেদেতে
তাবান্ = ততটা প্রয়োজন থাকে।

কর্মজম্, বুদ্ধিযুক্তাঃ, হি, ফলম্, ত্যক্ত্বা, মনীষিণঃ,
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ, পদম্, গচ্ছন্তি, অনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

হি = কেননা
বুদ্ধিযুক্তাঃ = বুদ্ধিযোগযুক্ত
মনীষিণঃ = জ্ঞানীজন
কর্মজম্ = কর্ম থেকে উৎপন্ন
ফলম্ = ফলকে (ফলের ইচ্ছাকে)
ত্যক্ত্বা = ত্যাগ করে
জন্মবন্ধ– বিনির্মুক্তাঃ = জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে
অনাময়ম্ = নির্দোষ অর্থাৎ অমৃতময়
পদম্ = পরমপদ
গচ্ছন্তি = প্রাপ্ত হন।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না, তে, যদা, স্থাস্যতি, নিশ্চলা,
সমাধৌ, অচলা, বুদ্ধিঃ, তদা, যোগম্, অবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

এবং –

যদা	= যখন
তে	= তোমার
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না	= অনেক প্রকার সিদ্ধান্ত শ্রবণে বিচলিত
বুদ্ধিঃ	= বুদ্ধি
সমাধৌ	= পরমাত্মার স্বরূপে
অচলা	= অচলা (এবং)
নিশ্চলা	= স্থির
স্থাস্যতি	= হবে,
তদা	= তখন (তুমি)
যোগম্	= সমত্বরূপ যোগ
অবাপ্স্যসি	= প্রাপ্ত হবে।

বিষয়াঃ, বিনিবর্তন্তে, নিরাহারস্য, দেহিনঃ,
রসবর্জম্, রসঃ, অপি, অস্য, পরম্, দৃষ্ট্বা, নিবর্ততে॥ ৫৯॥

যদিও –

	(ইন্দ্রিয় দ্বারা)
নিরাহারস্য	= বিষয় গ্রহণ করে না এরূপ
দেহিনঃ	= পুরুষের (ও) (কেবল)
বিষয়াঃ	= বিষয়গুলি
বিনিবর্তন্তে	= নিবৃত্ত হয়ে বটে (তবুও)
রসবর্জম্	= রাগ (আসক্তি)
	নিবৃত্ত হয় না (আর)
অস্য	= এই (স্থিতপ্রজ্ঞ) পুরুষের
রসঃ	= রাগ (আসক্তি)
অপি	= ও
পরম্	= পরমাত্মাকে
দৃষ্ট্বা	= সাক্ষাৎ করে
নিবর্ততে	=নিবৃত্ত হয়ে যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৩ এর শ্লোকের কিছু ফটোকপি

তৃতীয় অধ্যায়

জ্যায়সী, চেৎ, কর্মণঃ, তে, মতা, বুদ্ধিঃ, জনার্দন,
তৎ, কিম্, কর্মণি, ঘোরে, মাম্, নিয়োজয়সি, কেশব॥ ১॥

এর পর অর্জুন প্রশ্ন করলেন যে –

জনার্দন	= হে জনার্দন!
চেৎ	= যদি
কর্মণঃ	= কর্ম অপেক্ষা
বুদ্ধিঃ	= জ্ঞান
জ্যায়সী	= শ্রেষ্ঠ
তে	= আপনার (এই)
মতা	= অভিমত,
তৎ	= তবে
কেশব	= হে কেশব!
মাম্	= আমাকে
ঘোরে	= ঘোর
কর্মণি	= কর্মে
কিম্	= কেন
নিয়োজয়সি	= নিযুক্ত করছেন।

ব্যামিশ্রেণ, ইব, বাক্যেন, বুদ্ধিম্, মোহয়সি, ইব, মে,
তৎ, একম্, বদ, নিশ্চিত্য, যেন, শ্রেয়ঃ, অহম্, আপ্নুয়াম্॥ ২॥

এবং আপনি –

ব্যামিশ্রেণ = মিশ্র
ইব = প্রায়
বাক্যেন = বাক্যের দ্বারা
মে = আমার
বুদ্ধিম্ = বুদ্ধিকে
মোহয়সি, ইব = { যেন মোহিত করছেন, (অতএব)
তৎ = সেই

একম্ = একরকম (বাক্য)
নিশ্চিত্য = নিশ্চয় করে
বদ = বলুন
যেন = যার দ্বারা
অহম্ = আমি
শ্রেয়ঃ = শ্রেয়
আপ্নুয়াম্ = লাভ করতে পারি।

শ্রীভগবানুবাচ –

লোকে, অস্মিন্, দ্বিবিধা, নিষ্ঠা, পুরা, প্রোক্তা, ময়া, অনঘ,
জ্ঞানযোগেন, সাংখ্যানাম্, কর্মযোগেন, যোগিনাম্॥ ৩॥

এই প্রকার অর্জুন জিজ্ঞাসা করলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন –

অনঘ = হে নিষ্পাপ (অর্জুন)!
অস্মিন্ = এই
লোকে = লোকে
দ্বিবিধা = দুই প্রকার
নিষ্ঠা = নিষ্ঠা
ময়া = আমার দ্বারা
পুরা = পূর্বে

প্রোক্তা = { কথিত হয়েছে, (তন্মধ্যে)
সাংখ্যানাম্ = জ্ঞানীদের (নিষ্ঠা)
জ্ঞানযোগেন = জ্ঞানযোগে (এবং)
যোগিনাম্ = যোগীদের (নিষ্ঠা)
কর্মযোগেন = { নিষ্কাম কর্মযোগে হয়ে থাকে।

ন, কর্মণাম্, অনারম্ভাৎ, নৈষ্কর্ম্যম্, পুরুষঃ, অশ্নুতে,
ন, চ, সন্ন্যসনাৎ, এব, সিদ্ধিম্, সমধিগচ্ছতি॥ ৪॥

কিন্তু কোনও যোগেই কর্মকে বাহ্যতঃ পরিত্যাগ করার আবশ্যকতা নেই কেননা–

পুরুষঃ = মানুষ
কর্মণাম্ = কর্মসমূহের
অনারম্ভাৎ = আরম্ভ না করলে
নৈষ্কর্ম্যম্ = নিষ্কর্মতাকে
ন, অশ্নুতে = লাভ করে না

চ = আর
সন্ন্যসনাৎ, এব = { কর্ম সকল পরিত্যাগ করলেই
সিদ্ধিম্ = সিদ্ধি (সাংখ্যনিষ্ঠা)
ন, সমধিগচ্ছতি = লাভ করে না।

ন, হি, কশ্চিৎ, ক্ষণম্, অপি, জাতু, তিষ্ঠতি, অকর্মকৃৎ।
কার্যতে, হি, অবশঃ, কর্ম, সর্বঃ, প্রকৃতিজৈঃ, গুণৈঃ॥ ৫॥

এবং সর্বতোভাবে কর্মের বাহ্যতঃ ত্যাগ হতেও পারে না –

হি = কেননা
কশ্চিৎ = কোনও (পুরুষ)
জাতু = কখনো
ক্ষণম্ = ক্ষণমাত্র
অপি = ও
অকর্মকৃৎ = কর্ম না করে

ন, তিষ্ঠতি = থাকতে পারে না;
হি = নিঃসন্দেহে
সর্বঃ = { সকলেই (মনুষ্যমাত্রই)
প্রকৃতিজৈঃ = { প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন

গুণৈঃ	=	গুণসমূহ দ্বারা	কর্ম	=	কর্ম
অবশঃ	=	পরবশ (হয়ে)	কার্যতে	=	করে থাকে।

কর্মেন্দ্রিয়াণি, সংযম্য, যঃ, আস্তে, মনসা, স্মরন্,
ইন্দ্রিয়ার্থান্, বিমূঢ়াত্মা, মিথ্যাচারঃ, সঃ, উচ্যতে॥ ৬॥
এইজন্য –

যঃ	=	যে	মনসা	=	মনের দ্বারা
বিমূঢ়াত্মা	=	মূঢ়বুদ্ধি পুরুষ	স্মরন্	=	স্মরণ করতে
কর্মেন্দ্রিয়াণি	=	কর্মেন্দ্রিয়সকল (হঠকারিতা পূর্বক)	আস্তে	=	থাকে,
			সঃ	=	সে
সংযম্য	=	রোধ করে	মিথ্যাচারঃ	=	মিথ্যাচারী অর্থাৎ দাম্ভিক (নামে)
ইন্দ্রিয়ার্থান্	=	ইন্দ্রিয়াদির ভোগসমূহ	উচ্যতে	=	কথিত হয়।

[নিষ্কাম কর্মযোগীর প্রশংসা।]

যঃ, তু, ইন্দ্রিয়াণি, মনসা, নিয়মা, আরভতে, অর্জুন,
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ, কর্মযোগম্, অসক্তঃ, সঃ, বিশিষ্যতে॥ ৭॥

তু	=	এবং	অসক্তঃ	=	অনাসক্ত হয়ে
অর্জুন	=	হে অর্জুন!	কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ	=	কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা
যঃ	=	যে (পুরুষ)	কর্মযোগম্	=	কর্মযোগের
মনসা	=	মনের দ্বারা	আরভতে	=	আচরণ করে,
ইন্দ্রিয়াণি	=	ইন্দ্রিয়সকল	সঃ	=	সেই
নিয়ম্য	=	বশ করে	বিশিষ্যতে	=	শ্রেষ্ঠ।

নিয়তম্, কুরু, কর্ম, ত্বম্, কর্ম, জ্যায়ঃ, হি, অকর্মণঃ,
শরীরযাত্রা, অপি, চ, তে ন, প্রসিদ্ধ্যেৎ, অকর্মণঃ॥ ৮॥
এই নিমিত্ত –

ত্বম্	=	তুমি	জ্যায়ঃ	=	শ্রেষ্ঠ
নিয়তম্	=	শাস্ত্রবিধি দ্বারা বিহিত	চ	=	এবং
			অকর্মণঃ	=	কর্ম না করলে
কর্ম	=	স্বধর্মরূপ কর্ম	তে	=	তোমার
কুরু	=	পালন করো,	শরীরযাত্রা	=	শরীরনির্বাহ
হি	=	কেননা	অপি	=	ও
অকর্মণঃ	=	কর্ম না করা অপেক্ষা	ন, প্রসিদ্ধ্যেৎ	=	সিদ্ধ হবে না।
কর্ম	=	কর্ম করা			

যজ্ঞার্থাৎ, কর্মণঃ, অন্যত্র, লোকঃ, অয়ম্, কর্মবন্ধনঃ,
তদর্থম্, কর্ম, কৌন্তেয়, মুক্তসঙ্গঃ, সমাচর॥ ৯॥

যজ্ঞার্থাৎ	=	যজ্ঞের নিমিত্ত কৃত
কর্মণঃ	=	কর্মভিন্ন
অন্যত্র	=	অন্যকর্মে (সংযুক্ত)
অয়ম্	=	এই
লোকঃ	=	মানুষ
কর্মবন্ধনঃ	=	কর্মসমূহ দ্বারা বদ্ধ
		হয়, (অতএব)
কৌন্তেয়	=	হে অর্জুন! (তুমি)
মুক্তসঙ্গঃ	=	আসক্তি রহিত হয়ে
তদর্থম্	=	সেই যজ্ঞের নিমিত্ত
কর্ম	=	কর্ম
সমাচর	=	উত্তমরূপে পালন করো।

সহযজ্ঞাঃ, প্রজাঃ, সৃষ্ট্বা, পুরা, উবাচ, প্রজাপতিঃ,
অনেন, প্রসবিষ্যধ্বম্, এষঃ, বঃ, অস্তু, ইষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

প্রজাপতিঃ	=	প্রজাপতি (ব্রহ্মা)
পুরা	=	সৃষ্টি কালে
সহযজ্ঞাঃ	=	যজ্ঞের সঙ্গেই
প্রজাঃ	=	প্রজা সকল
সৃষ্ট্বা	=	সৃষ্টি করে
উবাচ	=	বলছেন যে,
অনেন	=	এই যজ্ঞ দ্বারা
প্রসবিষ্যধ্বম্	=	(তোমরা) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও (এবং)
এষঃ	=	এই যজ্ঞ
বঃ	=	তোমাদের
ইষ্টাকামধুক্	=	ঈপ্সিত কাম্যবস্তু প্রদানকারী
অস্তু	=	হোক।

দেবান্, ভাবয়ত, অনেন, তে, দেবাঃ, ভাবয়ন্তু, বঃ,
পরস্পরম্, ভাবয়ন্তঃ, শ্রেয়ঃ, পরম্, অবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

এবং তোমরা –

অনেন	=	এই যজ্ঞদ্বারা
দেবান্	=	দেবতাদের
ভাবয়ত	=	সংবর্ধন করো (আর)
তে	=	ঐ
দেবাঃ	=	দেবতারা
বঃ	=	তোমাদের
ভাবয়ন্তু	=	সংবর্ধিত করুন।
(এবম্)	=	এই প্রকার
		(নিঃস্বার্থভাবে)
পরস্পরম্	=	পরস্পর (একে অপরকে)
ভাবয়ন্তঃ	=	উন্নত করে (তোমরা)
পরম্	=	পরম
শ্রেয়ঃ	=	কল্যাণ
অবাপ্স্যথ	=	লাভ করবে।

ইষ্টান্, ভোগান্, হি, বঃ, দেবাঃ, দাস্যন্তে, যজ্ঞভাবিতাঃ,
তৈঃ, দত্তান্, অপ্রদায়, এভ্যঃ, যঃ, ভুঙ্‌ক্তে, স্তেনঃ, এব, সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞভাবিতাঃ	=	যজ্ঞদ্বারা সংবর্ধিত
দেবাঃ	=	দেবতাগণ
বঃ	=	তোমাদের (বিনা যাচনাতেই)
ইষ্টান্	=	ইষ্ট (আকাঙ্ক্ষিত)
ভোগান্	=	ভোগসমূহ
দাস্যন্তে	=	প্রদান করবেন
তৈঃ	=	তাঁদের দ্বারা
দত্তান্	=	প্রদত্ত ভোগ সমূহ
এভ্যঃ	=	তাঁদের
অপ্রদায়	=	উৎসর্গ না করে
হি	=	ই
যঃ	=	যে
ভুঙ্‌ক্তে	=	ভোগ করে,
সঃ	=	সেই ব্যক্তি
এব	=	নিশ্চয়ই
স্তেনঃ	=	চোর।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ, সন্তঃ, মুচ্যন্তে, সর্বকিল্বিষৈঃ,

ভুঞ্জতে, তে, তু অঘম্, পাপাঃ, যে, পচন্তি, আত্মকারণাৎ॥ ১৩॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ	= যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের ভোক্তা	আত্মকারণাৎ	= নিজেদের (শরীর পোষণের) জন্যই
সন্তঃ	= শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ	পচন্তি	= পাক করে
সর্বকিল্বিষৈঃ	= সকল পাপ থেকে	তে	= তারা
মুচ্যন্তে	= মুক্ত হন (এবং)	তু	= তো
যে	= যে সকল	অঘম্	= পাপকেই
পাপাঃ	= পাপী	ভুঞ্জতে	= ভক্ষণ করে।

অন্নাৎ, ভবন্তি, ভূতানি, পর্জন্যাৎ, অন্নসম্ভবঃ,
যজ্ঞাৎ, ভবতি, পর্জন্যঃ, যজ্ঞঃ, কর্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥
যেহেতু –

ভূতানি	= প্রাণীসকল	পর্জন্যঃ	= বৃষ্টি
অন্নাৎ	= অন্ন থেকে	ভবতি	= হয়
ভবন্তি	= উৎপন্ন হয় (এবং)	যজ্ঞাৎ	= যজ্ঞ দ্বারা (এবং)
অন্নসম্ভবঃ	= অন্নের উৎপত্তি	যজ্ঞঃ	= যজ্ঞ
পর্জন্যাৎ	= হয় বৃষ্টি থেকে (আর)	কর্মসমুদ্ভবঃ	= কর্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

কর্ম, ব্রহ্মোদ্ভবম্, বিদ্ধি, ব্রহ্ম, অক্ষরসমুদ্ভবম্,
তস্মাৎ, সর্বগতম্, ব্রহ্ম, নিত্যম্, যজ্ঞে, প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥

কর্ম	= কর্মকে (তুমি)	তস্মাৎ	= সেইজন্য
ব্রহ্মোদ্ভবম্	= বেদ থেকে উৎপন্ন ‘বলে’	সর্বগতম্	= সর্বব্যাপী
		ব্রহ্ম	= পরম অক্ষর (পরমাত্মা)
বিদ্ধি	= জানবে (আর)		
ব্রহ্ম	= বেদ	নিত্যম্	= সর্বদাই (নিত্য)
অক্ষর–সমুদ্ভবম্	= অবিনাশী (পরমাত্মা) থেকে উৎপন্ন (বলে জানবে)	যজ্ঞে	= যজ্ঞে
		প্রতিষ্ঠিতম্	= প্রতিষ্ঠিত।

এবম্, প্রবর্তিতম্, চক্রম্, ন, অনুবর্তয়তি, ইহ, যঃ,
অঘায়ুঃ, ইন্দ্রিয়ারামঃ, মোঘম্, পার্থ, সঃ, জীবতি॥ ১৬॥

পার্থ	= হে পার্থ!	চক্রম্	= সৃষ্টিচক্র
যঃ	= যে পুরুষ	ন, অনুবর্তয়তি	= অনুসরণ না করে (অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে কর্ম করে না),
ইহ	= এই লোকে		
এবম্	= এই প্রকার		
প্রবর্তিতম্	= প্রবর্তিত	সঃ	= সেই

ইন্দ্রিয়ারামঃ = ইন্দ্রিয়সুখভোগী
অঘায়ুঃ = পাপ–আয়ু (পাপ–জীবন পুরুষ)
মোঘম্ = ব্যর্থই
জীবতি = জীবন ধারণ করে।

তস্মাৎ, অসক্তঃ, সততম্, কার্যম্, কর্ম, সমাচর,
অসক্তঃ, হি, আচরন্, কর্ম, পরম্, আপ্নোতি, পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ = সেইজন্য (তুমি)
সততম্ = নিরন্তর
অসক্তঃ = অনাসক্ত থেকে
কার্যম্ = কর্তব্য
কর্ম = কর্ম
সমাচর = উত্তমরূপে আচরণ করো।
হি = কেননা
অসক্তঃ = অনাসক্ত হয়ে
কর্ম = (কর্তব্য) কর্ম
আচরণ্ = পালনকারী
পূরুষঃ = পুরুষ
পরম্ = পরমাত্মাকে
আপ্নোতি = লাভ করে।

যদি, হি, অহম্, ন, বর্তেয়ম্, জাতু, কর্মণি, অতন্দ্রিতঃ,
মম, বর্ত্ম, অনুবর্তন্তে, মনুষ্যাঃ, পার্থ, সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥

হি = কেননা
পার্থ = হে অর্জুন!
যদি = যদি
জাতু = কদাচিৎ
অহম্ = আমি
অতন্দ্রিতঃ = সর্তক হয়ে
কর্মণি = কর্মে
ন = না
বর্তেয়ম্ = প্রবৃত্ত হই (তবে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে, কেননা)
মনুষ্যাঃ = মানুষেরা
সর্বশঃ = সর্বপ্রকারে
মম = আমার
বর্ত্ম = আচরিত পথ
অনুবর্তন্তে = অনুসরণ করবে।

ন, বুদ্ধিভেদম্, জনয়েৎ, অজ্ঞানাম্, কর্মসঙ্গিনাম্,
জোষয়েৎ, সর্বকর্মাণি, বিদ্বান্, যুক্তঃ, সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

এবং –

যুক্তঃ = পরমাত্মার স্বরূপে অটলভাবে স্থিত
বিদ্বান্ = জ্ঞানীপুরুষের (উচিত যে)
কর্মসঙ্গিনাম্ = কর্মে আসক্তিযুক্ত
অজ্ঞানাম্ = অজ্ঞানীদের
বুদ্ধিভেদম্ = বুদ্ধিতে ভ্রম, ভেদ অর্থাৎ কর্মে অশ্রদ্ধা
ন, জনয়েৎ = উৎপন্ন না করে (কিন্তু স্বয়ং)
সর্বকর্মাণি = সকল কর্ম
সমাচরন্ = উত্তম প্রকারে আচরণ করে (এদের অর্থাৎ অজ্ঞানীদেরও সেই প্রকার)
জোষয়েৎ = কর্মে নিযুক্ত রাখবেন।

যে, মে, মতম্, ইদম্, নিত্যম্, অনুতিষ্ঠন্তি, মানবাঃ,
শ্রদ্ধাবন্তঃ, অনসূয়ন্তঃ, মুচ্যন্তে, তে, অপি, কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

আর হে অর্জুন, –

যে	= যে কোনো	নিত্যম্	= সদা (ই)
মানবাঃ	= মানুষ	অনুতিষ্ঠন্তি	= অনুসরণ করেন
অনসূয়ন্তঃ	= দোষবুদ্ধিরহিত (এবং)	তে	= তিনি
		অপি	= ও
শ্রদ্ধাবন্তঃ	= শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে	কর্মভিঃ	= সকল কর্ম থেকে
মে	= আমার	মুচ্যন্তে	= মুক্ত হয়ে যান।
ইদম্	= এই		
মতম্	= মতকে		

শ্রেয়ান্, স্বধর্মঃ, বিগুণঃ, পরধর্মাৎ, স্বনুষ্ঠিতাৎ,
স্বধর্মে, নিধনম্, শ্রেয়ঃ, পরধর্মঃ, ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

তাই ঐ দুটিকে জয় করে সাবধান হয়ে স্বধর্মাচরণ কর্তব্য, কেননা –

স্বনুষ্ঠিতাৎ	= উত্তম রূপে আচরিত	স্বধর্মে	= নিজ ধর্মে
পরধর্মাৎ	= পরধর্ম থেকে	নিধনম্	= মৃত্যু (ও)
বিগুণঃ	= গুণরহিত (ও)	শ্রেয়ঃ	= শ্রেয়ঃ (আর)
স্বধর্মঃ	= নিজ ধর্ম	পরধর্মঃ	= পরের ধর্ম
শ্রেয়ান্	= অতি উত্তম	ভয়াবহঃ	= ভয়প্রদ।

ইন্দ্রিয়াণি, পরাণি, আহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ, পরম্, মনঃ,
মনসঃ, তু, পরা, বুদ্ধিঃ, যঃ, বুদ্ধেঃ, পরতঃ, তু, সঃ ॥ ৪২ ॥

আর যদি তুমি মনে করো যে ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করে কামরূপ শত্রুকে নাশ করবার শক্তি আমার নেই, তবে এ তোমার ভ্রম, কেননা –

ইন্দ্রিয়াণি	= ইন্দ্রিয়াদি (স্থুল শরীর থেকে)	মনসঃ	= মন থেকে
		পরা	= শ্রেষ্ঠ (হল)
পরাণি	= পর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, বলবান্ এবং সূক্ষ্ম)	বুদ্ধিঃ	= বুদ্ধি,
		তু	= এবং
আহুঃ	= কথিত হয়, (এবং)	যঃ	= যে
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ	= ইন্দ্রিয়গণ থেকে	বুদ্ধেঃ	= বুদ্ধি থেকেও
পরম্	= শ্রেষ্ঠ	পরতঃ	= অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ,
মনঃ	= মন,	সঃ	= সেই হল (আত্ম)।
তু	= আর		

এবম্, বুদ্ধেঃ, পরম্, বুদ্ধ্বা, সংস্তভ্য, আত্মানম্, আত্মনা,
জহি, শত্রুম্, মহাবাহো, কামরূপম্, দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

এবম্	= এই প্রকার	পরম্	= পর অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং সর্ব প্রকারে
বুদ্ধেঃ	= বুদ্ধি থেকে		

		{বলবান ও শ্রেষ্ঠ স্বীয় আত্মাকে			{(নিজের শক্তিকে জেনে তুমি)
বুদ্ধা	=	জেনে (আর)	কামরূপম্	=	কামরূপ
আত্মনা	=	বুদ্ধি দ্বারা	দুরাসদম্	=	(এই) দুর্জয়
আত্মানম্	=	মনকে	শত্রুম্	=	শত্রুকে
সংস্তভ্য	=	বশ করে	জহি	=	নাশ করো।
মহাবাহো	=	হে মহাবাহো!			

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোকের ফটোকপি

চতুর্থ অধ্যায়

ইমম্, বিবস্বতে, যোগম্, প্রোক্তবান্, অহম্, অব্যয়ম্,
বিবস্বান্, মনবে, প্রাহ, মনুঃ, ইক্ষ্বাকবে, অব্রবীৎ॥ ১॥

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন –

অহম্	=	আমি	বিবস্বান্	=	সূর্য (নিজপুত্র)
ইমম্	=	এই	মনবে	=	মনুকে
অব্যয়ম্	=	অবিনাশী	প্রাহ	=	বলেছেন (আর)
যোগম্	=	যোগ (কল্পের আদিতে)	মনুঃ	=	মনু (স্বীয়পুত্র)
বিবস্বতে	=	সূর্যকে	ইক্ষ্বাকবে	=	রাজা ইক্ষ্বাকুকে
প্রোক্তবান্	=	বলেছিলাম (এবং)	অব্রবীৎ	=	বলেছেন।

এবম্, পরম্পরাপ্রাপ্তম্, ইমম্, রাজর্ষয়ঃ, বিদুঃ,
সঃ, কালেন, ইহ, মহতা, যোগঃ, নষ্টঃ, পরন্তপ॥ ২॥

এবম্	=	এইপ্রকার	পরন্তপ	=	হে অর্জুন!
পরম্পরা প্রাপ্তম্	=	পরম্পরারূপে প্রাপ্ত	সঃ	=	ওই
			যোগঃ	=	যোগ
ইমম্	=	এই যোগকে	মহতা	=	সুদীর্ঘ
রাজর্ষয়ঃ	=	রাজর্ষিগণ	কালেন	=	কাল থেকে
বিদুঃ	=	{জেনেছিলেন (কিন্তু)	ইহ	=	এই পৃথিবীলোকে
			নষ্টঃ	=	লুপ্ত (প্রায়) ছিল।

সঃ, এব, অয়ম্, ময়া, তে, অদ্য, যোগঃ, প্রোক্তঃ, পুরাতনঃ,
ভক্তঃ, অসি, মে, সখা, চ, ইতি, রহস্যম্, হি, এতৎ, উত্তমম্॥৩॥

মে	=	(তুমি) আমার	এব	=	ই
ভক্তঃ	=	ভক্ত	অয়ম্	=	এই
চ	=	এবং	পুরাতনঃ	=	পুরাতন
সখা	=	প্রিয় সখা	যোগঃ	=	যোগ
অসি	=	হও	অদ্য	=	এখন
ইতি	=	এর নিমিত্ত	ময়া	=	আমার দ্বারা
সঃ	=	সেই	তে	=	তোমাকে

প্রোক্তঃ = বলা হল,
হি = কেননা
এতৎ = এই যোগ
উত্তমম্ = অতি উত্তম

রহস্যম্ = রহস্য পূর্ণ অর্থাৎ অতিশয় রহস্যের বিষয়।

অপরম্, ভবতঃ, জন্ম, পরম্, জন্ম, বিবস্বতঃ,
কথম্, এতৎ, বিজানীয়াম্, ত্বম্, আদৌ, প্রোক্তবান্, ইতি ॥ ৪ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার কথা শুনে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু, –

ভবতঃ = আপনার
জন্ম = জন্ম
অপরম্ = বর্তমানে অর্থাৎ এখন হয়েছে (এবং)
বিবস্বতঃ = সূর্যের
জন্ম = জন্ম
পরম্ = অত্যন্ত পুরাতন (অতএব)

এতৎ = এই যোগকে
আদৌ = কল্পাদিতে
ত্বম্ = আপনি
প্রোক্তবান্ = বলেছিলেন,
ইতি = এ (আমি)
কথম্ = কী প্রকারে
বিজানীয়াম্ = জানব?

বহূনি, মে, ব্যতীতানি, জন্মানি, তব, চ, অর্জুন,
তানি, অহম্, বেদ, সর্বাণি, ন, ত্বম্, বেত্থ, পরন্তপ ॥ ৫ ॥

এর উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন –

পরন্তপ = হে পরন্তপ
অর্জুন = হে অর্জুন!
মে = আমার
চ = এবং
তব = তোমার
বহূনি = অনেক
জন্মানি = জন্ম
ব্যতীতানি = অতীত হয়ে গেছে (কিন্তু)

তানি = ঐ
সর্বাণি = সকল (জন্মের কথা)
ত্বম্ = তুমি
ন, বেত্থ = জানো না, (কিন্তু)
অহম্ = আমি
বেদ = জানি।

অজঃ, অপি, সন্, অব্যয়াত্মা, ভূতানাম্, ঈশ্বরঃ, অপি, সন্,
প্রকৃতিম্, স্বাম্, অধিষ্ঠায়, সম্ভবামি, আত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

এবং আমার জন্ম প্রাকৃত মানুষের মত নয় –

অজঃ = (আমি) জন্মরহিত
অব্যয়াত্মা = (এবং) অবিনাশী স্বরূপ
সন্ = হয়ে
অপি = ও (তথা)
ভূতানাম্ = সর্বপ্রাণীর

ঈশ্বরঃ = ঈশ্বর
সন্ = হয়ে
অপি = ও
স্বাম্ = স্বীয়
প্রকৃতিম্ = প্রকৃতিকে
অধিষ্ঠায় = বশীভূত করে

আত্মমায়য়া	=	যোগমায়া বা আত্মমায়ার দ্বারা	সম্ভবামি	=	আবির্ভূত হই।

যদা, যদা, হি, ধর্মস্য, গ্লানিঃ, ভবতি, ভারত,
অভ্যুত্থানম্, অধর্মস্য, তদা, আত্মানম্, সৃজামি, অহম্॥ ৭॥

ভারত	=	হে ভারত (অর্জুন)!	ভবতি	=	হয়
যদা	=	যখন	তদা	=	তখন
যদা	=	যখন	হি	=	ই
ধর্মস্য	=	ধর্মের	অহম্	=	আমি
গ্লানিঃ	=	হানি (এবং)	আত্মানম্	=	নিজরূপের
অধর্মস্য	=	অধর্মের	সৃজামি	=	সৃষ্টি করি অর্থাৎ আবির্ভূত হই।
অভ্যুত্থানম্	=	অভ্যুত্থান			

পরিত্রাণায়, সাধূনাম্, বিনাশায়, চ, দুষ্কৃতাম্,
ধর্মসংস্থাপনার্থায়, সম্ভবামি, যুগে, যুগে॥ ৮॥

অবতার গ্রহণের কারণ হ'ল –

সাধুনাম্	=	সাধু পুরুষগণের	ধর্মসংস্থাপ–নার্থায়	=	ধর্ম স্থাপন করবার জন্য (আমি)
পরিত্রাণায়	=	উদ্ধার করবার জন্য	যুগে	=	যুগে
চ	=	এবং	যুগে	=	যুগে
দুষ্কৃতাম্	=	পাপাচারীদের	সম্ভবামি	=	আবির্ভূত হই।
বিনাশায়	=	বিনাশ করবার জন্য (তথা)			

জন্ম, কর্ম, চ, মে, দিব্যম্, এবম্, যঃ, বেত্তি, তত্ত্বতঃ,
ত্যক্ত্বা, দেহম্, পুনঃ, জন্ম, ন, এতি, মাম্, এতি, সঃ, অর্জুন॥ ৯॥

এই নিমিত্ত –

অর্জুন	=	হে অর্জুন!	বেত্তি	=	জানে
মে	=	আমার	সঃ	=	সে
জন্ম	=	জন্ম	দেহম্	=	শরীর
চ	=	এবং	ত্যক্ত্বা	=	ত্যাগ করে
কর্ম	=	কর্ম	পুনঃ	=	পুনরায়
দিব্যম্	=	দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক,	জন্ম	=	জন্ম
এবম্	=	এই প্রকার	ন এতি	=	গ্রহণ করে না (কিন্তু)
যঃ	=	যে–ব্যক্তি (ইহা)	মাম্	=	আমাকে (ই)
তত্ত্বতঃ	=	তত্ত্বতঃ	এতি	=	লাভ করে।

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ, মন্ময়াঃ, মাম্, উপাশ্রিতাঃ,
বহবঃ, জ্ঞানতপসা, পূজাঃ, মদ্ভাবম্, আগতাঃ॥ ১০॥

এবং হে অর্জুন পূর্বেও –

বীতরাগ–ভয়ক্রোধাঃ	= রাগ, আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধরহিত,	বহবঃ	= বহু পুরুষ
মন্ময়াঃ	= অনন্যভাবে আমাতেই স্থিতিযুক্ত,	জ্ঞানতপসা	= জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা
মাম্	= আমার	পূতাঃ	= পবিত্র হয়ে
উপাশ্রিতাঃ	= শরণপ্রাপ্ত	মদ্ভাবম্	= আমার স্বরূপকে
		আগতাঃ	= প্রাপ্ত হয়েছেন।

যে, যথা, মাম্, প্রপদ্যন্তে, তান্, তথা, এব, ভজামি, অহম্,
মম, বর্ত্ম, অনুবর্তন্তে, মনুষ্যাঃ, পার্থ, সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

কেননা –

পার্থ	= হে অর্জুন!	এব	= ই
যে	= যারা	ভজামি	= ভজনা করি (এই রহস্যকে জেনেই)
মাম্	= আমাকে		
যথা	= যে ভাবে	মনুষ্যাঃ	= বুদ্ধিমান মনুষ্যগণ
প্রপদ্যন্তে	= উপাসনা করে	সর্বশঃ	= সকল প্রকারে
অহম্	= আমি (ও)	মম	= আমার
তান্	= তাদের	বর্ত্ম	= পন্থাকে
তথা	= সেইরূপ	অনুবর্তন্তে	= অনুসরণ করেন।

কাঙ্ক্ষন্তঃ, কর্মণাম্, সিদ্ধিম্, যজন্তে, ইহ, দেবতাঃ,
ক্ষিপ্রম্, হি, মানুষে, লোকে, সিদ্ধিঃ, ভবতি, কর্মজা ॥ ১২ ॥

আর যারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানে না তারা –

ইহ	= এই	যজন্তে	= পূজা করে
মানুষে	= মনুষ্য–	হি	= কেননা
লোকে	= লোকে	কর্মজা	= কর্ম থেকে উৎপন্ন
কর্মণাম্	= কর্মের	সিদ্ধিঃ	= ফল
সিদ্ধিম্	= ফল	ক্ষিপ্রম্	= শীঘ্র
কাঙ্ক্ষন্তঃ	= আকাঙ্ক্ষা করে	ভবতি	= প্রাপ্ত হয়।
দেবতাঃ	= দেবতাদের		

চাতুর্বর্ণ্যম্, ময়া, সৃষ্টম্, গুণকর্মবিভাগশঃ,
তস্য, কর্তারম্, অপি, মাম্, বিদ্ধি, অকর্তারম্, অব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

এবং হে অর্জুন –

গুণকর্ম–বিভাগশঃ	= গুণ এবং কর্মের বিভাগানুসারে	কর্তারম্	= কর্তা (হওয়া সত্ত্বে)
		অপি	= ও
চাতুর্বর্ণ্যম্	= ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র (চারি বর্ণ)	অব্যয়ম্	= অবিনাশী (পরমেশ্বর রূপ)
ময়া	= আমার দ্বারা	মাম্	= আমাকে (তুমি)
সৃষ্টম্	= সৃষ্ট হয়েছে	অকর্তারম্	= অকর্তা (বলেই)
তস্য	= তার (সৃষ্টি রচনাদির)	বিদ্ধি	= জানবে।

ন, মাম্‌, কর্মাণি, লিম্পন্তি, ন, মে, কর্মফলে, স্পৃহা,
ইতি, মাম্‌, যঃ, অভিজানাতি, কর্মভিঃ, ন, স, বধ্যতে॥ ১৪॥

কেননা –

কর্মফলে	=	কর্মের ফলে	ইতি	=	এই প্রকার
মে	=	আমার	যঃ	=	যে
স্পৃহা	=	স্পৃহা	মাম্‌	=	আমাকে
ন	=	নেই, (এই নিমিত্ত)	অভিজানাতি	=	তত্ত্বতঃ জানে,
মাম্‌	=	আমাকে	সঃ	=	সে (ও)
কর্মাণি	=	কর্ম	কর্মভিঃ	=	কর্মের দ্বারা
ন, লিম্পন্তি	=	লিপ্ত করতে পারে না	ন বধ্যতে	=	বদ্ধ হয় না।

এবম্‌, জ্ঞাত্বা, কৃতম্‌, কর্ম, পূর্বৈঃ, অপি, মুমুক্ষুভিঃ,
কুরু, কর্ম, এব, তস্মাৎ, ত্বম, পূর্বৈঃ, পূর্বতরম্‌, কৃতম্‌॥ ১৫॥

তথা –

পূর্বৈঃ	=	পূর্বে	ত্বম্‌	=	তুমি (ও)
মুমুক্ষুভিঃ	=	মুমুক্ষুগণের দ্বারা	পূর্বৈঃ,	=	পূর্ব পুরুষগণের দ্বারা
অপি	=	ও	পূর্বতরম্‌		
এবম্‌	=	এই প্রকার	কৃতম্‌		পূর্ব পূর্বকালে কৃত
জ্ঞাত্বা	=	জেনে (ই)			(রূপে)
কর্ম	=	কর্ম	কর্ম	=	কর্ম
কৃতম্‌	=	করা হয়েছে।	এব	=	ই
তস্মাৎ	=	অতএব	কুরু	=	করো।

কিম্‌, কর্ম, কিম্‌, অকর্ম, ইতি, কবয়ঃ, অপি, অত্র, মোহিতাঃ,
তৎ, তে, কর্ম, প্রবক্ষ্যামি, যৎ, জ্ঞাত্বা, মোক্ষ্যসে, অশুভাৎ॥ ১৬॥

কিন্তু –

কর্ম	=	কর্ম	কর্ম	=	কর্ম অর্থাৎ কর্মের তত্ত্ব
কিম্‌	=	কী (এবং)			(আমি)
অকর্ম	=	অকর্ম	তে	=	তোমাকে
কিম্‌	=	কী?	প্রবক্ষ্যামি	=	বিশেষরূপে বলব
ইতি	=	এইরূপ	যৎ	=	যা
অত্র	=	এই বিষয়ে	জ্ঞাত্বা	=	জেনে (তুমি)
কবয়ঃ	=	বুদ্ধিমান পুরুষগণ	অশুভাৎ	=	অশুভ অর্থাৎ সংসার–
অপি	=	ও			বন্ধন থেকে
মোহিতাঃ	=	মোহগ্রস্ত হন	মোক্ষ্যসে	=	মুক্ত হয়ে যাবে।
তৎ	=	সেই			

কর্মণঃ, হি, অপি, বোদ্ধব্যম্‌, বোদ্ধব্যম্‌, চ, বিকর্মণঃ,
অকর্মণঃ, চ, বোদ্ধব্যম্‌, গহনা, কর্মণঃ, গতিঃ॥ ১৭॥

কর্মণঃ = কর্মের স্বরূপ
অপি = ও
বোদ্ধব্যম্ = জানা আবশ্যক
চ = এবং
অকর্মণঃ = অকর্মের স্বরূপ (ও)
বোদ্ধব্যম্ = জানা আবশ্যক,
চ = আর

বিকর্মণঃ = নিষিদ্ধ কর্মের স্বরূপ (ও)
বোদ্ধব্যম্ = জানা আবশ্যক।
হি = কেননা
কর্মণঃ = কর্মের
গতিঃ = গতি
গহনা = গহন (দুর্বোধ্য)।

কর্মণি, অকর্ম, যঃ, পশ্যেৎ, অকর্মণি, চ, কর্ম, যঃ,
সঃ, বুদ্ধিমান্, মনুষ্যেষু, সঃ, যুক্তঃ, কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ ১৮॥

যঃ = যিনি
কর্মণি = কর্মে (অর্থাৎ অহঙ্কার–রহিত কৃত সকল চেষ্টাতে)
অকর্ম = অকর্ম অর্থাৎ বস্তুতঃ তা না হওয়া
পশ্যেৎ = দেখেন,
চ = আর
যঃ = যিনি
অকর্মণি = অকর্মে (অর্থাৎ অজ্ঞানী পুরুষ দ্বারা কৃত সম্পূর্ণ ক্রিয়ার ত্যাগে)
কর্ম = কর্ম (দেখেন)
সঃ = তিনি 'সেই পুরুষ'
মনুষ্যেষু = মনুষ্য মধ্যে
বুদ্ধিমান্ = বুদ্ধিমান (এবং)
সঃ = সেই
যুক্তঃ = যোগী
কৃৎস্নকর্মকৃৎ = সমুদয় কর্মকারী হন।

যস্য, সর্বে, সমারম্ভাঃ, কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ,
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্, তম্, আহুঃ, পণ্ডিতম্, বুধাঃ॥ ১৯॥

এবং হে অর্জুন –

যস্য = যার
সর্বে = সকল
সমারম্ভাঃ = (শাস্ত্র সম্মত) কর্ম
কামসঙ্কল্প–বর্জিতাঃ = কামনা ও সঙ্কল্প–বর্জিত (হয়),
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ–কর্মাণম্ = (তথা) যার সমস্ত কর্ম জ্ঞানরূপী অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছে;
তম্ = সেই পুরুষকে
বুধাঃ = জ্ঞানীব্যক্তিরা (ও)
পণ্ডিতম্ = পণ্ডিত
আহুঃ = বলে থাকেন।

ত্যক্ত্বা, কর্মফলাসঙ্গম্, নিত্যতৃপ্তঃ, নিরাশ্রয়ঃ,
কর্মণি, অভিপ্রবৃত্তঃ, অপি, ন, এব, কিঞ্চিৎ, করোতি, সঃ॥ ২০॥

আর যে পুরুষ –

কর্মফলা–সঙ্গম্ = সমস্ত কর্মে এবং সেগুলির ফলে সর্বতো ভাবে আসক্তি
ত্যক্ত্বা = ত্যাগ করে
নিরাশ্রয়ঃ = সাংসারিক আশ্রয় রহিত হয়েছেন (এবং)
নিত্যতৃপ্তঃ = {সদা পরমানন্দ পরমাত্মাতে তৃপ্ত,
সঃ = (তিনি)
কর্মণি = কর্মে

অভিপ্রবৃত্তঃ = উত্তমরূপে নিয়োজিত হয়ে–
অপি = ও
কিঞ্চিৎ = (বাস্তবে) কিছু
এব = ই
ন, করোতি = না করেন।

নিরাশীঃ, যতচিত্তাত্মা, ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ,
শারীরম্, কেবলম, কর্ম, কুর্বন, ন, আপ্নোতি, কিল্বিষম্॥ ২১॥

আর –

যতচিত্তাত্মা = সংযত চিত্ত,
ত্যক্তসর্ব–পরিগ্রহঃ = সকল ভোগ সামগ্রীর ত্যাগী (এবং)
নিরাশীঃ = আশারহিত পুরুষ
কেবলম্ = কেবল
শারীরম্ = শরীর সম্বন্ধীয়
কর্ম = কর্ম
কুর্বন্ = করে (ও)
কিল্বিষম্ = পাপের ভাগী
ন আপ্নোতি = হন না।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ, বিমৎসরঃ,
সমঃ, সিদ্ধৌ, অসিদ্ধৌ, চ, কৃত্বা, অপি, ন, নিবধ্যতে॥ ২২॥

এবং –

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টঃ = অনিচ্ছায় আপনা–আপনি যা কিছু পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট,
বিমৎসরঃ = (সর্বতোভাবে) মৎসরতা অর্থাৎ ঈর্ষারহিত,
দ্বন্দ্বাতীতঃ = হর্ষশোকাদি দ্বন্দ্বের অতীত–
সিদ্ধৌ = এরূপ সিদ্ধি
চ = এবং
অসিদ্ধৌ = অসিদ্ধিতে
সমঃ = সমত্বভাবযুক্ত পুরুষ (কর্ম)
কৃত্বা = করে
অপি = ও
ন, নিবধ্যতে = আবদ্ধ হন না।

গতসঙ্গস্য, মুক্তস্য, জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ,
যজ্ঞায়, আচরতঃ, কর্ম, সমগ্রম্, প্রবিলীয়তে॥ ২৩॥

কেননা –

গতসঙ্গস্য = আসক্তিরহিত,
মুক্তস্য = দেহাভিমান এবং মমতাশূন্য,
জ্ঞানাবস্থিত–চেতসঃ = জ্ঞানে অবস্থিত চিত্তযুক্ত,
যজ্ঞায় = যজ্ঞের নিমিত্ত
আচরতঃ = আচরণকারী মনুষ্যের
সমগ্রম্ = সকল
কর্ম = কর্ম (ফলসহ)
প্রবিলীয়তে = ভস্ম হয়ে যায়।

ব্রহ্ম, অর্পণম্, ব্রহ্ম, হবিঃ, ব্রহ্মাগ্নৌ, ব্রহ্মণা, হুতম্,
ব্রহ্ম, এব, তেন, গন্তব্যম্, ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪॥

ঐ সকল যজ্ঞের নিমিত্ত আচরণকারী পুরুষের মধ্যে কেউ কেউ এই ভাবে যজ্ঞ করেন –

অর্পণম্ = অর্পণ অর্থাৎ স্রুবাদি [যার দ্বারা হবি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়] (ও)
ব্রহ্ম = ব্রহ্ম, (এবং)
হবিঃ = হবি অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য (ও)
ব্রহ্ম = ব্রহ্ম, (আর)
ব্রহ্মণা = ব্রহ্মরূপ কর্তার দ্বারা
ব্রহ্মাগ্নৌ = ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে
হুতম্ = হোম করা হয় (তাও ব্রহ্মই –এই নিমিত্ত)
ব্রহ্মকর্ম- = ব্রহ্মরূপ কর্মে
সমাধিনা = সমাধিস্থ
তেন = সেই পুরুষদ্বারা (যা)
গন্তব্যম্ = পাবার যোগ্য (তাও)
ব্রহ্ম = ব্রহ্ম
এব = ই (হয়)।

দৈবম্, এব, অপরে, যজ্ঞম্, যোগিনঃ, পর্যুপাসতে,
ব্রহ্মাগ্নৌ, অপরে, যজ্ঞম্, যজ্ঞেন, এব, উপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

এবং –

অপরে = অন্য
যোগিনঃ = যোগীগণ
দৈবম্ = দেবতাদের পূজনরূপ
যজ্ঞম্ = যজ্ঞকে
এব = ই
পর্যুপাসতে = উত্তমরূপে উপাসনা করেন অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন (আর)
অপরে = অপর (জ্ঞানীগণ)
ব্রহ্মাগ্নৌ = পরব্রহ্ম, পরমাত্মারূপ অগ্নিতে
যজ্ঞেন = যজ্ঞের দ্বারা
এব = ই
যজ্ঞম্ = যজ্ঞকে
উপজুহ্বতি = হোম করেন।

শ্রোত্রাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি, অন্যে, সংযমাগ্নিষু, জহ্বতি,
শব্দাদীন্, বিষয়ান্, অন্যে, ইন্দ্রিয়াগ্নিষু, জহ্বতি ॥ ২৬ ॥

আর –

অন্যে = অন্য যোগিগণ
শ্রোত্রাদীনি = শ্রোত্রাদি
ইন্দ্রিয়াণি = সকল ইন্দ্রিয়কে
সংযমাগ্নিষু = সংযমরূপ অগ্নিতে
জুহ্বতি = হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে সমস্ত বিষয়-গুলি থেকে অবরোধ করে নিজের বশ করে নেন
অন্যে = আর অপর যোগিগণ
শব্দাদীন্ = শব্দাদি
বিষয়ান্ = বিষয়কে
ইন্দ্রিয়াগ্নিষু = ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে
জুহ্বতি = হোম করেন অর্থাৎ রাগদ্বেষরহিত ইন্দ্রিয় গুলি দ্বারা বিষয়কে গ্রহণ করে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হবন করেন।

সর্বাণি, ইন্দ্রিয়কর্মাণি, প্রাণকর্মাণি, চ, অপরে,
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ, জুহ্বতি, জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

এবং –

অপরে = অন্য যোগিগণ
সর্বাণি = সকল
ইন্দ্রিয়কর্মাণি = ইন্দ্রিয়ের কর্ম চেষ্টাকে
চ = তথা
প্রাণকর্মাণি = প্রাণের ক্রিয়াকে
জ্ঞানদীপিতে = জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত
আত্মসংযম–যোগাগ্নৌ = আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে
জুহ্বতি = হোম করেন।

দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তপোযজ্ঞাঃ, যোগযজ্ঞাঃ, তথা, অপরে,
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ, চ, যতয়ঃ, সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

এবং –

অপরে = অপর কেউ কেউ
দ্রব্যযজ্ঞাঃ = ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে লোকসেবার জন্য দ্রব্য নিয়োগকারী হন,
তথা = সেইরূপ অন্য কেউ আবার
তপোযজ্ঞাঃ = স্বধর্মপালনরূপ তপোযজ্ঞকারী (এবং কেউ)
যোগযজ্ঞাঃ = অষ্টাঙ্গ যোগরূপ যজ্ঞ–কারী হন
চ = অন্যেরা
সংশিতব্রতাঃ = অহিংসাদি তীক্ষ্ণ ব্রতযুক্ত
যতয়ঃ = যত্নশীল পুরুষগণ
স্বাধ্যায়জ্ঞান–যজ্ঞাঃ = ভগবানের নাম জপ ও ভগবৎপ্রাপ্তিবিষয়ক শাস্ত্রগুলির অধ্যয়নরূপ জ্ঞান যজ্ঞকারী হন।

অপানে, জুহ্বতি, প্রাণম্, প্রাণে, অপানম্, তথা, অপরে,
প্রাণাপানগতী, রুদ্ধ্বা, প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥

এবং অপর যোগিগণ –

অপানে = অপানবায়ুতে অর্থাৎ অধোগামী বায়ুতে
প্রাণম্ = প্রাণবায়ুকে অর্থাৎ ঊর্ধ্বগামী বায়ুকে
জুহ্বতি = হোম করেন
তথা = সেইরূপ (অন্য যোগিগণ)
প্রাণে = প্রাণ বায়ুতে
অপানম্ = অপান বায়ুকে
(জুহ্বতি) = হোম করেন (আর)
অপরে = অপর যোগিগণ
প্রাণাপান–গতি = প্রাণ এবং অপানের গতিকে
রুদ্ধ্বা = রোধ করে
প্রাণায়াম–পরায়ণাঃ = প্রাণায়াম–পরায়ণ হন।

অপরে, নিয়তাহারাঃ, প্রাণান্, প্রাণেষু, জুহ্বতি,
সর্বে, অপি, এতে, যজ্ঞবিদঃ, যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥

আর –

অপরে = অন্য
নিয়তাহারাঃ = নিয়মিত আহারকারী যোগিগণ
প্রাণান্ = প্রাণ সকলকে
প্রাণেষু = প্রাণেতেই
জুহ্বতি = হোম করেন (এই প্রকার)
যজ্ঞক্ষপিত– = যজ্ঞদ্বারা যাঁদের সমুদয়

কল্মষাঃ	পাপ নষ্ট হয়েছে (এরূপ)	সর্বে	= সকল (পুরুষ)
এতে	= এই	অপি	= ই (হলেন)
		যজ্ঞবিদঃ	= যজ্ঞবিষয়ে জ্ঞানী।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ, যান্তি, ব্রহ্ম, সনাতনম্, ন,
অয়ম্, লোকঃ, অস্তি, অযজ্ঞস্য, কুতঃ, অন্যঃ, কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

এবং –

কুরুসত্তম	= হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন!	অয়ম্	= এই
যজ্ঞাশিষ্টা–মৃতভুজঃ	= যজ্ঞের পরিণামরূপ জ্ঞানামৃত ভোগকারী যোগিগণ	লোকঃ	= মনুষ্যলোক (ও) (সুখপ্রদ)
সনাতনম্	= সনাতন	ন, অস্তি	= হয় না, (তবে)
ব্রহ্ম	= পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে	অন্যঃ	= পরলোক
যান্তি	= প্রাপ্ত হন (আর)	কুতঃ	= কী প্রকারে (সুখপ্রদ হবে)?
অযজ্ঞস্য	= যজ্ঞরহিত পুরুষের		

এবম্, বহুবিধাঃ, যজ্ঞাঃ, বিততাঃ, ব্রহ্মণঃ, মুখে,
কর্মজান্, বিদ্ধি, তান্ সর্বান্, এবম্, জ্ঞাত্বা, বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

এবম্	= এইরূপ	কর্মজান্	= শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া দ্বারাই নিষ্পন্ন
বহুবিধাঃ	= বহুবিধ	বিদ্ধি	= জানো
যজ্ঞাঃ	= যজ্ঞ	এবম্	= এই প্রকার (তত্ত্বতঃ)
ব্রহ্মণঃ	= বেদের	জ্ঞাত্বা	= (তত্ত্বতঃ) জেনে (তুমি)
মুখে	= বাণীতে	বিমোক্ষ্যসে	= সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।
বিততাঃ	= বিস্তারিত বলা আছে		
তান্	= সেই		
সর্বান্	= সবকে		

শ্রেয়ান্, দ্রব্যময়াৎ, যজ্ঞাৎ, জ্ঞানযজ্ঞঃ, পরন্তপ,
সর্বম্, কর্ম, অখিলম্, পার্থ, জ্ঞানে, পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

এবং –

পরন্তপ	= হে অর্জুন!	পার্থ	= হে পার্থ!
দ্রব্যময়াৎ	= সাংসারিক বস্তু সকল দ্বারা সিদ্ধভূত অর্থাৎ দ্রব্যময়	অখিলম্	= যাবৎমাত্র
		সর্বম্	= সকল
		কর্ম	= কর্ম
যজ্ঞাৎ	= যজ্ঞ থেকে	জ্ঞানে	= জ্ঞানে
জ্ঞানযজ্ঞঃ	= জ্ঞানরূপযজ্ঞ (সকল প্রকারে)	পরিসমাপ্যতে	= শেষ হয় অর্থাৎ জ্ঞানই এর পরাকাষ্ঠা।
শ্রেয়ান্	= শ্রেষ্ঠ; (কেননা)		

তৎ, বিদ্ধি, প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া,
উপদেক্ষ্যন্তি, তে জ্ঞানম্, জ্ঞানিনঃ, তত্ত্বদর্শিন।॥ ৩৪॥

তৎ = সেই জ্ঞানকে তুমি তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ গণের নিকট গিয়ে
বিদ্ধি = বুঝে নাও। (তাঁদের)
প্রণিপাতেন = উত্তমরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,
সেবয়া = সেবা (ও)
পরিপ্রশ্নেন = অকপটভাবে প্রশ্ন করলে
তে = সেই
তত্ত্বদর্শিনঃ = তত্ত্বদর্শী
জ্ঞানিনঃ = জ্ঞানীজন (তোমাকে সেই)
জ্ঞানম্ = তত্ত্ব জ্ঞানের
উপদেক্ষ্যন্তি = উপদেশ দেবেন।

যৎ, জ্ঞাত্বা, ন, পুনঃ, মোহম্, এবম্, যাস্যসি, পাণ্ডব,
যেন, ভূতানি, অশেষেণ, দ্রক্ষ্যসি, আত্মনি, অথো, ময়ি॥ ৩৫॥

যৎ = যা
জ্ঞাত্বা = জেনে (তুমি)
পুনঃ = পুনরায়
এবম্ = এই প্রকার
মোহম্ = মোহ
ন, যাস্যসি = প্রাপ্ত হবে না; (এবং)
পাণ্ডব = হে অর্জুন!
যেন = যে জ্ঞানের দ্বারা (তুমি)
ভূতানি = সম্পূর্ণ প্রাণীকে
অশেষেণ = নিঃশেষ ভাবে
আত্মনি = নিজের মধ্যে
দ্রক্ষ্যসি = দেখবে (আর)
অথো = তারপরে
ময়ি = আমাতে অর্থাৎ সচ্চি–দানন্দস্বরূপে একীভা–বাভিভূত সচ্চিদানন্দ ময়ই দেখবে।

অপি, চেৎ, অসি, পাপেভ্যঃ, সর্বেভ্যঃ, পাপকৃত্তমঃ,
সর্বম্, জ্ঞানপ্লবেন, এব, বৃজিনম্, সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬॥

আর –

চেৎ = যদি (তুমি)
সর্বেভ্যঃ = সকল
পাপেভ্যঃ = পাপী থেকে–
অপি = ও
পাপকৃত্তমঃ = অধিক পাপকারী
অসি = হও (তবুও)
জ্ঞানপ্লবেন = জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা (তুমি)
এব = নিশ্চয়ই
সর্বম্ = সকল
বৃজিনম্ = পাপরাশি
সন্তরিষ্যসি = উত্তমরূপে পার হয়ে যাবে।

যথা, এধাংসি, সমিদ্ধঃ, অগ্নিঃ, ভস্মসাৎ, কুরুতে, অর্জুন,
জ্ঞানাগ্নিঃ, সর্বকর্মাণি, ভস্মসাৎ, কুরুতে, তথা॥ ৩৭॥

কেননা –

অর্জুন	= হে অর্জুন!	কুরুতে	= করে দেয়,
যথা	= যেরূপ	তথা	= সেইরূপ
সমিদ্ধঃ	= প্রজ্বলিত	জ্ঞানাগ্নিঃ	= জ্ঞানরূপ অগ্নি
অগ্নিঃ	= অগ্নি	সর্বকর্মাণি	= সম্পূর্ণ কর্মকে
এধাংসি	= ইন্ধনকে (অর্থাৎ কাষ্ঠ সমূহকে)	ভস্মসাৎ	= ভস্মীভূত
ভস্মাসাৎ	= ভস্মীভূত	কুরুতে	= করে দেয়।

ন, হি, জ্ঞানেন, সদৃশম্, পবিত্রম্, ইহ, বিদ্যতে,
তৎ, স্বয়ম্, যোগসংসিদ্ধঃ, কালেন, আত্মনি, বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

এই নিমিত্ত –

ইহ	= এই সংসারে	কালেন	= উপযুক্ত কালে
জ্ঞানেন	= জ্ঞানের	যোগ–সংসিদ্ধঃ	= কর্মযোগ দ্বারা যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে এইরূপ পুরুষ
সদৃশম্	= সমান		
পবিত্রম্	= পবিত্রকারী		
হি	= নিঃসন্দেহে (কিছুই)	স্বয়ম্	= স্বয়ংই
ন, বিদ্যতে	= নেই।	আত্মনি	= আত্মাতে (নিজের মধ্যে)
তৎ	= সেই জ্ঞানকে	বিন্দতি	= অনুভব করে।

শ্রদ্ধাবান্, লভতে, জ্ঞানম্, তৎপরঃ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানম্, লব্ধ্বা পরাম্, শান্তিম, অচিরেণ, অধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

এবং হে অর্জুন –

সংযতেন্দ্রিয়ঃ	= জিতেন্দ্রিয়, (ও)	লব্ধ্বা	= লাভ করে
তৎপরঃ	= তৎপরায়ণ,	অচিরেণ	= তৎক্ষণাৎ (ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ)
শ্রদ্ধাবান্	= শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ		
জ্ঞানম্	= জ্ঞান	পরাম্	= পরম
লভতে	= লাভ করে; (এবং)	শান্তিম্	= শান্তি
জ্ঞানম্	= জ্ঞান	অধিগচ্ছতি	= প্রাপ্ত হয়।

অজ্ঞঃ, চ, অশ্রদ্দধানঃ, চ, সংশয়াত্মা, বিনশ্যতি,
ন, অয়ম্, লোকঃ, অস্তি, ন, পরঃ, ন, সুখম্, সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

আর হে অর্জুন –

অজ্ঞঃ	= ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানহীন	অয়ম্	= এই
		লোকঃ	= লোক (ও)
চ	= তথা	ন	= নেই,
অশ্রদ্দধানঃ	= শ্রদ্ধারহিত,	পরঃ	= পরলোক (ও)
সংশয়াত্মা	= সংশয়যুক্ত পুরুষ	ন (অস্তি)	= নেই –ই
বিনশ্যতি	= পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায় (এরূপ)	চ	= এবং
		সুখম্	= সুখও
সংশয়াত্মনঃ	= সংশয়যুক্ত পুরুষের	ন	= নেই।

যোগসন্ন্যস্তকর্মাণম্, জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্,
আত্মবন্তম্, ন, কর্মাণী, নিবধ্নন্তি, ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

এবং –

ধনঞ্জয়	=	হে ধনঞ্জয়!
যোগসন্ন্যস্ত–কর্মাণম্	=	সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ দ্বারা সকল কর্ম যিনি পরমাত্মায় অর্পণ করে দিয়েছেন (আর)
জ্ঞানসংছিন্ন–	=	জ্ঞানদ্বারা যাঁর সমুদয়
সংশয়ম্		সংশয় বিনষ্ট হয়েছে এইরূপ
আত্মবন্তম্	=	পরমাত্মপরায়ণ পুরুষকে
কর্মাণি	=	কর্ম সকল
ন, নিবধ্নন্তি	=	আবদ্ধ করে না।

তস্মাৎ, অজ্ঞানসম্ভূতম্, হৃৎস্থম্, জ্ঞানাসিনা, আত্মনঃ,
ছিত্ত্বা, এনম্, সংশয়ম্, যোগম্, আতিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠ, ভারত ॥ ৪২ ॥

তস্মাৎ	=	অতএব
ভারত	=	হে ভরতবংশীয় অর্জুন! (তুমি)
হৃৎস্থম্	=	হৃদয়স্থিত
এনম্	=	এই
অজ্ঞান–সম্ভূতম্	=	অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন
আত্মনঃ	=	নিজের
সংশয়ম্	=	সংশয়কে
জ্ঞানাসিনা	=	জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা
ছিত্ত্বা	=	ছেদন করে
যোগম্	=	সমত্বরূপ
আতিষ্ঠ	=	কর্মযোগে স্থিত হও (এবং যুদ্ধের জন্য)
উত্তিষ্ঠ	=	উত্থিত হও।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৫ এর শ্লোকের কিছু ফটোকপি

পঞ্চম অধ্যায়

অর্জুন উবাচ –

সন্ন্যাসম্, কর্মণাম্, কৃষ্ণ, পুনঃ, যোগম, চ, শংসসি,
যৎ, শ্রেয়ঃ, এতয়োঃ, একম্, তৎ, মে, ব্রূহি, সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

তদনন্তর অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন –

কৃষ্ণ	=	হে কৃষ্ণ! (আপনি)
কর্মণাম্	=	কর্মগুলির
সন্ন্যাসম্	=	সন্ন্যাসের (ত্যাগের)
চ	=	এবং
পুনঃ	=	পুনরায়
যোগম্	=	কর্মযোগের
শংসসি	=	প্রশংসা করছেন (অতএব)
এতয়োঃ	=	এই দুটির মধ্যে
একম্, যৎ	=	যে একটি
সুনিশ্চিতম্	=	নিশ্চিতভাবে
শ্রেয়ঃ	=	কল্যাণকারী (হয়)
তৎ	=	তা
মে	=	আমাকে
ব্রূহি	=	বলুন।

সন্ন্যাসঃ, কর্মযোগঃ, চ, নিঃশ্রেয়সকরৌ, উভৌ,
তয়োঃ, তু, কর্মসন্ন্যাসাৎ, কর্মযোগঃ, বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

এইপ্রকার অর্জুন জিজ্ঞাসা করলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন –

সন্ন্যাসঃ = কর্মের সন্ন্যাস
চ = এবং
কর্মযোগঃ = নিষ্কাম কর্মযোগ
উভৌ = এই দুইটিই
নিঃশ্রেয়সকরৌ = পরম কল্যাণকারী হয়,

তু = কিন্তু
তয়োঃ = ঐ দুইয়ের মধ্যে
কর্মসন্ন্যাসাৎ = কর্মের সন্ন্যাস হতে
কর্মযোগঃ = নিষ্কাম কর্মযোগ (সাধনে সুগম হওয়ায়)
বিশিষ্যতে = শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞেয়ঃ, সঃ, নিত্যসন্ন্যাসী, যঃ, ন, দ্বেষ্টি, ন, কাঙ্ক্ষতি,
নির্দ্বন্দ্বঃ, হি, মহাবাহো, সুখম্, বন্ধাৎ, প্রমুচ্যতে॥ ৩॥

এইজন্য –

মহাবাহো = হে অর্জুন!
যঃ = যে পুরুষ
ন, দ্বেষ্টি = (কাউকে) দ্বেষ করে না (এবং)
ন, কাঙ্ক্ষতি = (কোনও কিছুর) আকাঙ্ক্ষা করে না
সঃ = সেই (নিষ্কাম কর্মযোগীকে)

নিত্যসন্ন্যাসী = নিত্য সন্ন্যাসী
জ্ঞেয়ঃ = বলে জানবে।
হি = যেহেতু
নির্দ্বন্দ্বঃ = রাগ–দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব রহিত পুরুষ
সুখম্ = আনন্দপূর্বক
বন্ধাৎ = সংসার রূপ বন্ধন হতে
প্রমুচ্যতে = মুক্ত হয়ে যায়।

সাংখ্যযোগৌ, পৃথক, বালাঃ, প্রবদন্তি, ন, পণ্ডিতাঃ,
একম্, অপি, আস্থিতঃ, সম্যক্, উভয়োঃ, বিন্দতে, ফলম্॥ ৪॥

এবং হে অর্জুন –
(উল্লিখিত)

সাংখ্যযোগৌ = সন্ন্যাস এবং নিষ্কাম কর্ম যোগকে
বালাঃ = মূর্খ লোক
পৃথক্ = পৃথক পৃথক (ফল যুক্ত)
প্রবদন্তি = বলে থাকে,
ন, পণ্ডিতাঃ = পণ্ডিতগণ (বলেন) না। (কেননা উভয়ের মধ্যে)

একম্ = একটিতে
অপি = ও
সম্যক্ = উত্তমরূপে
আস্থিতঃ = স্থিত (পুরুষ)
উভয়োঃ = উভয়ের
ফলম্ = ফলরূপ পরমাত্মাকে
বিন্দতে = প্রাপ্ত হয়।

যৎ, সাংখ্যৈঃ, প্রাপ্যতে, স্থানম্, তৎ, যোগৈঃ, অপি, গম্যতে,
একম্, সাংখ্যম্, চ, যোগম্, চ, যঃ, পশ্যতি, সঃ, পশ্যতি॥ ৫॥

তথা –

সাংখ্যৈঃ = জ্ঞানযোগীদের দ্বারা
যৎ = যে
স্থানম্ = পরম ধাম

প্রাপ্যতে = প্রাপ্ত করা হয়,
যোগৈঃ = নিষ্কাম কর্মযোগীদের দ্বারা

অপি	=	ও			(ফলরূপে)
তৎ	=	তাহা (ই)	একম্	=	এক
গম্যতে	=	প্রাপ্ত হয়। (এই নিমিত্ত)	পশ্যতি	=	দেখে
যঃ	=	যে (পুরুষ)	সঃ	=	সে
সাংখ্যম্	=	জ্ঞানযোগ	চ	=	ই (যথার্থ)
চ	=	এবং	পশ্যতি	=	দেখে।
যোগম্	=	নিষ্কাম কর্মযোগকে			

সন্ন্যাসঃ, তু, মহাবাহো, দুঃখম্, আপ্তুম্, অযোগতঃ,
যোগযুক্তঃ, মুনিঃ, ব্রহ্ম, নচিরেণ অধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

তু	=	কিন্তু	আপ্তুম্	=	হওয়া
মহাবাহো	=	হে অর্জুন!	দুঃখম্	=	কঠিন, (এবং)
অযোগতঃ	=	নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত	মুনিঃ	=	ভগবৎস্বরূপকে মননকারী
সন্ন্যাসঃ	=	সন্ন্যাস অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা যে সকল কর্ম হয় তাতে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ	যোগযুক্তঃ	=	নিষ্কাম কর্মযোগী
			ব্রহ্ম	=	পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে
			নচিরেণ	=	শীঘ্রই
			অধিগচ্ছতি	=	প্রাপ্ত হয়।

যোগযুক্তঃ, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা, কুর্বন, অপি, ন, লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

এবং –

বিজিতাত্মা	=	শরীর বশকারী,	ভূতাত্মা		পরমাত্মাতে একী ভাববিশিষ্ট
জিতেন্দ্রিয়ঃ	=	জিতেন্দ্রিয়, (আর)			
বিশুদ্ধাত্মা	=	বিশুদ্ধান্তঃকরণ, (এবং)	যোগযুক্তঃ	=	নিষ্কাম কর্মযোগী
সর্বভূতাত্ম–	=	সমস্ত প্রাণীর আত্মরূপ	কুর্বন, অপি	=	কর্মে সংযুক্ত হয়েও (তাতে)
			ন, লিপ্যতে	=	লিপ্ত হন না।

ন, এব, কিঞ্চিৎ, করোমি, ইতি, যুক্তঃ, মন্যেত, তত্ত্ববিৎ,
পশ্যন্, শৃণ্বন্, স্পৃশন্, জিঘ্রন্, অশ্নন্, গচ্ছন্, স্বপন্, শ্বসন্,
প্রলপন্, বিসৃজন্, গৃহ্নন্, উন্মিষন্, নিমিষন্, অপি,
ইন্দ্রিয়ানি, ইন্দ্রিয়ার্থেষু, বর্তন্তে, ইতি, ধারয়ন্ ॥ ৮–৯ ॥

এবং হে অর্জুন –

তত্ত্ববিৎ	=	তত্ত্বজ্ঞানী	শৃণ্বন্	=	শ্রবণ,
যুক্তঃ	=	সাংখ্যযোগী	স্পৃশন্	=	স্পর্শ,
পশ্যন্	=	দর্শন,	জিঘ্রন্	=	ঘ্রাণ,

অশ্নন্	=	ভোজন,	ইন্দ্রিয়ার্থেষু	=	স্ব স্ব বিষয় সকলে
গচ্ছন্	=	গমন,	বর্ত্তন্তে	=	প্রবৃত হচ্ছে
স্বপন্	=	শয়ন,	ইতি	=	এইরকম
শ্বসন্	=	শ্বাসগ্রহণ,	ধারয়ন্	=	মনে করে
প্রলপন্	=	বাক্যোচ্চারণ,	এব	=	নিঃসন্দেহে
বিসৃজন্	=	ত্যাগ,	ইতি	=	এইরূপ
গৃহ্নন্	=	গ্রহণ,	মন্যেত	=	নিশ্চিতভাবে মেনে নেন যে (আমি)
উন্মিষন্	=	উন্মেষ (এবং)			
নিমিষন্	=	নিমেষ (করতঃ)	কিঞ্চিৎ	=	কিছুই
অপি	=	ও	ন, করোমি	=	করছি না।
ইন্দ্রিয়াণি	=	ইন্দ্রিয়গণ			

ব্রহ্মণি, আধায়, কর্মাণি, সঙ্গম্, ত্যক্ত্বা, করোতি, যঃ,
লিপ্যতে, ন, সঃ, পাপেন, পদ্মপত্রম্, ইব, অম্ভসা॥ ১০॥

কিন্তু হে অর্জুন! দেহাভিমানীদের দ্বারা এই সাধন হওয়া কঠিন এবং নিষ্কাম কর্মযোগ সুগম্, কেননা –

যঃ	=	যে পুরুষ	সঃ	=	সেই পুরুষ
কর্মাণি	=	সকল কর্ম	অম্ভসা	=	জল দ্বারা
ব্রহ্মণি	=	পরমাত্মাতে	পদ্মপত্রম্	=	পদ্মপত্রের
আধায়	=	অর্পণ করে, (এবং)	ইব	=	ন্যায়
সঙ্গম্	=	আসক্তি	পাপেন	=	পাপ দ্বারা
ত্যক্ত্বা	=	ত্যাগ করে	ন, লিপ্যতে	=	লিপ্ত হয় না।
করোতি	=	কর্ম করে,			

কায়েন, মনসা, বুদ্ধ্যা, কেবলৈঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ, অপি,
যোগিনঃ, কর্ম, কুর্বন্তি, সঙ্গম্, ত্যক্ত্বা, আত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১॥

এই নিমিত্ত –

যোগিনঃ	=	নিষ্কাম কর্মযোগী (মমত্ব–বুদ্ধি রহিত)	অপি	=	ও
			সঙ্গম্	=	আসক্তিকে
কেবলৈঃ	=	কেবল	ত্যক্ত্বা	=	ত্যাগ করে
ইন্দ্রিয়ৈঃ	=	ইন্দ্রিয়গণ,	আত্মশুদ্ধয়ে	=	অন্তঃকরণের শুদ্ধির নিমিত্ত
মনসা	=	মন,			
বুদ্ধ্যা	=	বুদ্ধি, (এবং)	কর্ম	=	কর্ম
কায়েন	=	শরীর দ্বারা	কুর্বন্তি	=	করে থাকেন।

যুক্তঃ, কর্মফলম্, ত্যক্ত্বা, শান্তিম্, আপ্নোতি, নৈষ্ঠিকীম,
অযুক্তঃ, কামকারেণ, ফলে, সক্তঃ, নিবধ্যতে॥ ১২॥

এই হেতু –

যুক্তঃ = নিষ্কাম কর্মযোগী
কর্মফলম্ = কর্মফলকে
ত্যক্ত্বা = পরমেশ্বরে অর্পণ করে
নৈষ্ঠিকীম্ = ভগবদ্প্রাপ্তি রূপ
শান্তিম্ = শান্তি

আপ্নোতি = লাভ করে (এবং)
অযুক্তঃ = সকাম পুরুষ
কামকারেণ = কামনা দ্বারা
ফলে = ফলে
সক্তঃ = আসক্ত হয়ে
নিবধ্যতে = বদ্ধ হয়।

সর্বকর্মাণি, মনসা, সন্ন্যস্য, আস্তে, সুখম্, বশী,
নবদ্বারে, পুরে, দেহী, ন, এব, কুর্বন্, ন, কারয়ন্॥ ১৩॥

এবং হে অর্জুন –

বশী = যার অন্তঃকরণ বশীভূত – এইরূপ সাংখ্যযোগের আচরণকারী
দেহী = পুরুষ
এব = নিঃসন্দেহরূপে (কোনওপ্রকার কর্ম)
ন = (নিজে) না (করে)
কুর্বন্ = এবং অন্যের দ্বারা
ন = না
কারয়ন্ = করিয়ে

নবদ্বারে = নবদ্বারযুক্ত
পুরে = শরীররূপ গৃহে
সর্বকর্মাণি = সকল কর্ম
মনসা = মন দ্বারা
সন্ন্যস্য = ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিষয় গুলিতে প্রবৃত্ত রয়েছে, এরূপ মেনে নিয়ে
সুখম্ = আনন্দপূর্বক (সচ্চিদানন্দ ঘন পরমাত্মার স্বরূপে)
আস্তে = স্থিত থাকেন।

ন, কর্তৃত্বম্, ন, কর্মাণি, লোকস্য, সৃজতি, প্রভুঃ,
ন, কর্মফলসংযোগম্, স্বভাবঃ, তু, প্রবর্ততে॥ ১৪॥

এবং –

প্রভুঃ = পরমেশ্বর (ও)
লোকস্য = ভূতপ্রাণীদিগের
ন = না
কর্তৃত্বম্ = কর্তৃত্বকে (ও)
ন = না
কর্মাণি = কর্মসমূহকে (আর)
ন = না
কর্মফল– = কর্মফলের সংযোগকে

সংযোগম্ (বাস্তবিকপক্ষে)
সৃজতি = রচনা করেন,
তু = কিন্তু (পরমাত্মার সত্তার দ্বারা)
স্বভাবঃ = প্রকৃতি (ই)
প্রবর্ততে = প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ গুণই গুণসকলে প্রবৃত্ত হচ্ছে।

ন, আদত্তে, কস্যচিৎ, পাপম্, ন, চ, এব, সুকৃতম্, বিভুঃ,
অজ্ঞানেন, আবৃতম্, জ্ঞানম্, তেন, মুহ্যন্তি, জন্তবঃ॥ ১৫॥

এবং –

বিভুঃ = সর্বব্যাপী পরমাত্মা
কস্যচিৎ = কারও

পাপম্ = পাপকর্মকে
ন = (গ্রহণ করেন) না

চ	= আর (কারও)	জ্ঞানম্	= জ্ঞান
সুকৃতম্	= শুভকর্মকে	আবৃতম্	= আবৃত্ত রয়েছে
এব	= ও	তেন	= সেইজন্য
ন আদত্তে	= গ্রহণ করেন না; (কিন্তু)	জন্তবঃ	= সকল জীব
অজ্ঞানেন	= মায়া দ্বারা	মুহ্যন্তি	= মোহগ্রস্ত হচ্ছে।

জ্ঞানেন, তু, তৎ, অজ্ঞানম্, যেষাম্, নাশিতম্, আত্মনঃ,
তেষাম্, আদিত্যবৎ, জ্ঞানম্, প্রকাশয়তি, তৎপরম্॥ ১৬॥

তু	= কিন্তু	তেষাম্	= তাঁদের (সেই)
যেষাম্	= যাঁদের	জ্ঞানম্	= জ্ঞান
তৎ	= সেই	আদিত্যবৎ	= সূর্যের মত
আত্মনঃ	= অন্তঃকরণের	তৎপরম্	= সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে
অজ্ঞানম্	= অজ্ঞান	প্রকাশয়তি	= প্রকাশ করায়।
জ্ঞানেন	= আত্মজ্ঞান দ্বারা		
নাশিতম্	= নষ্ট হয়েছে,		

তদ্বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠায়, তৎপরায়ণাঃ,
গচ্ছন্তি, অপুনরাবৃত্তিম্, জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥

এবং হে অর্জুন –

তদাত্মানঃ	= যাঁদের মন তদ্রূপ (ও)	তৎপরায়ণাঃ	= তৎপরায়ণ পুরুষ
তদ্বুদ্ধয়ঃ	= যাঁদের বুদ্ধি তদ্রূপ (আর)	জ্ঞাননির্ধূত–কল্মষাঃ	= জ্ঞান দ্বারা পাপরহিত হয়ে
তন্নিষ্ঠাঃ	= যাঁদের সেই সচ্চিদানন্দ–ঘন পরমাত্মাতেই নিরন্তর একীভাবে স্থিতি, এইরকম	অপুনরা–বৃত্তিম্	= অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরমগতিকে
		গচ্ছন্তি	= প্রাপ্ত হন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে, ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি,
শুনি, চ, এব, শ্বপাকে, চ, পণ্ডিতাঃ, সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥

এইরূপ ঐ –

পণ্ডিতাঃ	= জ্ঞানীব্যক্তিরা	হস্তিনি	= হাতি,
বিদ্যাবিনয়–সম্পন্নে	= বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত	শুনি	= কুকুর (এবং)
ব্রাহ্মণে	= ব্রাহ্মণে	শ্বপাকে	= চণ্ডালে–
চ	= এবং	চ	= ও
গবি	= গোরু,	সমদর্শিনঃ	= সমদর্শী
		এব	= ই (হয়ে থাকেন)।

ইহ, এব, তৈঃ, জিতঃ, সর্গঃ, যেষাম্, সাম্যে, স্থিতম্, মনঃ
নির্দোষম্, হি, সমম্, ব্রহ্ম, তস্মাৎ, ব্রহ্মণি, তে, স্থিতাঃ॥ ১৯॥

এইজন্য –

যেষাম্	= যাঁদের	হি	= কেননা
মনঃ	= মন	ব্রহ্ম	= সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা
সাম্যে	= সমত্বভাবে	নির্দোষম্	= নির্দোষ (এবং)
স্থিতম্	= স্থিত আছে	সমম্	= সম,
তৈঃ	= তাঁদের দ্বারা	তস্মাৎ	= সেইজন্য
ইহ	= এই জীবিত অবস্থাতে	তে	= তাঁরা
এব	= ই	ব্রহ্মণি	= সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই
সর্গঃ	= সম্পূর্ণ সংসার		
জিতঃ	= বিজিত হয়েছে	স্থিতাঃ	= স্থিত আছেন।

ন, প্রহৃষ্যেৎ, প্রিয়ম্, প্রাপ্য, ন, উদ্বিজেৎ, প্রাপ্য চ, অপ্রিয়ম্,
স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমূঢ়ঃ, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মণি, স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

এবং যে পুরুষ –

প্রিয়ম্	= প্রিয়কে অর্থাৎ সাধারণ লোক যাকে প্রিয় জ্ঞান করে তাকে		উদ্বিগ্ন হন না (এইরূপ)
প্রাপ্য	= পেয়ে	স্থিরবুদ্ধিঃ	= স্থিরবুদ্ধি
ন, প্রহৃষ্যেৎ	= হৃষ্ট হন না,	অসংমূঢ়ঃ	= সংশয় রহিত
চ	= আর	ব্রহ্মবিৎ	= ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ
অপ্রিয়ম্	= অপ্রিয় অর্থাৎ সাধারণ লোক যাকে অপ্রিয় জ্ঞান করে তাকে	ব্রহ্মণি	= সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে
প্রাপ্য	= পেয়ে	স্থিতঃ	= একীভাবে নিত্যস্থিত আছেন।

বাহ্যস্পর্শেষু, অসক্তাত্মা, বিন্দতি, আত্মনি, যৎ, সুখম্,
সঃ, ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা, সুখম্, অক্ষয়ম্, অশ্নুতে ॥ ২১ ॥

এবং –

বাহ্যস্পর্শেষু	= বাহিরের বিষয়গুলিতে অর্থাৎ সাংসারিক ভোগ সমূহে	(তৎ)	= তা
		বিন্দতি	= প্রাপ্ত হন (এবং)
		সঃ	= সেই পুরুষ
অসক্তাত্মা	= আসক্তিরহিত (অন্তঃ–করণযুক্ত) পুরুষ	ব্রহ্মযোগ–যুক্তাত্মা	= সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপ যোগে একীভাবে স্থিত হয়ে
আত্মনি	= অন্তঃকরণে		
যৎ	= যে	অক্ষয়ম্	= অক্ষয়
সুখম্	= ভগবৎ ধ্যানজনিত সাত্ত্বিক আনন্দ আছে	সুখম্	= আনন্দ
		অশ্নুতে	= অনুভব করেন।

যে, হি, সংস্পর্শজাঃ, ভোগাঃ, দুঃখযোনয়ঃ, এব, তে,
আদ্যন্তবন্তঃ, কৌন্তেয়, ন, তেষু, রমতে, বুধঃ ॥ ২২॥

এবং –

যে = যে সকল (এই)
সংস্পর্শজাঃ = ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন
ভোগাঃ = ভোগ আছে,
তে = সে সব (যদিও বিষয়ী পুরুষগণের কাছে সুখ রূপে প্রতিভাসিত হয় তবু)
হি = নিঃসন্দেহে (সেগুলি)

দুঃখযোনয়ঃ = দুঃখেরই হেতু হয়
এব হয় (আর)
আদ্যন্তবন্তঃ = আদি–অন্ত বিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য (এইজন্য)
কৌন্তেয় = হে অর্জুন!
বুধঃ = বুদ্ধিমান বিবেকী পুরুষ
তেষু = তাতে
ন, রমতে = লিপ্ত (আসক্ত) হন না।

শক্নোতি, ইহ, এব, যঃ, সোঢুম্, প্রাক্, শরীরবিমোক্ষণাৎ,
কামক্রোধোদ্ভবম, বেগম্, সঃ, যুক্তঃ, সঃ, সুখী, নরঃ ॥ ২৩ ॥

যঃ = যে (মনুষ্য)
ইহ = এই মনুষ্য–শরীরে
বিমোক্ষণাৎ = শরীর নাশ হবার
প্রাক্ = পূর্বে
এব = ই
কামক্রো–ধোদ্ভবম্ = কাম এবং ক্রোধ হতে উৎপন্ন
বেগম্ = বেগকে
সোঢুম্ = সহ্য করতে

শক্নোতি = সমর্থ হয় অর্থাৎ কাম এবং ক্রোধকে যে সর্ব–কালের জন্য জয় করেছে
সঃ = সেই
নরঃ = মনুষ্য
যুক্তঃ = যোগী (এবং)
সঃ = সেই
সুখী = সুখী।ন

যঃ, অন্তঃসুখঃ, অন্তরারামঃ, তথা, অন্তর্জ্যোতিঃ এব, যঃ,
সঃ, যোগী, ব্রহ্মনির্বাণম্, ব্রহ্মভূতঃ, অধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

যঃ = যে পুরুষ
এব = নিশ্চয়রূপে
অন্তঃসুখঃ = অন্তরাত্মাতেই সুখযুক্ত, (এবং)
অন্তরারামঃ = আত্মারাম
তথা = আর
যঃ = যে
অন্তর্জ্যোতিঃ = আত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত

(হয়);
সঃ = সেই
ব্রহ্মভূতঃ = সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে একী–ভাবপ্রাপ্ত
যোগী = সাংখ্যযোগী
ব্রহ্মনির্বাণম্ = শান্ত (নির্বান) ব্রহ্মকে
অধিগচ্ছতি = প্রাপ্ত হন।

লভন্তে, ব্রহ্মনির্বাণম্, ঋষয়ঃ, ক্ষীণকল্মষাঃ,
ছিন্নদ্বৈধাঃ, যতাত্মানঃ, সর্বভূতহিতে, রতাঃ॥ ২৫॥

এবং –

ক্ষীণকল্মষাঃ = যাঁদের সকল পাপ নষ্ট হয়েছে (তথা)
ছিন্নদ্বৈধাঃ = জ্ঞান দ্বারা যাঁদের সংশয় নিবৃত্তি হয়েছে,
সর্বভূতহি–তে রতাঃ = এবং যাঁরা সর্ব প্রানীর হিতে রত এবং
যতাত্মানঃ = যাঁদের চিত্ত পরমাত্মায় একাগ্র হয়েছে (এইরূপ)
ঋষয়ঃ = ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ
ব্রহ্মনির্বাণম্ = শান্ত পরব্রহ্মকে
লভন্তে = লাভ করেন।

কামক্রোধবিযুক্তানাম্, যতীনাম্, সতচেতসাম্,
অভিতঃ, ব্রহ্মনির্বাণম্, বর্ততে, বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬॥

কামক্রোধ–বিযুক্তানাম্ = কামক্রোধ রহিত,
যতচেতসাম্ = সংযতচিত্তবিশিষ্ট,
বিদিত্বাত্ম–নাম্ = পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত
যতীনাম্ = জ্ঞানীপুরুষদের
অভিতঃ = সকল দিকেই
ব্রহ্মনির্বাণম্ = শান্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মাই
বর্ত্ততে = স্থিত আছেন।

স্পর্শান্, কৃত্বা, বহিঃ, বাহ্যান্, চক্ষুঃ, চ, এব, অন্তরে, ভ্রুবোঃ,
প্রাণাপানৌ, সমৌ, কৃত্বা, নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭॥

এবং হে অর্জুন –

বাহ্যান্ = বাইরের
স্পর্শান্ = বিষয়ভোগ সকলকে (চিন্তা না করে)
বহিঃ = বাইরে
এব = ই
কৃত্বা = ত্যাগ করে,
চ = আর
চক্ষুঃ = চক্ষুর দৃষ্টিকে
ভ্রুবোঃ = ভ্রুযুগলের
অন্তরে = মধ্যস্থলে (স্থিত করে) এবং
নাসাভ্যন্তর–চারিণৌ = নাসিকাভ্যন্তরে বিচরণকারী
প্রাণাপানৌ = প্রাণ এবং অপান বায়ুকে
সমৌ = সমান
কৃত্বা = করে;

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ, মুনিঃ, মোক্ষপরায়ণঃ,
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ, যঃ, সদা, মুক্তঃ, এব, সঃ॥ ২৮ ॥

যতেন্দ্রিয়–মনোবুদ্ধিঃ = যার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত হয়েছে, এইরকম
যঃ = যে
মোক্ষপরায়ণ = মোক্ষপরায়ণ
মুনিঃ = মুনি

বিগতেচ্ছা–ভয়ক্রোধঃ	= ইচ্ছা, ভয় এবং ক্রোধ রহিত হয়েছেন,	সদা	= সর্বদা–
সঃ	= তিনি	মুক্তঃ, এব	= ই মুক্ত।

ভোক্তারম্, যজ্ঞতপসাম্, সর্বলোকমহেশ্বরম্,
সুহৃদম্, সর্বভূতানাম্, জ্ঞাত্বা, মাম্, শান্তিম্, ঋচ্ছতি॥ ২৯॥

এবং হে অর্জুন! আমার ভক্ত –

মাম্	= আমাকে	সুহৃদম্	= সুহৃদ্ অর্থাৎ স্বার্থরহিত দয়ালু এবং প্রেমী (এইরকম)
যজ্ঞতপসাম্	= সকল যজ্ঞ এবং তপস্যার		
ভোক্তারম্	= ভোক্তা (আর)	জ্ঞাত্বা	= তত্ত্বতঃ জেনে
সর্বলোক–মহেশ্বরম্	= সর্বলোকের মহান্ ঈশ্বর (তথা)	শান্তিম্	= শান্তি
		ঋচ্ছতি	= লাভ করে।
সর্বভূতানাম্	= সকল প্রাণীর		

এবং সচ্চিদানন্দঘন পরিপূর্ণ শান্তব্রহ্ম অতিরিক্ত তাঁর দৃষ্টিতে আর কিছুই থাকে না, কেবল একমাত্র সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ বাসুদেবই থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৬ এর শ্লোকের ফটোকপি

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ –

অনাশ্রিতঃ, কর্মফলম্, কার্যম্, কর্ম, করোতি, যঃ,
সঃ, সন্ন্যাসী, চ, যোগী, চ, ন, নিরগ্নিঃ, ন, চ, অক্রিয়ঃ।। ১।।

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন –

যঃ	= যে পুরুষ	যোগী	= যোগী (হয়);
কর্মফলম্	= কর্মফলের	চ	= আর (কেবল)
অনাশ্রিতঃ	= আশ্রয় না নিয়ে	নিরগ্নিঃ	= অগ্নিত্যাগী ব্যক্তি (সন্ন্যাসী)
কার্যম্	= কর্তব্য		
কর্ম	= কর্ম	ন	= নয়
করোতি	= করে	চ	= আর (কেবল)
সঃ	= সে	অক্রিয়ঃ	= ক্রিয়াত্যাগী ব্যক্তি (ও যোগী)
সন্ন্যাসী	= সন্ন্যাসী		
চ	= ও	ন	= নয়।

যম্, সন্ন্যাসম্, ইতি, প্রাহুঃ, যোগম্, তম্, বিদ্ধি, পাণ্ডব,
ন, হি, অসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ, যোগী, ভবতি, কশ্চন॥ ২॥

অতএব –

পাণ্ডব	= হে অর্জুন!	ইতি	= এইরূপ
যম্	= যাকে	প্রাহুঃ	= বলে থাকে
সন্ন্যাসম্	= সন্ন্যাস	তম্	= তাকেই (তুমি)

যোগম্	=	যোগ (বলে)			না করলে
বিদ্ধি	=	জানবে	কশ্চন	=	কোনও পুরুষ
হি	=	কেননা	যোগী	=	যোগী
অসন্ন্যস্ত সংকল্পঃ	=	সংঙ্কল্প ত্যাগ	ন, ভবতি	=	হয় না।

আরুরুক্ষোঃ, মুনেঃ, যোগম্, কর্ম, কারণম্, উচ্যতে,
যোগারূঢ়স্য, তস্য, এবো, শমঃ, কারণম্, উচ্যতে ॥ ৩ ॥

এবং –

যোগম্	=	সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগে	উচ্যতে	=	কথিত আছে; (এবং যোগারূঢ় হলে)
আরুরুক্ষোঃ	=	আরূঢ় হবার ইচ্ছাযুক্ত	তস্য	=	সেই
মুনেঃ	=	মননশীল পুরুষের জন্য (যোগপ্রাপ্তিতে)	যোগারূঢ়স্য	=	যোগারূঢ় পুরুষের
			শমঃ	=	সর্বসঙ্কল্পের অভাব
কর্ম	=	নিষ্কামভাবে কর্ম করাই	এব	=	ই (কল্যাণের)
			কারণম্	=	হেতু (বলে)
কারণম্	=	হেতু (বলে)	উচ্যতে	=	কথিত আছে।

যদা, হি, ন, ইন্দ্রিয়ার্থেষু, ন, কর্মসু, অনুষজ্জতে,
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী, যোগারূঢ়ঃ, তদা, উচ্যতে ॥ ৪ ॥

এবং –

যদা	=	যে কালে (সময়ে)	ন, অনুষজ্জতে	=	আসক্ত হয় না;
ইন্দ্রিয়ার্থেষু	=	ইন্দ্রিয়সমূহের ভোগ গুলিতে	তদা	=	সেই কালে (তখন)
			সর্বসংকল্প–সন্ন্যাসী	=	সর্বসঙ্কল্পের ত্যাগী পুরুষ
ন (অনু–যজ্জতেঃ)	=	আসক্ত হয় না (এবং)	যোগারূঢ়ঃ	=	যোগারূঢ় (বলে)
কর্মসু	=	কর্মসমূহে	উচ্যতে	=	কথিত হয়।
হি	=	ও			

উদ্ধরেৎ, আত্মনা, আত্মানম্, ন, আত্মানম্, অবসাদয়েৎ,
আত্মা, এব, হি, আত্মনঃ, বন্ধুঃ, আত্মা, এব, রিপুঃ, আত্মনঃ ॥ ৫ ॥

আত্মনা	=	নিজের দ্বারা	আত্মা	=	জীবাত্মা স্বয়ং–
আত্মানম্	=	নিজেকে (সংসার সমুদ্র হতে)	এব	=	ই (তো)
			আত্মনঃ	=	নিজের
উদ্ধরেৎ	=	উদ্ধার করে (এবং)	বন্ধুঃ	=	মিত্র (ও)
আত্মানম্	=	স্বীয় আত্মাকে	আত্মা	=	নিজে–
ন, অবসাদয়েৎ	=	অধঃপতিত না করে;	এব	=	ই
			আত্মনঃ	=	নিজের
হি	=	কেননা (এই)	রিপুঃ	=	শত্রু হয়।

বন্ধুঃ, আত্মা, আত্মনঃ, তস্য, যেন, আত্মা, এব, আত্মনা, জিতঃ,
অনাত্মনঃ, তু, শত্রুত্বে, বর্তেত, আত্মা, এব, শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

যেন	=	যে	তু	=	এবং
আত্মনা	=	জীবাত্মা দ্বারা	অনাত্মনঃ	=	যে জীবাত্মার দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয় সহ শরীর জয় করা হয়নি
আত্মা	=	মন এবং ইন্দ্রিয় (সহ শরীর)	আত্মা	=	(সে) স্বয়ং
জিতঃ	=	জয় করা হয়েছে	এব	=	ই (নিজের প্রতি)
তস্য	=	সেই	শত্রুবৎ	=	শত্রুর মতো
আত্মনঃ	=	জীবাত্মা	শত্রুত্বে	=	শত্রুতাতে
আত্মা	=	নিজে	বর্তেত	=	প্রবৃত্ত হয়।
এব	=	হি (নিজের)			
বন্ধুঃ	=	বন্ধু			

জিতাত্মনঃ, প্রশান্তস্য, পরমাত্মা, সমাহিতঃ,
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু, তথা, মানাপমানয়োঃ ॥ ৭॥

এবং হে অর্জুন –

শীতোষ্ণ–সুখদুঃখেষু	=	শীতল–উষ্ণ এবং সুখ দুঃখাদিতে	জিতাত্মনঃ	=	স্বাধীন আত্মাযুক্ত পুরুষের (জ্ঞানে)
তথা	=	তথা	পরমাত্মা	=	সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা
মানাপমানয়োঃ	=	মান এবং অপমানে	সমাহিতঃ	=	সম্যক্ প্রকারে স্থিত আছেন অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানে পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নেই।
প্রশান্তস্য	=	যার অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি অতিশয় শান্ত অর্থাৎ বিকার রহিত অবস্থায় থাকে (এইরূপ)			

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থঃ, বিজিতেন্দ্রিয়ঃ,
যুক্তঃ, ইতি, উচ্যতে, যোগী, সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

এবং –

জ্ঞানবিজ্ঞান–তৃপ্তাত্মা	=	যাঁর অন্তঃকরণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত (আর)			(তথা)
কূটস্থঃ	=	যাঁর স্থিতি সর্বদাই অবিকৃত (ও)	সমলোষ্টাশ্ম–কাঞ্চনঃ	=	যাঁর জ্ঞানে মাটি, পাথর ও সুবর্ণ সমান, (সেই)
বিজিতেন্দ্রিয়ঃ	=	সম্যক্ প্রকার জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ যাঁর ইন্দ্রিয়গণ উত্তম রূপে বশে আছে	যোগী	=	যোগী পুরুষ
			যুক্তঃ	=	যুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্ত
			ইতি	=	এইরূপ
			উচ্যতে	=	বলা হয়।

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু,
সাধুষু, অপি, চ, পাপেষু, সমবুদ্ধিঃ, বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

এবং যে পুরুষ –

সুহৃদ্– = সুহৃদ্,
মিত্র– মিত্র,
অরি– = শত্রু,
উদাসীন– = উদাসীন,
মধ্যস্থ– = মধ্যস্থ,
দ্বেষ্য = দ্বেষী, (আর)
বন্ধুষু = বন্ধুগণে, (তথা)

সাধুষু = ধর্মাত্মাগণে
চ = এবং
পাপেষু = পাপীগণে–
অপি = ও
সমবুদ্ধিঃ = যিনি সমান ভাববিশিষ্ট (তিনিই
বিশিষ্যতে = অতিশ্রেষ্ঠ।

যোগী, যুঞ্জীত, সততম্, আত্মানম্, রহসি, স্থিতঃ,
একাকী, যতচিত্তাত্মা, নিরাশীঃ, অপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

সেইজন্য –

যতচিত্তাত্মা = মন এবং ইন্দ্রিয় সহ শরীর জয়কারী,
নিরাশীঃ = বাসনা রহিত এবং
অপরিগ্রহঃ = সংগ্রহরহিত
যোগী = যোগী
একাকী = একা–ই

রহসি = নির্জন স্থানে
স্থিতঃ = স্থিত হয়ে
সততম্ = নিরন্তর
আত্মানম্ = আত্মাকে
যুঞ্জীত = (পরমেশ্বরের ধ্যানে) নিযুক্ত করবে।

শুচৌ, দেশে, প্রতিষ্ঠাপ্য, স্থিরম্, আসনম্, আত্মনঃ,
ন, অত্যুচ্ছ্রিতম্, ন, অতিনীচম্, চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

কিভাবে? –

শুচৌ = শুদ্ধ
দেশে = ভূমিতে
চৈলাজিন কুশোত্তরম্ = উপর্যুপরিভাবে কুশ, মৃগচর্ম ও বস্ত্রাচ্ছাদিত
আত্মনঃ = নিজের
আসনম্ = আসনকে

ন = না
অত্যুচ্ছ্রিতম্ = অতি উঁচু (এবং)
ন = না
অতিনীচম্ = অতি নিচু (স্থানে)
স্থিরম্ = স্থিরভাবে
প্রতিষ্ঠাপ্য = স্থাপন করে–

তত্র, একাগ্রম্, মনঃ, কৃত্বা, যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ,
উপবিশ্য, আসনে, যুঞ্জ্যাৎ, যোগম্, আত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

এবং –

তত্র = সেই
আসনে = আসনে
উপবিশ্য = বসে (তথা)
যতচিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ = চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহকে বশ করে,
মনঃ = মনকে

একাগ্রম্ = একাগ্র
কৃত্বা = করে,
আত্মবিশুদ্ধয়ে = অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য
যোগম্ = যোগ
যুঞ্জ্যাৎ = অভ্যাস করবে।

সমম্, কায়শিরোগ্রীবম্, ধারয়ন্, অচলম্, স্থিরঃ,
সংপ্রেক্ষ্য, নাসিকাগ্রম্, স্বম্, দিশঃ, চ, অনবলোকয়ন্॥ ১৩॥

তার বিধি এইপ্রকার –

কায়শিরো–গ্রীবম্	=	শরীর, মস্তক, এবং গ্রীবাকে	স্বম্নাসিকাগ্রম	=	নিজের নাসিকার অগ্রভাগে
সমম্	=	সমান	সংপ্রেক্ষ্য	=	দেখে (দৃষ্টি স্থাপন করে),
চ	=	ও	দিশঃ	=	অন্যদিকে
অচলম্	=	অচল (ভাবে)	অনবলোকয়ন্	=	না তাকিয়ে।
ধারয়ন্	=	ধারণ করে,			
স্থিরঃ	=	স্থির (হয়ে)			

প্রশান্তাত্মা, বিগতভীঃ, ব্রহ্মচারিব্রতে, স্থিতঃ,
মনঃ, সংযম্য, মচ্চিত্তঃ, যুক্তঃ, আসীত, মৎপরঃ॥ ১৪॥

এবং –

ব্রহ্মচারিব্রতে	=	ব্রহ্মচর্যব্রতে	মনঃ	=	মনকে
স্থিতঃ	=	স্থিত,	সংযম্য	=	বশ করে
বিগতভীঃ	=	ভয়রহিত (ও)	মচ্চিত্তঃ	=	আমাতেই চিত্ত সংলগ্ন (যুক্ত) (এবং)
প্রশান্তাত্মা	=	উত্তম প্রকারে শান্ত অন্তঃকরণ বিশিষ্ট	মৎপরঃ	=	মৎ পরায়ণ (হয়ে)
যুক্তঃ	=	সাবধান (যোগী)	আসীত	=	(স্থিত) হবে।

যুঞ্জন্, এবম্, সদা, আত্মানম্, যোগী, নিয়তমানসঃ,
শান্তিম্, নির্বাণপরমাম্, মৎসংস্থাম্, অধিগচ্ছতি॥ ১৫॥

নিয়তমানসঃ	=	সংযতচিত্ত			স্বরূপে) লগ্ন করে
যোগী	=	যোগী	মৎসংস্থাম্	=	আমাতে স্থিতিরূপ
এবম্	=	এইপ্রকারে	নির্বাণপরমাম্	=	পরমানন্দ পরাকাষ্ঠা–যুক্ত
আত্মানম্	=	আত্মাকে	শান্তিম্	=	শান্তি
সদা	=	নিরন্তর	অধিগচ্ছতি	=	লাভ করে।
যুঞ্জন্	=	(পরমেশ্বরের			

ন, অতি, অশ্নতঃ, তু, যোগঃ, অস্তি, ন, চ, একান্তম্, অনশ্নতঃ,
ন, চ, অতি, স্বপ্নশীলস্য, জাগ্রতঃ, ন, এব, চ, অর্জুন॥ ১৬॥

কিন্তু –

অর্জুন	=	হে অর্জুন!	অস্তি	=	সিদ্ধ হয়,
যোগঃ	=	এই যোগ	চ	=	এবং
ন	=	না	ন	=	না
তু	=	তো	একান্তম্	=	একেবারে
অতি	=	অতিরিক্ত	অনশ্নতঃ	=	নিরাহারীর (সিদ্ধ হয়)
অশ্নতঃ	=	আহারকারীর	চ	=	আর

ন = না
অতি = অতিরিক্ত
স্বপ্নশীলস্য = নিদ্রাশীল
চ = ও
ন = না
জাগ্রতঃ = অত্যন্ত জাগরণশীলের
এব = ই (সিদ্ধ হয়)।

যুক্তাহারবিহারস্য, যুক্তচেষ্টস্য, কর্মসু,
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য, যোগঃ, ভবতি, দুঃখহা ॥ ১৭॥

এই –

দুঃখহা = দুঃখনাশকারী
যোগঃ = যোগ (তো)
যুক্তাহার–বিহারস্য = নিয়মিত আহার বিহারকারীর (এবং)
কর্মসু = কর্মসমূহতে
যুক্তচেষ্টস্য = যথাযোগ্য চেষ্টা–কারীর (আর)
যুক্তস্বপ্নাব–বোধস্য = যথাযোগ্য শয়ন ও জাগরণকারীর (ই) (সিদ্ধ)
ভবতি = হয়।

তম্, বিদ্যাৎ, দুঃখসংযোগবিয়োগম্, যোগসংজ্ঞিতম্,
সঃ, নিশ্চয়েন, যোক্তব্যঃ, যোগঃ, অনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥

এবং যা –

দুঃখসংযোগ–বিয়োগম্ = দুঃখরূপ সংসারের সংযোগ রহিত (আর)
যোগসংজ্ঞিতম্ = যার নাম যোগ
তম্ = তাকে
বিদ্যাৎ = জানা চাই।
সঃ = সেই
যোগঃ = যোগ
অনির্বিণ্ণ–চেতসা = নিরুদ্যম চিত্তে ধৈর্য ও উৎসাহপূর্বক অর্থাৎ তৎপরায়ণ চিত্তে
নিশ্চয়েন = নিশ্চয়পূর্বক
যোক্তব্যঃ = করা কর্তব্য।

সর্বভূতস্থিতম্, যঃ, মাম্, ভজতি, একত্বম্, আস্থিতঃ,
সর্বথা, বর্তমানঃ, অপি, সঃ, যোগী, ময়ি, বর্ততে ॥ ৩১ ॥

এইপ্রকার –

যঃ = যে পুরুষ
একত্বম্ = একীভাবে
আস্থিতঃ = স্থিত হয়ে
সর্বভূতস্থিতম্ = সকল ভূতে আত্মা–রূপে স্থিত
মাম্ = সচ্চিদানন্দঘন বাসু–দেবরূপ আমাকে
ভজতি = ভজন করে,
সঃ = সেই
যোগী = যোগী
সর্বথা = সর্বপ্রকারের
বর্তমানঃ = ব্যবহার করে
অপি = ও
ময়ি = আমাতে (ই)
বর্ততে = অবস্থান করে।

আত্মৌপম্যেন, সর্বত্র, সমম্, পশ্যতি, যঃ, অর্জুন,
সুখম্, বা, যদি, বা, দুঃখম্, সঃ, যোগী, পরমঃ, মতঃ ॥ ৩২ ॥

এবং –

অর্জুন	= হে অর্জুন!	যদি বা	= অথবা
যঃ	= যে যোগী	দুঃখম্	= দুঃখকে (ও) (সকলেতে সমান দেখে)
আত্মৌপম্যেন	= নিজের সাদৃশ্যানুসারে	সঃ	= সেই
সর্বত্র	= সর্বভূতে	যোগী	= যোগী
সমম্	= সমভাবে	পরমঃ	= পরম শ্রেষ্ঠ (বলে)
পশ্যতি	= দেখে,	মতঃ	= মানা হয়েছে।
বা	= আর		
সুখম্	= সুখ		

অসংশয়ম্, মহাবাহো, মনঃ, দুর্নিগ্রহম্, চলম্,
অভ্যাসেন, তু, কৌন্তেয়, বৈরাগ্যেণ, চ, গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

এইপ্রকারে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন –

মহাবাহো	= হে মহাবাহো!	কৌন্তেয়	= হে কুন্তীপুত্র অর্জুন!
অসংশয়ম্	= নিঃসন্দেহে (ই)	অভ্যাসেন	= অভ্যাস (স্থিতির নিমিত্ত বারংবার যত্ন) দ্বারা
মনঃ	= মন	চ	= ও
চলম্	= চঞ্চল (এবং)	বৈরাগ্যেণ	= বৈরাগ্য দ্বারা (তাকে)
দুর্নিগ্রহম্	= দুর্নিগ্রহ,	গৃহ্যতে	= বশ করা যায় (অতএব
তু	= কিন্তু		

অসংযতাত্মনা, যোগঃ, দুষ্প্রাপঃ, ইতি, মে মতিঃ,
বশ্যাত্মনা, তু, যততা, শক্যঃ, অবাপ্তুম্, উপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অসংযতাত্মনা	= যে মনকে বশ করতে পারেনি এরকম পুরুষের	যততা	= প্রযত্নশীল পুরুষের দ্বারা
যোগঃ	= যোগ	উপায়তঃ	= সাধনার বলে তা
দুষ্প্রাপঃ	= দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন,	অবাপ্তুম্	= পাওয়া
তু	= এবং	শক্যঃ	= সহজ;
বশ্যাত্মনা	= স্বাধীনচেতাঃ (ও)	ইতি	= এটা
		মে	= আমার
		মতিঃ	= মত

অযতিঃ, শ্রদ্ধয়া, উপেতঃ যোগাৎ, চলিতমানসঃ,
অপ্রাপ্য, যোগসংসিদ্ধিম্, কাম্, গতিম, কৃষ্ণ, গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ	= হে কৃষ্ণ!	চলিতমানসঃ	= চলায়মান হন, (এরূপ সাধক যোগী)
শ্রদ্ধয়া, – উপেতঃ	= যিনি যোগে শ্রদ্ধাযুক্ত	যোগসংসিদ্ধিম্	= যোগের সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎ সাক্ষাৎকাররূপ সিদ্ধিকে
অযতিঃ	= (কিন্তু) সংযমী নন, এইজন্য অন্তিমকালে		
যোগাৎ	= যোগ থেকে		

অপ্রাপ্য = লাভ না করে
কাম্ = কোন্
গতিম্ = গতি
গচ্ছতি = লাভ করে।

কচ্চিৎ, ন, উভয়বিভ্রষ্টঃ, ছিন্নাভ্রম্, ইব, নশ্যতি,
অপ্রতিষ্ঠঃ, মহাবাহো, বিমূঢ়ঃ, ব্রহ্মণঃ, পথি॥ ৩৮॥

মহাবাহো = হে মহাবাহো! (সেই পুরুষ)
কচ্চিৎ = কি
ব্রহ্মণঃ = ভগবৎ প্রাপ্তির
পথি = পথে
বিমূঢ়ঃ = হতবুদ্ধি (ও)
অপ্রতিষ্ঠঃ = আশ্রয়রহিত হয়ে
ছিন্নাভ্রম্ = ছিন্নভিন্ন মেঘের
ইব = মতো
উভয়বিভ্রষ্টঃ = উভয়দিক থেকে অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি এবং সাংসারিক ভোগ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে
ন, নশ্যতি = কি নষ্ট (অর্থাৎ উভয়–চ্যুত) হয়ে যায় না?

এতৎ, মে, সংশয়ম্, কৃষ্ণ, ছেত্তুম্, অর্হসি, অশেষতঃ
ত্বদন্যঃ, সংশয়স্য, অস্য, ছেত্তা, ন, হি, উপপদ্যতে॥ ৩৯॥

কৃষ্ণ = হে কৃষ্ণ!
মে = আমার
এতৎ = এই
সংশয়ম্ = সংশয়কে
অশেষতঃ = সম্পূর্ণরূপে
ছেত্তুম্ = ছেদন করতে (আপনিই)
অর্হসি = পারেন,
হি = যেহেতু
ত্বদন্যঃ = আপনি ছাড়া অন্য কাউকে
অস্য = এই
সংশয়স্য = সংশয়ের
ছেত্তা = ছেদনকারী রূপে
ন, উপপদ্যতে = পাওয়া সম্ভব নয়।

পার্থ, ন, এব, ইহ, ন, অমুত্র, বিনাশঃ, তস্য, বিদ্যতে,
ন, হি, কল্যাণকৃৎ, কশ্চিৎ, দুর্গতিম্, তাত, গচ্ছতি॥ ৪০॥

এইভাবে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

পার্থ = হে পার্থ!
তস্য = সেই পুরুষের
ন = না
ইহ = ইহলোক (এবং)
ন = না
অমুত্র = পরলোক–
এব = ও
বিনাশঃ = নাশ
বিদ্যতে = হয়ে থাকে;
হি = কেননা
তাত = হে প্রিয়!
কশ্চিৎ = কোনও
কল্যাণকৃৎ = শুভকর্মকারী অর্থাৎ ভগবদর্থে কর্মকারী ব্যক্তি
দুর্গতিম্ = দুর্গতিকে
ন, গচ্ছতি = প্রাপ্ত হয় না।

প্রাপ্য, পুণ্যকৃতাম্, লোকান, উষিত্বা, শাশ্বতীঃ, সমাঃ,
শুচীনাম্, শ্রীমতাম্, গেহে, যোগভ্রষ্টঃ, অভিজায়তে॥ ৪১॥

কিন্তু সেই –

যোগভ্রষ্টঃ	= যোগভ্রষ্ট পুরুষ	সমাঃ	= বর্ষ
পুণ্যকৃতাম্	= পুণ্যবানদের	উষিত্বা	= বাস করে
লোকান্	= লোকসমূহ অর্থাৎ স্বর্গাদি উত্তম লোক সকল	শুচীনাম্	= শুদ্ধাচারী
প্রাপ্য	= লাভ করে, (সেইসব স্থানে)	শ্রীমতাম্	= শ্রীমান পুরুষ (ধনী) দের
শাশ্বতীঃ	= বহু	গেহে	= ঘরে
		অভিজায়তে	= জন্মগ্রহণ করে থাকে।

অথবা, যোগিনাম্, এব, কুলে, ভবতি, ধীমতাম্,
এতৎ, হি, দুর্লভতরম্, লোকে, জন্ম, যৎ, ঈদৃশম্॥ ৪২॥

অথবা	= অথবা (বৈরাগ্যবান পুরুষ ঐ সব লোকে না গিয়ে)	ঈদৃশম্	= এইপ্রকার
ধীমতাম্	= জ্ঞানবান্	যৎ	= যে
যোগিনাম	= যোগীদের	এতৎ	= এই
এব	= ই	জন্ম	= জন্ম (তা)
কুলে	= কুলে	লোকে	= সংসারে
ভবতি	= জন্মগ্রহণ করে, (কিন্তু)	হি	= নিঃসন্দেহেই
		দুর্লভতরম্	= অতি দুর্লভ।

তত্র, তম্, বুদ্ধিসংযোগম্, লভতে, পৌর্বদেহিকম্,
যততে, চ, ততঃ, ভূয়ঃ, সংসিদ্ধৌ, কুরুনন্দন॥ ৪৩॥

এবং সেই পুরুষ –

তত্র	= সেখানে	লভতে	= লাভ করে,
তম্	= সেই	চ	= এবং
পৌর্বদেহিকম্	= পূর্বজন্মের সাধিত	কুরুনন্দন	= হে কুরুনন্দন!
বুদ্ধিসংযোগম্	= বুদ্ধিসংযোগ অর্থাৎ সমত্ববুদ্ধি যোগের সংস্কার সমুদয়কে (অনায়াসেই)	ততঃ	= তার প্রভাবে (সে)
		ভূয়ঃ	= পুনরায় (উত্তমরূপে)
		সংসিদ্ধৌ	= ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য
		যততে	= যত্ন করে।

পূর্বাভ্যাসেন, তেন, এব, হ্রিয়তে, হি, অবশঃ, অপি, সঃ,
জিজ্ঞাসুঃ, অপি, যোগস্য, শব্দব্রহ্ম, অতিবর্ততে॥ ৪৪॥

এবং –

সঃ	= সে	তেন	= সেই
অবশঃ	= বিষয় সকলের বশে হয়ে	পূর্বাভ্যাসেন	= পূর্বজন্মের অভ্যাস দ্বারা
অপি	= ও	এব	= হি

হি = নিঃসন্দেহরূপে
হ্রিয়তে = ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, (তথা)
যোগস্য = সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগের
জিজ্ঞাসুঃ = জিজ্ঞাসু

অপি = ও
শব্দব্রহ্ম = বেদে কথিত সকাম–কর্মের ফলকে
অতিবর্ততে = উল্লঙ্ঘন করে।

প্রযত্নাৎ, যতমানঃ, তু, যোগী, সংশুদ্ধকিল্বিষঃ,
অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ, ততঃ, যাতি, পরাম্, গতিম্॥ ৪৫॥

প্রযত্নাৎ = অতি যত্নের সঙ্গে
যতমানঃ = অভ্যাসকারী
যোগী = যোগী
তু = কিন্তু
অনেকজন্ম–সংসিদ্ধঃ = বহু জন্মের শুভ সংস্কারের ফলে
সংশুদ্ধ–কিল্বিষঃ = সকল পাপ থেকে উত্তমরূপে শুদ্ধ হয়ে
ততঃ = অতঃপর তৎকালেই
পরাম্ = পরম
গতিম্ = গতিকে
যাতি = প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করে।

তপস্বভ্যঃ, অধিকঃ, যোগী, জ্ঞানিভ্যঃ, অপি, মতঃ, অধিকঃ,
কর্মিভ্যঃ, চ, অধিকঃ, যোগী, তস্মাৎ, যোগী, ভব, অর্জুন॥ ৪৬॥

যেহেতু –

যোগী = যোগী
তপস্বিভ্যঃ = তপস্বীগণ অপেক্ষা
অধিকঃ = শ্রেষ্ঠ,
জ্ঞানিভ্যঃ = শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে
অপি = ও
অধিকঃ = শ্রেষ্ঠ
মতঃ = এটা মান্য আছে
চ = তথা
কর্মিভ্যঃ = সকামকর্মকারীগণদের থেকে (ও)
যোগী = যোগী
অধিকঃ = শ্রেষ্ঠ
তস্মাৎ = সেইজন্য
অর্জুন = হে অর্জুন! (তুমি)
যোগী = যোগী
ভব = হও।

যোগিনাম্, অপি, সর্বেষাম্, মদ্গতেন, অন্তরাত্মনা,
শ্রদ্ধাবান্, ভজতে, যঃ, মাম্, সঃ, মে, যুক্ততমঃ, মতঃ॥ ৪৭॥

এবং হে প্রিয় –

সর্বেষাম্ = সকল
যোগিনাম্ = যোগীদের মধ্যে
অপি = ও
যঃ = যে
শ্রদ্ধাবান্ = শ্রদ্ধাবান যোগী
মদ্গতেন = আমাতে লগ্ন
অন্তরাত্মনা = অন্তরাত্মা দ্বারা
মাম্ = আমাকে
ভজতে = নিরন্তর ভজনা করে,
সঃ = সেই যোগী
মে = আমার (কাছে)
যুক্ততমঃ = পরমশ্রেষ্ঠ
মতঃ = বলে মান্য হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৭ এর শ্লোকের ফটোকপি

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ –

ময়ি, আসক্তমনাঃ, পার্থ, যোগম্, যুঞ্জন্, মদাশ্রয়ঃ,
অসংশয়ম্, সমগ্রম্, মাম্, যথা, জ্ঞাস্যসি, তৎ, শৃণু ॥ ১ ॥

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন –

পার্থ	= হে পার্থ!
ময়ি,	= আমাতে
আসক্তমনাঃ	= অনন্যপ্রেমে আমাতে আসক্তিযুক্ত মন বিশিষ্ট (ও অনন্যভাবে)
মদাশ্রয়ঃ	= মৎপরায়ণ হয়ে (তুমি)
যোগম্	= যোগে
যুঞ্জন্	= সংলগ্ন হয়ে
যথা	= যে প্রকারে
সমগ্রম্	= সম্পূর্ণ বিভূতি বল, ঐশ্বর্যাদি গুণসমূহযুক্ত সকলের আত্মরূপ
মাম্	= আমাকে
অসংশয়ম্	= নিঃসংশয়ে
জ্ঞাস্যসি	= জানবে,
তৎ	= তা
শৃণু	= শোনো।

জ্ঞানম্, তে, অহম, সবিজ্ঞানম্, ইদম, বক্ষ্যামি, অশেষতঃ,
যৎ, জ্ঞাত্বা, ন, ইহ, ভূয়ঃ, অন্যৎ, জ্ঞাতব্যম, অবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অহম্	= আমি
তে	= তোমাকে
ইদম্	= এই
সবিজ্ঞানম্	= বিজ্ঞানসহ
জ্ঞানম্	= তত্ত্বজ্ঞান
অশেষতঃ	= সম্পূর্ণরূপে
বক্ষ্যামি	= বলব,
যৎ	= যা
জ্ঞাত্বা	= জানলে
ইহ	= এই সংসারে
ভূয়ঃ	= পুনরায়
অন্যৎ	= অন্য কিছুই
জ্ঞাতব্যম্	= জানবার যোগ্য
ন, অবশিষ্যতে	= অবশিষ্ট থাকে না।

মনুষ্যাণাম্, সহস্রেষু, কশ্চিৎ, যততি, সিদ্ধয়ে,
যততাম্, অপি, সিদ্ধানাম্, কশ্চিৎ, মাম্, বেত্তি, তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

কিন্তু –

সহস্রেষু	= সহস্র সহস্র
মনুষ্যাণাম্	= মানুষের মধ্যে
কশ্চিৎ	= কোন কোন ব্যক্তি
সিদ্ধয়ে	= আমার প্রাপ্তির জন্য
যততি	= যত্ন করে থাকে, (এবং)
যততাম্	= ঐ যত্নকারী
সিদ্ধানাম্	= যোগীদের মধ্যে
অপি	= ও
কশ্চিৎ	= কোনও পুরুষ (মৎপরায়ণ হয়ে)
মাম্	= আমাকে
তত্ত্বতঃ	= তত্ত্বতঃ
বেত্তি	= জেনে থাকে অর্থাৎ যথার্থই অনুভব করে।

ভূমিঃ, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, খম্, মনঃ, বুদ্ধিঃ এব, চ,
অহঙ্কারঃ, ইতি, ইয়ম্, মে, ভিন্না, প্রকৃতিঃ, অষ্টধা॥ ৪॥

এবং হে অর্জুন –

ভূমিঃ	= পৃথিবী,	অহঙ্কারঃ	= অহঙ্কার
আপঃ	= জল,	এব	= ও
অনলঃ	= অগ্নি,	ইতি	= এইভাবে
বায়ুঃ	= বায়ু,	ইয়ম্	= এই
খম্	= আকাশ,	অষ্টধা	= আটভাগে
মনঃ	= মন,	ভিন্না	= বিভক্ত
বুদ্ধিঃ	= বুদ্ধি,	মে	= আমার
চ	= আর	প্রকৃতিঃ	= প্রকৃতি রয়েছে।

অপরা, ইয়ম্, ইতঃ, তু, অন্যাম্, প্রকৃতিম্, বিদ্ধি, মে, পরাম্,
জীবভূতাম্, মহাবাহো, যয়া, ইদম্, ধার্যতে, জগৎ॥ ৫॥

সেই –

ইয়ম্	= এই (আট প্রকার ভেদযুক্ত)	জীবভূতাম্	= জীবরূপ
		পরাম্	= পরা অর্থাৎ চেতন
তু	= তো	প্রকৃতিম্	= প্রকৃতিকে
অপরা	= অপরা অর্থাৎ আমার জড় প্রকৃতি (এবং)	বিদ্ধি	= জানো,
		যয়া	= যার দ্বারা
মহাবাহো	= হে মহাবাহো!	ইদম্	= এই (সম্পূর্ণ)
ইতঃ	= এ থেকে	জগৎ	= জগৎ
অন্যাম্	= ভিন্ন	ধার্যতে	= ধারণ করা হয়।
মে	= আমার		

এতদ্‌যোনীনি, ভূতানি, সর্বাণি, ইতি, উপধারয়,
অহম্, কৃৎস্নস্য, জগতঃ, প্রভবঃ, প্রলয়ঃ, তথা॥ ৬॥

এবং হে অর্জুন তুমি –

ইতি	= এইরূপ	অহম্	= আমি (হই)
উপধারয়	= বুঝে নাও (যে)	কৃৎস্নস্য	= সম্পূর্ণ
সর্বাণি	= সকল	জগতঃ	= জগতের
ভূতানি	= প্রাণী	প্রভবঃ	= প্রভব
এতদ্‌যোনীনি	= এই দুই প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন হয় (আর)	তথা	= এবং
		প্রলয়ঃ	= প্রলয়রূপ।

মত্তঃ, পরতরম্, ন, অন্যৎ, কিঞ্চিৎ, অস্তি, ধনঞ্জয়,
ময়ি, সর্বম্, ইদম্, প্রোতম, সূত্রে, মণিগণাঃ, ইব॥ ৭॥

অতএব –

ধনঞ্জয় = হে ধনঞ্জয়
মত্তঃ = আমার থেকে
অন্যৎ = ভিন্ন
কিঞ্চিৎ = কিছুমাত্রও
অন্যৎ = অন্য কোনও
পরতরম্ = পরম (কারণ)
ন, অস্তি = নেই

ইদম্ = এই
সর্বম্ = সম্পূর্ণ জগৎ
সূত্রে = সূত্রতে (সূত্রের)
মণিগণাঃ = মণিসমূহের
ইব = মতো
ময়ি = আমাতে
প্রোতম্ = গ্রথিত আছে।

রসঃ, অহম্, অপ্সু কৌন্তেয়, প্রভা, অস্মি, শশিসূর্যয়োঃ,
প্রণবঃ, সর্ববেদেষু, শব্দঃ, খে, পৌরুষম্, নৃষু॥ ৮॥

যেমন –

কৌন্তেয় = হে অর্জুন!
অপ্সু = জলে
অহম্ = আমি
রসঃ = রস, (এবং)
শশি সূর্যয়োঃ = চন্দ্র ও সূর্যে
প্রভা = প্রকাশ
অস্মি = হই (আমি)

সর্ববেদেষু = সকল বেদেতে
প্রণবঃ = ওঁকার (তথা)
খে = আকাশে
শব্দঃ = শব্দ (ও)
নৃষু = পুরুষগণের
পৌরুষম্ = পৌরুষ (আমিই)।

পুণ্যঃ, গন্ধঃ, পৃথিব্যাম্, চ, তেজঃ, অস্মি, বিভাবসৌ,
জীবনম্, সর্বভূতেষু, তপঃ, চ, অস্মি, তপস্বিষু॥ ৯॥

তথা –

পৃথিব্যাম্ = পৃথিবীতে
পুণ্যঃ = পবিত্র
গন্ধঃ = গন্ধ
চ = আর
বিভাবসৌ = অগ্নিতে
তেজঃ = তেজ
অস্মি = হচ্ছি, (আমি)
চ = এবং
সর্বভূতেষু = সকল প্রাণীতে

জীবনম্ = (তাদের) জীবন অর্থাৎ যার দ্বারা তারা জীবিত অর্থাৎ জীবনীশক্তি হই আমি।
চ = আর
তপস্বিষু = তপস্বীদের
তপঃ = তপস্যা
অস্মি = হচ্ছি (আমি)।

বীজম্, মাম, সর্বভূতানাম্, বিদ্ধি, পার্থ, সনাতনম্,
বুদ্ধিঃ, বুদ্ধিমতাম্, অস্মি, তেজঃ, তেজস্বিনাম্, অহম্॥ ১০॥

এবং –

পার্থ = হে অর্জুন! (তুমি)
সর্বভূতানাম্ = সকল ভূতের
সনাতনম্ = সনাতন
বীজম্ = কারণ
মাম্ = আমাকেই

বিদ্ধি = জানো
অহম্ = আমি
অস্মি = হচ্ছি
বুদ্ধিমতাম্ = বুদ্ধিমানদের
বুদ্ধিঃ = বুদ্ধি (আর)

তেজস্বিনাম্	= তেজস্বীদের	তেজঃ	= তেজ।

বলম্, বলবতাম্, চ, অহম্, কামরাগবিবর্জিতম্,
ধর্মাবিরুদ্ধঃ, ভূতেষু, কামঃ, অস্মি, ভারতর্ষভ ॥ ১১ ॥

এবং –

ভরতর্ষভ	= হে ভরত শ্রেষ্ঠ!	চ	= আর
অহম্	= আমি	ভূতেষু	= প্রাণীদের
বলবতাম্	= বলবানদের	ধর্মবিরুদ্ধঃ	= ধর্মের অনুকূল অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত
কামরাগবি- বর্জিতম্	= আসক্তি এবং কাম- নারহিত	কামঃ	= কাম
বলম্	= বল অর্থাৎ সামর্থ্য,	অস্মি	= হই।

যে, চ, এব, সাত্ত্বিকাঃ, ভাবাঃ, রাজসাঃ, তামসাঃ, চ, যে,
মত্তঃ, এব, ইতি, তান্, বিদ্ধি, ন, তু, অহম্, তেষু, তে, ময়ি ॥ ১২ ॥

তথা –

চ	= আর	তান্	= সে সকলকে
এব	= ও	মত্তঃ	= আমা হতে
যে	= সে সকল	এব	= ই (উৎপন্ন)
সাত্ত্বিকাঃ	= সত্ত্বগুণ হতে উৎপন্ন	ইতি	= এইরকম
ভাবাঃ	= ভাব আছে	বিদ্ধি	= জানো।
চ	= এবং	তু	= কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে)
যে	= যে সকল	তেষু	= তাদের মধ্যে
রাজসাঃ	= রজোগুণ হতে উৎপন্ন (আর)	অহম্	= আমি (আর)
		তে	= তারা
তামসাঃ	= তমোগুণ হতে উৎপন্ন ভাব আছে	ময়ি	= আমাতে
		ন	= নেই।

ত্রিভিঃ, গুণময়ৈঃ, ভাবৈঃ, এভিঃ, সর্বম্, ইদম্, জগৎ,
মোহিতম্, ন, অভিজানাতি, মাম, এভ্যঃ, পরম্, অব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

কিন্তু –

গুণময়ৈঃ	= গুণের কার্যরূপ (সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস)	মোহিতম্	= মোহিত হয়ে আছে (এইজন্য)
এভিঃ	= এইসকল	এভ্যঃ	= এই তিন গুণ থেকে
ত্রিভিঃ	= তিনপ্রকার	পরম্	= পর (শ্রেষ্ঠ)
ভাবৈঃ	= ভাব দ্বারা	অব্যয়ম্	= অবিনাশীরূপ
ইদম্	= এই	মাম্	= আমাকে
সর্বম্	= সকল	ন, অভি- জানাতি	= তত্ত্বতঃ জানতে পারে না।
জগৎ	= জগৎ		

দৈবী, হি, এষা, গুণময়ী, মম, মায়া, দুরত্যয়া,
মাম্, এব, যে, প্রপদ্যন্তে, মায়াম্, এতাম্, তরন্তি, তে ॥ ১৪ ॥

হি	=	কেননা
এষা	=	এই
দৈবী	=	অলৌকিক অর্থাৎ অতি অদ্ভুত
গুণময়ী	=	ত্রিগুণময়ী
মম	=	আমার
মায়া	=	যোগমায়া
দুরত্যয়া	=	বড়ই দুস্তর; (কিন্তু)
যে	=	যে পুরুষেরা
মাম্	=	আমাকে
এব	=	ই
প্রপদ্যন্তে	=	নিরন্তর ভজনা করে,
তে	=	তারা
এতাম্	=	এই
মায়াম্	=	মায়াকে লঙ্ঘন করে
তরন্তি	=	অর্থাৎ সংসার থেকে উত্তীর্ণ হয়।

ন, মাম্, দুষ্কৃতিনঃ, মূঢ়াঃ, প্রপদ্যন্তে, নরাধমাঃ,
মায়য়া, অপহৃতজ্ঞানাঃ, আসুরম্, ভাবম্, আশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

এইরকম সুগম উপায় থাকা সত্ত্বেও –

মায়য়া	=	মায়া দ্বারা
অপহৃতজ্ঞানাঃ	=	যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এরূপ (এবং)
আসুরম্	=	আসুর
ভাবম্	=	স্বভাবকে
আশ্রিতাঃ	=	যারা আশ্রয় করেছে এরূপ
দুষ্কৃতিনঃ	=	দুষ্কৃতী,
নরাধমাঃ	=	নরাধম,
মূঢ়াঃ	=	মূঢ়গণ
মাম্	=	আমাকে
ন, প্রপদ্যন্তে	=	ভজনা করে না।

চতুর্বিধাঃ, ভজন্তে, মাম্, জনাঃ, সুকৃতিনঃ, অর্জুন,
আর্তঃ, জিজ্ঞাসুঃ, অর্থার্থী, জ্ঞানী, চ, ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

এবং –

ভরতর্ষভ	=	হে ভরতবংশ শ্রেষ্ঠ
অর্জুন	=	অর্জুন!
সুকৃতিনঃ	=	উত্তম কর্মকারী
অর্থার্থী	=	অর্থার্থী,
আর্তঃ	=	আর্ত,
জিজ্ঞাসুঃ	=	জিজ্ঞাসু
চ	=	আর
জ্ঞানী	=	জ্ঞানী অর্থাৎ নিষ্কামী– (এইরূপ)
চতুর্বিধাঃ	=	চারপ্রকার
জনাঃ	=	ভক্তজন
মাম্	=	আমাকে
ভজন্তে	=	ভজনা করে।

তেষাম্, জ্ঞানী, নিত্যযুক্তঃ, একভক্তিঃ, বিশিষ্যতে,
প্রিয়ঃ, হি, জ্ঞানিনঃ, অত্যর্থম্, অহম্, সঃ, চ, মম, প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তেষাম্	=	তাদের মধ্যে (ও)
নিত্যযুক্তঃ	=	নিত্য আমাতে একীভাবে স্থিত
একভক্তিঃ	=	অনন্য প্রেমভক্তি বিশিষ্ট
জ্ঞানী	=	জ্ঞানীভক্ত
বিশিষ্যতে	=	অতি উত্তম হয়;
হি	=	যেহেতু
জ্ঞানিনঃ	=	(যে আমাকে তত্ত্বতঃ

জানে এরূপ) জ্ঞানীর
অহম্ = আমি
অত্যর্থম্ = অত্যন্ত
প্রিয়ঃ = প্রিয় হই,

চ = এবং
সঃ = সেই জ্ঞানী
মম = আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়।

উদারাঃ, সর্বে, এব, এতে, জ্ঞানী, তু আত্মা, এব, মে, মতম্,
আস্থিতঃ, সঃ, হি, যুক্তাত্মা, মাম্, এব, অনুত্তমাম্, গতিম ॥ ১৮ ॥

যদ্যপি –

এতে = এঁরা
সর্বে, এব = সকলেই
উদারাঃ = উদার অর্থাৎ আমাকে সশ্রদ্ধ ভজনা করায় উত্তম;
তু = কিন্তু
জ্ঞানী = জ্ঞানী (তো) (সাক্ষাৎ)
আত্মা = আমার স্বরূপ
এব = ই হয় (এরূপ)
মে = আমার

মতম্ = মত।
হি = কেননা
সঃ = সেই
যুক্তাত্মা = মদ্গত মন বুদ্ধিযুক্ত (জ্ঞানীভক্ত)
অনুত্তমাম্ = অতি উত্তম
গতিম্ = গতিস্বরূপ
মাম্ = আমাতে
এব = ই
আস্থিতঃ = উত্তমরূপে স্থিত আছে।

বহূনাম্, জন্মনাম্, অন্তে, জ্ঞানবান্, মাম্, প্রপদ্যতে,
বাসুদেবঃ, সর্বম্, ইতি, সঃ, মহাত্মা, সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

এবং যে –

বহূনাম্ = অনেক
জন্মনাম্ = জন্মের
অন্তে = অন্তিম জন্মে
জ্ঞানবান্ = তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত জ্ঞানী
সর্বম্ = সবকিছু
বাসুদেবঃ = বাসুদেবই হন;

ইতি = এইরূপ
মাম্ = আমাকে
প্রপদ্যতে = ভজনা করেন,
সঃ = সেই
মহাত্মা = মহাত্মা
সুদুর্লভঃ = অতিশয় দুর্লভ।

কামৈঃ, তৈঃ, তৈঃ, হৃদজ্ঞানাঃ, প্রপদ্যন্তে, অন্যদেবতাঃ,
তম্, তম্, নিয়মম্, আস্থায়, প্রকৃত্যা, নিয়তাঃ, স্বয়া ॥ ২০ ॥

আর হে অর্জুন! যে সকল পুরুষ বিষয়াসক্ত হয় তারা তো –

স্বয়া = নিজ
প্রকৃত্যা = স্বভাব দ্বারা
নিয়তাঃ = প্রেরিত হয়ে
তৈঃ তৈঃ = সেই সেই
কামৈঃ = ভোগের কামনা দ্বারা
হৃতজ্ঞানাঃ = জ্ঞানভ্রষ্ট হয়ে,
তম্ = সেই

তম্ = সেই
নিয়মম্ = নিয়মকে
আস্থায় = ধারণা করে
অন্যদেবতাঃ = অন্য দেবতাগণকে
প্রপদ্যন্তে = ভজনা করে অর্থাৎ তাদের পূজা করে।

যঃ, যঃ, যাম্, যাম্, তনুম্, ভক্তঃ, শ্রদ্ধয়া, অর্চিতুম্, ইচ্ছতি,
তস্য, তস্য, অচলাম্, শ্রদ্ধাম্, তাম্, এব, বিদধামি, অহম॥ ২১॥

যঃ	=	যে	ইচ্ছতি	=	ইচ্ছা করে,
যঃ	=	যে	তস্য	=	সেই
ভক্তঃ	=	সকামভক্ত	তস্য	=	সেই ভক্তের
যাম্	=	যে	শ্রদ্ধাম্	=	শ্রদ্ধাকে
যাম্	=	যে	তাম্, এব	=	সেই দেবতার প্রতি
তনুম্	=	দেবতার স্বরূপকে	অহম্	=	আমি
শ্রদ্ধয়া	=	শ্রদ্ধাপূর্বক	অচলাম্	=	স্থির
অর্চিতুম্	=	পূজা করতে	বিদধামি	=	করে দিই।

সঃ, তয়া, শ্রদ্ধয়া, যুক্তঃ, তস্য, আরাধনম্, ঈহতে,
লভতে, চ, ততঃ, কামান্, ময়া, এব, বিহিতান্, হি, তান্॥ ২২॥

তথা –

সঃ	=	সেই পুরুষ	ময়া	=	আমার দ্বারা
তয়া	=	সেই	এব	=	ই
শ্রদ্ধায়া, যুক্তঃ	=	শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে	বিহিতান্	=	বিহিত
তস্য	=	সেই দেবতার	তান্	=	সেই
আরাধনম্	=	পূজা করতে	কামান্	=	ইষ্ট (আকাঙ্খিত) ভোগসকল
ঈহতে	=	প্রবৃত্ত হয়			
চ	=	এবং	হি	=	নিঃসন্দেহরূপে
ততঃ	=	সেই দেবতা থেকে	লভতে	=	লাভ করে।

অন্তবৎ, তু, ফলম্, তেষাম্, তৎ, ভবতি, অল্পমেধসাম্,
দেবান্, দেবযজঃ, যান্তি, মদ্ভক্তাঃ, যান্তি, মাম্, অপি॥ ২৩॥

তু	=	কিন্তু	দেবান্	=	দেবতাদের
তেষাম্	=	সেই	যান্তি	=	প্রাপ্ত হন (এবং)
অল্পমেধসাম্	=	অল্পবুদ্ধিমানদের	মদ্ভক্তাঃ	=	আমার ভক্তগণ (যেভাবেই ভজন করুন না কেন শেষে তাঁরা)
তৎ	=	সেই			
ফলম্	=	ফল			
অন্তবৎ	=	বিনাশী			
ভবতি	=	হয়, (তথা)	মাম্	=	আমাকে
দেবযজঃ	=	দেবতার পূজাকারী (সেই) ব্যক্তিগণ	অপি	=	ই
			যান্তি	=	লাভ করে থাকেন।

অব্যক্তম্, ব্যক্তিম্, আপন্নম্, মন্যন্তে, মাম্, অবুদ্ধয়ঃ,
পরম্, ভাবম্, অজানন্তঃ, মম, অব্যয়ম্, অনুত্তমম্॥ ২৪॥

এরূপ সত্ত্বেও সব মানুষ আমার ভজন করে না, তার কারণ এই যে –

অবুদ্ধয়ঃ = বুদ্ধিহীন পুরুষেরা
মম = আমার
অনুত্তমম্ = অনুত্তম অর্থাৎ যা থেকে আর কিছুই উত্তম নেই এরূপ
অব্যয়ম্ = অবিনাশী
পরম্ = পরম
ভাবম্ = ভাবকে অর্থাৎ অজন্মা অবিনাশী হয়েও স্বীয় মায়া দ্বারা প্রকট হই এই রকম প্রভাবকে
অজানন্তঃ = তত্ত্বতঃ না জেনে,
অব্যক্তম্ = মন এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত
মাম্ = সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা রূপ আমাকে (মনুষ্যের ন্যায় জন্মগ্রহণকারী)
ব্যক্তিম্ = ব্যক্তিভাবকে
আপন্নম্ = প্রাপ্ত (বলে)
মন্যন্তে = বিবেচনা করে।

ন, অহম্, প্রকাশঃ, সর্বস্য, যোগমায়াসমাবৃতঃ,
মূঢ়ঃ অয়ম, ন, অভিজানাতি, লোকঃ, মাম্, অজম্, অব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

যোগমায়া-সমাবৃতঃ = নিজের যোগমায়া দ্বারা লুক্কায়িত
অহম্ = আমি
সর্বস্য = সকলের
প্রকাশঃ = প্রত্যক্ষ
ন = হই না, (এইজন্য)
অয়ম্ = এই
মূঢ়ঃ = অজ্ঞানী
লোকঃ = মানুষেরা
অজম্ = জন্মরহিত,
অব্যয়ম = অবিনাশী, পরমাত্মারূপ
মাম্ = আমাকে
ন, অভি-জানাতি = তত্ত্বতঃ জানে না।

বেদ, অহম্, সমতীতানি, বর্তমানানি, চ, অর্জুন,
ভবিষ্যাণি, চ, ভূতানি, মাম্, তু বেদ, ন, কশ্চন ॥ ২৬ ॥

এবং –

অর্জুন = হে অর্জুন!
সমতীতানি = যারা হয়ে গিয়েছে,
চ = এবং
বর্তমানানি = যারা বর্তমান,
চ = আর
ভবিষ্যাণি = যা ভবিষ্যৎ কালে হবে- এরকম
ভুতানি = সকল প্রাণীকেই
অহম্ = আমি
বেদ = জানি,
তু = কিন্তু
মাম্ = আমাকে
কশ্চন = কোনও (শ্রদ্ধা-ভক্তি-রহিত পুরুষ)
ন, বেদ = জানে না

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন, দ্বন্দ্বমোহেন, ভারত,
সর্বভূতানি, সম্মোহম্, সর্গে, যান্তি, পরন্তপ ॥ ২৭॥

কেননা –

ভারত = হে ভরতবংশীয়
পরন্তপ = অর্জুন!
সর্গে = সংসারে
ইচ্ছাদ্বেষ-সমুত্থেন = ইচ্ছা এবং দ্বেষ থেকে উৎপন্ন
দ্বন্দ্বমোহেন = সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরূপ

মোহ দ্বারা
সর্বভূতানি = সকল প্রাণী
সম্মোহম্ = অত্যন্ত অজ্ঞানতাকে
যান্তি = (মোহকে) প্রাপ্ত হচ্ছে।

যেষাম্, তু, অন্তগতম্, পাপম্, জনানাম্, পুণ্যকর্মণাম্,
তে, দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ, ভজন্তে, মাম্, দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

তু = কিন্তু
পুণ্যকর্মণাম্ = (নিষ্কামভাবে) শ্রেষ্ঠ কর্মাচরণকারী
যেষাম্ = যে সকল
জনানাম্ = পুরুষের
পাপম্ = পাপ
অন্তগতম্ = নষ্ট হয়ে গেছে,
তে = সেই সকল
দ্বন্দ্বমোহ-নির্মুক্তাঃ = রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বরূপ মোহ মুক্ত (এবং)
দৃঢ়ব্রতাঃ = দৃঢ়নিশ্চয় বিশিষ্ট পুরুষেরা
মাম্ = আমাকে (সকল প্রকারে)
ভজন্তে = ভজনা করেন।

জরামরণমোক্ষায়, মাম্, আশ্রিত্য, যতন্তি, যে,
তে, ব্রহ্ম, তৎ, বিদুঃ, কৃৎস্নম্, অধ্যাত্মম্, কর্ম, চ, অখিলম্ ॥ ২৯ ॥

এবং –

যে = যারা
মাম্ = আমাকে
আশ্রিত্য = আশ্রয় করে
জরামরণ-মোক্ষায় = জরা এবং মরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য
যতন্তি = যত্ন করে,
তে = তারা
তৎ = সেই
ব্রহ্ম = ব্রহ্মকে
চ = তথা
কৃৎস্নম্ = সম্পূর্ণ
অধ্যাত্মম্ = অধ্যাত্মকে, (আর)
অখিলম্ = সমুদয়
কর্ম = কর্মকে
বিদুঃ = জানে।

সাধিভূতাধিদৈবম্, মাম্, সাধিযজ্ঞম্, চ, যে, বিদুঃ,
প্রয়াণকালে, অপি, চ, মাম্, তে, বিদুঃ, যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

এবং –

যে = যে পুরুষগণ
সাধিভূতাধি-দৈবম্ = অধিভূত এবং অধিদৈবের সঙ্গে
চ = আর
সাধিযজ্ঞম্ = অধিযজ্ঞের সঙ্গে (সকলের আত্মারূপে)
মাম্ = আমাকে
বিদুঃ = জানেন
তে = সেই
যুক্তচেতসঃ = যুক্তচিত্তবিশিষ্ট পুরুষগণ
প্রয়াণকালে = অন্তকালে
অপি = ও
মাম্ = আমাকে
চ = ই
বিদুঃ = জানেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোকের ফটোকপি

অষ্টম অধ্যায়

অর্জুন উবাচ –

কিম, তৎ, ব্রহ্ম,কিম, অধ্যাত্মম, কিম্, কর্ম, পুরুষোত্তম,
অধিভূতম্, চ, কিম্, প্রোক্তম্, অধিদৈবম্, কিম, উচ্যতে॥ ১॥

এইপ্রকার ভগবানের কথা বুঝতে না পারায় অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন–

পুরুষোত্তম	=	হে পুরুষোত্তম!	কিম্	=	কী
তৎ	=	(যা আপনি বর্ণনা	চ	=	ও
		করলেন) সেই	অধিভূতম্	=	অধিভূত (নামে)
ব্রহ্ম	=	ব্রহ্ম	কিম্	=	কী (কাকে)
কিম্	=	কী (এবং)	প্রোক্তম্	=	বলা হয়েছে (তথা)
অধ্যাত্মম্	=	অধ্যাত্ম	অধিদৈবম্	=	অধিদৈব (নামে)
কিম্	=	কী, (আর)	কিম্	=	কী
কর্ম	=	কর্ম	উচ্যতে	=	কথিত হয়েছে?

অধিযজ্ঞঃ, কথম্, কঃ, অত্র, দেহে, অস্মিন্, মধুসূদন,
প্রয়াণকালে, চ, কথম্, জ্ঞেয়ঃ, অসি, নিয়তাত্মভিঃ॥ ২॥

এবং –

মধুসূদন	=	হে মধুসূদন!	নিয়তাত্মভিঃ	=	যুক্তচিত্তবিশিষ্ট
অত্র	=	এখানে			পুরুষগণ দ্বারা
অধিযজ্ঞঃ	=	অধিযজ্ঞ	প্রয়াণকালে	=	অন্তিমকালে
কঃ	=	কে? (আর)			(আপনি)
অস্মিন্	=	এই	কথম্	=	কি প্রকারে
দেহে	=	শরীরে	জ্ঞেয়ঃ	=	জ্ঞাত
কথম্	=	কিভাবে আছে?	অসি	=	হন।
চ	=	ও			

শ্রী ভগবানুবাচ –

অক্ষরম্, ব্রহ্ম, পরমম্, স্বভাবঃ, অধ্যাত্মম্, উচ্যতে,
ভূতভাবোদ্ভবকরঃ, বিসর্গঃ, কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩॥

এইপ্রকার অর্জুন প্রশ্ন করলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন!–

পরমম্	=	পরম	অধ্যাত্মম্	=	'অধ্যাত্ম' (নামে)
		অক্ষর অর্থাৎ যার	উচ্যতে	=	কথিত হয়েছে, (আর)
অক্ষরম্	=	কখনও নাশ নেই–	ভূতভাবো–	=	প্রাণীগণের ভাবের
		এইরূপ সচ্চিদানন্দঘন	দ্ভবকরঃ		উৎপন্নকারী
		পরমাত্মা হলেন	বিসর্গঃ	=	যে ত্যাগ তা
ব্রহ্ম	=	'ব্রহ্ম' (এবং)	কর্মসংজ্ঞিতঃ	=	'কর্ম' নামে কথিত
স্বভাবঃ	=	নিজের স্বরূপ অর্থাৎ			হয়েছে।
		জীবাত্মা			

অধিভূতম্, ক্ষরঃ, ভাবঃ, পুরুষঃ, চ, অধিদৈবতম্,
অধিযজ্ঞঃ, অহম্, এব, অত্র, দেহে, দেহভৃতাম্, বর ॥ ৪ ॥

তথা –

ক্ষরঃ, ভাবঃ	=	উৎপত্তি ও বিনাশশীল সকল পদার্থ	দেহভৃতাম্–বর	=	হে দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন!
অধিভূতম্	=	'অধিভূত' (হয়)	অত্র	=	এই
চ	=	আর	দেহে	=	শরীরে
পুরুষঃ	=	হিরণ্যময় পুরুষ	অহম্	=	আমি বাসুদেব
অধিদৈবতম্	=	'অধিদৈব' হন।	এব	=	ই (বিষ্ণুরূপে)
		(এবং)	অধিযজ্ঞঃ	=	'অধিযজ্ঞ' হই।

অন্তকালে, চ, মাম্, এব, স্মরন্, মুক্ত্বা, কলেবরম্।
যঃ, প্রয়াতি, সঃ, মদ্ভাবম্, যাতি, ন, অস্তি, অত্র, সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

তথা –

চ	=	এবং	প্রয়াতি	=	যায়,
যঃ	=	যে পুরুষ	সঃ	=	সে
অন্তকালে	=	মৃত্যুকালে	মদ্ভাবম্	=	আমার (সাক্ষাৎ) স্বরূপকে
মাম্	=	আমাকে			
এব	=	ই	যাতি	=	প্রাপ্ত হয়
স্মরন্	=	স্মরণ করে	অত্র	=	এতে (কোনই)
কলেবরম্	=	শরীর	সংশয়ঃ	=	সংশয় (সন্দেহ)
মুক্ত্বা	=	ত্যাগ করে	ন, অস্তি	=	নেই।

যম্, যম্, বা, অপি, স্মরন্, ভাবম্, ত্যজতি, অন্তে, কলেবরম্,
তম্, তম্, এব, এতি, কৌন্তেয়, সদা, তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

এর কারণ হ'ল –

কৌন্তেয়	=	হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! (এই মানুষ)	ত্যজতি	=	ত্যাগ করে,
			তম্	=	সেই
অন্তে	=	মৃত্যুকালে	তম্	=	সেই
যম্	=	যে	এব	=	(ভাবকে) ই
যম্	=	যে	এতি	=	প্রাপ্ত হয়, (কেননা সে)
বা, অপিভাবম্	=	ভাবকেই	সদা	=	সর্বদা
স্মরন্	=	স্মরণ করে	তদ্ভাবভাবিত	=	সেই ভাব দ্বারাই ভাবিত থাকে।
কলেবরম্	=	শরীর			

তস্মাৎ, সর্বেষু, কালেষু, মাম্, অনুস্মর, যুধ্য, চ,
ময়ি, অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ, মাম্, এব, এষ্যসি, অসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

এবং

তস্মাৎ = সেইজন্য (হে অর্জুন! তুমি)
সর্বেষু = সকল
কালেষু = কালে (সময়ে) (নিরন্তর)
মাম্ = আমাকে
অনুস্মর = স্মরণ করো
চ = এবং
যুধ্য = যুদ্ধও করো,
(এইরকম)
ময়ি = আমাতে
অর্পিত–মনোবুদ্ধিঃ = মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে
অসংশয়ম্ = নিঃসন্দেহে (তুমি)
মাম্ = আমাকে
এব = ই
এষ্যসি = লাভ করবে।

অভ্যাসযোগযুক্তেন, চেতসা, নান্যগামিনা,
পরমম্, পুরুষম্, দিব্যম্, যাতি, পার্থ, অনুচিন্তয়ন্॥ ৮॥

এবং

পার্থ = হে পার্থ! (এটাই নিয়ম যে মানুষ)
অভ্যাস–যোগযুক্তেন = পরমেশ্বরের ধ্যানের অভ্যাস রূপ যোগযুক্ত
নান্যগামিনাঃ = অনন্যগামী
চেতসা = চিত্ত দ্বারা
অনু–চিন্তয়ন্ = নিরন্তর চিন্তা করতঃ
পরমম্ = পরম (প্রকাশ স্বরূপ)
দিব্যম্ = দিব্য
পুরুষম্ = পুরুষকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই
যাতি = প্রাপ্ত হয়।

কবিম্, পুরাণম্, অনুশাসিতারম্, অণোঃ, অণীয়াংসম, অনুস্মরেৎ, যঃ,
সর্বস্য, ধাতারম্, অচিন্ত্যরূপম, আদিত্যবর্ণম্, তমসঃ, পরস্তাৎ॥ ৯॥

এইজন্য –

যঃ = যে পুরুষ
কবিম্ = সর্বজ্ঞ,
পুরাণম্ = অনাদি,
অনুশাসিতারম্ = সকলের নিয়ন্তা
অণোঃ অণীয়াংসম্ = সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম,
সর্বস্য = সকলের
ধাতারম্ = ধারণপোষণকারী,
অচিন্ত্যরূপম = অচিন্ত্যস্বরূপ,
আদিত্যবর্ণম্ = সূর্যের মত নিত্য চেতন প্রকাশরূপ
তমসঃ = অবিদ্যার অতীত
পরস্তাৎ = সচ্চিদানন্দ ঘন পরমাত্মাকে
অনুস্মরেৎ = স্মরণ করে,

প্রয়াণকালে, মনসা, অচলেন, ভক্ত্যা, যুক্তঃ, যোগবলেন, চ, এব,
ভ্রুবোঃ, মধ্যে, প্রাণম্, আবেশ্য, সম্যক্, সঃ, তম্প
রম্, পুরুষম্, উপৈতি, দিব্যম্॥ ১০॥

সঃ = সেই
ভক্ত্যা, যুক্তঃ = ভক্তিযুক্ত পুরুষ
প্রয়াণকালে = মৃত্যুকালে (ও)
যোগবলেন = যোগবল দ্বারা
ভ্রুবোঃ = ভ্রুযুগলের
মধ্যে = মধ্যে
প্রাণম্ = প্রাণকে
সম্যক্ = উত্তমরূপে

আবেশ্য = স্থাপন করে,
চ = তারপর
অচলেন = নিশ্চল
মনসা = মন দ্বারা
(স্মরণ্) = স্মরণ করে
তম্ = সেই

দিব্যম্ = দিব্যস্বরূপ
পরম্ = পরম পুরুষ
পুরুষম্ = পরমাত্মাকে
এব = ই
উপৈতি = প্রাপ্ত হয়।

যৎ, অক্ষরম্, বেদবিদঃ, বদন্তি, বিশন্তি, যৎ, যতয়ঃ, বীতরাগাঃ,
যৎ, ইচ্ছন্তঃ, ব্রহ্মচর্যম্, চরন্তি, তৎ, তে, পদম্, সংগ্রহেণ, প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

এবং হে অর্জুন –

বেদবিদঃ = বেদবেত্তাগণ
যৎ = যে সচ্চিদানন্দঘন রূপ পরমপদকে
অক্ষরম্ = ওঁকার (নামে)
বদন্তি = অভিহিত করেন,
বীতরাগাঃ = আসক্তিরহিত
যতয়ঃ = যত্নশীল মহাত্মাগণ
যৎ = যাতে
বিশন্তি = প্রবেশ করেন, (আর)
যৎ = যে পরমপদকে

ইচ্ছন্তঃ = পাবার ইচ্ছা করে (ব্রহ্মচারীগণ)
ব্রহ্মচর্যম্ = ব্রহ্মচর্য
চরন্তি = আরচণ করেন,
তৎ = সেই
পদম্ = পরমপদটি
তে = তোমার কাছে
সংগ্রহেণ = সংক্ষেপে
প্রবক্ষ্যে = বলব।

সর্বদ্বারাণি, সংযম্য, মনঃ, হৃদি, নিরুধ্য, চ,
মূর্ধ্নি, আধায়, আত্মনঃ, প্রাণম্, আস্থিত, যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

হে অর্জুন –

সর্বদ্বারাণি = সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার
সংযম্য = রুদ্ধ করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হতে নিবৃত্ত করে (এবং)
মনঃ = মনকে
হৃদি = হৃদয়ে
নিরুধ্য = নিরুদ্ধ করে,

চ = আর
আত্মনঃ = নিজের
প্রাণম্ = প্রাণকে
মূর্ধ্নি = মস্তকে
আধায় = স্থাপন করে
যোগধারণাম্ = যোগধারণাতে
আস্থিতঃ = স্থিত হয়ে,

ওঁ, ইতি, একাক্ষরম্, ব্রহ্ম, ব্যাহরন্, মাম্, অনুস্মরন,
যঃ, প্রয়াতি, ত্যজন্, দেহম্, সঃ, যাতি, পরমাম্, গতিম্ ॥ ১৩ ॥

যঃ = যে পুরুষ
ওঁ = 'ওঁ'
ইতি = এই
একাক্ষরম্ = এক অক্ষররূপ

ব্রহ্ম = ব্রহ্মকে
ব্যাহরন্ = উচ্চারণ করতঃ (এবং তার অর্থস্বরূপ)
মাম্ = আমাকে

অনুস্মরণ্ = চিন্তা করতঃ
দেহম্ = শরীরকে
ত্যজন্ = ত্যাগ করে
প্রয়াতি = যায়,
সঃ = সেই পুরুষ
পরমাম্ = পরম–
গতিম্ = গতিকে
যাতি = প্রাপ্ত হয়।

অনন্যচেতাঃ, সততম্, যঃ, মাম্, স্মরতি, নিত্যশঃ,
তস্য, অহম্, সুলভঃ, পার্থ, নিত্যযুক্তস্য, যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

এবং –

পার্থ = হে অর্জুন!
যঃ = যে পুরুষ
অনন্যচেতাঃ = আমাতে অনন্যচিত্ত যুক্ত হয়ে
নিত্যশঃ = সর্বদাই
সততম্ = নিরন্তর
মাম্ = আমাকে
স্মরতি = স্মরণ করে,
তস্য = সেই
নিত্যযুক্তস্য = নিরন্তর আমাতে যুক্ত
যোগিনঃ = যোগীর পক্ষে
অহম্ = আমি
সুলভঃ = সুলভ হই।

মাম্, উপেত্য, পুনর্জন্ম, দুঃখালয়ম্, অশাশ্বতম্,
ন, আপ্নুবন্তি, মহাত্মানঃ, সংসিদ্ধিম্, পরমাম্, গতাঃ ॥ ১৫ ॥

এবং সেই –

পরমাম্ = পরম
সংসিদ্ধিম্ = সিদ্ধি
গতাঃ = প্রাপ্ত
মহাত্মানঃ = মহাত্মাগণ
মাম্ = আমাকে
উপেত্য = প্রাপ্ত হয়ে
দুঃখালয়ম্ = দুঃখের স্থানরূপ
অশাশ্বতম্ = ক্ষণভঙ্গুর
পুনর্জন্ম = পুনর্জন্ম
ন, আপ্নুবন্তি = প্রাপ্ত হন না।

আব্রহ্মভুবনাৎ, লোকাঃ, পুনরাবর্তিন।, অর্জুন,
মাম্, উপেত্য, তু, কৌন্তেয়, পুনর্জন্ম, ন, বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

কেননা –

অর্জুন = হে অর্জুন!
আব্রহ্মভুবনাৎ = ব্রহ্মলোক হতে আরম্ভ করে
লোকাঃ = সকল লোক
পুনরাবর্তিনঃ = পুনরাবর্তনকারী হয়।
তু = কিন্তু
কৌন্তেয় = হে কুন্তীপুত্র!
মাম্ = আমাকে
উপেত্য = প্রাপ্ত হলে (তার আর)
পুনর্জন্ম = পুনর্জন্ম
ন, বিদ্যতে = হয় না।

সহস্রযুগপর্যন্তম্, অহঃ, যৎ, ব্রহ্মণঃ, বিদুঃ,
রাত্রিম্, যুগসহস্রান্তাম্, তে, অহোরাত্রবিদঃ, জনাঃ ॥ ১৭ ॥

হে অর্জুন –

ব্রহ্মণঃ = ব্রহ্মার
যৎ = যে
অহঃ = একদিন (সেটি)
সহস্রযুগপর্যন্তম্ = এক সহস্র চতুর্যুগী

	অবধিযুক্ত (এবং)	বিদুঃ	= তত্ত্বতঃ জানে;
রাত্রিম্	= রাত্রিকে (ও)	তে	= সেই
যুগসস্রান্তাম্	= এক সহস্র চতুর্যুগী অবধিযুক্ত (বলে)	জনাঃ	= যোগিগণ
(যে)	= যে পুরুষ	অহোরাত্রবিদঃ	= কালতত্ত্ব অবহিত আছেন।

অব্যক্তাৎ, ব্যক্তয়ঃ, সর্বাঃ, প্রভবন্তি, অহরাগমে,
রাত্র্যাগমে, প্রলীয়ন্তে, তত্র, এব, অব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

এই নিমিত্ত তাঁরা এও জানেন যে –

সর্বাঃ	= সকল	রাত্র্যাগমে	= ব্রহ্মার রাত্রির প্রারম্ভে
ব্যক্তয়ঃ	= দৃশ্যমাত্র ভূতপ্রাণীগণ	তত্র	= সেই
অহরাগমে	= ব্রহ্মার দিনের প্রারম্ভে	অব্যক্ত–	= অব্যক্ত নামক
অব্যক্তাৎ	= অব্যক্ত হতে অর্থাৎ ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীর হতে	সংজ্ঞকে	ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীরে
		এব	= ই
প্রভবন্তি	= উৎপন্ন হন, (এবং)	প্রলীয়ন্তে	= লীন হন।

ভূতগ্রামঃ, সঃ, এব, অয়ম্, ভূত্বা, ভূত্বা, প্রলীয়তে,
রাত্র্যাগমে, অবশঃ, পার্থ, প্রভবতি, অহরাগমে ॥ ১৯ ॥

এবং –

পার্থ	= হে পার্থ!	অবশঃ	= প্রকৃতির বশীভূত হয়ে
সঃ	= সে	রাত্র্যাগমে	= রাত্রির প্রবেশ কালে
এব	= ই	প্রলীয়তে	= লয় হয় (আর)
অয়ম্	= এই	অহরাগমে	= দিনের প্রবেশ কালে (পুনঃ)
ভূতগ্রামঃ	= প্রাণী সমুদয়		
ভূত্বা ভূত্বা	= বারংবার উৎপন্ন হয়ে,	প্রভবতি	= উৎপন্ন হয়।

পরঃ, তস্মাৎ, তু, ভাবঃ, অন্যঃ, অব্যক্তঃ, অব্যক্তাৎ, সনাতনঃ,
যঃ, সঃ, সর্বেষু, ভূতেষু, নশ্যৎসু, ন, বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

তু	= কিন্তু	ভাবঃ	= ভাব আছে,
তস্মাৎ	= সেই	সঃ	= সেই সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা
অব্যক্তাৎ	= অব্যক্ত হতেও		
পরঃ	= অতি পর	সর্বেষু	= সকল
অন্যঃ	= অন্য অর্থাৎ বিলক্ষণ	ভূতেষু	= প্রাণী
যঃ	= যে	নশ্যৎসু	= নষ্ট হলেও
সনাতনঃ	= সনাতন	ন, বিনশ্যতি	= নষ্ট হন না।
অব্যক্তঃ	= অব্যক্ত		

অব্যক্তঃ, অক্ষরঃ, ইতি, উক্তঃ, তম্, আহুঃ, পরমাম্, গতিম্,
যম্, প্রাপ্য, ন, নিবর্তন্তে, তৎ, ধাম, পরমম্, মম ॥ ২১ ॥

এবং যা –

অব্যক্তঃ = অব্যক্ত
অক্ষরঃ = 'অক্ষর'
ইতি = এই (নামে)
উক্তঃ = কথিত হয়েছে,
তম্ = সেই অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবকেই
পরমাম্ = পরম
গতিম্ = গতি
আহুঃ = বলা হয়, (তথা)

যম্ = যে সনাতন অব্যক্ত ভাবকে
প্রাপ্য = প্রাপ্ত হয়ে (মানুষ)
ন, নিবর্তন্তে = ফিরে আসে না;
তৎ = তাই (হল)
মম = আমার
পরমম্ = পরম
ধাম = ধাম।

পুরুষঃ, সঃ, পরঃ, পার্থ, ভক্ত্যা, লভ্যঃ, তু, অনন্যয়া,
যস্য, অন্তঃস্থানি, ভূতানি, যেন, সর্বম্, ইদম্, ততম্॥ ২২॥

তু = এবং
পার্থ = হে পার্থ!
যস্য = যে পরমাত্মার
অন্তঃস্থানি ভূতানি = অন্তর্গত সমস্ত প্রাণী স্থিত, (আর)
যেন = যে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা দ্বারা
ইদম্ = এই

সর্বম্ = সম্পূর্ণ জগৎ
ততম্ = পরিপূর্ণ,
সঃ = সেই সনাতন অব্যক্ত
পরঃ = পরম
পুরুষঃ = পুরুষ
অনন্যয়া = অনন্য
ভক্ত্যা = ভক্তি দ্বারা
লভ্যঃ = প্রাপ্ত হন।

বেদেষু, যজ্ঞেষু, তপঃসু, চ, এব, দানেষু, যৎ, পুণ্যফলম্, প্রদিষ্টম্,
অত্যেতি, তৎ, সর্বম্, ইদম, বিদিত্বা, যোগী, পরম্, স্থানম্, উপৈতি, চ, আদ্যম্॥ ২৮॥

যেহেতু –

যোগী = যোগীপুরুষ
ইদম্ = এই রহস্য
বিদিত্বা = তত্ত্বতঃ জেনে
বেদেষু = বেদপাঠে
চ = এবং
যজ্ঞেসু = যজ্ঞে,
তপঃসু = তপস্যায় (আর)
দানেষু = দানাদি করলে
যৎ = যে
পূণ্যফলম্ = পুণ্যফল

প্রদিষ্টম্ = কথিত আছে;
তৎ = সেই
সর্বম্ = সকলকে
এব = নিঃসন্দেহ রূপে
অত্যেতি = লঙ্ঘন করে
চ = ও
আদ্যম্ = সনাতন
পরম্ = পরম
স্থানম্ = পদ
উপৈতি = লাভ করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোকের ফটোকপি

নবম অধ্যায়

ইদম্, তু, তে, গুহ্যতমম্, প্রবক্ষ্যামি, অনসূয়বে
জ্ঞানম্, বিজ্ঞানসহিতম্, যৎ, জ্ঞাত্বা, মোক্ষ্যসে, অশুভাৎ॥ ১॥

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন –

তে অনসূয়বে	=	দোষদৃষ্টিরহিত তোমাকে	প্রবক্ষ্যামি	=	বলব,
ইদম্	=	এই	যৎ, তু	=	যা
গুহ্যতমম্	=	পরম গোপনীয়	জ্ঞাত্বা	=	জেনে (তুমি)
বিজ্ঞান সহিতম্	=	বিজ্ঞান–সহ	অশুভাৎ	=	দুঃখরূপ সংসার থেকে
জ্ঞানম্	=	জ্ঞান	মোক্ষ্যসে	=	মুক্ত হয়ে যাবে।

রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যম, পবিত্রম্, ইদম্, উত্তমম্,
প্রত্যক্ষাবগমম্, ধর্ম্যম্, সুসুখম্, কর্তুম্, অব্যয়ম্॥ ২॥

ইদম্	=	এই (বিজ্ঞান–সহ জ্ঞান)			(আর)
রাজবিদ্যা	=	সমস্ত বিদ্যার রাজা,	ধর্ম্যম্	=	ধর্মযুক্ত,
রাজগুহ্যম্	=	সর্বাপেক্ষা গোপনীয়	কর্তুম্	=	সাধন করতে
পবিত্রম্	=	অতি পবিত্র,	সুসুখম্	=	অতি সুগম (এবং)
উত্তমম্	=	অতি উত্তম,	অব্যয়ম্	=	অবিনাশী।
প্রত্যক্ষাবগমম্	=	প্রত্যক্ষ ফল দায়ক			

অশ্রদ্দধানাঃ, পুরুষাঃ, ধর্মস্য, অস্য, পরন্তপ,
অপ্রাপ্য, মাম্ নিবর্তন্তে, মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩॥

এবং –

পরন্তপ	=	হে পরন্তপ!	অপ্রাপ্য	=	না পেয়ে
অস্য	=	এই (তত্ত্বজ্ঞানরূপ)	মৃত্যুসংসার–বর্ত্মনি	=	মৃত্যুরূপ সংসার চক্রে
ধর্মস্য	=	ধর্মে	নিবর্তন্তে	=	আবর্তন করতে থাকে।
অশ্রদ্দধানাঃ	=	শ্রদ্ধারহিত			
পুরুষাঃ	=	পুরুষেরা			
মাম্	=	আমাকে			

ময়া, ততম্, ইদম্, সর্বম্, জগৎ, অব্যক্তমূর্তিনা,
মৎস্থানি, সর্বভূতানি, ন, চ, অহম্, তেষু, অবস্থিতঃ॥ ৪॥

এবং হে অর্জুন –

অব্যক্তমূর্তিনা	=	সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মারূপ	সর্বম্	=	সব
ময়া	=	আমার দ্বারা	জগৎ	=	জগৎ (জলের দ্বারা বরফ সদৃশ)
ইদম্	=	এই	ততম্	=	পরিপূর্ণ রয়েছে

চ = আর
সর্বভূতানি = সকল প্রাণী
মৎস্থানি = আমার অন্তর্গত সঙ্কল্পের আধারে স্থিত আছে (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে)
অহম্ = আমি
তেষু = তাদের মধ্যে
ন, অবস্থিতঃ = স্থিত নই।

ন, চ, মৎস্থানি, ভূতানি, পশ্য, মে, যোগম্, ঐশ্বরম্,
ভূতভৃৎ, ন, চ, ভূতস্থঃ, মম, আত্মা, ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

চ = এবং (সেই)
ভূতানি = প্রাণীগণ
মৎস্থানি = আমাতে স্থিত
ন = নয়, (কিন্তু)
মে = আমার
যোগম্ = যোগমায়া (ঈশ্বরীয়)
ঐশ্বরম্ = প্রভাব
পশ্য = দেখ (যে)
ভূতভৃৎ = প্রাণীদের ধারণ পোষণকারী (এবং)
ভূতভাবনঃ = প্রাণীদের উৎপাদনকারী
চ = হয়েও
মম = আমার
আত্মা = আত্মা (বাস্তবপক্ষে)
ভূতস্থঃ = প্রাণীগণে স্থিত
ন = নয়।

যথা, আকাশস্থিতঃ, নিত্যম, বায়ুঃ, সর্বত্রগঃ, মহান্,
তথা, সর্বাণি, ভূতানি, মৎস্থানি, ইতি, উপধারয় ॥ ৬ ॥

যেহেতু –

যথা = যেমন (আকাশ থেকে উৎপন্ন,)
সর্বত্রগঃ = সর্বত্র বিচরণকারী
মহান্ = মহান
বায়ুঃ = বায়ু
নিত্যম্ = সর্বদা
আকাশস্থিতঃ = আকাশেই স্থিত আছে,
তথা = সেইরূপই (আমার সঙ্কল্প দ্বারা উৎপন্ন হওয়ার দরুণ)
সর্বাণি = সকল
ভূতানি = ভূত প্রাণী
মৎস্থানি = আমাতে স্থিত আছে
ইতি = এরূপ (তুমি)
উপধারয় = জানবে।

সর্বভূতানি, কৌন্তেয়, প্রকৃতিম্, যান্তি, মামিকাম্,
কল্পক্ষয়ে, পুনঃ, তানি, কল্পাদৌ, বিসৃজামি, অহম্ ॥ ৭ ॥

এবং –

কৌন্তেয় = হে অর্জুন!
কল্পক্ষয়ে = কল্পের অন্তে
সর্বভূতানি = সকল ভূতপ্রাণী
মামিকাম্ = আমার
প্রকৃতিম্ = প্রকৃতিকে
যান্তি = প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় হয়, (আর)
কল্পাদৌ = কল্পের আদিতে
তানি = তাদের
অহম্ = আমি
পুনঃ = পুনরায়
বিসৃজামি = সৃষ্টি করে থাকি।

প্রকৃতিম্, স্বাম্, অবষ্টভ্য, বিসৃজামি, পুনঃ, পুনঃ,
ভূতগ্রামম্, ইমম্, কৃৎস্নম্, অবশম্, প্রকৃতেঃ, বশাৎ॥ ৮॥
কেমন, তা বলি –

স্বাম্	= স্বীয়	ইমম্	= এই
প্রকৃতিম্	= ত্রিগুণময়ী মায়াকে	কৃৎস্নম্	= সম্পূর্ণ
অবষ্টভ্য	= অঙ্গীকার করে	ভূতগ্রামম্	= প্রাণী সমুদয়কে (আমি)
প্রকৃতেঃ	= স্বভাবের	পুনঃ, পুনঃ	= বারংবার (তাদের কর্মানুসারে)
বশাৎ	= বশে		
অবশম্	= পরতন্ত্র	বিসৃজামি	= সৃষ্টি করি।

অবজানন্তি, মাম্, মূঢ়াঃ মানুষীম্, তনুম্, আশ্রিতম্,
পরম্, ভাবম্, অজানন্তঃ, মম, ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১॥
এরূপ হওয়া সত্ত্বেও –

মম্	= আমার	তনুম্	= শরীর
পরম্	= পরম	আশ্রিতম্	= ধারণকারী
ভাবম্	= ভাব	মাম্	= আমাকে (অর্থাৎ)
অজানন্তঃ	= (সম্বন্ধে) অজ্ঞ	ভূতমহেশ্বরম্	= সম্পূর্ণ প্রাণীর মহান ঈশ্বর আমাকে
মূঢ়াঃ	= মূঢ়ঃ গণ		
মানুষীম্	= মনুষ্য	অবজানন্তি	= তুচ্ছ জ্ঞান করে।

সততম্, কীর্তয়ন্তঃ, মাম্, যতন্তঃ, চ, দৃঢ়ব্রতাঃ,
নমস্যন্তঃ, চ, মাম্, ভক্ত্যা, নিত্যযুক্তাঃ, উপাসতে॥ ১৪॥
এবং সেই –

দৃঢ়ব্রতাঃ	= দৃঢ়নিশ্চয় বিশিষ্ট ভক্তজন	চ	= আর
		মাম্	= আমাকে
সততম্	= নিরন্তর	নমস্যন্তঃ	= বারংবার প্রণাম করে
কীর্তয়ন্তঃ	= আমার নাম এবং গুণের কীর্তন করতঃ	নিত্যযুক্তাঃ	= সদা আমার ধ্যানে যুক্ত হয়ে
চ	= এবং (আমার প্রাপ্তির জন্য)	ভক্ত্যা	= অনন্য প্রেমপূর্বক
		মাম্	= আমাকে
যতন্তঃ	= যত্নশীল হয়ে	উপাসতে	= উপাসনা করে।

জ্ঞানযজ্ঞেন, চ, অপি, অন্যে, যজন্তঃ, মাম্, উপাসতে,
একত্বেন, পৃথকত্বেন, বহুধা, বিশ্বেতামুখম্॥ ১৫॥
তাঁদের মধ্যে কেউ –

বিশ্বতো–মুখম্	= বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা রূপ	জ্ঞানযজ্ঞেন	= জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা
মাম্	= আমাকে	একত্বেন	= একত্বভাবে অর্থাৎ যা কিছু সবই বাসুদেব–

		এইভাবে			প্রভূ–কিঙ্কর ভাবে
যজন্তঃ	=	পূজা করে	চ	=	আবার (অন্য কেউ)
(উপাসতে)	=	উপাসনা করে, (এবং)	বহুধা	=	অন্যান্য বিবিধভাবে,
অন্যে	=	অপর কেউ কেউ	অপি	=	ও (আমার)
পৃথকত্বেন	=	পৃথকভাবে অর্থাৎ	উপাসতে	=	উপাসনা করে।

গতিঃ, ভর্তা, প্রভুঃ, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণম্, সুহৃৎ,
প্রভবঃ, প্রলয়ঃ, স্থানম্, নিধানম্, বীজম্, অব্যয়ম্॥ ১৮॥

এবং হে অর্জুন –

গতিঃ	=	প্রাপ্তিযোগ্য পরমধাম (তথা)			করে হিতকারী (ও)
ভর্তা	=	ভরণপোষণকারী,	প্রভবঃ	=	উৎপত্তি,
প্রভুঃ	=	সকলের স্বামী,	প্রলয়ঃ	=	প্রলয়রূপ (তথা)
সাক্ষী	=	শুভাশুভদর্শী,	স্থানম্	=	সকলের আধার,
নিবাসঃ	=	সকলের বাসস্থান, (এবং)	নিধানম্	=	নিধান (আর)
শরণম্	=	শরণ নেবার যোগ্য, (আর)	অব্যয়ম্	=	অবিনাশী
সুহৃৎ	=	প্রত্যুপকার আশা না	বীজম্	=	কারণ (ও)
			(অহম্ এব)	=	আমিই হই।

তপামি, অহম্, অহম্, বর্ষম, নিগৃহ্ণামি, উৎসৃজামি, চ,
অমৃতম্, চ, এব, মৃত্যুঃ, চ, সৎ, অসৎ, চ, অহম্, অর্জুন॥ ১৯॥

এবং –

অহম্	=	আমি(ই)	অহম্	=	আমি (ই)
তপামি	=	সূর্যরূপে তাপ দিয়ে থাকি, (তথা)	অমৃতম্	=	অমৃত
			চ	=	ও
বর্ষম্	=	বর্ষাকে	মৃত্যুঃ	=	মৃত্যু,
নিগৃহ্ণামি	=	আকর্ষণ করি,	চ	=	এবং
চ	=	আর	অসৎ	=	অসৎ (এবং)
উৎসৃজামি	=	বর্ষণ করি	অসৎ	=	অসৎ (ও) (সকলই)
চ	=	এবং	অহম্	=	আমি
অর্জুন	=	হে অর্জুন!	এব	=	ই (হই)।

ত্রৈবিদ্যাঃ, মাম্, সোমপাঃ, পুতপাপাঃ, যজ্ঞৈঃ, ইষ্ট্বা, স্বর্গতিম্, প্রার্থয়ন্তে,
তে, পুণ্যম্, আসাদ্য, সুরেন্দ্রলোকম্, অশ্নন্তি, দিব্যান, দিবি, দেবভোগান্॥ ২০॥

কিন্তু যে সকল –

ত্রৈবিদ্যাঃ	=	বেদত্রয়ে বিহিত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকারী,	মাম্	=	আমাকে
			যজ্ঞৈঃ	=	যজ্ঞসমূহ দ্বারা
সোমপাঃ	=	সোমরসপায়ী,	ইষ্ট্বা	=	পূজা করে
পুতপাপাঃ	=	পাপ হতে বিমুক্ত পুরুষগণ	স্বর্গতিম্	=	স্বর্গপ্রাপ্তি
			প্রার্থয়ন্তে	=	প্রার্থনা করেন;

তে	=	সে সব পুরুষ
পুণ্যম্	=	নিজ পুণ্যের ফলরূপ
সুরেন্দ্রলোকম্	=	ইন্দ্রলোককে
আসাদ্য	=	প্রাপ্ত হয়ে
দিবি	=	স্বর্গে
দিব্যান্	=	দিব্য
দেবভোগান্	=	দেবতাদের ভোগ সকল
অশ্নন্তি	=	উপভোগ করে থাকেন।

তে, তম্, ভুক্ত্বা, স্বর্গলোকম্, বিশালম্, ক্ষীণে, পুণ্যে, মর্ত্যলোকম, বিশন্তি,
এবম্, ত্রয়ীধর্মম্, অনুপ্রপন্নাঃ, গতাগতম্, কামকামাঃ, লভন্তে ॥ ২১ ॥

এবং –

তে	=	তারা
তম্	=	সেই
বিশালম্	=	বিশাল
স্বর্গলোকম্	=	স্বর্গলোক
ভুক্ত্বা	=	উপভোগ করে
পুণ্যে ক্ষীণে	=	পুণ্য ক্ষীণ হলে পরে
মর্ত্যলোকম্	=	মৃত্যুলোক
বিশন্তি	=	প্রাপ্ত হয়
এবম্	=	এইরকম (স্বর্গের সাধনরূপ)
ত্রয়ী ধর্মম্	=	বেদত্রয়ে কথিত সকাম কর্মের
অনুপ্রপন্নাঃ	=	আশ্রিত
কামকামাঃ	=	ভোগকামনাকারী পুরুষেরা
গতাগতম্	=	বারংবার গমনা–গমনকে
লভন্তে	=	প্রাপ্ত হন।

অনন্যাঃ, চিন্তয়ন্তঃ, মাম্, যে, জনাঃ, পর্যুপাসতে,
তেষাম্, নিত্যাভিযুক্তানাম্, যোগক্ষেমম্, বহামি, অহম্ ॥ ২২ ॥

এবং –

অনন্যাঃ	=	অনন্যভাবে আমাতে স্থিত
যে	=	যে সকল
জনাঃ	=	ভক্তগণ (পরমেশ্বররূপ)
মাম্	=	আমাকে
চিন্তয়ন্তঃ	=	নিরন্তর চিন্তা করতঃ
পর্যুপাসতে	=	নিষ্কামভাবে ভজনা করেন;
তেষাম্	=	সেইসব
নিত্যাভি–যুক্তানাম্	=	নিত্য একীভাবে আমাতে স্থিত পুরুষদের
যোগক্ষেমম্	=	যোগক্ষেম
অহম্	=	আমি স্বয়ং
বহামি	=	বহন করি।

যে, অপি, অন্যদেবতাঃ, ভক্তাঃ, যজন্তে, শ্রদ্ধয়া, অন্বিতাঃ,
তে অপি, মাম্, এব, কৌন্তেয়, যজন্তি, অবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩ ॥

এবং –

কৌন্তেয়	=	হে অর্জুন!
অপি	=	যদিও
শ্রদ্ধয়া	=	শ্রদ্ধা
অন্বিতাঃ	=	যুক্ত হয়ে
যে	=	যে সব
ভক্তাঃ	=	সকামভক্ত
অন্যদেবতাঃ	=	অন্যদেবতাদের
যজন্তে	=	পুজা করেন,
তে	=	তাঁরা
অপি	=	ও
মাম্	=	আমাকে
এব	=	ই

যজন্তি	= পূজা করেন (কিন্তু তাঁদের এই পূজা)	অবিধি–পূর্বকম্	= অবিধিপূর্বক অর্থাৎ অজ্ঞান প্রসূত হয়।

অহম্, হি, সর্বযজ্ঞানাম্, ভোক্তা, চ, প্রভুঃ, এব, চ,
ন, তু, মাম্, অভিজানন্তি, তত্ত্বেন, অতঃ, চ্যবন্তি, তে ॥ ২৪ ॥

হি	= যেহেতু	তে	= তারা
সর্বযজ্ঞানাম্	= সকল যজ্ঞের	মাম্	= অধিযজ্ঞ পরমেশ্বর রূপ আমাকে
ভোক্তা	= ভোক্তা	তত্ত্বেন	= তত্ত্বতঃ
চ	= এবং	ন অভিজানন্তি	= জানে না,
প্রভুঃ	= স্বামী	অতঃ	= এইজন্য
চ	= ও	চ্যবন্তি	= পতিত হন অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন।
অহম্	= আমি		
এব	= ই (হই);		
তু	= কিন্তু		

যান্তি, দেবব্রতাঃ, দেবান্, পিতৃন্, যান্তি, পিতৃব্রতাঃ,
ভূতানি, যান্তি, ভূতেজ্যাঃ, যান্তি, মদযাজিনঃ, অপি, মাম্ ॥ ২৫ ॥
কারণ এটাই নিয়ম যে –

দেবব্রতাঃ	= দেবতাদের পূজাকগণ	ভূতানি	= ভূতদের
দেবান্	= দেবতাদের	যান্তি	= প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, (আর)
যান্তি	= প্রাপ্ত হন,		
পিতৃব্রতাঃ	= পিতৃগণের পূজকগণ	মদযাজিনঃ	= আমার ভক্তরা
পিতৃন	= পিতৃগণকে	মাম্	= আমাকে
যান্তি	= প্রাপ্ত হন,	অপি	= ই
ভূতেজ্যাঃ	= ভূতগণের পূজকগণ	যান্তি	= প্রাপ্ত হন।

অপি, চেৎ, সুদুরাচারঃ, ভজতে, মাম্, অনন্যভাক্,
সাধুঃ, এব, সঃ, মন্তব্যঃ, সম্যক্, ব্যবসিতঃ, হি, সঃ ॥ ৩০ ॥
এবং আরও আমার ভক্তির প্রভাব শোনো –

চেৎ	= যদি (কেউ)	সঃ	= সে
সুদুরাচারঃ	= অতিশয় দুরাচারী	সাধুঃ	= সাধু
অপি	= ও	এব	= ই
অনন্যভাক্	= অনন্যভাবে আমার ভক্ত হয়ে	মন্তব্যঃ	= মানবার যোগ্য হয়;
		হি	= যেহেতু
মাম্	= আমাকে (নিরন্তর)	সঃ	= সে
ভজতে	= ভজনা করে,	সম্যকব্যবসিতঃ	= যথার্থ নিশ্চয় বিশিষ্ট।

ক্ষিপ্রম্, ভবতি, ধর্মাত্মা, শশ্বৎ, শান্তিম্, নিগচ্ছতি,
কৌন্তেয়, প্রতি, জানীহি, ন, মে, ভক্তঃ, প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥
এইজন্য সে –

ক্ষিপ্রম্	= শীঘ্রই	কৌন্তেয়	= হে অর্জুন! (তুমি)
ধর্মাত্মা	= ধর্মাত্মা	প্রতি	= নিশ্চয়পূর্বক
ভবতি	= হয়ে যায় (এবং)	জানীহি	= সত্য জানবে (যে)
শশ্বৎ	= শাশ্বত	মে	= আমার
শান্তিম্	= পরম শান্তি	ভক্তঃ	= ভক্ত
নিগচ্ছতি	= প্রাপ্ত হয়।	ন, প্রণশ্যতি	= বিনষ্ট হয় না।

মাম্, হি, পার্থ, ব্যপাশ্রিত্য, যে, অপি, স্যুঃ, পাপযোনয়ঃ,
স্ত্রিয়ঃ, বৈশ্যাঃ, তথা, শূদ্রাঃ, তে, অপি, যান্তি, পরাম্, গতিম্॥ ৩২॥

হি	= কেননা	যে	= যে কেউ
পার্থ	= হে অর্জুন!	স্যুঃ	= হোক
স্ত্রিয়ঃ	= স্ত্রীগণ,	তে	= তারা
বৈশ্যাঃ	= বৈশ্যগণ, (এবং)	অপি	= ও
শূদ্রাঃ	= শূদ্রেরা,	মাম্	= আমাকে
তথা	= তথা	ব্যপাশ্রিত্য	= আশ্রয় করে
পাপযোনয়ঃ	= পাপযোনি বিশিষ্ট	পরাম্	= পরম
	(চন্ডলাদিও)	গতিম্	= গতি (ই)
অপি	= ও	যান্তি	= প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোকের ফটোকপি

দশম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ –

ভূয়ঃ, এব, মহাবাহো, শৃণু, মে, পরমম্, বচঃ,
যৎ, তে, অহম্, প্রীয়মাণায়, বক্ষ্যামি, হিতকাম্যয়া॥ ১॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন –

মহাবাহো	= হে মহাবাহো!	শৃণু	= শ্রবণ করো
ভুয়ঃ	= পুনরায়	যৎ	= যা
এব	= ও	অহম্	= আমি
মে	= আমার	প্রীয়মাণায়	= অতিশয় প্রেম বিশিষ্ট
পরমম্	= পরম (রহস্য এবং	তে	= তোমাকে
	প্রভাবযুক্ত)	হিতকাম্যয়া	= হিতেচ্ছায়
বচঃ	= বাক্য	বক্ষ্যামি	= বলব।

ন, মে, বিদুঃ, সুরগণাঃ, প্রভবম্, ন, মহর্ষয়ঃ,
অহম্, আদিঃ, হি, দেবানাম্, মহর্ষীণাম্, চ, সর্বশঃ॥ ২॥

হে অর্জুন!

মে = আমার
প্রভবম্ = উৎপত্তি অর্থাৎ বিভূতিসহ লীলা-দ্বারা প্রকাশ হওয়া
ন = না
সুরগণাঃ = দেবতারাই
= (জানেন এবং)
ন = না
মহর্ষয়ঃ = মহর্ষীগণ (ই)

বিদুঃ = জানেন;
হি = কেননা
অহম্ = আমি
সর্বশঃ = সকল প্রকারেই
দেবানাম্ = দেবতাদের
চ = ও
মহর্ষীণাম্ = মহর্ষিগণের
আদিঃ = আদি কারণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোকের ফটোকপি

একাদশ অধ্যায়

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ, ইদম্, অন্তরম্, হি, ব্যাপ্তম্, ত্বয়া, একেন,
দিশঃ, চ, সর্বাঃ, দৃষ্ট্বা, অদ্ভুতম্, রূপম্, উগ্রম্, তব,
ইদম্, লোকত্রয়ম্, প্রব্যথিতম্, মহাত্মন॥ ২০॥

এবং –

মহাত্মন্ = হে মহাত্মন্!
ইদম্ = এই
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ = স্বর্গ ও পৃথিবীর
অন্তরম্ = মধ্যস্থিত সম্পূর্ণ আকাশ
চ = আর
সর্বাঃ = সকল
দিশঃ = দিক্
একেন = এক
ত্বয়া = আপনার দ্বারা

ব্যাপ্তম্ = পরিপূর্ণ
তব = আপনার
ইদম্ = এই
অদ্ভুতম্ = অলৌকিক (ও)
উগ্রম্ = ভয়ঙ্কর
রূপম্ = রূপ
দৃষ্ট্বা = দেখে
লোকত্রয়ম্ = ত্রিলোক
প্রব্যথিতম্ = অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে।

অমী, হি, ত্বাম্, সুরসঙ্ঘাঃ, বিশন্তি, কেচিৎ, ভীতাঃ,
প্রাঞ্জলয়ঃ, গৃণন্তি, স্বস্তি, ইতি, উক্ত্বা, মহার্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ,
স্তুবন্তি, ত্বাম, স্তুতিভিঃ, পুষ্কলাভিঃ॥ ২১॥

এবং হে গোবিন্দ –

অমী = এইসকল
সুরসঙ্ঘাঃ = দেবতা
ত্বাম্ = আপনাতে
হি = ই
বিশন্তি = প্রবেশ করছেন (আর)
কেচিৎ = কেউ কেউ
ভীতাঃ = ভীত হয়ে
প্রাঞ্জলয়ঃ = করজোড়ে (আপনার নাম ও গুণের)
গৃণন্তি = উচ্চারণ করছেন (এবং)
মহর্ষিসিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ = মহর্ষি ও সিদ্ধ সমুদায়
স্বস্তি = 'কল্যাণ হোক'-
ইতি = এইরকম
উক্ত্বা = বলে
পুষ্কলাভিঃ = অতি শ্রেষ্ঠ

স্তুতিভিঃ	= স্তুতির দ্বারা	স্তুবন্তি	= স্তব করছেন।
ত্বাম্	= আপনাকে		

লেলিহ্যসে, গ্রসমানঃ, সমন্তাৎ, লোকান, সমগ্রান্, বদনৈঃ, জ্বলদ্ভিঃ,
তেজোভিঃ, আপূর্য, জগৎ, সসগ্রম্, ভাসঃ, তব, উগ্রাঃ, প্রতপন্তি, বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

এবং আপনি ঐ সব –

সমগ্রান্	= সম্পূর্ণ	তব	= আপনার
লোকান্	= লোককে	উগ্রাঃ	= উগ্র
জলদ্ভিঃ	= প্রজ্বলিত	ভাসঃ	= প্রকাশ
বদনৈঃ	= মুখগুলির দ্বারা	সমগ্রম্	= সম্পূর্ণ
গ্রসমানঃ	= গ্রাস করে	জগৎ	= জগৎকে
সমন্তাৎ	= সবদিক থেকে	তেজোভিঃ	= তেজের দ্বারা
লেলিহ্যসে	= লেহন করছেন	আপুর্য	= পরিপূর্ণ করে
বিষ্ণো	= হে বিষ্ণো!	প্রতপন্তি	= সন্তপ্ত করছে।

আখ্যাহি, মে, কঃ, ভবান্, উগ্ররূপঃ, নমঃ, অস্তু, তে, দেববর, প্রসীদ,
বিজ্ঞাতুম, ইচ্ছামি, ভবন্তম্, আদ্যম্, ন, হি, প্রজানামি, তব, প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

হে ভগবান কৃপা করে –

মে	= আমাকে	আদ্যম্	= আদি স্বরূপ
আখ্যাহি	= বলুন (যে)	ভবন্তম্	= আপনাকে (আমি)
উগ্ররূপঃ	= উগ্ররূপ বিশিষ্ট	বিজ্ঞাতুম্	= তত্ত্বতঃ জানতে
ভবান্	= আপনি	ইচ্ছামি	= ইচ্ছা করি;
কঃ	= কে?	হি	= কেননা
দেববর	= হে দেবশ্রেষ্ঠ!	তব	= আপনার
তে	= আপনার	প্রবৃত্তিম্	= প্রবৃত্তি (আমি)
নমঃ	= উদ্দেশ্যে		(বিশেষরূপে)
অস্তু	= নমস্কার, (আপনি)	ন, প্রজানামি	= জ্ঞাত নই।
প্রসীদ	= প্রসন্ন হোন।		

কালঃ, অস্মি, লোকক্ষয়কৃৎ, প্রবৃদ্ধঃ, লোকান্, সমাহর্তুম্,
হই, প্রবৃত্তঃ, ঋতে, অপি, ত্বাম্, ন, ভবিষ্যন্তি, সর্বে,
যে, অবস্থিতাঃ, প্রত্যনীকেষু, যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

এইভাবে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন!

লোকক্ষয়কৃৎ	= (আমি) লোক নাশকারী	লোকান্	= লোকসমূহকে
প্রবৃদ্ধঃ	= বর্ধিত	সমাহর্তুম্	= বিনষ্ট করার জন্য
কালঃ	= মহাকাল	প্রবৃত্তঃ	= প্রবৃত্ত হয়েছি।
অস্মি	= হই।		(অতএব)
ইহ	= এই সময় (এই)	যে	= যে সব

প্রত্যনীকেষু	= প্রতিপক্ষ সেনাতে	সর্বে	= সবাই
অবস্থিতাঃ	অবস্থিত	ত্বাম্	= তুমি
যোধাঃ	= যোদ্ধারা আছে	ঋতে, অপি	= ছাড়াও
(তে)	= তারা	ন, ভবিষ্যন্তি	= থাকবে না।

তস্মাৎ, ত্বম্, উত্তিষ্ঠ, যশঃ, লভস্ব, জিত্বা, শত্রূন্, ভুঙক্ষ্ব, রাজ্যম্, সমৃদ্ধম্,
ময়া, এব, এতে, নিহতাঃ, পূর্বম্, এব, নিমিত্তমাত্রম্, ভব, সব্যসাচিন্॥ ৩৩॥

তস্মাৎ	= অতএব	এতে	= এইসব (শূরবীর)
ত্বম্	= তুমি	পূর্বম্	= আগে–
উত্তিষ্ঠ	= উত্থিত হও!	এব	= ই
যশঃ	= যশ	ময়া	= আমার দ্বারা
লভস্ব	= লাভ করো (এবং)	নিহতাঃ	= নিহত হয়েছে।
শত্রূন্	= শত্রুদের	সব্যসাচিন্	= হে সব্যসাচিন্!
জিত্বা	= জয় করে	নিমিত্তমাত্রম্	= তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র
সমৃদ্ধম্	= ধনধান্য সম্পন্ন		
রাজ্যম্	= রাজ্যকে	এব	= ই
ভুঙক্ষ্ব	= ভোগ করো।	ভব	= হও।

কস্মাৎ, চ, তে, ন, নমেরন্, মহাত্মন, গরীয়সে, ব্রহ্মণঃ, অপি, আদিকর্ত্রে,
অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস, ত্বম্, অক্ষরম্, সৎ, অসৎ, তৎপরম্ যৎ॥ ৩৭॥

মহাত্মন্	= হে মহাত্মন্!	দেবেশ	= হে দেবেশ!
ব্রহ্মণঃ	= ব্রহ্মার	জগন্নিবাস	= হে জগন্নিবাস!
অপি	= ও	যৎ	= যা
আদিকর্ত্রে	= আদিকর্তা	সৎ	= সৎ,
চ	= এবং	অসৎ	= অসৎ (আর)
গরীয়সে	= সকলের শ্রেষ্ঠ	তৎপরম্	= তা থেকেও শ্রেষ্ঠ
তে	= আপনাকে (তারা)	অক্ষরম্	= অক্ষর অর্থাৎ সচ্চি–দানন্দঘন ব্রহ্ম,
কস্মাৎ	= কি হেতু		
ন নমেরন্	= নমস্কার করবে না। (যেহেতু)	(তৎ)	= তা
		ত্বম্	= আপনিই (হোন)।
অনন্ত	= হে অনন্ত!		

কিরীটিনম্, গদিনম্, চক্রহস্তম্, ইচ্ছামি, ত্বাম্, দ্রষ্টুম্, অহম্, তথা, এব, তেন,
এব, রূপেণ, চতুর্ভুজেন, সহস্রবাহো, ভব, বিশ্বমূর্তে॥ ৪৬॥
এবং হে বিষ্ণো!

অহম্	= আমি	ত্বাম্	= আপনাকে
তথা	= সেরকম	কিরীটিনম্	= মুকুট যুক্ত (এবং)
এব	= ই	গদিনম্–	= হস্তে গদা ও চক্র যুক্ত

চক্রহস্তম্		
দ্রষ্টুম্	=	দেখতে
ইচ্ছামি	=	ইচ্ছা করি, (এইজন্য)
বিশ্বমূর্তে	=	হে বিশ্বস্বরূপ!
সহস্রবাহো	=	হে সহস্রবাহো (আপনি)
তেন	=	সেই
চতুর্ভুজেন	=	চতুর্ভুজ
রূপেণ	=	রূপে
এব	=	ই (যুক্ত)
ভব	=	হোন।

ময়া, প্রসন্নেন, তব, অর্জুন, ইদম, রূপম, পরম, দর্শিতম্, আত্মযোগাৎ,
তেজোময়ম্, বিশ্বম্, অনন্তম্, আদ্যম্, যৎ, মে, ত্বদন্যেন, ন, দৃষ্টপূর্বম॥ ৪৭॥

এইপ্রকার অর্জুনের প্রার্থনা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

অর্জুন	=	হে অর্জুন!
প্রসন্নেন	=	প্রসন্নতা পূর্বক
ময়া	=	আমার দ্বারা
আত্মযোগাৎ	=	নিজের যোগশক্তির প্রভাবে
ইদম্	=	এই
মে	=	আমার
পরম্	=	পরম
তেজোময়ম্	=	তেজোময়
আদ্যম্	=	সকলের আদি (এবং)
অনন্তম্	=	সীমারহিত
বিশ্বম্	=	বিরাট
রূপম্	=	রূপ
তব	=	তোমাকে
দর্শিতম্	=	দেখিয়েছি
যৎ	=	যা
ত্বদন্যেন	=	তুমি ছাড়া অন্যের দ্বারা
ন, দৃষ্টপূর্বম্	=	আগে কখনও দেখা যায়নি।

ন, বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ, ন, দানৈঃ, ন, চ, ক্রিয়াভিঃ, ন, তপোভিঃ, উগ্রৈঃ,
এবংরূপঃ, শক্যঃ, অহম্, নৃলোকে, দ্রষ্টুম্, ত্বদন্যেন, কুরুপ্রবীর॥ ৪৮॥

কুরুপ্রবীর	=	হে অর্জুন!
নৃলোকে	=	মনুষ্যলোকে
এবংরূপঃ–	=	এইপ্রকার বিশ্বরূপ বিশিষ্ট
অহম্	=	আমি
ন	=	না
বেদযজ্ঞা–ধ্যয়নৈঃ	=	বেদ এবং যজ্ঞের অধ্যয়ন দ্বারা
ন	=	না
দানৈঃ	=	দান দ্বারা
ন	=	না
ক্রিয়াভিঃ	=	ক্রিয়াসমূহ দ্বারা
চ	=	এবং
ন	=	না
উগ্রৈঃ	=	উগ্র
তপোভিঃ	=	তপস্যা দ্বারা (ই)
ত্বদন্যেন	=	তুমি ছাড়া অন্য কর্তৃক
দ্রষ্টুম্	=	দর্শনদানের
শক্যঃ	=	যোগ্য হই অর্থাৎ উপরিউক্ত সাধন দ্বারা আমাকে কেউ দেখতে সমর্থ হয় না।

মা, তে, ব্যথা, মা, চ, বিমূঢ়ভাবঃ, দৃষ্ট্বা, রূপম্, ঘোরম্, ঈদৃক্, মম, ইদম্,
ব্যপেতভীঃ, প্রীতমনাঃ, পুনঃ, ত্বম্, তৎ, এব, মে, রূপম্, ইদম্, প্রপশ্য॥ ৪৯॥

ঈদৃক্	=	এইরকম
মম	=	আমার
ইদম্	=	এই
ঘোরম্	=	ভয়ানক
রূপম্	=	রূপ
দৃষ্ট্বা	=	দেখে

তে	= তোমার	ত্বম্	= তুমি
ব্যথা	= ব্যাকুলতা	তৎ এব	= সেই
মা	= না হোক	মে	= আমার
চ	= এবং	ইদম্	= এই
বিমূঢ়ভাবঃ	= মূঢ়ভাব (ও)	রূপম্	= শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম যুক্ত চতুর্ভুজ রূপ
মা	= না হোক (আর)		
ব্যপেতভীঃ	= ভয় রহিত	পুনঃ	= পুনরায়
প্রীতমনাঃ	= প্রীতিযুক্ত মনে	প্রপশ্য	= দর্শন করো।

ইতি, অর্জুনম্, বাসুদেবঃ, তথা, উক্ত্বা, স্বকম্, রূপম্,দর্শয়ামাস, ভূয়ঃ,
আশ্বাসয়ামাস, চ, ভীতম্, এনম্, ভূত্বা, পুনঃ, সৌম্যবপুঃ, মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

এরপর সঞ্জয় বললেন, হে মহারাজ –

বাসুদেবঃ	= ভগবান বাসুদেব	চ	= এবং
অর্জুনম্	= অর্জুনকে	পুনঃ	= পুনরায়
ইতি	= এইপ্রকার	মহাত্মা	= মহাত্মা কৃষ্ণ
উক্ত্বা	= বলে	সৌম্যবপুঃ	= সৌম্য মূর্তি
ভূয়ঃ	= পুনরায়	ভূত্বা	= হয়ে
তথা	= সেইরকম	এনম্	= এই
স্বকম্	= নিজের	ভীতম্	= ভয়ভীত অর্জুনকে
রূপম্	= চতুর্ভুজরূপ	আশ্বাসয়ামাস	= আশ্বাস প্রদান করলেন
দর্শয়ামাস	= দেখালেন		

দৃষ্ট্বা, ইদম্, মানুষম্, রূপম্, তব, সৌম্যম্, জনার্দন,
ইদানীম্, অস্মি, সংবৃত্তঃ, সচেতাঃ, প্রকৃতিম্, গতঃ ॥ ৫১ ॥

তদনন্তর অর্জুন বললেন –

জনার্দন	= হে জনার্দন!	দৃষ্ট্বা	= দেখে
তব	= আপনার	ইদানীম্	= এখন (আমি)
ইদম্	= এই	সচেতাঃ	= শান্তচিত্ত
সৌম্যম্	= অতি শান্ত	সংবৃত্তঃ	= হয়ে
মানুষম্	= মনুষ্য	প্রকৃতিম্	= নিজ স্বভাবিক স্থিতি
রূপম্	= রূপ	গতঃ, অস্মি	= প্রাপ্ত হয়েছি।

সুদুর্দর্শম্, ইদম্, রূপম, দৃষ্টবানসি, যৎ, মম,
দেবাঃ, অপি, অস্য, রূপস্য, নিত্যম্, দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

অর্জুনের এইরকম কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন!

মম	= আমার	ইদম্	= ইহা
যৎ	= যে	সুদুর্দর্শম্	= সুদুর্শর্শ অর্থাৎ এটির দর্শন খুবই দুর্লভ,
রূপম্	= (চতুর্ভুজ) রূপ		
দৃষ্টবান্, অসি	= (তুমি) দেখেছো,	দেবাঃ	= দেবতারা–

অপি	= ও	রূপস্য	= রূপের
নিত্যম্	= সর্বদা	দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ	= দর্শনাকাঙ্ক্ষী থাকেন।
অস্য	= এই		

ন, অহম্, বেদৈঃ, ন, তপসা, ন, দানেন, ন, চ, ইজ্যয়া,
শক্যঃ, এবংবিধঃ, দৃষ্টুম্, দৃষ্টবানসি, মাম্, যথা ॥ ৫৩ ॥
এবং হে অর্জুন!

যথা	= যেমন (তুমি)	তপসা	= তপস্যা দ্বারা,
মাম্	= আমাকে	ন	= না
দৃষ্টবান্, অসি	= দেখেছো	দানেন	= দান দ্বারা
এবংবিধঃ	= এইরূপ চতুর্ভুজ রূপ বিশিষ্ট	চ	= এবং
		ন	= না
অহম্	= আমি	ইজ্যয়া	= যজ্ঞ দ্বারা
ন	= না	দ্রুষ্টুম্	= দেখতে
বেদৈঃ	= বেদগুলির দ্বারা,	শক্যঃ	= উপযুক্ত হই
ন	= না		

ভক্ত্যা, তু, অনন্যয়া, শক্যঃ, অহম্, এবংবিধঃ, অর্জুন,
জ্ঞাতুম্, দ্রষ্টুম, চ, তত্ত্বেন, প্রবেষ্টুম্, চ, পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥
কিন্তু –

তু	= কিন্তু	দ্রষ্টুম্	= প্রত্যক্ষ দেখা,
পরন্তপ	= হে শ্রেষ্ঠ তপো বিশিষ্ট	তত্ত্বেন	= তত্ত্বতঃ
		জ্ঞাতুম্	= জ্ঞাত হওয়া
অর্জুন	= অর্জুন!	চ	= এবং
অনন্যয়া	= অনন্য	প্রবেষ্টুম্	= প্রবিষ্ট হতে অর্থাৎ একীভাবে প্রাপ্ত হতে–
ভক্ত্যা	= ভক্তি দ্বারা		
এবংবিধঃ	= এইপ্রকার চতুর্ভুজ রূপবিশিষ্ট	চ	= ও
অহম্	= আমি	শক্যঃ	= শক্য হয়ে থাকি।

মৎকর্মকৃৎ, মৎপরমঃ, মদ্ভক্তঃ, সঙ্গবর্জিতঃ, নির্বৈরঃ,
সর্বভূতেষু, যঃ, সঃ, মাম্, এতি, পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

পাণ্ডব	= হে অর্জুন		সমুদয় কর্তব্য কর্মকারী (এবং)
যঃ	= যে পুরুষ		
মৎকর্মকৃৎ	= (সকল বস্তু আমার বিবেচনা করে) কেবল আমার জন্যই যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাদি	মৎপরমঃ	= আমাতে পরায়ণ অর্থাৎ আমাকে পরম আশ্রয় ও পরমগতি মনে করে আমার প্রাপ্তির জন্য

তৎপর (আর)
মদ্ভক্তঃ = আমার ভক্ত অর্থাৎ প্রেমের সঙ্গে নিষ্কামভাবে আমার নাম, গুণ, প্রভাব এবং রহস্যের শ্রবণ, কীর্তন, মনন, ধ্যান এবং পঠন পাঠনের নিরন্তর অভ্যাসকারী (এবং)
সঙ্গবর্জিতঃ = আসক্তিরহিত অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র এবং ধনাদি যাবতীয় সাংসারিক পদার্থ সমূহে স্নেহ রহিত,
সর্বভূতেষু = সকল ভূত প্রাণীতে
নির্বৈরঃ = বৈরভাব রহিত হয়
সঃ = সেই (অনন্যভক্তি–মান পুরুষ)
মাম্ = আমাকে (ই)
এতি = প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোকের ফটোকপি

দ্বাদশ অধ্যায়

এবম্, সততযুক্তাঃ, যে, ভক্তাঃ, ত্বাম, পর্যুপাসতে,
যে, চ, অপি, অক্ষরম্, অব্যক্তম্, তেষাম্, কে, যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

এইপ্রকার ভগবানের বাক্য শুনে অর্জুন বললেন, হে মনোমোহন–

যে = যে সব
ভক্তাঃ = অনন্যপ্রেমী ভক্তজন
এবম্ = এই পূর্বোক্ত প্রকারে
সততযুক্তাঃ = নিরন্তর আপনার ভজন ও ধ্যানে মগ্ন হয়ে
ত্বাম্ = আপনাকে (অর্থাৎ সগুণ রূপ পরমেশ্বরকে)
পর্যুপাসতে = অতি শ্রেষ্ঠভাবে উপাসনা করেন
চ = এবং
যে = যে সব ব্যক্তি
অক্ষরম্ = অবিনাশী সচ্চিদা–নন্দঘন
অব্যক্তম্ = নিরাকারকে
অপি = ই (উপাসনা করেন)
তেষাম্ = এই দুইপ্রকার ভক্তের মধ্যে
যোগবিত্তমাঃ = অতি উত্তম যোগবেত্তা
কে = কারা?

ময়ি, আবেশ্য, মনঃ, যে, মাম্, নিত্যযুক্তাঃ, উপাসতে,
শ্রদ্ধয়া, পরয়া, উপেতাঃ, তে, মে, যুক্ততমাঃ, মতাঃ ॥ ২॥

এইপ্রকার অর্জুন জিজ্ঞাসা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে অর্জুন! –

ময়ি = আমাতে
মনঃ = মনকে
আবেশ্য = একাগ্র করে
নিত্যযুক্তাঃ = নিরন্তর আমার ভজন ও ধ্যানে মগ্ন হয়ে
যে = যে ভক্তগণ
পরয়া = অতিশয় শ্রেষ্ঠ
শ্রদ্ধয়া = শ্রদ্ধার সঙ্গে
উপেতাঃ = যুক্ত হয়ে
মাম্ = সগুণ পরমেশ্বর রূপ আমাকে
উপাসতে = ভজনা করেন,
তে = তাঁরা
যুক্ততমাঃ = যোগীদের মধ্যেও অতি উত্তম যোগী (বলে)

মে	=	আমার
মতাঃ	=	(মতে) মান্য।

অর্থাৎ তাঁদের আমি অতি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করি।

যে, তু, অক্ষরম্, অনির্দেশ্যম্, অব্যক্তম্, পর্যুপাসতে,
সর্বত্রগম্, অচিন্ত্যম্, চ, কূটস্থম্, অচলম্, ধ্রুবম্॥ ৩॥
সংনিয়ম্য, ইন্দ্রিয়গ্রামম্, সর্বত্র, সমবুদ্ধয়,
তে, প্রাপ্নুবন্তি, মাম্, এব, সর্বভূতহিতে, রতাঃ॥ ৪॥

তু	=	এবং
যে	=	যে পুরুষগণ
ইন্দ্রিয়গ্রামম	=	ইন্দ্রিয় সমুদয়কে
সংনিয়ম্য	=	উত্তমরূপে বশ করে
অচিন্ত্যম্	=	মন ও বুদ্ধির আগোচর,
সর্বত্রগম্	=	সর্বব্যাপী,
অনির্দেশ্যম্	=	অকথনীয় স্বরূপ
চ	=	আর
কূটস্থম্	=	সর্বদা একরূপে স্থিত,
ধ্রুবম্	=	নিত্য,
অচলম্	=	অচল,
অব্যক্তম্	=	নিরাকার,
অক্ষরম্	=	অবিনাশী সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মকে
পর্যুপাসতে	=	নিরন্তর একীভাবে ধ্যানরত হয়ে উপাসনা করেন;
তে	=	সেই
সর্বভূতহি–তে রতাঃ	=	সর্ব ভূতের হিতে রত (এবং)
সর্বত্র	=	সর্বত্র
সমবুদ্ধয়ঃ	=	সমভাব বিশিষ্ট যোগিগণ (ও)
মাম্	=	আমাকে
এব	=	ই
প্রাপ্নুবন্তি	=	প্রাপ্ত হন।

ক্লেশঃ, অধিকতরঃ, তেষাম্, অব্যক্তাসক্তচেতসাম্,
অব্যক্তা, হি, গতিঃ, দুঃখম্, দেহবদ্ভিঃ, অবাপ্যতে॥ ৫॥

কিন্তু –

তেষাম্	=	সেই
অব্যক্তাসক্ত–চেতসাম্	=	সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার ব্রহ্মতে আসক্ত চিত্তবিশিষ্ট পুরুষদের (সাধনাতে)
ক্লেশঃ	=	ক্লেশ অর্থাৎ পরিশ্রম
অধিকতরঃ	=	বিশেষ হয়
হি	=	কেননা,
দেহবদ্ভিঃ	=	দেহাভিমানী ব্যক্তিদের দ্বারা
অব্যক্তা	=	অব্যক্তবিষয়ক
গতিঃ	=	গতি
দুঃখম্	=	দুঃখপূর্বক
অবাপ্যতে	=	প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ যতক্ষণ শরীরে অভিমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার ব্রহ্মতে স্থিতি হওয়া কঠিন।

যে, তু, সর্বাণি, কর্মাণি, ময়ি, সন্ন্যস্য, মৎপরাঃ,
অনন্যেন, এব, যোগেন, মাম্, ধ্যায়ন্তঃ, উপাসতে॥ ৬॥

তু	=	কিন্তু
যে	=	যে সব
মৎপরাঃ	=	মৎপরায়ণ ভক্তগণ
সর্বাণি	=	সকল
কর্মাণি	=	কর্মগুলি
ময়ি	=	আমাতে

সন্ন্যস্য = অর্পণ করে
মাম্ = আমাকে অর্থাৎ (সগুণ–
রূপ পরমেশ্বরকে)
এব = ই
অনন্যেন = (তৈলধারার মত অনন্য)
যোগেন = ধ্যানযোগের দ্বারা
ধ্যায়ন্তঃ = নিরন্তর চিন্তা করে
উপাসতে = ভজনা করেন।

তেষাম্, অহম্, সমুদ্ধর্তা, মৃত্যুসংসারসাগরাৎ,
ভবামি, নচিরাৎ, পার্থ, ময়ি, আবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

পার্থ = হে অর্জুন!
তেষাম্ = সেই
ময়ি = আমাতে
আবেশিত– = চিত্তসংলগ্নকারী
চেতসাম্ প্রেমীভক্তদের
অহম্ = আমি
নচিরাৎ = শীঘ্রই
মৃত্যুসংসার– = মৃত্যুরূপ সংসার সমুদ্র
সাগরাৎ থেকে
সমুদ্ধর্তা = উদ্ধারকারী
ভবামি = হয়ে থাকি।

ময়ি, এব, মনঃ, আধৎস্ব, ময়ি, বুদ্ধিম্, নিবেশয়,
নিবসিষ্যসি, ময়ি, এব, অতঃ, উর্দ্ধম্, ন, সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
অতএব হে অর্জুন! তুমি –

ময়ি = আমাতে
মনঃ = মনকে
আধৎস্ব = স্থাপন করো (এবং)
ময়ি = আমাতে
এব = ই
বুদ্ধিম্ = বুদ্ধিকে
নিবেশয় = নিবিষ্ট করো;
অতঃ = এর
উর্দ্ধম্ = পর (তুমি)
ময়ি = আমাতে
এব = ই
নিবসিষ্যসি– = নিবাস করবে, অর্থাৎ
(যে) আমাকেই প্রাপ্ত হবে।
(অত্র) = এতে (কোনো)
সংশয়ঃ = সংশয়
ন = নেই।

অথ, চিত্তম্, সমাধাতুম্, ন, শক্নোষি, ময়ি, স্থিরম্,
অভ্যাসযোগেন, ততঃ, মাম্, ইচ্ছ, আপ্তুম্, ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥
এবং –

অথ = যদি (তুমি)
চিত্তম্ = মনকে
ময়ি = আমাতে
স্থিরম্ = অচলরূপে
সমাধাতুম্ = স্থাপন করতে
ন শক্নোষি = সমর্থ না হও,
ততঃ = তবে
ধনঞ্জয় = হে অর্জুন!
অভ্যাসযো– = অভ্যাসরূপ যোগ
গেন দ্বারা
মাম্ = আমাকে
আপ্তুম্ = প্রাপ্ত করতে
ইচ্ছ = ইচ্ছা করো।

অভ্যাসে, অপি, অসমর্থঃ, অসি, মৎকর্মপরমঃ, ভব,
মদর্থম্, অপি, কর্মাণি, কুর্বন, সিদ্ধিম্, অবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
এবং যদি তুমি –

অভ্যাসে = অভ্যাসে
অপি = ও
অসমর্থঃ = অসমর্থ
অসি = হও (তবে)
মৎকর্ম–পরমঃ = কেবল আমার নিমিত্ত কর্ম পরায়ণ
ভব = হও (এই প্রকারে)
মদর্থম্ = আমার জন্য
কর্মাণি = কর্মগুলি
কুর্বন্ = করতঃ
অপি = ও (তুমি)
সিদ্ধিম্ = আমার প্রাপ্তি রূপ সিদ্ধি (ই)
অবাপ্স্যসি = লাভ করবে।

অথ, এতৎ, অপি, অশক্তঃ, অসি, কর্তুম্, মদযোগম্, আশ্রিতঃ,
সর্বকর্মফলত্যাগম্, ততঃ, কুরু, যতাত্মবান্॥ ১১॥ এবং –

অথ = যদি
এতৎ = এটি
অপি = ও
কর্তুম্ = করতে
অশক্তঃ = অসমর্থ
অসি = হও,
ততঃ = তবে
যতাত্মবান্ = আত্মসংযমকারী (আর)
মদযোগম্ = আমার প্রাপ্তিরূপ যোগের
আশ্রিতঃ = আশ্রিত হয়ে
সর্বকর্ম–ফলত্যাগম = সকল কর্মের ফল আমার জন্য ত্যাগ
কুরু = করো।

শ্রেয়ঃ, হি, জ্ঞানম্, অভ্যাসাৎ, জ্ঞানাৎ, ধ্যানম্, বিশিষ্যতে,
ধ্যানাৎ, কর্মফলত্যাগঃ, ত্যাগাৎ, শান্তিঃ, অনন্তরম্॥ ১২॥

হি = যেহেতু (মর্ম না জেনে কৃত)
অভ্যাসাৎ = অভ্যাস থেকে
জ্ঞানম্ = পরোক্ষ জ্ঞান
শ্রেয়ঃ = শ্রেষ্ঠ, (এবং)
জ্ঞানাৎ = পরোক্ষ জ্ঞান থেকে
ধ্যানম্ = পরমেশ্বর রূপ আমার ধ্যান
বিশিষ্যতে = শ্রেষ্ঠ, (আর)
ধ্যানাৎ = ধ্যান থেকে (ও)
কর্মফল–ত্যাগঃ = আমার জন্য সকল কর্মের ফল ত্যাগ করা
(বিশিষ্যতে) = শ্রেষ্ঠ হয় (এবং)
ত্যাগাৎ = ত্যাগ দ্বারা
অনন্তরম্ = তৎকালেই
শান্তিঃ = পরম শান্তি লাভ হয়।

অদ্বেষ্টা, সর্বভূতানাম্, মৈত্রঃ, করুণঃ, এব, চ,
নির্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী॥ ১৩॥
এই প্রকার শান্তি প্রাপ্ত যে পুরুষ –

সর্বভূতানাম্ = সর্ব প্রাণীতে
অদ্বেষ্টা = দ্বেষভাব রহিত,
মৈত্রঃ = স্বার্থ রহিত, সকলের প্রেমী
চ = ও
করুণঃ = হেতু রহিত দয়ালু,
এব = তথা,
নির্মমঃ = মমতা রহিত, (এবং)
নিরহঙ্কারঃ = অহঙ্কার রহিত,
সমদুঃখ–সুখঃ = সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিতে সমান (এবং)
ক্ষমী = ক্ষমাবান অর্থাৎ অপরাধ–কারীদেরও অভয়দাতা;

সন্তুষ্টঃ, সততম্, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ,
ময়ি, অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ, যঃ, মদ্ভক্তঃ, সঃ, মে, প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

এবং –

যঃ	= যে	সঃ	= সেই
যোগী	= ধ্যানযোগে যুক্ত যোগী	ময়ি	= আমাতে
সততম্– সন্তুষ্টঃ	= (লাভহানিতে) সতত সন্তুষ্ট,	অর্পিত– মনোবুদ্ধিঃ	= অর্পিত মন এবং বুদ্ধিযুক্ত
যতাত্মা	= মন এবং ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে শরীর বশকারী,	মদ্ভক্তঃ	= আমার ভক্ত
		মে	= আমার
দৃঢ়– নিশ্চয়ঃ	= আমাতে দৃঢ় নিশ্চয় বিশিষ্ট;	প্রিয়ঃ	= প্রিয়।

যস্মাৎ, ন, উদ্বিজতে, লোকঃ, লোকাৎ, ন, উদ্বিজতে, চ, যঃ,
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ, মুক্তঃ, যঃ, স, চ, মে, প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

এরূপ আর –

যস্মাৎ	= যাঁর থেকে	হর্ষা–	= হর্ষ,
লোকঃ	= কোনও জীব	মর্ষ–	= অমর্ষ,
ন, উদ্বিজতে	= উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না	ভয়ো–	= ভয় (ও)
চ	= এবং	দ্বেগৈঃ	= উদ্বেগাদি হতে
যঃ	= যে (স্বয়ংও)	মুক্তঃ	= বিমুক্ত –
লোকাৎ	= কোনও জীব থেকে	সঃ	= সেই ভক্ত
ন, উদ্বিজতে	= উদ্বিগ্ন হয় না,	মে	= আমার
চ	= আর	প্রিয়ঃ	= প্রিয়।
যঃ	= যে		

অনপেক্ষঃ, শুচিঃ, দক্ষঃ, উদাসীনঃ, গতব্যথঃ,
সর্বারম্ভপরিত্যাগী, যঃ, মদ্ভক্তঃ, সঃ, মে, প্রিঃ ॥ ১৬ ॥

এবং –

যঃ	= যে পুরুষ	গতব্যথঃ	= দুঃখ শূন্য;
অনপেক্ষঃ	= আকাঙ্ক্ষা রহিত,	সঃ	= সেই
শুচিঃ	= অন্তর বাহিরে শুদ্ধ ,	সর্বারম্ভ– পরিত্যাগীঃ	= সমস্ত আরম্ভের ত্যাগী
দক্ষঃ	= বুদ্ধিমান অর্থাৎ যে কাজের জন্য এসেছিল তা সম্পূর্ণ করেছে,	মদ্ভক্তঃ	= আমার ভক্ত
		মে	= আমার
উদাসীনঃ	= পক্ষপাত রহিত,	প্রিয়ঃ	= প্রিয়।

যঃ, ন, হৃষ্যতি, ন, দ্বেষ্টি, ন, শোচতি, ন, কাঙ্ক্ষতি,
শুভাশুভপরিত্যাগী, ভক্তিমান্, যঃ, সঃ, মে, প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

এবং –

যঃ = যে
ন, হৃষ্যতি = (কখনও) হর্ষিত হয় না,
ন, দ্বেষ্টি = দ্বেষ করে না,
ন, শোচতি = শোক করে না,
ন, কাঙ্ক্ষতি = কামনা করে না,
যঃ = যে

শুভাশুভ– পরিত্যাগী = শুভ এবং অশুভ সকল কর্মের ফলত্যাগী–
সঃ = সে (ই)
ভক্তিমান্ = ভক্তিযুক্ত পুরুষ
মে = আমার
প্রিয়ঃ = প্রিয়।

সমঃ, শত্রৌ, চ, মিত্রে, চ, তথা, মানাপমানয়োঃ,
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু, সমঃ, সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
আর যে পুরুষ –

শত্রৌ = শত্রু,
মিত্রে = মিত্রতে
চ = এবং
মানাপমানয়োঃ = মান ও অপমানে
সমঃ = সমান,
তথা = তথা

শীতোষ্ণা– সুখদুঃখেষু = শীত, গ্রীষ্ম ও সুখদুঃখা–দির দ্বন্দ্বসমূহে
সমঃ = সমভাবযুক্ত
চ = আর
সঙ্গবি– বর্জিতঃ = সমস্ত (সংসারে) আসক্তিশূন্য–

তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী, সন্তুষ্টঃ, যেন, কেনচিৎ,
অনিকেতঃ, স্থিরমতিঃ, ভক্তিমান্, মে, প্রিয়ঃ, নরঃ ॥ ১৯ ॥
এবং যে –

তুল্য– নিন্দাস্তুতিঃ = নিন্দা ও স্তুতিতে সমান–বোধ বিশিষ্ট,
মৌনী = মননশীল
যেন,কেন– চিৎ = যে কোনও প্রকারে শরীরের নির্বাহে
সন্তুষ্টঃ = সর্বদা সন্তুষ্ট,
অনিকেতঃ = বাসস্থানে মমতা রহিত

(সেই)–
স্থিরমতিঃ = স্থিরবুদ্ধি বিশিষ্ট
ভক্তিমান্ = ভক্তিমান
নরঃ = পুরুষ
মে = আমার
প্রিয়ঃ = প্রিয়।

যে, তু, ধর্ম্যামৃতম্, ইদম, যথা, উক্তম্, পর্যুপাসতে,
শ্রদ্দধানাঃ, মৎপরমাঃ, ভক্তাঃ, তে, অতীব, মে, প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

তু = এবং
যে = যে সকল
মৎপরমাঃ = আমার পরায়ণ
শ্রদ্দধানাঃ = শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ
ইদম্ = এই
যথা, উক্তম্ = উপরিউক্ত
ধর্ম্যামৃতম্ = ধর্মময় অমৃতকে

পর্যুপাসতে = নিষ্কামভাবে সেবন করে,
তে = সেইসকল
ভক্তাঃ = ভক্ত
মে = আমার
অতীব = অতিশয়
প্রিয়াঃ = প্রিয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোকের ফটোকপি

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইদম্, শরীরম্, কৌন্তেয়, ক্ষেত্রম্, ইতি, অভিধীয়তে,
এতৎ, যঃ, বেত্তি, তম্, প্রাহুঃ, ক্ষেত্রজ্ঞঃ, ইতি, তদ্বিদঃ॥ ১॥

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার বললেন –

কৌন্তেয় = হে অর্জুন!
ইদম্ = এই
শরীরম্ = শরীর
ক্ষেত্রম্ = ক্ষেত্র
ইতি = এইরকম
অভিধীয়তে = কথিত হয়,
এতৎ = এটিকে
যঃ = যে
বেত্তি = জানে,
তম্ = তাকে
ক্ষেত্রজ্ঞঃ = ক্ষেত্রজ্ঞ
ইতি = এইরকম
তদ্বিদঃ = উহার তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীরা
প্রাহুঃ = বলে থাকেন।

ক্ষেত্রজ্ঞম্, চ, অপি, মাম্, বিদ্ধি, সর্বক্ষেত্রেষু, ভারত,
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ, জ্ঞানম, যৎ, তৎ, জ্ঞানম, মতম্, মম॥

চ = এবং
ভারত = হে অর্জনু! (তুমি)
সর্বক্ষেত্রেষু = সকল ক্ষেত্রে
ক্ষেত্রজ্ঞম্ = ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মা
অপি = ও
মাম্ = আমাকে (ই)
বিদ্ধি = জান (আর)
ক্ষেত্রক্ষেত্র– = ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেয়
জ্ঞয়োঃ অর্থাৎ বিকারসহ প্রকৃতি এবং পুরুষের
যৎ = যে
জ্ঞানম্ = তত্ত্বতঃ জ্ঞান
তৎ = তাই
জ্ঞানম্ = জ্ঞান এরকম
মম = আমার
মতম্ = মত।

তৎ, ক্ষেত্রম্, যৎ, চ, যাদৃক্, চ, যদ্বিকারি, যতঃ, চ, যৎ,
সঃ, চ, যঃ, যৎপ্রভাবঃ, চ, তৎ, সমাসেন, মে, শৃণু॥ ৩॥

অতএব –

তৎ = সেই
ক্ষেত্রম্ = ক্ষেত্র
যৎ = যা
চ = এবং
যাদৃক্ = যে সব
চ = আর
যদ্বিকারি = যে বিকার বিশিষ্ট
চ = ও
যতঃ = যে কারণ থেকে
যৎ = যা হয়েছে,
চ = এইরকম
সঃ = সেই (ক্ষেত্রজ্ঞ)
চ = ও
যঃ = যে (এবং)
যৎপ্রভাবঃ = যেসব প্রভাব বিশিষ্ট
তৎ = সে সব
সমাসেন = সংক্ষেপতঃ
মে = আমার কাছ থেকে
শৃণু = শোনো।

ঋষিভিঃ, বহুধা, গীতম্, ছন্দোভিঃ, বিবিধৈঃ, পৃথক,
ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ, চ, এব, হেতুমদ্ভিঃ, বিনিশ্চতৈঃ ॥ ৪ ॥

এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব –

ঋষিভিঃ = ঋষিদের দ্বারা
বহুধাগীতম্ = বহু প্রকারে কথিত হয়েছে অর্থাৎ বোঝানো হয়েছে
(চ) = আর
বিবিধৈঃ = নানাপ্রকার
ছন্দোভিঃ = বেদমন্ত্র দ্বারা
পৃথক্ = বিভাগপূর্বক
(গীতম্) = কথিত হয়েছে
চ = এবং
বিনিশ্চিতৈঃ = ভালভাবে নিশ্চয় কৃত
হেতুমদ্ভিঃ = যুক্তিযুক্ত
ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ = ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহ দ্বারা
এব = ও (ঐরূপই কথিত হয়েছে)।

মহাভূতানি, অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্, এব, চ,
ইন্দ্রিয়াণি, দশ, একম্, চ, পঞ্চ, চ, ইন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥

এবং হে অর্জুন! সেইটিই আমি তোমার কাছে বলছি –

মহাভূতানি = পঞ্চ মহাভূত,
অহঙ্কারঃ = অহঙ্কার,
বুদ্ধিঃ = বুদ্ধি
চ = আর
অব্যক্তম্ = মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী মায়া
এব = ও
চ = তথা
দশ = দশ
ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়,
একম্ = একটি মন
চ = এবং
পঞ্চ = পঞ্চ
ইন্দ্রিয়–গোচরাঃ = ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ–

ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখম্, দুঃখম্, সংঘাতঃ, চেতনা, ধৃতিঃ
এতৎ, ক্ষেত্রম্, সমাসেন, সবিকারম্, উদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

তথা –

ইচ্ছা = ইচ্ছা,
দ্বেষঃ = দ্বেষ,
সুখম্ = সুখ,
দুঃখম্ = দুঃখ (এবং)
সংঘাতঃ = স্থূল দেহের পিণ্ড, (আর)
চেতনা = চৈতন্য (ও)
ধৃতি = ধৃতি (এইপ্রকার)
এতৎ = এই
ক্ষেত্রম্ = ক্ষেত্র
সবিকারম্ = বিকারসমূহ সহ
সমাসেন = সংক্ষেপতঃ
উদাহৃতম্ = কথিত হল।

অমানিত্বম, অদম্ভিত্বম্, অহিংসা, ক্ষান্তিঃ, আর্জবম্,
আচার্যোপাসনম্, শৌচম, স্থৈর্যম্, আত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

এবং হে অর্জুন –

অমানিত্বম্ = শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানের অভাব,
অদম্ভিত্বম্ = দম্ভাচরণের অভাব,
অহিংসা = প্রাণীমাত্রকেই কোনও প্রকারে কষ্ট না দেওয়া,
ক্ষান্তিঃ = ক্ষমাভাব,
আর্জবম্ = মন ও বাক্যের সরলতা,

আচার্যো-পাসনম = শ্রদ্ধা ভক্তির সঙ্গে গুরুসেবা
শৌচম্ = অন্তর ও বাহিরের শুদ্ধি,
স্থৈর্যম্ = অন্তঃকরণের স্থিরতা,
আত্মবি-নিগ্রহঃ = মন এবং ইন্দ্রিয় সহ শরীরের নিগ্রহ-

ইন্দ্রিয়ার্থেষু, বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ, এব, চ,
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৮॥

তথা –

ইন্দ্রিয়ার্থেষু = ইহলোক এবং পরলোকের সকলভোগে
বৈরাগ্যম্ = আসক্তির অভাব,
চ = এবং
অনহঙ্কারঃ = অহঙ্কারেরও অভাব
এব (আর)
জন্ম- = জন্ম,

মৃত্যু- = মৃত্যু,
জরা- = জরা (ও)
ব্যাধি- = রোগাদিতে
দুঃখ- = দুঃখ (এবং)
দোষ- = দোষাদির
অনু-দর্শনম্ = বারংবার বিবেচনা করা-

অসক্তিঃ, অনভিষ্বঙ্গঃ, পুত্রদারগৃহাদিষু,
নিত্যম্, চ, সমচিত্তত্বম্, ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ৯॥

এবং –

পুত্রদার-গৃহাদিষু = পুত্র, স্ত্রী, গৃহ ও ধনাদিতে
অসক্তিঃ = আসক্তির অভাব (তথা)
অনভিষ্বঙ্গঃ = মমতার অভাব,

চ = আর
ইষ্টানিষ্টো-পপত্তিষু = প্রিয় এবং অপ্রিয়ের প্রাপ্তিতে
নিত্যম্ = সর্বদাই
সমচিত্তত্বম্ = সমচিত্ততা-

ময়ি, চ, অনন্যযোগেন, ভক্তিঃ, অব্যভিচারিণী,
বিবিক্তদেশসেবিত্বম্, অরতিঃ, জনসংসদি॥ ১০॥

এবং –

(পরেমশ্বররূপ)
ময়ি = আমাতে
অনন্য-যোগেন = একীভাবে স্থিতিরূপ ধ্যানযোগ দ্বারা
অব্যভিচারিণী = অব্যভিচারিণী
ভক্তিঃ = ভক্তি

চ = আর
বিবিক্তদেশ-সেবিত্বম্ = নির্জন ও শুদ্ধদেশে থাকবার স্বভাব (ও)
জনসংসদি = বিষয়াসক্ত মনুষ্যের সমুদায়ে
অরতিঃ = অনাসক্তি-

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্,
এতৎ, জ্ঞানম্, ইতি, প্রোক্তম্, অজ্ঞানম্, যৎ, অতঃ, অন্যথা ॥ ১১ ॥

তথা –

অধ্যাত্মজ্ঞান–নিত্যত্বম	= অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য–স্থিতি,
তত্ত্বজ্ঞানার্থ–দর্শনম্	= তত্ত্বজ্ঞানের অর্থরূপ পরমাত্মাকে সর্বত্র দেখা,
এতৎ	= এইসকল (ই)
জ্ঞানম্	= জ্ঞান (আর)
যৎ	= যা
অতঃ	= এর
অন্যথা	= বিপরীত
(তৎ)	= তা সবই
অজ্ঞানম	= অজ্ঞান
ইতি	= এইরূপ
প্রোক্তম্	= উক্ত হয়েছে।

জ্ঞেয়ম্, যৎ, তৎ, প্রবক্ষ্যামি, যৎ, জ্ঞাত্বা, অমৃতম্, অশ্নুতে,
অনাদিমৎ, পরম, ব্রহ্ম, ন, সৎ, তৎ, ন, অসৎ, উচ্যতে ॥ ১২ ॥

এবং হে অর্জুন –

যৎ	= যা
জ্ঞেয়ম্	= জানবার যোগ্য
(চ)	= ও
যৎ	= যা
জ্ঞাত্বা	= জেনে (মানুষ)
অমৃতম্	= পরমানন্দ
অশ্নুতে	= প্রাপ্ত হয়
তৎ	= তা
প্রবক্ষ্যামি	= উত্তম রূপে বলব
তৎ	= সেই
অনাদিমৎ	= আদিরহিত
পরম্	= পরম
ব্রহ্ম	= ব্রহ্ম (অনির্বচনীয় হওয়ায়)
ন	= না
সৎ	= সৎ (বলা যায়),
ন	= না
অসৎ	= অসৎও
উচ্যতে	= বলা যায়।

সর্বতঃপাণিপাদম্, তৎ, সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্,
সর্বতঃ শ্রুতিমৎ, লোকে, সর্বম্, আবৃত্য, তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

কিন্তু –

তৎ	= তিনি
সর্বতঃ–পাণিপাদম্	= সকল দিকেই হস্তপদ বিশিষ্ট, (এবং)
সর্বতোহক্ষি–শিরোমুখম্	= সকল দিকেই চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট, (আর)
সর্বতঃ–শ্রুতিমৎ	= সর্বদিকেই শ্রোত্র বিশিষ্ট,
(যতঃ)	= যেহেতু (তিনি)
লোকে	= সংসারে
সর্বম্	= সকলকে
আবৃত্য	= ব্যাপ্ত করে
তিষ্ঠতি	= স্থিত আছেন।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্, সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্, অসক্তম্, সর্বভৃৎ, চ, এব, নির্গুণম্, গুণভোক্তৃ, চ ॥ ১৪ ॥

এবং –

সর্বেন্দ্রিয়–গুণাভাসম্	= সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহের প্রকাশক (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে)
সর্বেন্দ্রিয়–	= সকল ইন্দ্রিয় রহিত

বিবর্জিতম্		সর্বভৃৎ	= সকলের ধারণ ও পোষণকারী
চ	= আর	চ	= এবং
অসক্তম্	= আসক্তিরহিত (ও)	গুণভোক্তৃ	= গুণের ভোক্তা।
নির্গুণম্	= গুণাতীত (হয়ে)–		
এব	= ও (স্বীয় যোগমায়া দ্বারা)		

বহিঃ, অন্তঃ, চ, ভূতানাম্, অচরম্, চরম, এব, চ,
সূক্ষ্মত্বাৎ, তৎ, অবিজ্ঞেয়ম্, দূরস্থম্, চ, অন্তিকে, চ, তৎ॥ ১৫॥

এবং সেই পরমাত্মা –

ভূতানাম্	= চরাচর (সকল ভূতের)	চ	= এবং
বহিঃ	= বাইরে (ও)	তৎ	= সেই পরমাত্মা
অন্ত	= অন্তরে (পরিপূর্ণ আছেন)	সূক্ষ্মত্বাৎ	= সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য
চ	= আর	অবিজ্ঞেয়ম্	= অবিজ্ঞেয়
চরম্	= চর	চ	= তথা
অচরম্	= অচররূপ	অন্তিকে	= অতি সমীপে
এব	= ও (তিনিই),	চ	= ও
		দূরস্থম্	= দূরেও স্থিত
		তৎ	= তিনিই (আছেন)।

অবিভক্তম্, চ, ভূতেষু, বিভক্তম্, ইব, চ, স্থিতম্,
ভূতভর্তৃ চ, তৎ, জ্ঞেয়ম্, গ্রসিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু, চ॥ ১৬॥

চ	= এবং (তিনি)	জ্ঞেয়ম্	= জানার যোগ্য পরমাত্মা
অবিভক্তম্– চ	= বিভাগরহিত একরূপে আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বে ও	ভূতভর্তৃ	= বিষ্ণুরূপে প্রাণীদের ধারণ পোষণকারী
ভূতেষু	= চরাচরে সমস্ত প্রাণীতে	চ	= এবং
বিভক্তম্, ইব	= পৃথক পৃথকের মতো	গ্রসিষ্ণু	= রুদ্ররূপে সংহারকারী
স্থিতম্	= স্থিত (প্রতীত হন);	চ	= আর
তৎ	= সেই	প্রভবিষ্ণু	= ব্রহ্মারূপে সকলের উৎপাদনকারী হন।

জ্যোতিষাম্, অপি, তৎ, জ্যোতিঃ, তমসঃ, পরম্, উচ্যতে,
জ্ঞানম্, জ্ঞেয়ম্, জ্ঞানগম্যম্, হৃদি, সর্বস্য, বিষ্ঠিতম্॥ ১৭॥

এবং –

তৎ	= সেই ব্রহ্ম	পরম্	= অতি পর
জ্যোতিষাম্	= জ্যোতি সমূহের	উচ্যতে	= কথিত হয়েছে, (এবং সেই পরমাত্মাই)
অপি	= ও		
জ্যোতিঃ	= জ্যোতি (আর)	জ্ঞানম্	= বোধস্বরূপ, (ও)
তমসঃ	= মায়ার	জ্ঞেয়ম্	= জ্ঞেয় (ও)

জ্ঞানগম্যম্ = তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তব্য (ও)
সর্বস্য = সকলের
হৃদি = হৃদয়ে
বিষ্ঠিতম্ = স্থিত আছেন।

ইতি, ক্ষেত্রম্, তথা, জ্ঞানম্, জ্ঞেয়ম, চ, উক্তম, সমাসতঃ,
মদ্ভক্তঃ, এতৎ, বিজ্ঞায়, মদ্ভাবায়, উপপদ্যতে॥ ১৮॥

হে অর্জুন –

ইতি = এইপ্রকার
ক্ষেত্রম্ = ক্ষেত্র
তথা = তথা
জ্ঞানম্ = জ্ঞান
চ = এবং
জ্ঞেয়ম্ = জানবার যোগ্য পরমাত্মার স্বরূপ
সমাসতঃ = সংক্ষেপে
উক্তম্ = বলা হলো
মদ্ভক্তঃ = আমার ভক্ত
এতৎ = এটি
বিজ্ঞায় = তত্ত্বতঃ জেনে
মদ্ভাবায় = আমার স্বরূপ
উপপদ্যতে = প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতিম্, পুরুষম্, চ, এব, বিদ্ধি, অনাদী, উভৌ, অপি,
বিকারান, চ, গুণান্, চ, এব, বিদ্ধি, প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯॥

এবং হে অর্জুন! –

প্রকৃতিম্ = প্রকৃতি অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী আমার মায়া
চ = ও
পুরুষম্ = জীবাত্মা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ
উভৌ = এই দুইটিকে
এব = ই (তুমি)
অনাদী = অনাদি (বলে)
বিদ্ধি = জানো
চ = আর
বিকারান্ = রাগ (আসক্তি) দ্বেষাদি বিকারগুলি
চ = এবং
গুণান্ = ত্রিগুণাত্মক সকল পদার্থকে
অপি = ও
প্রকৃতি–সম্ভবান, এব = প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন
বিদ্ধি = জানবে।

কার্যকরণকর্তৃত্বে, হেতুঃ, প্রকৃতিঃ, উচ্যতে,
পুরুষঃ, সুখদুঃখানাম্, ভোক্তৃত্বে, হেতুঃ, উচ্যতে॥ ২০॥

কেননা! –

কার্যকরণ–কর্তৃত্বে = কার্য এবং করণের উৎপত্তিতে
প্রকৃতিঃ = প্রকৃতি
হেতুঃ = হেতু
উচ্যতে = কথিত হয়েছে (আর)
পুরুষঃ = জীবাত্মা
সুখদুঃখানাম = সুখদুঃখের
ভোক্তৃত্বে = ভোক্তৃত্বে
হেতুঃ = হেতু
উচ্যতে = কথিত হয়েছে।

পুরুষঃ, প্রকৃতিস্থঃ, হি, ভুঙক্তে, প্রকৃতিজান, গুণান্,
কারণম্, গুণসঙ্গঃ, অস্য, সদসদযোনিজন্মসু॥ ২১॥

প্রকৃতিস্থঃ = প্রকৃতিতে স্থিত
হি, পুরুষঃ = পুরুষই
প্রকৃতিজান্ = প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন
গুণান্ = ত্রিগুণাত্মক সমস্ত পদার্থকে
ভুঙক্তে = ভোগ করে (আর)
(এবং এই)
গুণসঙ্গঃ = গুণের সংযোগ (ই)
অস্য = এই জীবাত্মার
সদসদ্যো–নিজন্মসু = উত্তম ও অধম যোনিতে জন্ম ধারণের
কারণম্ = কারণ হয়।

উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, চ, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বরঃ,
পরমাত্মা, ইতি, চ, অপি, উক্তঃ, দেহে, অস্মিন্, পুরুষঃ, পরঃ॥ ২২॥
প্রকৃতপক্ষে এই –

পুরুষঃ = পুরুষ (আত্মা)
অস্মিন = এই
দেহে = দেহতে
(স্থিতঃ) = স্থিত হওয়া
অপি = (সত্ত্বে) ও
পরঃ = পর অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী মায়া হতে সর্বথা অতীত অতীত (পরমাত্মাই) (কেবল)
উপদ্রষ্টা = সাক্ষী হওয়ায় উপদ্রষ্টা,
চ = এবং
অনুমন্তা = যথার্থ সম্মতি দাতা
হওয়ার জন্য অনুমন্তা, (ও)
ভর্তা = সকলের ধারণকারী হওয়ার জন্য ভর্তা,
ভোক্তা = জীবরূপে ভোক্তা (তথা)
মহেশ্বরঃ = ব্রহ্মাদি সকলের স্বামী হওয়ার কারণ মহেশ্বর
চ = আর
পরমাত্মা = শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন হওয়াতে পরমাত্মা–
ইতি = এইরূপ
উক্তঃ = কথিত আছে।

যঃ, এবম্, বেত্তি, পুরুষম্, প্রকৃতিম্, চ, গুণৈঃ, সহ,
সর্বথা, বর্তমানঃ, অপি, ন, সঃ, ভূয়ঃ, অভিজায়তে॥ ২৩॥

এবম্ = এইপ্রকার
পুরুষম্ = পুরুষকে
চ = এবং
গুণৈঃ = গুণের
সহ = সঙ্গে
প্রকৃতিম = প্রকৃতিকে
যঃ = যে মানুষ
বেত্তি = তত্ত্বতঃ জানে,
সঃ = সে
সর্বথা = সর্বপ্রকারে
বর্তমানঃ = ব্যবহার অর্থাৎ লোকাচারে প্রবৃত্ত হয়ে–
অপি = ও
ভূয়ঃ = পুনরায়
ন অভিজায়তে = জন্মগ্রহণ করে না অর্থাৎ তার পুনর্জন্ম হয় না।

ধ্যানেন, আত্মনি, পশ্যন্তি, কেচিৎ, আত্মানম্, আত্মনা,
অন্যে, সাংখ্যেন, যোগেন, কর্মযোগেন, চ, অপরে ॥ ২৪ ॥

হে অর্জুন ঐ পরম পুরুষ –

আত্মানম্	=	পরমাত্মাকে	সাংখ্যেন	=	জ্ঞান
কেচিৎ	=	কেউ কেউ	যোগেন	=	যোগ দ্বারা (দেখেন)
আত্মনা	=	শুদ্ধ সূক্ষ্মবুদ্ধিতে	চ	=	এবং
ধ্যানেন	=	ধ্যান দ্বারা	অপরে	=	অপর কোনও ব্যক্তি
আত্মনি	=	হৃদয়ে	কর্মযোগেন	=	নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা
পশ্যন্তি	=	দেখেন,	[পশ্যন্তি]	=	দেখেন।
অন্যে	=	অপর ব্যক্তিরা			

অন্যে, তু, এবম্, অজানন্তঃ, শ্রুত্বা, অন্যেভ্যঃ, উপাসতে,
তে, অপি, চ, অতিতরন্তি, এব, মৃত্যুম্, শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥

তু	=	কিন্তু	উপাসতে	=	উপাসনা করে
অন্যে	=	এ থেকে পৃথক্ অর্থাৎ অল্প বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (স্বয়ং)	চ	=	এবং
			তে	=	সেই
			শ্রুতি– পরায়ণাঃ	=	শ্রবণ পরায়ণ ব্যক্তিগণ
এবম্	=	এইপ্রকার			
অজানন্তঃ	=	না জেনে	অপি	=	ও
অন্যেভ্যঃ	=	অন্যের কাছ থেকে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষদের কাছ থেকে (কেবল)	মৃত্যুম্	=	মৃত্যুরূপ সংসার–সাগর
			অতি তরন্তি, এব	=	নিঃসন্দেহরূপে পার হয়ে যায়।
শ্রুত্বা	=	শ্রবণ করেই			

যাবৎ, সঞ্জায়তে, কিঞ্চিৎ, সত্ত্বম, স্থাবরজঙ্গমম্,
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ, তৎ, বিদ্ধি, ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥

ভারতর্ষভ	=	হে অর্জুন!	তৎ	=	সেই সকলকেই (তুমি)
যাবৎ	=	যা			
কিঞ্চিৎ	=	কিছু	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ	=	ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্র–জ্ঞের সংযোগ থেকেই (উৎপন্ন)
স্থাবরজঙ্গমম	=	স্থাবর ও জঙ্গম			
সত্ত্বম	=	বস্তু			
সঞ্চায়তে	=	উৎপন্ন হয়,	বিদ্ধি	=	জানবে।

সমম্, সর্বেষু, ভূতেষু, তিষ্ঠন্তম্, পরমেশ্বরম্,
বিনশ্যৎসু, অবিনশ্যন্তম্, যঃ, পশ্যতি, সঃ, পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

এইরকম জেনে –

যঃ	=	যে পুরুষ
বিনশ্যৎসু	=	বিনাশশীল
সর্বেষু	=	সকল
ভূতেষু	=	চরাচরস্থিত সকল বস্তু ও প্রানিগণের মধ্যে
পরমেশ্বরম্	=	পরমেশ্বরকে
অবিনশ্যন্তম্	=	নাশ রহিত (এবং)
সমম্	=	সমভাবে
তিষ্ঠন্তম্	=	স্থিত
পশ্যতি	=	দেখে
সঃ	=	সেই (যথার্থরূপে)
পশ্যতি	=	দেখে।

সমম্, পশ্যন, হি, সর্বত্র, সমবস্থিতম্, ঈশ্বরম্, ন,
হিনস্তি, আত্মনা, আত্মানম্, ততঃ, যাতি, পরাম্, গতিম্॥ ২৮॥

হি	=	যেহেতু (সেই পুরুষ)
সর্বত্র	=	সকল স্থানে
সমবস্থিতম্	=	সমভাবে স্থিত
ঈশ্বরম্	=	পরমেশ্বরকে
সমম্	=	সমভাবে
পশ্যন্	=	অবলোকন করতঃ
আত্মনা	=	নিজের দ্বারা
আত্মানম্	=	নিজেকে
ন, হিনস্তি	=	নষ্ট করে না,
ততঃ	=	সেই হেতু (সে)
পরাম্	=	পরম
গতিম্	=	গতি
যাতি	=	প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃত্যা, এব, চ, কর্মাণি, ক্রয়মাণানি, সর্বশ।,
যঃ, পশ্যতি, তথা আত্মানম্, অকর্তারম্, সঃ, পশ্যতি॥ ২৯॥

চ	=	এবং
যঃ	=	যে পুরুষ
কর্মাণি	=	সমস্ত কর্ম
সর্বশঃ	=	সকল প্রকারে
প্রকৃত্যা	=	প্রকৃতি দ্বারা
এব	=	ই
ক্রিয়মাণানি	=	কৃত
(পশ্যতি)	=	দেখে
তথা	=	এবং
আত্মানম্	=	আত্মাকে
অকর্তারম্	=	অকর্তা
পশ্যতি	=	দেখে,
সঃ	=	সেই (যথার্থ)
পশ্যতি	=	দেখে।

যদা, ভূতপৃথগভাবম, একস্থম, অনুপশ্যতি,
ততঃ, এব, চ, বিস্তারম্, ব্রহ্ম, সম্পদ্যতে, তদা॥ ৩০॥
এবং এই পুরুষ –

যদা	=	যেকালে
ভূতপৃথগ্–ভাবম	=	প্রাণীগুলির পৃথক পৃথক ভাবকে
একস্থম্	=	এক পরমাত্মার সঙ্কল্পের আধারে স্থিত
অনুপশ্যতি	=	দেখে
চ	=	আর
ততঃ	=	সেই পরমাত্মার সঙ্কল্প হতে
এব	=	ই (সকল প্রাণীর)
বিস্তারম্	=	বিস্তার
(পশ্যতি)	=	দেখে,
তদা	=	সেইকালেই (সে)
ব্রহ্ম	=	সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে
সম্পদ্যতে	=	প্রাপ্ত হয়।

অনাদিত্বাৎ, নির্গুণত্বাৎ, পরমাত্মা, অয়ম্, অব্যয়ঃ,
শরীরস্থঃ, অপি, কৌন্তেয়, ন, করোতি, ন, লিপ্যতে॥ ৩১॥

কৌন্তেয়	= হে অর্জুন!	পরমাত্মা	= পরমাত্মা
অনাদিত্বাৎ	= অনাদি হওয়ার জন্য, (এবং)	শরীরস্থঃ	= শরীরে স্থিত হয়ে
নির্গুণত্বাৎ	= গুণাতীত হওয়ার জন্য	অপি	= ও (বাস্তবপক্ষে) (কিছু)
অয়ম্	= এই	ন করোতি	= করে না (ও)
অব্যয়ঃ	= অবিনাশী	ন লিপ্যতে	= লিপ্তও হন না।

যথা, সর্বগতম্, সৌক্ষ্ম্যাৎ, আকাশম্, ন, উপলিপ্যতে,
সর্বত্র, অবস্থিতঃ, দেহে, তথা, আত্মা, ন, উপলিপ্যতে॥ ৩২॥

যথা	= যেমন	সর্বত্র	= সর্বত্র
সর্বগতম্	= সর্বত্রব্যাপ্ত	অবস্থিতঃ	= স্থিত হয়ে (ও)
আকাশম্	= আকাশ	আত্মা	= আত্মা (গুণাতীত হওয়ার কারণ দেহের গুণগুলির দ্বারা)
সৌক্ষ্ম্যাৎ	= সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য		
ন, উপলিপ্যতে	= লিপ্ত হয় না,		
তথা	= সেইরকম	ন উপলিপ্যতে	= লিপ্ত হন না।
দেহে	= দেহে		

যথা, প্রকাশয়তি, একঃ, কৃৎস্নম্, লোকম্, ইমম্, রবিঃ,
ক্ষেত্রম্, ক্ষেত্রী, তথা, কৃৎস্নম্, প্রকাশয়তি, ভারত॥ ৩৩॥

ভারত	= হে অর্জুন!	প্রকাশয়তি	= প্রকাশিত করে,
যথা	= যেরূপ	তথা	= সেইরূপ
একঃ	= একটি (ই)	ক্ষেত্রী	= একই আত্মা
রবিঃ	= সূর্য	কৃৎস্নম্	= সম্পূর্ণ
ইমম্	= এই	ক্ষেত্রম্	= ক্ষেত্রকে
কৃৎস্নম্	= সম্পূর্ণ	প্রকাশয়তি	= প্রকাশিত করে।
লোকম্	= ব্রহ্মাণ্ডকে		

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ, এবম্, অন্তরম্, জ্ঞানচক্ষুষা,
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্, চ, যে, বিদুঃ, যান্তি, তে, পরম্॥ ৩৪॥

এবম্	= এইপ্রকার		উপায়
ক্ষেত্রক্ষেত্র–জ্ঞয়োঃ	= ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের	যে	= যে ব্যক্তিরা
		জ্ঞানচক্ষুষা	= জ্ঞানচক্ষু দ্বারা
অন্তরম্	= ভেদ	বিদুঃ	= তত্ত্বতঃ জানেন,
চ	= আর	তে	= সেই মহাত্মাগণ
ভূতপ্রকৃতি–মোক্ষম্	= বিকারসহ প্রকৃতি হতে মুক্ত হবার	পরম্	= পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে
		যান্তি	= প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোকের ফটোকপি

চতুর্দশ অধ্যায়

পরম্, ভূয়ঃ, প্রবক্ষ্যামি, জ্ঞানানাম, জ্ঞানম্, উত্তমম্,
যৎ, জ্ঞাত্বা, মুনয়ঃ, সর্বে, পরাম্, সিদ্ধিম্, ইতঃ, গতাঃ ॥ ১ ॥

(তদনন্তর), ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! –

জ্ঞানানাম্	= সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে	সর্বে	= সকল
উত্তমম্	= অতি উত্তম	মুনয়ঃ	= মুনি
পরম্	= পরম	ইতঃ	= এই সংসার থেকে (মুক্ত হয়ে)
জ্ঞানম্	= জ্ঞান (আমি)		
ভূয়ঃ	= পুনরায় (তোমাকে)	পরাম্	= পরম
প্রবক্ষ্যামি	= বলব,	সিদ্ধিম্	= সিদ্ধি
যৎ	= যা	গতাঃ	= প্রাপ্ত হয়েছেন।
জ্ঞাত্বা	= জেনে		

ইদম্, জ্ঞানম্, উপাশ্রিত্য, মম, সাধর্ম্যম, আগতাঃ,
সর্গে, অপি, ন, উপজায়ন্তে, প্রলয়ে, ন, ব্যথন্তি, চ ॥ ২ ॥

হে অর্জুন –

ইদম্	= এই	সর্গে	= সৃষ্টির আদিতে (পুনরায়)
জ্ঞানম্	= জ্ঞানকে		
উপাশ্রিত্য	= আশ্রয় করে অর্থাৎ ধারণ করে	ন, উপজায়ন্তে	= উৎপন্ন হন না
		চ	= এবং
মম	= আমার	প্রলয়ে	= প্রলয় কালে
সাধর্ম্যম্	= স্বরূপ	অপি	= ও
আগতাঃ	= প্রাপ্ত পুরুষগণ	ন, ব্যথন্তি	= উদ্বিগ্ন হন না।

মম, যোনিঃ, মহৎ, ব্রহ্ম, তস্মিন, গর্ভম্, দধামি, অহম,
সম্ভবঃ, সর্বভূতানাম, ততঃ, ভবতি, ভারত ॥ ৩ ॥

ভারত	= হে অর্জুন!	তস্মিন্	= তাতে
মম	= আমার	গর্ভম	= চেতনরূপ বীজকে
মহৎ	= মহৎ	দধামি	= স্থাপন করি।
ব্রহ্ম	= ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী মায়া (প্রাণীগুলির)	ততঃ	= সেই জড়চেতনের সংযোগে
যোনিঃ	= যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানের স্থান (এবং)	সর্বভূতানাম	= সকল প্রাণীগণের
		সম্ভবঃ	= উৎপত্তি
অহম্	= আমি	ভবতি	= হয়।

সর্বযোনিষু, কৌন্তেয়, মূর্তয়ঃ, সম্ভবন্তি, যাঃ,
তাসাম্, ব্রহ্ম, মহৎ, যোনিঃ, অহম, বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

এবং –

কৌন্তেয় = হে অর্জুন!
সর্বযোনিষু = (নানা প্রকারের) সকল যোনিতে
যাঃ = যতগুলি
মূর্তয়ঃ = মূর্তি অর্থাৎ শরীর
সম্ভবন্তি = উৎপন্ন হয়,
মহৎ ব্রহ্ম = ত্রিগুণময়ী মায়া
তাসাম্ = তাদের
যোনিঃ = গর্ভধারণকারিণী মাতা (আর)
অহম্ = আমি (হই)
বীজপ্রদঃ = বীজ স্থাপনকারী
পিতা = পিতা।

সত্ত্বম্, রজঃ, তমঃ, ইতি, গুণাঃ, প্রকৃতিসম্ভবাঃ,
নিবধ্নন্তি, মহাবাহো, দেহে, দেহিনম্, অব্যয়ম্॥ ৫॥

তথা –

মহাবাহো = হে অর্জুন!
সত্ত্বম্ = সত্ত্বগুণ,
রজঃ = রজোগুণ (ও)
তমঃ = তমোগুণ –
ইতি = এই (সব)
প্রকৃতি–সম্ভবাঃ = প্রকৃতিজাত
গুণাঃ = তিনটি গুণ
অব্যয়ম্ = অবিনাশী
দেহিনম্ = জীবাত্মাকে
দেহে = শরীরে
নিবধ্নন্তি = বন্ধন করে।

ন, অন্যম্, গুণেভ্যঃ, কর্তারম্, যদা, দ্রষ্টা, অনুপশ্যতি,
গুণেভ্যঃ, চ, পরম্, বেত্তি, মদ্ভাবম্, সঃ, অধিগচ্ছতি॥ ১৯॥

এবং হে অর্জুন –

যদা = যে কালে
দ্রষ্টা = দ্রষ্টা
গুণেভ্যঃ = গুণত্রয় ভিন্ন
অন্যম্ = অন্য কাউকেও
কর্তারম্ = কর্তা
ন, অনুপশ্যতি = দেখে না অর্থাৎ গুণই গুণেতে প্রবৃত্ত হয়
চ = এবং
গুণেভ্যঃ = গুণত্রয় হতে
পরম্ = অত্যন্ত পর সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মারূপ আমাকে
বেত্তি = তত্ত্বতঃ জানে,
(তদা) = সেই কালে
সঃ = সেই পুরুষ
মদ্ভাবম্ = আমার স্বরূপকে
অধিগচ্ছতি = প্রাপ্ত হয়।

গুণান্, এতান, অতীত্য, ত্রীন্, দেহী, দেহসমুদ্ভবান্,
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ, বিমুক্তঃ, অমৃতম, অশ্নুতে॥ ২০॥

আর এই –

দেহী = পুরুষ
এতান = এইসকল
দেহসমুদ্ভবান = স্থূল শরীরের উৎপত্তির কারণরূপ
ত্রীন্ = তিন
গুণান্ = গুণগুলিকে
অতীত্য = অতিক্রম করে
জন্ম–মৃত্যু– = জন্ম, মৃত্যু, জরা

জরাদুঃখৈঃ		এবং সকল প্রকারের দুঃখ হতে
বিমুক্তঃ	=	মুক্ত হয়ে
অমৃতম্	=	পরমানন্দকে
অশ্নুতে	=	প্রাপ্ত হয়।

সমদুঃখসুখঃ, স্বস্থঃ, সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ,
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ, ধীরঃ, তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

এবং যে –

স্বস্থঃ	=	নিরন্তর আত্মভাবে স্থিত,
সমদুঃখসুখঃ	=	দুঃখ এবং সুখে সমভাব (আর)
সমলোষ্টাশ্ম–কাঞ্চনঃ	=	মাটি, পাথর এবং সুবর্ণতে সমভাব বিশিষ্ট,
ধীরঃ	=	ধৈর্যবান (এবং)
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ	=	যে প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান জ্ঞান করে (তথা)
তুল্যনিন্দাত্ম–সংস্তুতিঃ	=	স্বীয় নিন্দা এবং স্তুতিতে সমান ভাববিশিষ্ট।

মাম্, চ, যঃ, অব্যভিচারেণ, ভক্তিযোগেন, সেবতে,
সঃ, গুণান্, সমতীতা, এতান, ব্রহ্মভূয়ায়, কল্পতে ॥ ২৬ ॥

চ	=	এবং
যঃ	=	যে পুরুষ
অব্যভিচারেণ	=	অব্যভিচারী
ভক্তিযোগেন	=	ভক্তি যোগ দ্বারা
মাম্	=	আমাকে
সেবতে	=	নিরন্তর ভজনা করে,
সঃ	=	সে
এতান্	=	এইসকল
গুণান্	=	গুণকে
সমতীত্য	=	উত্তম রূপে অতিক্রম করে
ব্রহ্মভূয়ায়	=	সচ্চিদানন্দঘন পর–ব্রহ্মতে একীভাব প্রাপ্ত হবার
কল্পতে	=	যোগ্য হয়।

ব্রহ্মণঃ, হি, প্রতিষ্ঠা, অহম্, অমৃতস্য, অব্যয়স্য, চ,
শাশ্বতস, ধর্মস্য, সুখস্য, ঐকান্তিকস্য, চ ॥ ২৭ ॥

অতএব হে অর্জুন! সেই –

অব্যয়স্য	=	অবিনাশী
ব্রহ্মণঃ	=	পরব্রহ্মের
চ	=	এবং
অমৃতস্য	=	অমৃতের
চ	=	আর
শাশ্বতস্য	=	নিত্য
ধর্মস্য	=	ধর্মের
চ	=	ও
ঐকান্তিকস্য	=	অখণ্ড একরস
সুখস্য	=	আনন্দের
অহম্	=	আমি
হি	=	ই
প্রতিষ্ঠা	=	আশ্রয় হই।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোকের ফটোকপি

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ –

ঊর্ধ্বমূলম্, অধঃশাখম্, অশ্বত্থম্, প্রাহুঃ, অব্যয়ম্,
ছন্দাংসি, যস্য, পর্ণানি, যঃ, তম্, বেদ, সঃ, বেদবিৎ॥ ১॥

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন হে অর্জুন! –

ঊর্ধ্বমূলম্ = আদিপুরুষ পরমেশ্বর রূপ মূল বিশিষ্ট (এবং)
অধঃশাখম্ = বৃক্ষরূপ মূখ্যশাখা বিশিষ্ট (যে)
অশ্বত্থম্ = সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে
অব্যয়ম্ = অবিনাশী
প্রাহুঃ = বলা হয়ে থাকে (এবং)
ছন্দাংসি = বেদ
যস্য = যার
পর্ণানি = পাতা (কথিত হয়েছে)
তম্ = সেই সংসাররূপ বৃক্ষকে
যঃ = যে পুরুষ (মূলসহ)
বেদ = তত্ত্বতঃ জানে
সঃ = সে
বেদবিৎ = বেদের তাৎপর্যের জ্ঞাতা

অধঃ, চ, উর্দ্ধম্, প্রসৃতাঃ, তস্য, শাখাঃ, গুণপ্রবৃদ্ধাঃ
বিষয়প্রবালাঃ, অধঃ, চ, মূলানি, অনুসন্ততানি,
কর্মানুবন্ধীনি, মনুষ্যলোকে॥ ২॥

এবং হে অর্জুন –

তস্য = সেই সংসার বৃক্ষের
গুণপ্রবৃদ্ধাঃ = গুণত্রয়রূপ জল দ্বারা বর্ধিত (ও)
বিষয়প্র–প্রবালাঃ = বিষয় ভোগ রূপ প্রবাল বিশিষ্ট
শাখাঃ = দেব, মানুষ ও তির্যক আদি যোনিরূপ শাখা গুলি
অধঃ = নীচে
চ = আর
উর্দ্ধম্ = উপরে সর্বত্র
প্রসৃতাঃ = বিস্তৃত আছে, (এবং)
মনুষ্যলোকে = মনুষ্যযোনিতে
কর্মানুবন্ধীনি = কর্মানুসারে বন্ধনকারী
মূলানি = অহংবোধ, মমতা ও বাসনারূপ মূলগুলি
(অপি) = ও
অধঃ = নীচে
চ = এবং
(উর্দ্ধম্) = উপরে
অনুসন্ত–তানি = সমস্ত লোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

ন, রূপম্, অস্য, ইহ, তথা, উপলভ্যতে, ন, অন্তঃ, ন, চ, আদিঃ, ন,
চ, সম্প্রতিষ্ঠা, অশ্বত্থম্, এনম্, সুবিরূঢ়মূলম্, অসঙ্গশস্ত্রেণ, দৃঢ়েণ, ছিত্বা॥ ৩॥

কিন্তু –

অস্য = এই সংসার বৃক্ষের
রূপম্ = স্বরূপ (যেরূপ কথিত হয়েছে)
তথা = সেরূপ
ইহ = এখানে (বিচারকালে)
ন, উপলভ্যতে = পাওয়া যায় না
(যতঃ) = যেহেতু
ন = না (এর)
আদিঃ = আদি আছে
চ = এবং
ন = না
অন্তঃ = অন্ত আছে
চ = আর
ন = না
সম্প্রতিষ্ঠা– (অপি) = উত্তমরূপে স্থিতিই আছে,
(অতঃ) = এইজন্য
এনম্ = এই
সুবিরূঢ়– মূলম্ = অহংতা, মমতা এবং বাসনারূপ অতিদৃঢ় মূল বিশিষ্ট
অশ্বত্থম্ = সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে
দৃঢ়েন = দৃঢ়
অসঙ্গশস্ত্রেণ = বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা
ছিত্ত্বা = ছেদন করে–

ততঃ, পদম্, তৎ, পরিমার্গিতব্যম, যস্মিন্, গতাঃ, ন,
নিবর্তন্তি, ভূয়ঃ, তম্, এব, চ, আদ্যম্, পুরুষম্, প্রপদ্যে,
যতঃ, প্রবৃত্তিঃ, প্রসৃতা, পুরাণী ॥ ৪ ॥

ততঃ = তারপর
তৎ = সেই
পদম্ = পরমপদ রূপ পরমেশ্বরকে
পরমার্গি– তব্যম্ = উত্তমরূপে অন্বেষণ করতে হবে,
যস্মিন্ = যাতে
গতাঃ = গত পুরুষ
ভূয়ঃ = আবার
ন, নিবর্ত্তন্তি = সংসারে ফিরে আসে না
চ = এবং
যতঃ = যে পরমেশ্বর থেকে (এই)
পুরাণী = পুরাতন
প্রবৃত্তিঃ = সংসার বৃক্ষের প্রবৃত্তি
প্রসৃতা = বিস্তৃত হয়েছে,
তম্ = সে
এব = ই
আদ্যম্ = আদি
পুরুষম্ = পুরুষ নারায়ণেরই (আমি)
প্রপদ্যে = শরণ নিচ্ছি–(এইদৃঢ় নিশ্চয় করা উচিত)।

নির্মানমোহাঃ, জিতসঙ্গদোষাঃ, অধ্যাত্মনিত্যাঃ,
বিনিবৃত্তকামাঃ, দ্বন্দ্বৈঃ, বিমুক্তাঃ, সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ
, গচ্ছন্তি, অমূঢ়াঃ, পদম্, অব্যয়ম, তৎ ॥ ৫ ॥

নির্মানমোহাঃ = যাঁদের মান এবং মোহ বিনষ্ট হয়েছে (ও)
জিতসঙ্গ– দোষাঃ = যাঁরা আসক্তিরূপ দোষকে জয় করেছেন (এবং)
অধ্যাত্ম– নিত্যাঃ = পরমাত্মার স্বরূপে যাঁদের নৃত্য–নিরন্তর স্থিতি (ও)
বিনিবৃত্তকামাঃ = যাঁদের কামনা

উত্তমরূপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে (এইরূপ)
সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ = সুখদুঃখ নামক
দ্বন্দ্বৈঃ = দ্বন্দ্ব থেকে
বিমুক্তাঃ = বিমুক্ত

অমূঢ়াঃ = জ্ঞানীরা
তৎ = সেই
অব্যয়ম্ = অবিনাশী
পদম্ = পরমপদকে
গচ্ছন্তি = প্রাপ্ত হন।

ন, তৎ, ভাসয়তে, সূর্যঃ, ন, শশাঙ্কঃ, ন, পাবকঃ,
যৎ, গত্বা, ন, নিবর্তন্তে, তৎ, ধাম, পরমম্, মম॥ ৬॥

এবং –

তৎ = সেই স্বয়ং প্রকাশময় পরমপদকে
সূর্যঃ = সূর্য
ন, ভাসয়তে = প্রকাশিত করতে পারে না,
শশাঙ্কঃ = চন্দ্র
ন (ভাসয়তে) = প্রকাশিত করতে পারে না,
পাবকঃ = অগ্নিও
ন (ভাসয়তে) = প্রকাশিত করতে পারে না, (আর)

যৎ = যে পরমপদ
গত্বা = প্রাপ্ত হয়ে (মানুষ)
ন, নিবর্তন্তে = সংসারে ফিরে আসে না
তৎ = সেইটিই
মম = আমার
পরমম্ = পরম
ধাম = ধাম।

সর্বস্য, চ, অহম্, হৃদি, সন্নিবিষ্টঃ, মত্তঃ, স্মৃতিঃ,
জ্ঞানম্, অপোহনম্, চ, বেদৈঃ, চ, সর্বৈঃ, অহম্, এব,
বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ, বেদবিৎ, এব, চ, অহম্॥ ১৫॥

চ = এবং
অহম্ = আমি (ই)
সর্বস্য = সকল প্রাণীদের
হৃদি = হৃদয়ে
সন্নিবিষ্টঃ = অন্তর্যামিরূপে স্থিত আছি, (আর)
মত্তঃ = আমার থেকেই
স্মৃতিঃ = স্মৃতি,
জ্ঞানম্ = জ্ঞান
চ = ও
অপোহনম্ = অপোহন
(ভবতি) = হয়

চ = এবং
সর্বৈঃ = সমস্ত
বেদৈঃ = বেদ দ্বারা
অহম্ = আমি
এব = ই
বেদ্যঃ = জানবার যোগ্য হই (তথা)
বেদান্তকৃৎ = বেদান্তের কর্তা
চ = এবং
বেদবিৎ = বেদবেত্তা (ও)
অহম্ = আমি
এব = ই।

দ্বৌ, ইমৌ, পুরুষৌ, লোকে, ক্ষরঃ, চ, অক্ষরঃ, এব, চ,
ক্ষরঃ, সর্বাণি, ভূতানি, কূটস্থঃ, অক্ষরঃ, উচ্যতে॥ ১৬॥

এবং হে অর্জুন! –

লোকে = এই সংসারে
ক্ষরঃ = বিনাশশীল
চ = ও
অক্ষরঃ = অবিনাশী
এব = ই
ইমৌ = এই
দ্বৌ = দুই প্রকারের
পুরুষৌ = পুরুষ আছেন।

(তাঁদের মধ্যে)
সর্বাণি = সমস্ত
ভূতানি = প্রাণীদের শরীর
ক্ষরঃ = বিনাশশীল
চ = আর
কূটস্থঃ = জীবাত্মাকে
অক্ষরঃ = অবিনাশী
উচ্যতে = বলা হয়।

উত্তমঃ, পুরুষঃ, তু, অন্যঃ, পরমাত্মা, ইতি, উদাহৃতঃ,
যঃ, লোকত্রয়ম্, আবিশ্য, বিভর্তি, অব্যয়ঃ, ঈশ্বরঃ ॥ ১৭॥

এবং এই দুটি হতে –

উত্তমঃ = উত্তম
পুরুষঃ = পুরুষ
তু = তো
অন্যঃ = ভিন্ন (ই) (হন)
যঃ = যিনি
লোকত্রয়ম্ = লোকত্রয়ে
আবিশ্য = প্রবেশ করে
বিভর্তি = সকলকে ধারণ

পোষণ করেন
(এবং) যাকে
অব্যয়ঃ = অবিনাশী,
ঈশ্বরঃ = পরমেশ্বর (ও)
পরমাত্মা = পরমাত্মা
ইতি = এইরূপ
উদাহৃতঃ = বলা হয়েছে।

যস্মাৎ, ক্ষরম্, অতীতঃ, অহম্, অক্ষরাৎ, অপি, চ, উত্তমঃ
অতঃ, অস্মি, লোকে, বেদে, চ, প্রথিতঃ, পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ = যেহেতু
অহম্ = আমি
ক্ষরম্ = বিনাশশীল জড়বর্গ–
ক্ষেত্র হতে
অতীতঃ = সর্বতোভাবে অতীত
চ = এবং (মায়াতে স্থিত)
অক্ষরাৎ = অবিনাশী জীবাত্মা হতে
অপি = ও

উত্তমঃ = উত্তম,
অতঃ = সেই হেতু
লোকে = লোকে
চ = আর
বেদে = বেদে (ও)
পুরুষোত্তমঃ = পুরুষোত্তম (নামে)
প্রথিতঃ = প্রসিদ্ধ (হয়ে)
অস্মি = আছি।

যঃ, মাম্, এবম্, অসংমূঢ়ঃ, জানাতি, পুরুষোত্তমম্,
সঃ, সর্ববিৎ, ভজতি, মাম্, সর্বভাবেন, ভারত ॥ ১৯ ॥

ভারত = হে অর্জুন!
যঃ = যে
অসংমূঢ়ঃ = জ্ঞানী পুরুষ
মাম্ = আমাকে

এবম্ = এই প্রকার তত্ত্বতঃ
পুরুষোত্তমম্ = পুরুষোত্তম
জানাতি = জানে,
সঃ = সেই

সর্ববিৎ = সর্বজ্ঞ পুরুষ
সর্বভাবেন = সকল প্রকারে নিরন্তর
মাম্ = বাসুদেব পরমেশ্বর–
রূপ আমাকে (ই)
ভজতি = ভজনা করে।

ইতি, গুহ্যতমম, শাস্ত্রম্, ইদম, উক্তম্, ময়া অনঘ,
এতৎ, বুদ্ধা, বুদ্ধিমান্, স্যাৎ, কৃতকৃত্যাঃ, চ, ভারত ॥ ২০ ॥

অনঘ = হে নিষ্পাপ
ভারত = অর্জুন!
ইতি = এরূপ
ইদম্ = এই
গুহ্যতমম্ = অতি রহস্যযুক্ত গোপনীয়
শাস্ত্রম্ = শাস্ত্র
ময়া = আমার দ্বারা
উক্তম্ = উক্ত হল,
এতৎ = এটি
বুদ্ধা = তত্ত্বতঃ জেনে (মানুষ)
বুদ্ধিমান = জ্ঞানবান্
চ = ও
কৃতকৃত্যঃ = কৃতার্থ
স্যাৎ = হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোকের ফটোকপি

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ –

অভয়ম্, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ,
দানম্, দমঃ, চ, যজ্ঞঃ, চ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, আর্জবম ॥ ১ ॥

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার বললেন – হে অর্জুন! যে পুরুষেরা দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে এবং যারা আসুরী সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের লক্ষণ পৃথকভাবে বলছি। সেগুলির মধ্যে –

অভয়ম্ = সম্পূর্ণরূপ ভয়ের অভাব,
সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ = অন্তঃকরণের উত্তম–রূপ স্বচ্ছতা,
জ্ঞানযোগ–ব্যবস্থিতিঃ = তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানযোগে নিরন্তর দৃঢ় স্থিতি,
চ = এবং
দানম্ = সাত্ত্বিক দান (তথা)
দমঃ = ইন্দ্রিয়গুলির দমন,
যজ্ঞঃ = ভগবৎপূজা ও অগ্নি–হোত্রাদি উত্তম কর্মস–মূহের আচরণ (এবং)
স্বাধ্যায়ঃ = বেদ শাস্ত্রের পঠন–পাঠন পূর্বক ভগবানের নাম এবং গুণকীর্তন,
তপঃ = স্বধর্ম পালনের জন্য কষ্ট সহ্য করা
চ = তথা
আর্জবম্ = শরীর এবং ইন্দ্রিয়সহ অন্তঃকরণের সরলতা–

অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনম্,
দয়া, ভূতেষু, অলোলুপ্ত্বম্, মার্দবম্, হ্রীঃ, অচাপলম্ ॥ ২॥

এবং –

অহিংসা = কায়মনোবাক্য দ্বারা কাউকে কোনও প্রকারে কষ্ট না দেওয়া,
সত্যম্ = যথার্থ ও প্রিয়ভাষণ
অক্রোধঃ = অপকারকারীর প্রতিও ক্রোধ না হওয়া
ত্যাগঃ = সকল কর্মেই কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করা,
শান্তিঃ = অন্তঃকরণের উপরতি অর্থাৎ চিত্তের চঞ্চলতার অভাব,
অপৈশুনম্ = কারও নিন্দাদি না করা,
ভূতেষু = সকল প্রাণীর প্রতি
দয়া = অহৈতুকি দয়া,
অলোলু-প্ত্বম্ = বিষয়গুলির সঙ্গে ইন্দ্রিয়-গুলির সংযোগ হলেও আসক্ত না হওয়া,
মার্দবম্ = কোমলতা,
হ্রীঃ = লোক এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে লজ্জা (এবং)
অচাপলম্ = ব্যর্থ চেষ্টাগুলির অভাব।

তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ, নাতিমানিতা,
ভবন্তি, সম্পদম্, দৈবীম্, অভিজাতস্য, ভারত ॥ ৩ ॥

তথা –

তেজঃ = তেজ
ক্ষমা = ক্ষমা,
ধৃতিঃ = ধৈর্য, (এবং)
শৌচম্ = অন্তর বাহিরের শুদ্ধি
অদ্রোহঃ = কারও প্রতি শত্রুভাব না হওয়া,
নাতিমা-নিতা = আপনাতে পূজ্যভাবের অভিমানের অভাব (এইসব তো)
ভারত = হে অর্জুন!
দৈবীম্ = দৈবী
সম্পদম্ = সম্পদ
অভিজাতস্য = প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ
ভবন্তি = হয়ে থাকে।

দম্ভঃ, দর্পঃ, অভিমানঃ, চ, ক্রোধঃ, পারুষ্যম্, এব, চ,
অজ্ঞানম্, চ, অভিজাতস্য, পার্থ, সম্পদম্, আসুরীম্ ॥ ৪ ॥

এবং –

পার্থ = হে পার্থ!
দম্ভঃ = দম্ভ,
দর্পঃ = দর্প,
চ = আর
অভিমানঃ = অভিমান
চ = তথা
ক্রোধঃ = ক্রোধ,
পারুষ্যম্ = কঠোর বাক্য
চ = তথা
অজ্ঞানম্ = অজ্ঞান
এব = ও-(এইসব হল)
আসুরীম্ = আসুরী
সম্পদম্ = সম্পদ
অভিজাতস্য = প্রাপ্ত পুরুষের (লক্ষণ)

দৈবী সম্পৎ, বিমোক্ষায়, নিবন্ধায়, আসুরী, মতা,
মা, শুচঃ, সম্পদম্, দৈবীম্, অভিজাতঃ, অসি, পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

ঐ দু'রকম সম্পদের মধ্যে –

দৈবীসম্পৎ	= দৈবীসম্পদ	মা, শুচঃ	= শোক কোরো না,
বিমোক্ষায়	= মুক্তির জন্য (এবং)	(যতঃ)	= কেননা (তুমি)
আসুরী	= আসুরী সম্পদ	দৈবীম্	= দৈবী
নিবন্ধায়	= বন্ধনের জন্য	সম্পদম্	= সম্পদ
মতা	= অভিপ্রেত হয়	অভিজাতঃ	= প্রাপ্ত হয়ে
(অতঃ)	= এইজন্য	অসি	= আছো।
পাণ্ডব	= হে অর্জুন! (তুমি)		

দ্বৌ, ভূতসর্গৌ, লোকে, অস্মিন্, দৈবঃ, আসুরঃ, এব, চ,
দৈবঃ, বিস্তরশঃ, প্রোক্তঃ, আসুরম্, পার্থ, মে, শৃণু॥ ৬॥

এবং –

পার্থ	= হে অর্জুন!	আসুরঃ	= অসুর সদৃশ; (তাদের মধ্যে)
অস্মিন্	= এই		
লোকে	= লোকে	দৈবঃ	= দেবগণের স্বভাব
ভূতসর্গৌ	= ভূতগণের স্বভাব	বিস্তরশঃ	= বিস্তারপূর্বক
দ্বৌ, এব	= দু'রকমই	প্রোক্তঃ	= কথিত হয়েছে,
(মতৌ)	= মানা হয়ে থাকে, (এক)	আসুরম্	= অসুরদের স্বভাব (ও) সবিস্তারে
দৈবঃ	= দেব সদৃশ	মে	= আমার কাছ থেকে
চ	= এবং (দ্বিতীয়)	শৃণু	= শোনো।

প্রবৃত্তির, চ, নিবৃত্তিম্, চ, জনাঃ, ন, বিদুঃ, আসুরাঃ,
ন, শৌচম্, ন, অপি, চ, আচারঃ, ন, সত্যম্, তেষু, বিদ্যতে॥ ৭॥

হে অর্জুন –

আসুরাঃ	= আসুরী স্বভাব বিশিষ্ট	শৌচম্	= অন্তর–বাহিরের শুদ্ধি থাকে,
জনাঃ	= মানুষেরা		
প্রবৃত্তিম্	= কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত	ন	= না (থাকে)
চ	= এবং	আচারঃ	= শ্রেষ্ঠ আচরণ
নিবৃত্তিম্	= অকর্তব্য কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া (এই দুই)	চ	= এবং
		ন	= না
চ	= ই	সত্যম্	= সত্যভাষণ
ন বিদুঃ	= জানে না। (অতএব)	অপি	= ই
তেষু	= তাদের মধ্যে	বিদ্যতে	= থাকে।
ন	= না (তো)		

অসত্যম্, অপ্রতিষ্ঠম্, তে, জগৎ, আহুঃ, অনীশ্বরম্,
অপরস্পরসম্ভূতম্, কিম, অন্যৎ, কামহৈতুকম্॥ ৮॥

তথা –

তে = সেই আসুরী প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষেরা
আহুঃ = বলে থাকে (যে)
জগৎ = জগৎ
অপ্রতিষ্ঠম্ = আশ্রয় রহিত, (এবং)
অসত্যম্ = সম্পূর্ণ মিথ্যা (ও)
অনীশ্বরম্ = ঈশ্বর ছাড়া
অপরস্পর– = নিজে নিজেই স্ত্রী–
সম্ভুতম্ পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে;
(অতঃ) = অতএব এই জগৎ
কামহৈতুকম্ = উৎপত্তির হেতু হল একমাত্র কাম
(এব) = ই
অন্যৎ = এ ছাড়া (আর)
কিম্ = কিছুই নয়।

এতাম্, দৃষ্টিম্, অবষ্টভ্য, নষ্টাত্মানঃ, অল্পবুদ্ধয়ঃ,
প্রভবন্তি, উগ্রকর্মাণঃ, ক্ষয়ায়, জগতঃ, অহিতাঃ ॥ ৯ ॥

এইপ্রকারে –

এতাম্ = এই
দৃষ্টিম্ = মিথ্যাজ্ঞানকে
অবষ্টভ্য = আশ্রয় করে
নষ্টাত্মানঃ = ভ্রষ্ট স্বভাবযুক্ত (ও)
অল্পবুদ্ধয়ঃ = ক্ষুদ্রমতিবিশিষ্ট,
অহিতাঃ = সকলের অপকারকারী
উগ্রকর্মাণঃ = ক্রূরকর্মা মানুষদের যা সামর্থ, তা (কেবলমাত্র)
জগতঃ = জগতের
ক্ষয়ায় = বিনাশের জন্য (ই)
প্রভবন্তি = হয়ে থাকে।

কামম্, আশ্রিত্য, দুষ্পূরম্, দম্ভমানমদান্বিতাঃ,
মোহাৎ, গৃহীত্বা, অসদগ্রাহান, প্রবর্তন্তে, অশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

এবং ঐ মানুষেরা –

দম্ভমান– মদান্বিতাঃ = দম্ভ, মান ও মদমত্ত হয়ে,
দুষ্পূরম্ = যা কোনও প্রকারেও পূর্ণ হয় না–এরূপ
কামম্ = কামনাগুলির
আশ্রিত্য = আশ্রয় গ্রহণ করে (ও)
মোহাৎ = অজ্ঞানবশতঃ
অসদগ্রাহান্ = মিথ্যা সিদ্ধান্তগুলিকে
গৃহীত্বা = গ্রহণ করে
অশুচিব্রতাঃ = ভ্রষ্ট আচার পরায়ণ হয়ে (সংসারে)
প্রবর্তন্তে = কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

চিন্তাম্, অপরিমেয়াম্, চ, প্রলয়ান্তাম্, উপাশ্রিতাঃ,
কামোপভোগপরমাঃ, এতাবৎ, ইতি, নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

আর তারা –

প্রলয়ান্তাম্ = মরণ পর্যন্ত স্থায়ী
অপরিমেয়াম = অপরিমিত
চিন্তাম্ = চিন্তাকে
উপাশ্রিতাঃ = আশ্রয় করে
চ = এবং
কামোপ– ভোগপরমাঃ = বিষয়গুলির উপ–ভোগে তৎপর হয়ে
এতাবৎ = ‘এইটুকুই আনন্দ’
ইতি = এরকম
নিশ্চিতাঃ = স্থির নিশ্চয়যুক্ত হয়।

আশাপাশশতৈঃ, বদ্ধাঃ, কামক্রোধপরায়ণাঃ,
ঈহন্তে, কামভোগার্থম্, অন্যায়েন, অর্থসঞ্চয়ান্॥ ১২॥
এইজন্য তারা –

আশাপাশ–শতৈঃ	=	আশারূপ শত শত পাশ দ্বারা
বদ্ধাঃ	=	আবদ্ধ (এবং)
কামক্রোধঃ–পরায়ণাঃ	=	কাম–ক্রোধের পরায়ণ হয়ে
কামভোগার্থম	=	বিষয়ভোগের পূর্তির জন্য
অন্যায়েন	=	অন্যায়পূর্বক
অর্থসঞ্চয়ান	=	ধনাদি বহু পদার্থ সঞ্চয়ের জন্য
ঈহন্তে	=	চেষ্টা করে।

ইদম্, অদ্য, ময়া, লব্ধম্, ইমম, প্রাপ্স্যে, মনোরথম্,
ইদম্, অস্তি, ইদম্, অপি, মে, ভবিষ্যতি, পুনঃ, ধনম্॥ ১৩॥
এবং ঐসব পুরুষের বিচার এইরকম হয়ে থাকে যে –

ময়া	=	আমি
অদ্য	=	আজ
ইদম্	=	এটি
লব্ধম্	=	লাভ করেছি, (আর)
ইমম্	=	এই
মনোরথম্	=	মনোমত বস্তু
প্রাপ্স্যে	=	প্রাপ্ত হব। (ও)
মে	=	আমার
ইদম্	=	এই (এত)
ধনম্	=	ধন
অস্তি	=	আছে
পুনঃ	=	পুনরায়
অপি	=	ও
ইদম্	=	এটি
ভবিষ্যতি	=	হবে।

অসৌ, ময়া, হতঃ, শত্রুঃ, হনিষ্যে, চ, অপরান, অপি,
ঈশ্বরঃ, অহম্, অহম্, ভোগী, সিদ্ধঃ, অহম্, বলবান্ সুখী॥ ১৪॥
এবং –

অসৌ	=	অমুক
শত্রুঃ	=	শত্রু
ময়া	=	আমার দ্বারা
হতঃ	=	হত হয়েছে, (এবং)
অপরান্	=	অপর শত্রুদের
অপি	=	ও
অহম্	=	আমি
হনিষ্যে	=	শেষ করব
অহম্	=	আমি (ই)
ঈশ্বরঃ	=	প্রভু
চ	=	ও
ভোগী	=	ঐশ্বর্যভোগকারী।
অহম্	=	আমি
সিদ্ধঃ	=	সকল সিদ্ধিবিশিষ্ট।
বলবান্	=	বলবান (এবং)
সুখী	=	সুখী।

আঢ্যঃ, অভিজনবান্, অস্মি, কঃ, অন্যঃ, অস্তি, সদৃশঃ,
ময়া, যক্ষ্যে, দাস্যামি, মোদিষ্যে, ইতি, অজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫॥
এবং আমি –

আঢ্যঃ	= অশেষ ধনি ব্যক্তি,	অস্তি	= আছে? (আমি)
অভিজনবান্	= বহু কুটুম্ব বিশিষ্ট	যক্ষ্যে	= যজ্ঞ করব,
অস্মি	= হই	দাস্যামি	= দান করব,
ময়া	= আমার	মোদিষ্যে	= হর্ষ প্রাপ্ত হব–
সদৃশঃ	= সমান	ইতি	= এইরকম
অন্যঃ	= অন্য	অজ্ঞানবি–মোহিতাঃ	= অজ্ঞান দ্বারা মোহিত হয়।
কঃ	= কে		

অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ, মোহজালসমাবৃতাঃ,
প্রসক্তাঃ, কামভোগেষু, পতন্তি, নরকে, অশুচৌ ॥ ১৬ ॥

এইজন্য সেইসব –

অনেকচিত্ত–বিভ্রান্তাঃ	= অনেক প্রকার ভ্রান্ত চিত্তবিশিষ্ট (অজ্ঞানী ব্যক্তিরা)	প্রসক্তাঃ	= অত্যন্ত আসক্ত (অসুর স্বভাব বিশিষ্ট মানুষেরা ভয়ানক)
মোহজাল–সমাবৃতাঃ	= মোহময় জালে জড়িত থেকে (আর)	অশুচৌ	= অপবিত্র
		নরকে	= নরকে
কামভোগেষু	= বিষয়ভোগ সমূহে	পতন্তি	= পতিত হয়।

আত্মসম্ভাবিতাঃ, স্তব্ধাঃ, ধনমানমদান্বিতাঃ,
যজন্তে, মানযজ্ঞৈঃ, তে, দম্ভেন, অবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭ ॥

তথা –

তে	= ঐসব	অবিধিপূর্বকম্	= শাস্ত্রবিধিবর্জিত
আত্মসম্ভাবিতাঃ	= নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকারী	নামযজ্ঞৈঃ	= কেবল নামমাত্র যজ্ঞ দ্বারা
স্তব্ধাঃ	= অহঙ্কারী পুরুষেরা	দম্ভেন	= দম্ভপূর্বক
ধনমানমদা–ন্বিতাঃ	= ধন এবং মানের মদ যুক্ত হয়ে	যজন্তে	= যজন করে।

অহঙ্কারম্, বলম্, দর্পম্, কামম্, ক্রোধম্, চ, সংশ্রিতাঃ,
মাম্, আত্মপরদেহেষু, প্রদ্বিষন্তঃ, অভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

আর সেইসব –

অহঙ্কারম্	= অহঙ্কার,	অভ্যসূয়কাঃ	= অন্যের নিন্দাকারী পুরুষ
বলম্	= বল,		
দর্পম্	= দর্প,	আত্মপরদেহেষু	= নিজের এবং অপরের শরীরে (স্থিত)
কামম্	= কামনা		
চ	= এবং	মাম্	= অন্তর্যামীরূপ আমাকে
ক্রোধম্	= ক্রোধাদিকে		
সংশ্রিতাঃ	= আশ্রয় করে	প্রদ্বিষন্তঃ	= দ্বেষ করে থাকে।

তান, অহম্, দ্বিষতঃ, ক্রূরান্, সংসারেষু, নরাধমান্,
ক্ষিপামি, অজস্রম্, অশুভান্, আসুরীষু, এব, যোনিষু॥ ১৯॥

এইরূপ –

তান্	= সেই	সংসারেষু	= সংসারে
দ্বিষতঃ	= দ্বেষকারী,	অজস্রম্	= বারংবার
অশুভান্	= পাপাচারী,	আসুরীষু	= আসুরী
ক্রূরান্	= ক্রূরকর্মা,	যোনিষু	= যোনিতে–
নরাধমান্	= নরাধমদের	এব	= ই
অহম্	= আমি	ক্ষিপামি	= নিক্ষেপ করি।

অর্থাৎ শূকর, কুকুর প্রভৃতি নীচ যোনিতেই উৎপন্ন করে দিই।

আসুরীম্, যোনিম্, আপন্নাঃ, মূঢ়াঃ, জন্মনি, জন্মনি,
মাম্, অপ্রাপ্য, এব, কৌন্তেয়, ততঃ, যান্তি, অধমাম্, গতিম্॥ ২০॥

এইজন্য –

কৌন্তেয়	= হে অর্জুন!	অপ্রাপ্য	= প্রাপ্ত না হয়ে
জন্মনি,	= জন্ম–জন্মান্তর	ততঃ	= তার চেয়ে
জন্মনি	= ধরে	অধমাম্	= অতি নীচ
আসুরীম্	= আসুরী	গতিম্	= গতিকে
যোনিম্	= যোনি	এব	= ই
আপন্নাঃ	= প্রাপ্ত	যান্তি	= প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ
মূঢ়া	= ঐসব মূঢ় ব্যক্তিরা		ঘোর নরকে
মাম্	= আমাকে		পতিত হয়।

ত্রিবিধম্, নরকস্য, ইদম্, দ্বারম্, নাশনম্, আত্মনঃ,
কামঃ, ক্রোধঃ, তথা লোভঃ, তস্মাৎ, এতৎ, ত্রয়ম্, ত্যজেৎ॥ ২১॥

এবং হে অর্জুন –

কামঃ	= কাম,	আত্মনঃ	= আত্মার
ক্রোধঃ	= ক্রোধ,	নাশনম্	= নাশকারী অর্থাৎ
তথা	= আর		অধোগতি প্রাপ্তি
লোভঃ	= লোভ –		করায়।
ইদম্	= এই	তস্মাৎ	= সেইজন্য
ত্রিবিধম্	= তিন	এতৎ	= এই
নরকস্য	= নরকের	ত্রয়ম্	= তিনটিকে
দ্বারম্	= দ্বার	ত্যজেৎ	= ত্যাগ করবে।

এতৈঃ, বিমুক্তঃ, কৌন্তেয়, তমোদ্বারৈঃ, ত্রিভিঃ, নরঃ,
আচরতি, আত্মনঃ, শ্রেয়ঃ, ততঃ, যাতি, পরাম্, গতিম্॥ ২২॥

যেহেতু –

কৌন্তেয়	= হে অর্জুন!	শ্রেয়ঃ	= কল্যাণ
এতৈঃ	= এই	আচরতি	= আচরণ করে;
ত্রিভঃ	= তিন	ততঃ	= সেজন্য (সে)
তমোদ্বারৈঃ	= নরকের দ্বার থেকে	পরাম্	= পরম
বিমুক্তঃ	= মুক্ত	গতিম্	= গতি
নরঃ	= পুরুষ	যাতি	= প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হয়।
আত্মনঃ	= নিজের		

যঃ, শাস্ত্রবিধিম্, উৎসৃজ্য, বর্ততে, কামকারতঃ,
ন, সঃ, সিদ্ধিম্, অবাপ্নোতি, ন, সুখম্, ন, পরাম্, গতিম্॥ ২৩॥

এবং –

যঃ	= যে পুরুষ	অবাপ্নোতি	= প্রাপ্ত হয়,
শাস্ত্রবিধিম্	= শাস্ত্রবিধিকে	ন	= না
উৎসৃজ্য	= ত্যাগ করে	পরাম্	= পরম–
কামকারতঃ	= স্বেচ্ছাচারী হয়ে	গতিম্	= গতি
বর্ততে	= আচরণ করে,	ন	= না
সঃ	= সে	যাতি	= অর্থাৎ আমাকে (প্রাপ্ত হয়)।
ন	= না		
সিদ্ধিম্	= সিদ্ধিকে		

তস্মাৎ, শাস্ত্রম্, প্রমাণম্, তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ,
জ্ঞাত্বা, শাস্ত্রবিধানোক্তম্, কর্ম, কর্তুম্, ইহ, অর্হসি॥ ২৪॥

তস্মাৎ	= সেইজন্য	(এবম্)	= এইরকম
তে	= তোমাকে	জ্ঞাত্বা	= জেনে (তুমি)
হই	= এই	শাস্ত্রবিধা–নোক্তম্	= শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিয়ত
কার্যাকার্য–ব্যবস্থিতৌ	= কর্তব্য এবং অকর্ত–ব্যের ব্যবস্থাতে	কর্ম	= কর্ম
শাস্ত্রম্	= শাস্ত্র (ই)	কর্তুম্	= করার
প্রমাণম্	= প্রমাণ (মান্য করা উচিত)	অর্হসি	= যোগ্য রয়েছো।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোকের ফটোকপি

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জুন উবাচ –

যে, শাস্ত্রবিধিম্, উৎসৃজ্য, যজন্তে, শ্রদ্ধয়া, অন্বিতাঃ,
তেষাম্, নিষ্ঠা, তু, কা, কৃষ্ণ, সত্ত্বম্, আহো, রজঃ, তমঃ॥ ১॥

এইপ্রকার ভগবানের কথা শুনে অর্জুন বললেন –

কৃষ্ণ = হে কৃষ্ণ!
যে = যেসব মানুষ
শাস্ত্রবিধিম্ = শাস্ত্রবিধিকে
উৎসৃজ্য = ত্যাগ করে (কেবল)
শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ = শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে
যজন্তে = দেবাদির পূজা করে,
তেষাম্ = তাদের
নিষ্ঠা = স্থিতি
তু = তাহলে
কা = কেমন?
সত্ত্বম্ = সাত্ত্বিকী
আহো = অথবা
রজঃ = রাজসী (কিংবা)
তমঃ = তামসী?

ত্রিবিধা, ভবতি, শ্রদ্ধা, দেহিনাম্, সা, স্বভাবজা,
সাত্ত্বিকী, রাজসী, চ, এব, তামসী, চ, ইতি, তাম্, শৃণু॥ ২॥

এইপ্রকার অর্জুন জিজ্ঞাসা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! –

দেহিনাম্ = মানুষদের
সা = সেই (শাস্ত্রীয় সংস্কার শূন্য কেবল)
স্বভাবজা = স্বভাব থেকে উৎপন্ন
শ্রদ্ধা = শ্রদ্ধা
সাত্ত্বিকী = সাত্ত্বিকী
চ = এবং
রাজসী = রাজসী
চ = আর
তামসী = তামসী–
ইতি = এইরকম
ত্রিবিধা = তিন প্রকারের–
এব = ই
ভবতি = হয়
তাম্ = তা (তুমি)
(মত্তঃ) = আমার কাছ থেকে
শৃণু = শোন।

সত্ত্বানুরূপা, সর্বস্য, শ্রদ্ধা, ভবতি, ভারত,
শ্রদ্ধাময়ঃ, অয়ম্, পুরুষঃ, যঃ, যচ্ছ্রদ্ধঃ, সঃ, এব, সঃ॥ ৩॥

ভারত = হে অর্জুন!
সর্বস্য = সব মানুষদের
শ্রদ্ধা = শ্রদ্ধা (তাদের)
সত্ত্বানুরূপা = অন্তঃকরণের অনুরূপ
ভবতি = হয়। (এবং)
অয়ম্ = এই
পুরুষঃ = পুরুষ
শ্রদ্ধাময়ঃ = শ্রদ্ধাময়,
(অতঃ) = এইজন্য
যঃ = যে পুরুষ
যচ্ছ্রদ্ধঃ = যেরূপ শ্রদ্ধা বিশিষ্ট,
সঃ = সে স্বয়ং
এব = ও
সঃ = সেইরূপ।

যজন্তে, সাত্ত্বিকাঃ, দেবান্, যক্ষরক্ষাংসি, রাজসাঃ,
প্রেতান, ভূতগণান্, চ, অন্যে, যজন্তে, তামসাঃ, জনাঃ॥ ৪॥

তাদের মধ্যে –

সাত্ত্বিকাঃ = সাত্ত্বিক পুরুষেরা
দেবান্ = দেবতাদের
যজন্তে = পূজা করেন,
রাজসাঃ = রাজস পুরুষেরা
যক্ষরক্ষাংসি = যক্ষ এবং রাক্ষসদের (পূজা করে) (আর)
অন্যে = অন্য
তামসাঃ = তামস

জনাঃ = ব্যক্তিরা
প্রেতান্ = প্রেত
চ = এবং
ভূতগণান্ = ভূতগণের
যজন্তে = পূজা করে।

অশাস্ত্রবিহিতম্, ঘোরম্, তপ্যন্তে, যে, তপঃ, জনাঃ,
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ, কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

এবং হে অর্জুন! –

যে = যে
জনাঃ = মানুষেরা
অশাস্ত্রবিহিতম্ = শাস্ত্রবিধিরহিত (কেবল ইচ্ছামত)
ঘোরম্ = ঘোর
তপঃ = তপস্যা
তপ্যন্তে = করে থাকে (ও)
দম্ভাহঙ্কার–সংযুক্তাঃ = দম্ভ এবং অহঙ্কার যুক্ত (আর)
কামরাগবলা–ন্বিতাঃ = কামনা, আসক্তি ও বলের অভিমান যুক্ত–

কর্ষয়ন্তঃ, শরীরস্থম্, ভূতগ্রামম্, অচেতসঃ, মাম্,
চ, এব, অন্তঃশরীরস্থম্, তান্, বিদ্ধি, আসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

এবং যে –

শরীরস্থম্ = শরীররূপে স্থিত
ভূতগ্রামম্ = ভূতসমুদায়কে
চ = এবং
অন্তঃশরীরস্থম্ = অন্তঃকরণে স্থিত
মাম্ = অন্তর্যামী রূপ আমাকে
এব = ও
কর্ষয়ন্তঃ = কৃশ করে,
তান্ = সেইসব
অচেতসঃ = অজ্ঞানীদের (তুমি)
আসুর নিশ্চয়ান্ = আসুর স্বভাব বিশিষ্ট
বিদ্ধি = জানবে।

আহারও, তু, অপি, সর্বস্য, ত্রিবিধঃ, ভবতি, প্রিয়ঃ,
যজ্ঞঃ, তপঃ, তথা, দানম্, তেষাম্, ভেদম, ইমম্, শৃণু ॥ ৭ ॥

এবং হে অর্জুন! যেরূপ শ্রদ্ধা তিনপ্রকার, সেইরূপ –

আহারঃ = ভোজন–
অপি = ও
সর্বস্য = সকলের (নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে)
ত্রিবিধঃ = তিনপ্রকার
প্রিয়ঃ = প্রিয়
ভবতি = হয়।
তু = এবং
তথা = ঐরূপ
যজ্ঞঃ = যজ্ঞ,
তপঃ = তপস্যা,
দানম্ = দানও (তিন তিন প্রকারের হয়ে থাকে)।
তেষাম্ = তাদের
ইমম্ = এই
ভেদম্ = পার্থক্য (তুমি আমার কাছ থেকে)
শৃণু = শোন।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ,
রস্যাঃ, স্নিগ্ধাঃ, স্থিরাঃ, হৃদ্যাঃ, আহারাঃ, সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

আয়ুঃ– = আয়ু
সত্ত্ব– = বুদ্ধি
বলা– = বল,
রোগ্য– = আরোগ্য
সুখ– = সুখ (এবং)
প্রীতি– = প্রীতি
বিবর্দ্ধনাঃ = বর্ধনকারী (ও)
রস্যাঃ = রসযুক্ত,
স্নিগ্ধাঃ = স্নিগ্ধ,
স্থিরাঃ = স্থির (এবং)
হৃদ্যাঃ = চিত্ত তৃপ্তিকর – (এইরকম)
আহারাঃ = আহার অর্থাৎ ভোজ্য পদার্থ
সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ = সাত্ত্বিক পুরুষের প্রিয় হয়।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ,
আহারাঃ, রাজসস্য, ইষ্টাঃ, দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

এবং –

কট্বম্ল– = কটু, টক,
লবণা– = লবণাক্ত,
ত্যুষ্ণ– = অতি গরম, (ও)
তীক্ষ্ণ = তীক্ষ্ণ,
রূক্ষ– = রুক্ষ,
বিদাহিনঃ = দাহকারী, (আর)
দুঃখশোকা– ময়প্রদাঃ = দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপাদনকারী
আহারাঃ = আহার অর্থাৎ খাদ্যবস্তু
রাজসস্য = রাজস পুরুষের
ইষ্টাঃ = প্রিয় হয়।

যাতযামম্, গতরসম্, পূতি, পর্য্যুষিতম্, চ, যৎ,
উচ্ছিষ্টম্, অপি, চ, অমেধ্যম্, ভোজনম্, তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

তথা –

যৎ = যে
ভোজনম্ = ভোজন
যাতযামম্ = অর্দ্ধপক্ক,
গতরসম্ = রসরহিত
চ = এবং
পূতি = দুর্গন্ধযুক্ত,
পর্য্যুষিতম্ = বাসী,
উচ্ছিষ্টম্ = উচ্ছিষ্ট
চ = আর
অমেধ্যম্, অপি = অপবিত্রও,
(তৎ) = সেই (ভোজন)
তামস প্রিয়ম্ = তামস পুরুষের প্রিয় হয়।

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ, যজ্ঞঃ, বিধিদৃষ্টঃ, যঃ, ইজ্যতে,
যষ্টব্যম্, এব, ইতি, মনঃ, সমাধায়, সঃ, সাত্ত্বিক। ॥ ১১ ॥

এবং হে অর্জুন –

যঃ	=	যা	সমাধায়	=	সমাধান করে
বিধিদৃষ্টঃ	=	শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিয়ত,	অফলা–কাঙ্ক্ষিভিঃ	=	ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষারহিত পুরুষদের দ্বারা
যজ্ঞঃ	=	যজ্ঞ	ইজ্যতে	=	করা হয়ে থাকে,
যষ্টব্যম্ এব	=	করাই কর্তব্য–	সঃ	=	সেই (যজ্ঞই)
ইতি	=	এইরূপ	সাত্ত্বিকঃ	=	সাত্ত্বিক।
মনঃ	=	মনে			

অভিসন্ধায়, তু, ফলম্, দম্ভার্থম্, অপি, চ, এব, যৎ,
ইজ্যতে, ভরতশ্রেষ্ঠ, তম্, যজ্ঞম্, বিদ্ধি, রাজসম্॥ ১২॥

তু	=	আর	অভিসন্ধায়	=	উদ্দেশ্য করে
ভরতশ্রেষ্ঠ	=	হে অর্জুন!	যৎ	=	যে (যজ্ঞ)
দম্ভার্থম্, এব	=	কেবল দম্ভ প্রদর্শনের জন্য	ইজ্যতে	=	করা হয়,
			তম্	=	সেই
চ	=	অথবা	যজ্ঞম্	=	যজ্ঞকে (তুমি)
ফলম্	=	ফলকে	রাজসম্	=	রাজস
অপি	=	ই	বিদ্ধি	=	জানবে।

বিধিহীনম্, অসৃষ্টান্নম্, মন্ত্রহীনম্, অদক্ষিণম্,
শ্রদ্ধাবিরহিতম্, যজ্ঞম্, তামসম্, পরিচক্ষতে॥ ১৩॥

আর –

বিধিহীনম্	=	শাস্ত্রবিধিহীন,	শ্রদ্ধা বিরহিতম্	=	শ্রদ্ধা রহিত
অসৃষ্টান্নম্	=	অন্নদান রহিত,	যজ্ঞম্	=	যজ্ঞকে
মন্ত্রহীনম্	=	মন্ত্রহীন,	তামসম্	=	তামস (যজ্ঞ)
অদক্ষিণম্	=	দক্ষিণাশূন্য (এবং)	পরিচক্ষতে	=	বলা হয়।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনম্, শৌচম্, আর্জবম্,
ব্রহ্মচর্যম্, অহিংসা, চ, শারীরম্, তপঃ, উচ্যতে॥ ১৪॥

এবং হে অর্জুন! –

দেব–	=	দেবতা,	ব্রহ্মচর্যম	=	ব্রহ্মচর্য
দ্বিজ–	=	ব্রাহ্মণ,	চ	=	আর
গুরু–	=	গুরু (ও)	অহিংসা	=	অহিংসা (এইগুলিই)
প্রাজ্ঞ–	=	জ্ঞানীজনের	শারীরম্	=	শরীরসম্বন্ধীয়
পূজনম্	=	পূজা, (এবং)	তপঃ	=	তপস্যা (বলে)
শৌচম্	=	পবিত্রতা,	উচ্যতে	=	কথিত হয়।
আর্জবম্	=	সরলতা,			

অনুদ্বেগকরম্, বাক্যম্, সত্যম্, প্রিয়হিতম্, চ, যৎ,
স্বাধ্যায়াভ্যসনম্, চ, এব, বাঙ্ময়ম্, তপঃ, উচ্যতে॥ ১৫॥

চ = তথা
যৎ = যা
অনুদ্বেগকরম্ = অনুদ্বেগকর,
প্রিয়হিতম্ = প্রিয় ও হিতকারক (এবং)
সত্যম্ = যথার্থ
বাক্যম্ = বাক্য
চ = আর (যা)
স্বাধ্যায়াভ্যসনম্ = বেদশাস্ত্রপাঠ ও নাম জপের অভ্যাস
(তৎ) = তা
এব = ই (নিঃসন্দেহরূপে)
বাঙ্ময়ম্ = বাক্যসম্বন্ধী
তপঃ = তপস্যা
উচ্যতে = কথিত হয়।

মনঃপ্রসাদঃ, সৌম্যত্বম্, মৌনম্, আত্মবিনিগ্রহঃ,
ভাবসংশুদ্ধিঃ, ইতি, এতৎ, তপঃ, মানসম্, উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

এবং –

মনঃপ্রসাদঃ = মনের প্রসন্নতা,
সৌম্যত্বম্ = শান্তভাব,
মৌনম্ = ভগবৎচিন্তা করবার স্বভাব,
আত্মবিনিগ্রহঃ = মনের নিগ্রহ (এবং)
ভাবসংশুদ্ধিঃ = অন্তঃকরণের পবিত্রতা–
ইতি = এইরূপ
এতৎ = এই
মানসম্ = মনসম্বন্ধী
তপঃ = তপস্যা
উচ্যতে = কথিত হয়।

শ্রদ্ধয়া, পরয়া, তপ্তম্, তপঃ, তৎ, ত্রিবিধম্, নরৈঃ,
অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ, যুক্তৈঃ, সাত্ত্বিকম্, পরিচক্ষতে ॥ ১৭

কিন্তু হে অর্জুন –

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ = ফলাকাঙ্ক্ষারহিত
যক্তৈঃ = যোগী
নরৈঃ = পুরুষদের দ্বারা
পরয়া = পরম
শ্রদ্ধয়া = শ্রদ্ধার সঙ্গে
তপ্তম্ = আচরিত
তৎ = সেই (পূর্বোক্ত)
ত্রিবিধম্ = তিনপ্রকার
তপঃ = তপস্যাকে
সাত্ত্বিকম্ = সাত্ত্বিক (তপ)
পরিচক্ষতে = বলা হয়।

সৎকারমানপূজার্থম্, তপঃ, দম্ভেন, চ, এব, যৎ,
ক্রিয়তে, তৎ, ইহ, প্রোক্তম্, রাজসম্, চলম, অধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

চ = এবং
যৎ = যে
তপঃ = তপস্যা
সৎকার–মানপূজার্থম্ = সৎকার, মান ও পূজার জন্য
(বা) = অথবা
দম্ভেন = কেবল দম্ভের সঙ্গে
এব = ই
ক্রিয়তে = করা হয়,
তৎ = সেই
অধ্রুবম্ = অনিশ্চিত (ও)
চলম্ = ক্ষণিক ফলবিশিষ্ট (তপ)
ইহ = এখানে
রাজসম্ = রাজস (বলে)
প্রোক্তম্ = কথিত হয়েছে।

মূঢ়গ্রাহেণ, আত্মনঃ, যৎ, পীড়য়া, ক্রিয়তে, তপঃ,
পরস্য, উৎসাদনার্থম্, বা, তৎ, তামসম্, উদাহৃতম্॥ ১৯॥

এবং –

যৎ = যে
তপঃ = তপ
মূঢ়গ্রাহেণ = মূঢ়তাপূর্বক আগ্রহ সহকারে,
আত্মনঃ = মন, বাক্য এবং শরীরকে
পীড়য়া = কষ্ট দিয়ে
বা = অথবা
পরস্য = পরের
উৎসাদ–নার্থম্ = অনিষ্ট করার জন্য
ক্রিয়তে = করা হয়,
তৎ = সেই (তপ)
তামসম্ = তামস (বলে)
উদাহৃতম্ = কথিত হয়েছে।

দাতব্যম্, ইতি, যৎ, দানম্, দীয়তে, অনুপকারিণে,
দেশে, কালে, চ, পাত্রে, চ, তৎ, দানম্, সাত্ত্বিকম, স্মৃতম্॥ ২০॥

চ = এবং (হে অর্জুন)!
দাতব্যম্ = দান করাই কর্তব্য–
ইতি = এইভাবে
যৎ = যে
দানম্ = দান
দেশে = দেশ
কালে = কাল
চ - ও
পাত্রে = পাত্র প্রাপ্ত হলে
অনুপকারিণে = অনুপকারী ব্যক্তিকে
দীয়তে = দেওয়া হয়,
তৎ = সেই
দানম্ = দান
সাত্ত্বিকম্ = সাত্ত্বিক (বলে)
স্মৃতম্ = কথিত হয়েছে।

যৎ, তু, প্রত্যুপকারার্থম, ফলম্, উদ্দিশ্য, বা পুনঃ,
দীয়তে, চ, পরিক্লিষ্টম্, তৎ, দানম্, রাজসম্, স্মৃতম্॥ ২১॥

তু = কিন্তু
যৎ = যে দান
পরিক্লিষ্টম্ = ক্লেশপূর্বক
চ = আর
প্রত্যুপকা–রার্থম্ = প্রত্যুপকারের জন্য
বা = অথবা
ফলম্ = ফল
উদ্দিশ্য = উদ্দেশ্য করে
পুনঃ = (তারপরে)
দীয়তে = দেওয়া হয়
তৎ = সেই
দানম্ = দান
রাজসম্ = রাজস (বলে)
স্মৃতম্ = কথিত হয়েছে।

আদেশকালে, যৎ, দানম্, অপাত্রেভ্যঃ, চ, দীয়তে,
অসৎকৃতম্, অবজ্ঞাতম্, তৎ, তমসম্, উদাহৃতম্॥ ২২॥

চ	= এবং
যৎ	= যে
দানম্	= দান
অসৎকৃতম্	= সৎকার রহিত
(বা)	= অথবা
অবজ্ঞাতম্	= তিরস্কারপূর্বক,
অদেশকালে	= অযোগ্য দেশ, কাল
অপাত্রেভ্যঃ	= অপাত্রদের
দীয়তে	= দেওয়া হয়
তৎ	= সেই (দান)
তামসম্	= তামস (বলে)
উদাহৃতম্	= কথিত হয়েছে।

ওঁ তৎসৎ, ইতি, নির্দেশঃ, ব্রহ্মণঃ, ত্রিবিধঃ, স্মৃতঃ,
ব্রাহ্মণাঃ, তেন, বেদাঃ, চ, যজ্ঞাঃ, চ, বিহিতাঃ, পুরা ॥ ২৩ ॥

এবং হে অর্জুন! –

ওঁ	= ওঁ,
তৎ	= তৎ,
সৎ	= সৎ–
ইতি	= এইরূপ
ত্রিবিধঃ	= তিন প্রকারের
ব্রহ্মণঃ	= সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের
নির্দেশঃ	= নাম
স্মৃতঃ	= কথিত হয়েছে।
তেন	= তাঁর দ্বারা
পুরা	= সৃষ্টির আদি কালে
ব্রাহ্মণাঃ	= ব্রাহ্মণ
চ	= আর
বেদাঃ	= বেদ
চ	= ও
যজ্ঞাঃ	= যজ্ঞাদি
বিহিতাঃ	= রচিত হয়েছে।

তস্মাৎ, ওঁ, ইতি, উদাহৃত্য, যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ,
প্রবর্তন্তে, বিধানোক্তাঃ, সততম্, ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ	= সেইজন্য
ব্রহ্ম–বাদিনাম্	= বেদ কথনকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষদের
বিধানোক্তাঃ	= শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিয়ত
যজ্ঞদান–তপঃক্রিয়াঃ	= যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা রূপ ক্রিয়াগুলি
সততম্	= সর্বদা
ওঁ	= 'ওঁ'
ইতি	= এইরূপ (পরমাত্মার নাম)
উদাহৃত্য	= উচ্চারণ করে (ই)
প্রবর্তন্তে	= আরম্ভ হয়।

তৎ, ইতি, অনভিসন্ধায়, ফলম্, যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ,
দানক্রিয়াঃ, চ, বিবিধাঃ, ক্রিয়ন্তে, মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

এবং –

তৎ	= তৎ অর্থাৎ তৎ নামে অভিহিত পরমাত্মারই এইসব,
ইতি	= –এইভাবে
ফলম্	= ফল
অনভি সন্ধায়	= প্রার্থনা না করে
বিবিধাঃ	= নানা প্রকার
যজ্ঞতপঃ–ক্রিয়া	= যজ্ঞতপস্যারূপ ক্রিয়া
চ	= এবং
দানক্রিয়াঃ	= দানরূপ ক্রিয়া
মোক্ষ–কাঙ্ক্ষিভিঃ	= কল্যাণেচ্ছু পুরুষদের দ্বারা
ক্রিয়ন্তে	= করা হয়ে থাকে।

সদ্ভাবে, সাধুভাবে, চ, সৎ, ইতি, এতৎ, প্রযুজ্যতে,
প্রশস্তে, কর্মণি, তথা, সৎ, শব্দঃ, পার্থ, যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

এবং –

সৎ	= ‘সৎ’	তথা	= আর
ইতি	= এ প্রকার	পার্থ	= হে পার্থ!
এতৎ	= এই (পরমাত্মার নাম)	প্রশস্তে	= উত্তম
সদ্ভাবে	= সদ্ ভাব	কর্মণি	= কর্মে (ও)
চ	= ও	সৎ	= সৎ
সাধুভাবে	= শ্রেষ্ঠ ভাবে	শব্দঃ	= শব্দ
প্রযুজ্যতে	= প্রযুক্ত হয়	যুজ্যতে	= প্রযুক্ত হয়।

যজ্ঞে, তপসি, দানে, চ, স্থিতিঃ, সৎ, ইতি, চ, উচ্যতে,
কর্ম, চ, এব, তদর্থীয়ম্, সৎ, ইতি, এব, অভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

চ	= এবং	ইতি	= এইরকম
যজ্ঞে	= যজ্ঞ,	উচ্যতে	= বলা হয়;
তপসি	= তপস্যা	চ	= এবং
চ	= আর	তদর্থীয়ম্	= ঐ পরমাত্মার জন্য কৃত
দানে	= দানে	কর্ম	= কর্ম
(যা)	= যে	এব	= নিশ্চয়ই
স্থিতিঃ	= স্থিতি	সৎ	= সৎ –
(সা)	= তা –	ইতি	= এইরকম
এব	= ও	অভিধীয়তে	= কথিত হয়।
সৎ	= ‘সৎ’		

অশ্রদ্ধয়া, হুতম্, দত্তম্, তপঃ, তপ্তম্, কৃতম্, চ, যৎ,
অসৎ, ইতি, উচ্যতে, পার্থ, ন, চ, তৎ, প্রেত্য, নো, ইহ ॥ ২৮ ॥

এবং –

পার্থ	= হে অর্জুন!	ইতি	= এইরূপ
অশ্রদ্ধয়া	= অশ্রদ্ধাপূর্বক	উচ্যতে	= কথিত হয়; (অতএব)
হুতম্	= কৃত হোম,	তৎ	= তা
দত্তম্	= প্রদত্ত দান,	নো	= না
তপ্তম্	= অনুষ্ঠিত	ইহ	= ইহলোকে
তপঃ	= তপস্যা	চ	= এবং
চ	= আর	ন	= না
যৎ	= যা (কিছু)	প্রেত্য	= মৃত্যুর পরে ও (ফলদায়ক হয়)।
কৃতম্	= কৃতকর্ম –		
(তৎ)	= সে (সমস্তই)		
অসৎ	= ‘অসৎ’ –		

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোকেরফটোকপি

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জুন উবাচ–

সন্ন্যাসস্য, মহাবাহো, তত্ত্বম, ইচ্ছামি, বেদিতুম্,
ত্যাগস্য, চ, হৃষীকেশ, পৃথক, কেশিনিষূদন॥ ১॥

তারপর অর্জুন বললেন –

মহাবাহো	= হে মহাবাহো!	ত্যাগস্য	= ত্যাগের
হৃষীকেশ	= হে অন্তর্যামী!	তত্ত্বম্	= তত্ত্ব
কেশিনিষুদন	= হে বাসুদেব! (আমি)	পৃথক	= পৃথক পৃথক ভাবে
সন্ন্যাসস্য	= সন্ন্যাসের	বেদিতুম	= জানতে
চ =	এবং	ইচ্ছামি	= ইচ্ছা করি।

কাম্যানাম্, কর্মণাম্, ন্যাসম্, সন্ন্যাসম, কবয়ঃ, বিদুঃ,
সর্বকর্মফলত্যাগম, প্রাহুঃ, ত্যাগম্, বিচক্ষণাঃ॥ ২॥

এইপ্রকার অর্জুন জিজ্ঞাসা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! কোন কোন –

কবয়ঃ	=	পণ্ডিত ব্যক্তি	(চ)	=	এবং (কোন কোন)
কাম্যানাম্	=	কাম্য	বিচক্ষণাঃ	=	বিচার কুশল পুরুষ
কর্মণাম	=	কর্মসমূহের	সর্বকর্ম–	=	সমস্ত কর্মফল
ন্যাসম্	=	ত্যাগকে	ফলত্যাগম		ত্যাগকে
সন্ন্যাসম্	=	সন্ন্যাস বলে	ত্যাগম্	=	ত্যাগ
বিদুঃ	=	জানেন	প্রাহুঃ	=	বলে থাকেন।

ত্যাজ্যম্, দোষবৎ, ইতি, একে, কর্ম, প্রাহুঃ, মণীষিণঃ,
যজ্ঞদানতপঃকর্ম, ন, ত্যাজ্যম্, ইতি, চ, অপরে॥ ৩॥

তথা –

একে	= অপর কেউ	চ	= এবং
মনীষিণঃ	= বিদ্বান	অপরে	= অন্যান্য বিদ্বানগণ
ইতি	= এইরূপ	ইতি	= এইরূপ
প্রাহুঃ	= বলেন (যে) (সকল)	(আহুঃ)	= বলেন (যে)
কর্ম	= কর্ম মান (ই)	যজ্ঞদান–	= যজ্ঞ, দান এবং
দোষবৎ	= দোষযুক্ত, (এইজন্য)	তপঃকর্ম	তপরূপ কর্ম
ত্যাজ্যম্	= ত্যাগ করার যোগ্য	ন, ত্যাজ্যম্	= ত্যাগ করার উপযুক্ত নয়।

নিশ্চয়ম্, শৃণু, মে, তত্র, ত্যাগে, ভারতসত্তম্,
ত্যাগঃ, হি, পুরুষব্যাঘ্র, ত্রিবিধঃ, সংপ্রকীর্তিতঃ॥ ৪॥

কিন্তু –

ভারতসত্তম্	=	হে অর্জুন!	হি	=	কেন না
তত্র	=	সেই	পুরুষব্যাঘ্র	=	হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! (সেই)
ত্যাগে	=	ত্যাগের বিষয়ে (তুমি)	ত্যাগঃ	=	ত্যাগ (সাত্ত্বিক, রাজস ও তাসম এইরূপ)
মে	=	আমার	ত্রিবিধঃ	=	তিনপ্রকার
নিশ্চয়ম্	=	মত	সংপ্রকীর্তিত	=	কথিত হয়েছে।
শৃণু	=	শোনো।			

যজ্ঞদানতপঃকর্ম, ন, ত্যাজ্যম্, কার্যম্, এব, তৎ,
যজ্ঞঃ, দানম্, তপঃ, চ, এব, পাবনানি, মনীষিণাম্॥ ৫ ॥

তথা –

যজ্ঞদান–তপঃকর্ম	=	যজ্ঞ, দান ও তপরূপ কর্ম	যজ্ঞঃ	=	যজ্ঞ,
			দানম্	=	দান
ন, ত্যাজ্যম্	=	ত্যাগ করার যোগ্য নয় (কিন্তু)	চ	=	এবং
			তপঃ	=	তপ–(এই তিনটি)–
তৎ	=	তা	এব	=	ই
এব	=	অবশ্য	মনীষিণাম্	=	বুদ্ধিমান পুরুষদের
কার্যম্	=	করা কর্তব্য (কেননা)	পাবনানি	=	পবিত্রকারী হয়।

এতানি, অপি, তু, কর্মাণি, সঙ্গম, ত্যক্ত্বা, ফলানি, চ,
কর্তব্যানি, ইতি, মে, পার্থ, নিশ্চিতম্, মতম্, উত্তমম॥ ৬ ॥

এইজন্য –

পার্থ	=	হে পার্থ!	ফলানি	=	ফলাকাঙ্ক্ষা
এতানি	=	এই যজ্ঞ, দান ও তপ–রূপ কর্ম	ত্যক্ত্বা	=	ত্যাগ করে (অবশ্য)
			কর্তব্যানি	=	কর্তব্য;
তু	=	এবং	ইতি	=	এইরূপ (হল)
(অন্যানি)	=	অন্যান্য	মে	=	আমার
অপি	=	ও	নিশ্চিতম্	=	নিশ্চিত
কর্মাণি	=	সকল শ্রেষ্ঠ কর্ম	উত্তমম্	=	উত্তম
সঙ্গম্	=	আসক্তি	মতম্	=	মত।
চ	=	আর			

নিয়তস্য, তু, সন্ন্যাসঃ, কর্মণঃ, ন, উপপদ্যতে,
মোহাৎ, তস্য, পরিত্যাগঃ, তামসঃ, পরিকীর্তিতঃ॥ ৭ ॥

তু	=	এবং (হে অর্জুন)	মোহাৎ	=	মোহবশতঃ
নিয়তস্য	=	নিয়ত	তস্য	=	তার
কর্মণঃ	=	কর্মের	পরিত্যাগঃ	=	ত্যাগ করা
সন্ন্যাসঃ	=	ত্যাগ করা	তামসঃ	=	তামস ত্যাগ
ন, উপপদ্যতে	=	উচিত নয় (এই জন্য)	পরিকীর্তিতঃ	=	কথিত হয়েছে।

দুঃখম্, ইতি, এব, যৎ, কর্ম, কায়ক্লেশভয়াৎ, ত্যজেৎ,
সঃ, কৃত্বা, রাজসম্, ত্যাগম্, ন, এব, ত্যাগফলম, লভেৎ॥ ৮॥

এবং যদি কোনও মানুষ –

যৎ	= যা (কিছু)	ত্যজেৎ	= ত্যাগ করে (তবে)
কর্ম	= কর্ম (আছে)	সঃ	= সেই পুরুষ (ঐরূপ)
(তৎ)	= সেই (সব)	রাজসম্	= রাজস
এব	= ই	ত্যাগম্	= ত্যাগ
দুঃখম্	= দুঃখরূপ	কৃত্বা	= করে –
ইতি	= এইরূপ (বিবেচনা করে)	এব	= ও
		ত্যাগফলম্	= ত্যাগের ফল
কায়ক্লেশ–ভয়াৎ	= শারীরিক ক্লেশের ভয়ে (কর্মগুলি)	ন, লভেৎ	= প্রাপ্ত হয় না।

কার্যম্, ইতি, এব, যৎ, কর্ম, নিয়তম্, ক্রিয়তে, অর্জুন,
সঙ্গম্, ত্যক্ত্বা, ফলম্, চ, এব, সঃ, ত্যাগঃ, সাত্ত্বিকঃ, মতঃ॥ ৯॥

এবং –

অর্জুন	= হে অর্জুন!	ফলম্	= ফল
যৎ	= যা	ত্যক্ত্বা	= ত্যাগ করে
নিয়তম্	= শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিয়ত	ক্রিয়তে	= করা হয়,
কর্ম	= (কর্তব্য) কর্ম	সঃ	= সেটিকে
কার্যম্	= করা কর্তব্য–	এব	= ই
ইতি	= এইরূপ (বুঝে)–	সাত্ত্বিকঃ	= সাত্ত্বিক
এব	= ই	ত্যাগঃ	= ত্যাগ (বলে)
সঙ্গম্	= আসক্তি	মতঃ	= মানা হয়েছে।
চ	= ও		

ন, দ্বেষ্টি, অকুশলম্, কর্ম, কুশলে, ন, অনুষজ্জতে,
ত্যাগী, সত্ত্বসমাবিষ্টঃ, মেধাবী, ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০॥

এবং হে অর্জুন! যে পুরুষ –

অকুশলম্	= অকল্যাণকারক	সত্ত্বসমাবিষ্টঃ	= শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট পুরুষই
কর্ম	= কর্মকে		
ন, দ্বেষ্টি	= দ্বেষ করে না,	ছিন্নসংশয়ঃ	= সংশয় রহিত
কুশলে	= কল্যাণকারী কর্মে	মেধাবী	= জ্ঞানবান্ (ও)
ন, অনুষজ্জতে	= আসক্ত হয় না (এরূপ)	ত্যাগী	= ত্যাগী।

ন, হি, দেহভৃত্যা, শক্যম্, ত্যক্তুম্, কর্মাণি, অশেষতঃ,
যঃ, তু, কর্মফলত্যাগী, সঃ, ত্যাগী, ইতি, অভিধীয়তে॥ ১১॥

হি	=	কেননা	যঃ	=	যে পুরুষ
দেহভৃতা	=	দেহধারী পুরুষের দ্বারা	কর্মফলত্যাগী	=	কর্মফলের ত্যাগী,
			সঃ	=	সে–
অশেষতঃ	=	সম্পূর্ণরূপে	তু	=	ই (পুরুষ)
কর্মাণি	=	সকল কর্ম	ত্যাগী	=	(প্রকৃত) ত্যাগী
ত্যক্তুম্	=	ত্যাগ করা	ইতি	=	এইরূপ
ন শক্যম্	=	সক্ষম নয়;	অভিধীয়তে	=	বলা হয়।
(তস্মাৎ)	=	সেইজন্য			

অনিষ্টম্, ইষ্টম্, মিশ্রম্, চ, ত্রিবধম্, কর্মণঃ, ফলম্,
ভবতি, অত্যাগিনাম্, প্রেত্য, ন, তু, সন্ন্যাসিনাম্, ক্বচিৎ॥ ১২॥

এবং –

অত্যাগিনাম্	=	সকামী পুরুষদের	ফলম্	=	ফল
কর্মণঃ	=	কর্মের	প্রেত্য	=	মৃত্যুর পরে (ও)
ইষ্টম্	=	ভালো,	ভবতি	=	হয়,
অনিষ্টম্	=	মন্দ	তু	=	কিন্তু
চ	=	আর	সন্ন্যাসিনাম্	=	ত্যাগী পুরুষদের (কর্মের ফল)
মিশ্রম্	=	মিশ্র–			
(ইতি)	=	এরূপ	ক্বচিৎ	=	কোনও কালেই
ত্রিবিধম্	=	তিনপ্রকার	ন	=	হয় না।

সুখম্, তু, ইদানীম্, ত্রিবিধম্, শৃণু, মে, ভরতর্যভ,
অভ্যাসাৎ, রমতে, যত্র, দুঃখান্তম্, চ, নিগচ্ছতি॥ ৩৬॥

হে অর্জুন –

ইদানীম্	=	এখন	যত্র	=	যে সুখে (সাধক)
সুখম্	=	সুখ	অভ্যাসাৎ	=	ভজন, ধ্যান এবং সেবাদির অভ্যাসে
তু	=	ও			
ত্রিবিধম্	=	তিনপ্রকার,	রমতে	=	রমণ করে
মে	=	আমার কাছ থেকে (তা তুমি)	চ	=	এবং
			দুঃখান্তম্	=	দুঃখের অন্তকে
শৃণু	=	শোনো।	নিগচ্ছতি	=	প্রাপ্ত হয়–
ভরতর্যভ	=	হে ভরতশ্রেষ্ঠ!			

যৎ, তৎ, অগ্রে, বিষম্, ইব, পরিণামে, অমৃতোপমম্ঃ,
তৎ, সুখম, সাত্ত্বিকম, প্রোক্তম্, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭॥

তৎ = সেই (সুখ)
অগ্রে = সাধনার প্রারম্ভে (যদিও)
বিষম্ = বিষের
ইব = মতো প্রতীত হয় কিন্তু
পরিণামে = পরিণামে
অমৃতোপমম্ = অমৃত তুল্য,

(অতঃ) = এইজন্য
যৎ = যা
আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজম্ = ভগবদ্বিষয়ক বুদ্ধির প্রসাদ হতে উৎপন্ন
সুখম = সুখ
তৎ = তা
সাত্ত্বিকম্ = সাত্ত্বিক (বলে)
প্রোক্তম্ = কথিত হয়েছে।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ, যৎ, তৎ, অগ্রে, অমৃতোপমম্,
পরিণামে, বিষম্, ইব, তৎ, সুখম, রাজসম্, স্মৃতম্॥ ৩৮॥

এবং –

যৎ = যে
সুখম্ = সুখ
বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাৎ = বিষয় এবং ইন্দ্রিয়-গুলির সংযোগে
(ভবতি) = হয়,
তৎ = তা (যদিও)
অগ্রে = ভোগকালে
অমৃতোপমম্ = অমৃতের মতো (বোধ হয় কিন্তু)

পরিণামে = পরিণামে
বিষম্ = বিষের
ইব = মত (হয়ে থাকে);
(অতঃ) = এইজন্য
তৎ = সেই (সুখ)
রাজসম্ = রাজস (বলে)
স্মৃতম্ = কথিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্, শূদ্রাণাম্, চ, পরন্তপ,
কর্মাণি, প্রবিভক্তানি, স্বভাবপ্রভবৈঃ, গুণৈঃ॥ ৪১॥

এইজন্য –

পরন্তপ = হে পরন্তপ!
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বিশাম্ = ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের
চ = এবং
শূদ্রাণাম্ = শূদ্রদের (ও)
কর্মাণি = কর্মগুলি

স্বভাব-প্রভবৈঃ = স্বভাব থেকে উৎপন্ন
গুণৈঃ = গুণের দ্বারা
প্রবিভক্তানি = বিভক্ত করা হয়েছে।

শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচম্, ক্ষান্তিঃ, আর্জবম্, এব, চ,
জ্ঞানম্, বিজ্ঞানম্, আস্তিক্যম্, ব্রহ্মকর্ম, স্বভাবজম্॥ ৪২॥

তার মধ্যে –

শমঃ = অন্তঃকরণের নিগ্রহ,
দমঃ = ইন্দ্রিয়গুলির দমন,
শৌচম্ = অন্তর বাহিরের শুদ্ধি,
তপঃ = ধর্মের জন্য কষ্ট সহ্য করা (এবং)

ক্ষান্তিঃ = ক্ষমাভাব,
আর্জবম্ = মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সরলতা,
আস্তিক্যম্ = আস্তিক বুদ্ধি,
জ্ঞানম্ = শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান

চ = এবং
বিজ্ঞানম্– এব = পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব করা –
(এইসকল হল)
ব্রহ্মকর্ম– স্বভাবজম্ = ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম।

শৌর্যম্, তেজঃ, ধৃতিঃ, দাক্ষ্যম্, যুদ্ধে, চ, অপি, অপলায়নম্,
দানম্, ঈশ্বরভাবঃ, চ, ক্ষাত্রম্, কর্ম, স্বভাবজম্॥ ৪৩॥

এবং –

শৌর্যম্ = শৌর্য,
তেজঃ = তেজ,
ধৃতিঃ = ধৈর্য,
দাক্ষ্যম্ = দক্ষতা
চ = এবং
যুদ্ধে = যুদ্ধে –
অপি = ও
অপলায়নম্ = পরান্মুখ না হওয়ার স্বভাব (আর)
দানম্ = দান
চ = ও
ঈশ্বরভাবঃ = স্বামীভাব (এইসব হল)
ক্ষাত্রম্ = ক্ষত্রিয়ের
স্বভাবজম্ = স্বাভাবিক
কর্ম = কর্ম।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্, বৈশ্যকর্ম, স্বভাবজম্,
পরিচর্যাত্মকম্, কর্ম, শূদ্রস্য, অপি, স্বভাবজম্॥ ৪৪॥

আর –

কৃষিগৌরক্ষ্য– বাণিজ্যম্ = কৃষিকাজ, গোপালন ও ক্রয় বিক্রয়রূপ সত্যব্যবহার (এইসব হল)
বৈশ্যকর্ম– স্বভাবজম্ = বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম (এবং)
পরিচর্যাত্মকম্ = সর্ব বর্ণের সেবা করা
শূদ্রস্য = শূদ্রের –
অপি = ও
স্বভাবজম্ = স্বাভাবিক
কর্ম = কর্ম।

স্বে, স্বে, কর্মণি, অভিরতঃ, সংসিদ্ধিম্, লভতে, নরঃ,
স্বকর্মনিরতঃ, সিদ্ধিম্, যথা, বিন্দতি, তৎ, শৃণু॥ ৪৫॥

এবং এই –

স্বে = নিজ
স্বে = নিজ (স্বাভাবিক)
কর্মণি = কর্মে
অভিরতঃ = প্রবৃত্ত
নরঃ = মানুষ
সংসিদ্ধিম্ = ভগবৎ প্রাপ্তি রূপ পরমসিদ্ধি
লভতে = লাভ করে।
যথা = যে প্রকারে
স্বকর্মনিরতঃ = নিজের স্বাভাবিক কর্মে প্রবৃত্ত মানুষ
সিদ্ধিম্ = পরম সিদ্ধিকে
বিন্দতি = প্রাপ্ত হয়,
তৎ = সেই বিধি (তুমি আমার কাছে)
শৃণু = শোনো।

যতঃ, প্রবৃত্তিঃ, ভূতানাম্, যেন, সর্বম্, ইদম্, ততম্,
স্বকর্মণা, তম্, তভ্যর্চ্য, সিদ্ধিম্, বিন্দতি, মানবঃ॥ ৪৬॥

হে অর্জুন –

যতঃ	=	যে পরমাত্মা থেকে	তম্	=	সেই পরমেশ্বরকে
ভূতানাম্	=	সমস্ত ভূতের (প্রাণীর)	স্বকর্মণা	=	নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা
প্রবৃত্তিঃ	=	উৎপত্তি হয়েছে (এবং)			
যেন	=	যা দ্বারা	অভ্যর্চ্য	=	পূজা করে
ইদম্,	=	এই	মানবঃ	=	মানুষ
সর্বম্	=	সর্ব (জগৎ)	সিদ্ধিম্	=	পরম সিদ্ধি
ততম্	=	ব্যাপ্ত আছে,	বিন্দতি	=	লাভ করে।

শ্রেয়ান্, স্বধর্মঃ, বিগুণঃ পরধর্মাৎ, স্বনুষ্ঠিতাৎ,
স্বভাবনিয়তম্, কর্ম, কুর্বন, ন, আপ্নোতি, কিল্বিষম্॥ ৪৭॥

এইজন্য –

স্বনুষ্ঠিতাৎ	=	উত্তমরূপে আচরিত	স্বভাব– নিয়তম্	=	স্বভাব দ্বারা নিয়ত
পরধর্মাৎ	=	অন্যের ধর্ম থেকে			
বিগুণঃ	=	গুণরহিত –	কর্ম	=	স্বধর্মরূপ কর্ম
(অপি)	=	ও	কুর্বন	=	করে (মানুষ)
স্বধর্মঃ	=	নিজের ধর্ম	কিল্বিষম্	=	পাপের
শ্রেয়ান	=	শ্রেষ্ঠ,	ন, আপ্নোতি	=	ভাগী হয় না।
(যস্মাৎ)	=	কেননা			

সহজম্, কর্ম, কৌন্তেয়, সদোষম্, অপি, ন, ত্যজেৎ,
সর্বারম্ভাঃ, হি, দোষেণ, ধূমেন, অগ্নিঃ, ইব, আবৃতাঃ॥ ৪৮॥

অতএব –

কৌন্তেয়	=	হে কুন্তীপুত্র!	ধূমেন	=	ধোঁয়ার দ্বারা
সদোষম্	=	দোষযুক্ত	অগ্নিঃ	=	অগ্নির
অপি	=	ও	ইব	=	মতো
সহজম্	=	স্বাভাবিক	সর্বারম্ভাঃ	=	সকল কর্মই (কোন না কোন)
কর্ম	=	কর্ম			
ন, ত্যজেৎ	=	ত্যাগ করবে না;	দোষেণ	=	দোষের দ্বারা
হি	=	কেননা	আবৃতাঃ	=	আবৃত আছে।

অসক্তবুদ্ধিঃ, সর্বত্র, জিতাত্মা, বিগতস্পৃহঃ,
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্, পরমাম্, সন্ন্যাসেন, অধিগচ্ছতি॥ ৪৯॥

আর হে অর্জুন –

সর্বত্র	=	সর্বত্র	সন্ন্যাসেন	=	সাংখ্যযোগের দ্বারা (ও)
অসক্তবুদ্ধিঃ	=	আসক্তিশূন্য বুদ্ধি–বিশিষ্ট,	পরমাম্	=	পরম
বিগতস্পৃহঃ	=	স্পৃহারহিত (এবং)	নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্	=	নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিকে
জিতাত্মা	=	বিজিত অন্তঃকরণ–যুক্ত পুরুষ	অধিগচ্ছতি	=	প্রাপ্ত হয়।

সিদ্ধিম্, প্রাপ্তঃ, যথা, ব্রহ্ম, তথা, আপ্নোতি, নিবোধ, মে,
সমাসেন, এব, কৌন্তেয়, নিষ্ঠা, জ্ঞানস্য, যা, পরা ॥ ৫০ ॥

এইজন্য –

কৌন্তেয়	=	হে কুন্তীপুত্র!	যা	=	যা
সিদ্ধিম্	=	অন্তঃকরণের শুদ্ধি–রূপ সিদ্ধিকে	জ্ঞানস্য	=	তত্ত্বজ্ঞানের
			পরা	=	পরা
প্রাপ্তঃ	=	প্রাপ্ত পুরুষ	নিষ্ঠা	=	নিষ্ঠা,
যথা	=	যেমন ভাবে (সাংখ্যযোগের দ্বারা)	(তৎ)	=	তা –
			এব	=	ও (তুমি)
ব্রহ্ম	=	সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে	মে	=	আমার কাছ থেকে
আপ্নোতি	=	প্রাপ্ত হয়	সমাসেন	=	সংক্ষেপে
তথা	=	তথা	নিবোধ	=	জানো।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাককায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
বুদ্ধ্যা, বিশুদ্ধয়া, যুক্তঃ, ধৃত্যা, আত্মানম্, নিয়ম্য, চ,
শব্দাদীন, বিষয়ান্, ত্যক্ত্বা, রাগদ্বেষৌ, ব্যুদস্য, চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী, লঘ্বাশী, যতবাককায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরঃ, নিত্যম্, বৈরাগ্যম্, সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥

হে অর্জুন –

বিশুদ্ধয়া	=	বিশুদ্ধ	নিত্যম্	=	নিরন্তর স্থিত,
বুদ্ধ্যা,	=	বুদ্ধি	ধ্যানযোগপরঃ	=	ধ্যানপরায়ণ পুরুষ
যুক্তঃ	=	যুক্ত	ধৃত্যা	=	সাত্ত্বিক ধারণার দ্বারা
বিবিক্তসেবী	=	নির্জন ও শুদ্ধ দেশ সেবনকারী (আর)	আত্মানম্	=	অন্তঃকরণকে
			নিয়ম্য	=	বশ করে
লঘ্বাশী	=	মিতাহারী,	চ	=	এবং
যতবাক–কায়মানসঃ	=	সংযত কায়মনো–বাক্য যুক্ত (এবং)	শব্দাদীন্	=	শব্দাদি
			বিষয়ান্	=	বিষয়কে
বৈরাগ্যম্	=	দৃঢ় বৈরাগ্যে	ত্যক্ত্বা	=	ত্যাগ করে
সমুপাশ্রিতঃ	=	ভালভাবে স্থিত,	চ	=	ও

রাগদ্বেষৌ	= রাগ (আসক্তি)–দ্বেষ	ব্যুদস্য	= নষ্ট করে–

অহঙ্কারম্, বলম্, দর্পম, কামম্, ক্রোধম্, পরিগ্রহম্,
বিমুচ্য, নির্মমঃ, শান্তঃ, ব্রহ্মভূয়ায়, কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

এবং –

অহঙ্কারম্	= অহঙ্কার	নির্মমঃ	= মমতা রহিত (আর)
বলম্	= বল,	শান্তঃ	= শান্ত অন্তঃকরণ যুক্ত হয়ে
দর্পম্	= দর্প,	ব্রহ্মভূয়ায়	= সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মাতে একীভূত হবার
কামম্	= কাম,	কল্পতে	= যোগ্য হয়।
ক্রোধম্	= ক্রোধ (ও)		
পরিগ্রহম্	= সংগ্রহ		
বিমুচ্য	= পরিত্যাগ করে,		

ব্রহ্মভূতঃ, প্রসন্নাত্মা, ন, শোচতি, ন, কাঙ্ক্ষতি,
সমঃ, সর্বেষু, ভূতেষু, মদ্ভক্তিম্, লভতে, পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

অতঃপর সে –

ব্রহ্মভূত	= সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মাতে একীভাব স্থিত		না। (এরূপ)
প্রসন্নাত্মা	= প্রসন্নচিত্ত পুরুষ (কোনও বস্তুর জন্য)	সর্বেষু	= সমস্ত
ন, শোচতি	= শোক করে না (এবং) (কোনও বস্তুর)	ভূতেষু	= ভূতে (প্রাণীতে)
ন কাঙ্ক্ষতি	= আকাঙ্ক্ষা (ও) করে	সমঃ	= সমভাব যুক্ত যোগী
		পরাম্– মদ্ভক্তিম	= আমার পরাভক্তি
		লভতে	= লাভ করে।

ভক্ত্যা, মাম্, অভিজানাতি, যাবান, যঃ, চ, অস্মি, তত্ত্বতঃ,
ততঃ, মাম্, তত্ত্বতঃ, জ্ঞাত্বা, বিশতে, তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

এবং সেই –

ভক্ত্যা	= পরাভক্তির দ্বারা	অভিজানাতি	= ভালভাবে জেনে
মাম্	= আমাকে –	ততঃ	= সেই ভক্তির প্রভাবে
(অহম্)	= আমি	মাম্	= আমাকে
যঃ	= স্বরূপতঃ যা	তত্ত্বতঃ	= তত্ত্বতঃ
চ	= এবং	জ্ঞাত্বা	= জেনে
যাবান্	= যে প্রভাব বিশিষ্ট	তদনন্তরম্	= তৎকালে (ই)
অস্মি	= হই,	বিশতে	= আমাতে প্রবিষ্ট হয়।
তত্ত্বতঃ	= যথাযথ (অর্থাৎ)		

সর্বকর্মাণি, অপি, সদা, কুর্বাণঃ, মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ,
মৎপ্রসাদাৎ, অবাপ্নোতি, শাশ্বতম্, পদম্, অব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

এবং –

মদব্য– = মৎপরায়ণ নিষ্কাম
পাশ্রয়ঃ কর্মযোগী
সর্বকর্মাণি = সকল কর্ম
সদা = সর্বদা
কুর্বাণঃ = করতে থেকে –
অপি = ও

মৎ প্রসাদাৎ = আমার কৃপাতে
শাশ্বতম্ = সনাতন
অব্যয়ম্ = অবিনাশী
পদম্ = পরম পদ
অবাপ্নোতি = প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বরঃ, সর্বভূতানাম, হৃদ্দেশে, অর্জুন, তিষ্ঠতি,
ভ্রাময়ন, সর্বভূতানি, যন্ত্রারূঢ়ানি, মায়য়া॥ ৬১॥

কেননা –

অর্জুন = হে অর্জুন!
ঈশ্বরঃ = অন্তর্যামী পরমেশ্বর
মায়য়া = (নিজের) মায়ার দ্বারা
যন্ত্রারূঢ়াণি = শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ়
সর্বভূতানি = সমস্ত প্রাণীকে
(তাদের কর্মানুসারে)
ভ্রাময়ন = ভ্রমণ করাতে থেকে
সর্বভূতানাম্ = সমস্ত ভূতপ্রাণীগণের
হৃদ্দেশে = হৃদয়ে
তিষ্ঠতি = স্থিত আছেন।

তম্, এব, শরণম্, গচ্ছ, সর্বভাবেন, ভারত,
তৎপ্রসাদাৎ, পরাম, শান্তিম্, স্থানম্, প্রাপ্স্যসি, শাশ্বতম্॥ ৬২॥

এইজন্য –

ভারত = হে ভারত (অর্জুন)!
সর্বভাবেন = সর্ব প্রকারে (তুমি)
তম্ = সেই পরমেশ্বরের
এব = ই
শরণম্ = অনন্যভাবে শরণ
গচ্ছ = গ্রহণ করো
তৎপ্রসাদাৎ = সেই পরমাত্মার
কৃপাতে (ই)
পরাম্ = পরম
শান্তিম্ = শান্তি (ও)
শাশ্বতম্ = সনাতন
স্থানম্ = পরমধাম
প্রাপ্স্যসি = প্রাপ্ত হবে।

ইতি, তে, জ্ঞানম্, আখ্যাতম্, গুহ্যাৎ, গুহ্যতরম্, ময়া,
বিমৃশ্য, এতৎ, অশেষেণ, যথা ইচ্ছসি, তথা, কুরু॥ ৬৩॥

ইতি = এইরকম (এই)
গুহ্যাৎ = গোপনীয় হতে (ও)
গুহ্যতরম্ = অতি গোপনীয়
জ্ঞানম্ = জ্ঞান
ময়া = আমার দ্বারা
তে = তোমাকে
আখ্যাতম্ = বলা হল।
এতৎ = এই রহস্যযুক্ত জ্ঞানকে
অশেষেণ = সম্পূর্ণ রূপে
বিমৃশ্য = ভালভাবে বিচার করে
(অতঃপর তুমি)
যথা = যেমন
ইচ্ছসি = ইচ্ছা
তথা = সেইরকম
কুরু = করো।

সর্বগুহ্যতমম্, ভূয়ঃ, শৃণু, মে, পরমম্, বচঃ,
ইষ্টঃ, অসি, মে, দৃঢ়ম্, ইতি, ততঃ, বক্ষ্যামি, তে হিতম্॥ ৬৪॥

এরূপ বলা সত্ত্বেও অর্জুনের কোনও উত্তর না পেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন, হে অর্জুন –

সর্বগুহ্যতমম	= সকল গোপনীয় হতেও অতি গোপনীয়	দৃঢ়ম্	= অতিশয়
মে	= আমার	ইষ্টঃ	= প্রিয়
পরমম্	= পরম (রহস্যযুক্ত)	অসি	= আছ,
বচঃ	= বচন (তুমি)	ততঃ	= সেইজন্য
ভূয়ঃ	= পুনরায়	ইতি	= এই
শৃণু	= শোনো (যেহেতু) (তুমি)	হিতম্	= পরম হিতকারক বাক্য (আমি)
মে	= আমার	তে	= তোমাকে
		বক্ষ্যামি	= বলব।

মন্মনাঃ, ভব, মদ্ভক্তঃ, মদযাজী, মাম্, নমস্কুরু,
মাম, এব, এষ্যসি, সত্যম, তে প্রতিজানে, প্রিয়ঃ, অসি, মে॥ ৬৫॥

হে অর্জুন তুমি –

মন্মনাঃ– ভব	= কেবল সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মারূপ আমাতেই অনন্য প্রেম সহ নিত্য–নিরন্তর অচল মনযুক্ত হও (আর)		(আর)
মদ্ভক্তঃ– (ভব)	= পরমেশ্বররূপ আমাকেই অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে নিষ্কামভাবে নাম, গুণ ও প্রভাবের শ্রবণ, কীর্তন, মনন ও পঠন–পাঠন দ্বারা নিরন্তর ভজনকারী হও (এবং)	মাম্	= সর্বশক্তিমান, বিভূতি, বল, ঐশ্বর্য, গাম্ভীর্য উদারতা, বাৎসল্য ও সহৃদয়তা আদি গুণ সম্পন্ন, সকলের আশ্রয় বাসুদেবরূপ, আমাকে,
মদ্‌যাজী (ভব)	= মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা সর্বস্ব অর্পণ করে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম আর কিরীট কুণ্ডল আদি ভূষণযুক্ত পীতাম্বর বনমালা ও কৌস্তুভমণি ধারী বিষ্ণুরূপ আমার অতিশয় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের সঙ্গে বিহ্বলতা পূর্বক পূজনকারী হও।	নমস্কুরু	= বিনয়ভাবপূর্বক ভক্তির সঙ্গে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করো।
		(এবম)	= এইরকম করলে (তুমি)
		মাম	= আমাকে –
		এব	= ই
		এষ্যসি	= প্রাপ্ত হবে (এটি আমি)
		তে	= তোমার প্রতি
		সত্যম্	= সত্য
		প্রতিজানে	= প্রতিজ্ঞা করছি
		(যতঃ)	= (যেহেতু) (তুমি)
		মে	= আমার
		প্রিয়ঃ	= অত্যন্ত প্রিয় (সখা)
		অসি	= হও।

সর্বধর্মান, পরিত্যজ্য, মাম্, একম, শরণম্, ব্রজ,
অহম্, ত্বা, সর্বপাপেভ্যঃ, মোক্ষয়িষ্যামি, মা, শুচঃ॥ ৬৬॥
এইজন্য –

সর্বধর্মান	= সকল ধর্মকে অর্থাৎ সকল কর্মের আশ্রয়কে	ব্রজ	= গ্রহণ করো।
পরিত্যজ্য	= পরিত্যাগ করে	অহম্	= আমি
একম্	= কেবল একমাত্র	ত্বা	= তোমাকে
মাম্	= সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মারূপ আমারই	সর্বপাপেভ্য	= সকল পাপ থেকে
শরণম্	= অনন্যভাবে শরণ	মোক্ষয়ি–য্যামি	= মুক্ত করব,
		মা, শুচঃ	= তুমি শোক কোরো না।

অধ্যেষ্যতে, চ, যঃ, ইমম্, ধর্ম্যম্, সংবাদম্, আবয়োঃ,
জ্ঞানযজ্ঞেন, তেন, অহম্, ইষ্টঃ, স্যাম, ইতি, মে, মতিঃ॥ ৭০॥

চ	= এবং (হে অর্জুন)	তেন	= তা দ্বারা
যঃ	= যে (পুরুষ)	অহম্	= আমি
ইমম্	= এই	জ্ঞানযজ্ঞেন	= জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা
ধর্ম্যম	= ধর্মময়	ইষ্টঃ	= পূজিত
আবয়োঃ	= আমাদের	স্যাম্	= হব –
সংবাদম্	= সংবাদরূপ গীতা শাস্ত্র	ইতি	= এই হল
অধ্যেষ্যতে	= পড়বে অর্থাৎ নিত্য পাঠ করবে,	মে	= আমার
		মতিঃ	= মত।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ দেখুন! গীতা অধ্যায় নং ১৮ শ্লোক নং ৭০ এর মধ্যে "ইষ্ট" শব্দটি রয়েছে, যার অর্থ 'পূজা করা' অর্থাৎ 'পূজ্য' করা হয়েছে। ৬৪ নং শ্লোকেও 'ইষ্ট' শব্দটি রয়েছে। যদি তার অর্থ "পূজ্য দেব" অর্থাৎ "ইষ্ট দেব" করে দেওয়া হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গীতা জ্ঞান দাতার ইষ্ট দেবও ঐ 'পরমঅক্ষর ব্রহ্ম'।

❑❑❑

Note : For circulation amongst the followers of Sant Rampalji Maharaj& like minded people only.